ভূদেব-রচনাসম্ভার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান :

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

সংস্কারবাদী ও সংস্কারক

একদিন কথাপ্রসঙ্গে জনৈক সাহিত্যিক-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আচ্ছা, লোকে ভূদেববাবুকে ভুলিয়া গেল কেন? বাংলা দেশের তিনি একজন সুসন্তান, উনিশ শতকের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক, অনেকে তাঁহাকে Prophet মনে করিত, এখন এমন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন, ব্যাপারটা কি? বন্ধু চট করিয়া বলিলেন, আর কিছুই নয়, তাঁহার রচিত 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বই-খানাই এ জন্য দায়ী। বন্ধুর উল্লিখিত কারণ শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল, বুঝিলাম ভূদেববাবুর অন্য কীর্তি সম্বন্ধে যে মতভেদই থাকুক না কেন, 'পারিবারিক প্রবন্ধ' সম্বন্ধে উপস্থিতগণের মধ্যে মতভেদ নাই। ভূদেববাবু সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা হইতেছিল, কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টি উঠিয়াছিল, কাজেই ব্যাপারটা ঐখানেই মিটিয়া গেল। কিন্তু কথাটা আমি ভুলিতে পারিলাম না, মনের মধ্যে এক কোণে রহিয়া গেল। পরে ভূদেববাবু সম্বন্ধে লিখিবার প্রয়োজন হইলে কথাটা আবার মনে পড়িল, টানিয়া বাহির করিলাম, ভাবিলাম দেখা যাক ঐ লঘু পরিহাসটার মধ্যে সত্যই কোন গুরুতর ইঙ্গিত আছে কিনা।

ভূদেববাবুর সমস্ত রচনা পড়িতে বসিয়া 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধে' চোখ আটকাইয়া গেল, সেদিনকার লঘু পরিহাস গুরুতর আকার ধারণ করিল, বুঝিলাম বই দু'খানা মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি লিখিলেও একালের পাঠকের চক্ষুশূল স্বরূপ হইয়াছে; আরও মনে হইল বই দু'খানা তাঁহাকে ভুলিবার কারণ না হইলেও একালের বিচারে তাঁহার যশের অন্তরায় হইয়াছে সন্দেহ নাই।

'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলির শিরোনামার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ভূদেববাবুর চিন্তাধারার একটা আভাস দেখিতে পাওয়া যাইবে, আরও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার সহিত একালের চিন্তাধারার কোথাও এতটুকু মিল নাই। 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র 'বাল্যবিবাহে' তিনি বাল্যবিবাহের সমর্থন করিয়াছেন। একালে বাল্যবিবাহ কেহ সমর্থন করে না, কোন বালক বিবাহ করে না, দেশের আইন ও দেশাচার প্রতিকূল। 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে বিদ্যালয়ে বা কলেজে শিক্ষার কথা নাই—'স্ত্রীশিক্ষা' বলিতে নারীর গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা

তিনি বুঝিয়াছেন। একালের লোকে সমস্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। 'সতীর ধর্মে' যে কথাই তিনি বলুন, যে-যুগ বিবাহবিচ্ছেদ-আইন স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহার রুচিকর নিশ্চয় হইবে না। 'গহনা গড়ান' প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত এ যুগের কেমন লাগিবে ? সোনার ভরি এক-শ দশ টাকা ; মেয়েদের এখন বেশি ঝোঁক গহনার চেয়ে শাড়ি-ব্লাউসের প্রতি। কুটুম্বতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথিসেবা আর সেকালের আদর্শে হইবার উপায় নাই। একাল দু'কামরা ফ্ল্যাট-বাড়ির বাসিন্দা, তার আবার একটি সোফা-সেটিতে ঠাসিয়া ভর্তি, পরিশ্রমের মর্যাদার অজুহাতে সহোদর ভাই বিতাড়িত; কাজেই ওসব উপদেশ একালের কানে নিরর্থক। 'চাকর প্রতিপালন', 'পশ্বাদি পালন' প্রবন্ধ দুটিও একই কারণে নিরর্থক। দুর্মূল্যের বাজারে চাকরও দুর্মূল্য, আর-এক প্রজন্ম পরে কল-কারখানার অধিকতর প্রসার ঘটিলে আদৌ পাওয়া যাইবে না। শৌখিন কুকুর ছাড়া মানুষের ঘরে অন্য পশুর ভবিষ্যৎ নাই। পিতামহ ঠাকুর, পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভাইভগিনী প্রভৃতি যে সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা হইয়াছে, এখন তাহা শিথিল ; আর কিছুদিন পরে সম্বন্ধটা মানসিক হইয়া দাঁড়াইবে, অন্য কোনপ্রকার দায় এ যুগ স্বীকার করিবে না, সব দায় State-এর ঘাড়ে চাপাইয়া কাক-নিশ্চিন্ত হইবে। 'পুত্রবধূ'র দায়িত্ব আর বাপ-মাকে বহন করিতে হইবে না, যে-ছেলে ইন্দোরে কাজ করে, মাঝে মাঝে পত্রযোগে তাহার ও তদীয় পত্নীর সংবাদ মাত্র বাপ-মা পাইবে। 'কন্যাপুত্রের বিবাহে'র দায়িত্ব হইতেও বাপ-মা একেবারে মুক্তি পাইবে। শিক্ষার প্রসারে ইহা অনিবার্য। নির-পত্যতার জন্য এখন আর লোকে তেমন উদ্বিগ্ন নয়, পরিবার-নিয়ন্ত্রণের আদর্শ গ্রহণ করিয়া লোকে এখন আনাতোল ফ্রান্সের ভাষায় 'Sinning without conceiving' সাধনায় নিযুক্ত। 'সন্তান পালনে'র ভার এখন পাড়ার কিণ্ডারগার্টেন-গুলির উপর—সমাজতন্ত্র আরও প্রকট-মূর্তি ধারণ করিলে রাষ্ট্রীয় শিশুপালনশালা বা State Nursery তাহা গ্রহণ করিবে। সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব এখন কাহার ? আর যাই হোক, বাপ-মায়ের নয়, তাহারা বিদ্যালয়নামধেয় প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত। 'বহু বিবাহ' এখন আর কেহ করে না, আইন বিরূপ। 'বৈধব্যব্রতে' ভূদেব বিধবাবিবাহ-বিরোধী। সমাজ বিধবাবিবাহ স্বীকার করিয়া লইয়াছে, দেশাচারেও বাধা নাই। এইভাবে 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে সমস্ত বা প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের মতিগতি ও ঝোঁক ভূদেবের আদর্শের বিপরীত দিকে। অধিক কি, 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র ভিত্তি পরিবার। সেকালের অর্থে পরিবার এখন আছে কি ? একান্নবর্তিত্ব

তো নাই-ই, এখন কার্যব্যপদেশে বৃদ্ধ পিতা ও উপযুক্ত পুত্র ভিন্নায়। 'আচার প্রবন্ধে'র পরিণাম আরও বিচিত্র। ভূদেবের আদর্শ হইতে যে আমরা কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি সূচীপত্রখানার দিকে একবার তাকাইলে বুঝিতে পারা যাইবে।

বিষয়

তিনি কোথায় আর আমরা কোথায় আছি! তাঁহাকে বিস্মৃত না হওয়াটাই যে বিস্ময়কর!

এখন এইসব পুস্তক রচনায় তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি হিন্দু বাঙালীর 'গৃহ্য-সূত্র' রচনা করিয়াছিলেন। যে যুগে তিনি এসব লিখিতেছিলেন তখনো হিন্দু-বাঙালীর গৃহ ছিল, কাজেই গৃহসূত্রের সার্থকতাও ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ হিন্দু বাঙালী কায়িক অর্থে ও আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহহীন, কাজেই ভূদেবের 'গৃহসূত্র' তাহার মনে রাখিবার কারণ থাকিতে পারে না। এখনকার ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা সম্ভব কিন্তু হিন্দুয়ানি রক্ষা সম্ভব নয়। এখনকার চাকুরে মেয়েদের পক্ষে

ব্রতপূজাদি কতদূর সম্ভব? এখন চাকরো পুরুষের পক্ষে ত্রিসন্ধ্যা কতদূর সম্ভব? ফলত ভূদেববর্ণিত নিত্যাচার ও নৈমিত্তিকাচার দুই-ই অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। ভূদেব অতি মহৎ কার্যে হাত দিয়াছিলেন, কেবল তৎপূর্বের যুগের মতিগতির প্রতি যথেষ্ট সচেতন হন নাই। ভূদেবের দেহান্তের পরে মনস্বী শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছিলেন "আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতশ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুতে দেখিয়াছি।" কথাটি সর্বৈব সত্য। সেই সঙ্গে 'শেষ আদর্শ' কথাটিও সত্য। একটা ধারাকে বহন করিবার লোক না থাকিলে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়, ভূদেববাবু 'শেষ আদর্শ' বলিয়া সাধনার উত্তরপুরুষ না থাকায় তাঁহার আদর্শ ধারক-বাহক পায় নাই; পায় নাই যে, তার কারণ যুগ ক্রমশ সে আদর্শের প্রতিকূল হইয়া উঠিতেছিল, ফলে সুমহৎ চেষ্টা কালাত্যয়দোষে সুমহৎ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। সেকালের প্রবল পবিত্র জীবনজাহ্নবী-তীরে ভূদেব অমূল্য স্ফটিকের ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সেখানে স্নানার্থী নাই, পানার্থী নাই, পূজার্থী নাই, নির্মলপুণ্যবায়ু-সেবীর দল নাই, সমস্ত জনশূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে! কেন এমন হইল? জীবনজাহ্নবী-স্রোত এখন অনেকদূরে সরিয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে নিরর্থক শুষ্ক আচারের মরুবালুরাশি আর সেই সঙ্গে অমূল্য শিলায় রচিত অপূর্বকারুকার্যখচিত সোপানশ্রেণী। সে-সব এখন ঐতিহাসিক ও কৌতূহলীর আশ্রয়, জীবনের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন।

২

উপরে যে কথাগুলি বলিলাম তাহাতে ভূদেবের আসল পরিচয় নাই, বড়-জোর আসল পরিচয়ের আধখানামাত্র রহিয়াছে। বাকি আধখানা তবে কোথায়? হিন্দু-আচারের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠায় তাঁহাকে গোঁড়া ও ধর্মান্ধ করিয়া তোলে নাই, তাঁহাকে উদার ও পরমতসহিষ্ণু করিয়াছে। কোন আচার যথাযথ পালনে মানুষকে গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণ করে না। আচার-পালনের অভাবেই মানুষ উচ্চাদর্শভ্রষ্ট হয়। আচার আদর্শের সোপান। ভূদেব খাদ্য-পানীয় সম্বন্ধে সামাজিক আচার মানিয়া চলিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি অন্যধর্মাবলম্বীর প্রতি উদাসীন বা অসহিষ্ণু ছিলেন? ভূদেবচরিত নামে সুলিখিত গ্রন্থখানি পড়িলে দেখা যাইবে যে তাঁহার বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আদরে ব্রহ্মদেশীয় একটি পরিবার কিছুদিন ছিল। মুসলমান ছাত্রগণের, নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের তাঁহার গৃহে আদরের অভাব ছিল না। তিনি ইংরেজের সহিত পানভোজন করিতেন না কিন্তু বহু উচ্চমনা ইংরেজের

সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল; অনেকের গৃহে তিনি নিজ আচার রক্ষা করিয়া অতিথিরূপে বাস করিয়াছেন। সমবেদনা ও সৌহার্দ্য আচারগত নয়। আধুনিক রাজনীতিকগণ প্রায় সকলেই পানভোজন সম্বন্ধে আচার পালন করেন না, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে নিম্ন বর্ণ, অন্য ধর্ম, ও দরিদ্রের প্রতি ভূদেবের চেয়ে বেশি সমবেদনাপরায়ণ একথা মনে করিবার কারণ নাই। আচারপালনকারী আপন সামাজিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন; আচারপালনে উদাসীনতা অনেক ক্ষেত্রেই হৃদয়ের অসাড়তা মাত্র।

ভূদেব হিন্দু-আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন বলিয়াই ভারতের বৃহৎ হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। ভারতীয় হিন্দুসমাজের যাহাতে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, যাহাতে ঐক্যবোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে চেষ্টা নিরন্তর তিনি করিতেন। এই উদ্দেশ্যেই আন্তঃপ্রাদেশিক সমবর্ণের বিবাহে তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলার ব্রাহ্মণের সহিত মারাঠী ব্রাহ্মণের বিবাহে শাস্ত্র প্রতিকূল নয়, প্রতিকূল দেশাচার। রেল-টেলিগ্রাফের যুগে দেশাচারের ভিত্তি দুর্বল; কাজেই এইরূপ বিবাহ সমবর্ণ-গণের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

একবার ভূদেব ও রাজনারায়ণ বসু এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের মনে হইল, এত কাছে আসিয়া 'পিতৃভূমি' কনৌজ না দেখিয়া যাওয়া অনুচিত। তখন দুইজনে—সেকালে কনৌজ হইতে বাংলায় আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের দুই সুযোগ্য বংশধর—'পিতৃভূমি' ঘুরিয়া আসিলেন। ইহা বাতুলতা বা বাতিক মাত্র নয়, প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দুসমাজের মধ্যে মানসিক ঘনিষ্ঠতাবোধ হইতে ইহা উদ্ভূত। কিন্তু কেবল সামাজিক ঐক্যবোধই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, জন্মভূমি ভারতবর্ষকে একটি দেবীপ্রতিমা-রূপে কল্পনা ও উপলব্ধি না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের পরিচয়ে তিনি লিখিয়াছেন "কতিপয় তীর্থ-দর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাসমার্কণ্ডেয়-সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্যকথন।" সেই গ্যেটের দুটি ছত্রের ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে—

"Ordinary history is traditional, higher History mythical, and highest mystical."

এই শ্লোকের ইঙ্গিতে ভূদেব বলিতে চান যে, তিনি 'traditional history' লিখিতে উদ্যত নন, তিনি ইতিহাসের mythical রূপ-কে অবলম্বন করিয়া mystical রূপ অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতের যাবতীয়-তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ভারতবোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেই সঙ্গে ভারতের

হিন্দু-সাধনার ইতিহাসও বিবৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতের আন্তর বাহ্য মূর্তি একদেহে প্রকট করিয়া তোলা হইয়াছে। পুষ্পাঞ্জলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—

"হিন্দুবিশ্বাসের যে সকল উপাখ্যান আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচায়ক ও কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত ভাবিতেন, তাহা পুষ্পাঞ্জলির গ্রন্থকারের সভক্তিক আলোচনায় যে ফল দিয়াছে তাহা ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হীন নহে।"

এবারে 'পুষ্পাঞ্জলি'র অন্যতর নায়ক স্বয়ং মার্কণ্ডেয়মুনি কি বলিয়াছেন শোনা যাক।—

"ব্যাসদেব প্রশ্ন করিলেন 'ইনি কোন্ দেবী?' মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না দিয়া ব্যাসদেবকে সঙ্গে করিয়া 'তীর্থদর্শন' করাইতে কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী হইয়া কুমারিকা দিয়া কামাখ্যায় লইয়া গিয়া এই গ্রন্থের শেষে বলিলেন 'এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির দর্শন প্রাপ্ত হইলে।' অর্থাৎ ভারতবর্ষই অধিভারতী দেবীর ভৌতিক মূর্তি। তীর্থদর্শনেই তাঁহার পরিক্রমণ করা হয়।"

ভারতভূমিকে দেবী-রূপে কল্পনা বাংলা সাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। পুষ্পাঞ্জলির প্রকাশ ১৮৭৬ সালে, 'আনন্দমঠ'-রচনার অনেক আগে। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় এ ক্ষেত্রে পুষ্পাঞ্জলি কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন।

কিন্তু ভূদেবের ভারতদর্শী কল্পনার এখানেই চূড়ান্ত নয়, তাঁহার ভারত শুধু হিন্দুভারত নয়। মুসলমানসমাজকেও এই ঐক্যবোধের মধ্যে তিনি গ্রথিত করিয়া লইয়াছেন। উনবিংশ শতকে রামমোহন ব্যতীত মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে এমন উদারতা বোধ করি আর কোন বাংলা সাহিত্যিকে দেখা যায় নাই। মুসলমানসমাজের প্রতি ভূদেবের সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার অন্ত ছিল না—তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে সঙ্কীর্ণতাব্যঞ্জক একটি ছত্রও নাই। যে ব্যক্তি নিজের আচার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপরায়ণ পরের আচার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল না হইয়া সে পারে না।

"পৃথিবীতে যত পেগম্বর বা নরদেব এ পর্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়।"—ধর্মচর্য্যা [পারিবারিক প্রবন্ধ]

ধর্মগুরু সম্বন্ধে এমন মত যাঁহার, ধর্ম সম্বন্ধে অন্যথা হইবে কিরূপে?

'সফল স্বপ্ন' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সবক্তগীন চরিত্রটি মহৎ আদর্শের রঙে চিত্রিত। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' লেখক কল্পনা করিয়াছেন শিবাজী আরংজেব-কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত অঙ্গুরী-বিনিময় করিয়াছেন। আয়েষা জগৎ-সিংহের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, ফলে বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমানের গাল খাইতে

হইয়াছে। আর হিন্দুশিরোমণি শিবাজীকে হিন্দুবিদ্বেষী আরংজেবের কন্যার প্রতি অনুরক্ত করায় ভূদেবকে যে কেহ কিছু বলে নাই—গ্রন্থখানির অপ্রচারই তার একমাত্র কারণ। জাতীয় মনের লজিক অনুসারে ভূদেবের হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই অপ্রীতিভাজন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কল্পনার মূলে ছিল ভারতীয় ঐক্যের পরিকল্পনা। আর কি হওয়া সম্ভব?

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে" ভূদেব মহারাষ্ট্রশক্তির নেতৃত্বে ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য ও পুনরুত্থানের চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসজাতীয় কয়খানি গ্রন্থেরই এই এক উদ্দেশ্য—ভারতীয় ঐক্যবুদ্ধি, ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে সংহতিবোধ যাহাতে সকলের মনে জাগ্রত হয়—সেই লক্ষ্যে তিনি লেখনীচালনা করিয়াছেন।

আর এই ঐক্যের বাহনস্বরূপ একটি সাধারণ ভাষাও যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে সেরূপ চেষ্টও তিনি করিয়াছেন। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টাতে বিহার প্রদেশে ফারসী ভাষার ব্যবহার উঠিয়া গিয়া হিন্দী ভাষার প্রচলন হয়। ইহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের "সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাজ" মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল কালক্রমে হিন্দী ভারতের সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ভূদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ ভোলে নাই। উভয় প্রদেশেই "ভূদেব হিন্দী মেডাল" নামে পদক দানের ব্যবস্থা হইয়াছে—ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল-লীভিং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোত্তমকে ইহা দেওয়া হইয়া থাকে।

ফল কথা, প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, প্রদেশনির্বিশেষে সমবর্ণের হিন্দুর মধ্যে, এবং সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যাহাতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। ভূদেবচরিত্রের এই দিকটি এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত। উনিশ শতকে যে-সব মনীষী বাঙালী কল্পনায় অখণ্ড ভারতভূমি দর্শন করিয়াছিলেন, কল্পনার সত্যকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিবার দুশ্চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভূদেব নিঃসন্দেহ তাঁহাদের অন্যতম। এইজন্যই গোড়াতে Prophet বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়াছিলাম।

৩

দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বলেন যে মধ্যযুগে মুসলমান নবাবগণের (পাঠান) উৎসাহ ও বদান্যতার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, বাঙালী পণ্ডিত ও ভাষাধরগণের দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের উপরে পড়ে। এখন, একথা সত্য হইলে নব্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের

মূলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজ সরকারের সাহায্যও অল্প নয়। অবশ্য দুইক্ষেত্রেই উৎসাহ ও সাহায্য পরোক্ষ। রামমোহন হইতে সুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য বাঙালী সাহিত্যিক সরকারী চাকুরে ছিলেন, অনেকে বেশ উচ্চপদাধিষ্ঠিত ছিলেন। উদাহরণ উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন, তৎকালীন সাহিত্যিকগণের নাম একে একে স্মরণ করিলেই দেখা যাইবে যে, কেহ বিচার-বিভাগ, কেহ শাসন-বিভাগ, কেহ শিক্ষা-বিভাগ, কেহ ডাক-বিভাগ প্রভৃতি অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

ভূদেব কলিকাতা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে চাকুরি-জীবন সুরু করিয়া প্রথম শ্রেণীর স্কুল-ইন্সপেক্টর পদে আরোহণ করেন। দেশীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথমে এ পদ লাভ করেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর সরকারী চাকুরি করিয়া ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ধন, মান ও কৃতিত্বের বিচারে তাঁহার চাকুরি-জীবনকে সার্থক বলা যাইতে পারে।

তৎকালীন সাহিত্যিকগণের চাকুরি-জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ সাহিত্যিক কৃতিত্বের সহিত চাকুরি করিলেও অকৃতীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। সঞ্জীবচন্দ্র সরকারী চাকুরিতে খাপ খান নাই, চাকুরি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মধুসূদনের পক্ষে পুলিশ আদালতের দোভাষী-পদ বেখাপ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ হইতে বিদায় গ্রহণের কথা সর্বজনবিদিত। অপর পক্ষে ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ—সকলেরই চাকুরি-জীবন সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ সাহিত্যিক সরকারী চাকুরির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও বাধা-নিষেধের সহিত সাহিত্যের উচ্চাদর্শ মিলাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কাণ্ডজ্ঞান ও নৈতিকজ্ঞানের সুষ্ঠু সমাবেশ হইয়াছিল তাঁহাদের জীবনে। অবশ্য বিদ্যাসাগরের কথা স্বতন্ত্র; গরুড়ের জন্য সুখনীড় নয়।

তৎকালে বাংলা সাহিত্য জীবিকা-দানের সামর্থ্যলাভ করে নাই। এই সব মনীষী সরকারী চাকুরির নিরাপদ আশ্রয় লাভ না করিলে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিতেন, বা আদৌ কিছু রচনা করিতেন কি না জানি না; কিন্তু নব্য বাংলা সাহিত্যের পত্তন হইত কি না সন্দেহ। আরও একটি কথা—তৎকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিধি বিস্তৃত থাকায় এইসব চাকুরিজীবী সাহিত্যিকগণ বাংলাদেশের বাহিরে বিহার উড়িষ্যা ও আসামে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, জন্মলগ্ন হইতেই নব্য বাংলা-সাহিত্য উদার দৃষ্টি লাভ

করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "সপ্ত কোটি"-র আদমসুমারি-গত ব্যাখ্যা কি? তখন বাংলা দেশের জনসংখ্যা নিশ্চয়ই সাত কোটি ছিল না, এখনও নয়। ভূদেবের আন্তঃপ্রাদেশিক প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের মূলে কি? বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিলে এই বোধ কি তাঁহার মনে এমন প্রবল হইত? অখিলভারতীয় ভাষা রূপে হিন্দীর উৎকর্ষসাধনের মূলেও কি ভৌগোলিক সীমার বিস্তার সক্রিয় নয়? ফারসী ভাষার বদলে হিন্দীকে বিহারের শিক্ষার ও আদালতের ভাষা রূপে স্বীকার করাইয়া লওয়াকে ভূদেব জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মনে করিতেন। চাকুরির সূত্রে বিহারে অবস্থান না করিলে কি ইহা সম্ভব হইত? সরকারী চাকুরির বিধিনিষেধ একদিকে তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনকে যেমন গণ্ডীবদ্ধ করিয়াছিল, আর একদিকে সরকারী চাকুরির নিরাপদ আশ্রয়, নিয়মিত অর্থ ও চাকুরি-সীমার বিস্তার তাঁহাদের উচ্চতর জীবনকে অসীম স্বাধীনতা দান করিয়াছিল। বলা যাইতে পারে যে, সরকারী চাকুরির কাকের বাসায় কল্পনার কোকিলের ছানা লালিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবলই কি কোকিলের ছানা? সত্যই শিশু-গরুড় নয় কি? বাংলা সাহিত্যের শিশুগরুড় ঐ অপরিণত অবস্থাতেই চন্দ্রলোক হইতে সুধা আহরণের স্বপ্ন দেখিতেছিল। রাজপুরুষগণ বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, কৃতী ও বিশ্বস্ত রাজপুরুষগণের লেখনীমুখ ভারতের মুক্তিজাহ্নবীর ভাষাপথ খনন করিতেছে। নব্য বাংলাভাষা রাজনৈতিক চেতনার ধাত্রী, পরবর্তী কালে রাজনীতিকগণ ভাষাধাত্রীর কোল হইতে সেই শিশুকে গ্রহণ করিয়া সাবালক করিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে মূল কৃতিত্ব সাহিত্যিকগণের, স্থূল কৃতিত্ব রাজনীতিকগণের। এই মূল কৃতিত্বে ভূদেবের দাবী সামান্য নয়। এদেশে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি যেসব লেখনীধর করিয়াছেন সেই রামমোহন, রাজনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেবের নামও অবশ্য স্মরণীয়।

৪

১৮২৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতার হরীতকীবাগানে ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। তিনি নয় বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল কুলপ্রথানুযায়ী পুত্র সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠুক। কিন্তু বালকের রোখ হইল যে সে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিবে। কাজেই ১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভূদেব প্রবিষ্ট হইলেন। যথাসময় জুনিয়র বিভাগের পাঠ সাঙ্গ করিয়া

তিনি ১৮৪১ সালে সিনিয়র বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পাস করিয়া ৬ বৎসর ৫ মাস কাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিবার পর তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু ও গৌরদাস বসাক প্রসিদ্ধ। হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়েই ১৬ বছর বয়সে তাঁহার বিবাহ। অতঃপর আরম্ভ হয় তাঁহার কর্মজীবন।

এই সময় রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূদেব ৬০৲ টাকা বেতনে তাহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। লৌকিক বিষয় শিক্ষাদানের সঙ্গে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা এই বিদ্যালয়ে থাকায় কাজটি তাঁহার মনঃপূত হয়। কিন্তু কতকগুলি কারণে একবছর পরে কাজটি ছাড়িয়া দিতে তিনি বাধ্য হন।

তখন তিনি আর চাকুরি করিবেন না বলিয়া স্থির করেন এবং কৌলিক প্রথানুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবৈতনিক বিদ্যাসত্র খুলিবার আশায় চন্দননগর সেমিনারী নামে একটি বিদ্যালয় চন্দননগরে স্থাপিত করেন। পিতা বৃদ্ধ, তিনি বহুকষ্টে সংসার চালাইতেছেন, কন্যার বিবাহের জন্য ঋণ করিতেছেন—দেখিয়া তিনি সরকারী কাজের সন্ধান সুরু করেন। কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষক-পদ রূপে সরকারী চাকুরির ক্ষীণ সূত্র তাঁহার হাতে আসিল। সেই সূত্র অনুসরণ করিয়া চেষ্টার্জিত কৃতিত্বের সোপানে সোপানে তিনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম পদ লাভ করিয়া স্কুল-ইন্সপেক্টর হইলেন। তখন ঐ পদ ইংরেজগণ ছাড়া অপর কাহাকেও দেওয়া হইত না। এমন প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঐ পদপ্রাপ্তি ভূদেবের অসামান্য মনীষা ও কৃতিত্ব সূচিত করে।

চাকুরির সঙ্গে সমান্তরালভাবে গ্রন্থরচনা ও সাময়িকপত্র-পরিচালনা চলিতে লাগিল। শিক্ষাদর্শন ও সংবাদসার ভূদেবপরিচালিত শিক্ষাবিষয়ক প্রথম সাময়িক পত্র। পরে তিনি দেশবিখ্যাত এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহের সম্যক ভার গ্রহণ করেন। বস্তুত শেষোক্ত পত্রখানি তাঁহার শিক্ষানীতি, মনীষা ও আদর্শের বাহন। বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন বঙ্গদর্শন, দেবেন্দ্রনাথের যেমন তত্ত্ববোধিনী, অক্ষয় সরকারের যেমন সাধারণী—এডুকেশন গেজেটও তেমনি ভূদেবের বাণীবাহী দূত। এই পত্রখানিকে আদর্শনিষ্ঠ রাখিয়াও যে সার্থক ব্যবসায়ে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার আর-একটি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

চাকুরিজীবনে ছুটি লইয়া ও চাকুরি-অন্তে অবসরজীবনে ভূদেব ভারতের নানাস্থানে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। একবার তিনি সিংহল ও ব্রহ্মদেশেও

গিয়াছিলেন। দেশভ্রমণ তাঁহার বাতিকের মধ্যে ছিল।

১৮৮৯ সালে তিনি পিতার নামে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ও মাতার নামে ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় স্থাপন করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে এই দুই সংস্থার আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে উপার্জিত বিত্তের অর্ধাংশ (দেড় লক্ষ টাকার উপরে) দান করেন।

১৮৯৪ সালে ১৫ই মে রাত্রিকালে পরিবার পরিজন-পরিবেষ্টিত অবস্থায় সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে এই ধর্মপ্রাণ মনীষী শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

লৌকিক ও আত্মিক অর্থে এমন একটি সুসম্পূর্ণ, সার্থক জীবন বাঙালীসমাজে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

৫

উনিশ শতকের বাঙালী মনীষিগণের ইতিহাস যতই চিন্তা করি, বিস্ময় বাড়িতে থাকে। শুনিয়াছি যে, শীতের দেশে বরফ গলিয়া গেলে একরাত্রে গাছ ফুলে ভরিয়া যায়। এ-ও যেন অনেকটা সেইরূপ ঘটিয়াছিল। নব্য মনীষিগণের আদি রাম-মোহনকে (১৭৭৪) ধরিলে আর সে ধারার উপান্তে অবনীন্দ্রনাথকে (১৮৭১) ধরিলে এক-শ বছরের মধ্যে কি কাণ্ডই না ঘটিয়া গেল! বেশ বুঝিতে পারা যায় প্রচণ্ড জীবনীশক্তি অন্তর্লীন ছিল দেশে, আর তাহা স্তরবিশেষে আবদ্ধ ছিল না, অভিজাত, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সর্বত্র বিস্তারিত ছিল। অভিজাত ঘরের সন্তান রবীন্দ্র-নাথ, অবনীন্দ্রনাথ; মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র; দরিদ্র-ঘরের সন্তান বিদ্যাসাগর, বিত্তনিরপেক্ষভাবে দেশের জীবনীশক্তির অধিকারী ছিলেন। আর সকলেরই ললাটে ভারতের পুরাণী প্রজ্ঞা নব্য শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শ করাইল, তাঁহারা ঘুম ভাঙিয়া প্রথমে যাহার পুণ্য মুখচ্ছবি দর্শন করিলেন সে ঐ পুরাণী প্রজ্ঞা। বাংলাদেশের এই সময়কার মানসিক জাগরণের ইতিহাস যথাযথভাবে লিখিত হইলে দেখা যাইবে: সে বিবরণ অন্য কোন দেশের অনুরূপ ইতিহাসের চেয়ে কম বিস্ময়কর, কম বিচিত্র, কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৈচিত্র্যের কথাটাই একটু বলি। বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের সমান্তরাল জীবনকথা মনে উদিত হওয়া অসম্ভব নয়, দু'য়ে এত মিল আবার এত অমিল। একই বিধাতা দুইজনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু এক মেজাজে নিশ্চয় সে সৃষ্টিকার্য হয় নাই।

বিদ্যাসাগর ও ভূদেব সাত বছরের ছোটবড়, মৃত্যুতেও দুজনে তিন বছরের

আগে পিছে ; কাজেই বলা চলে যে, তাঁহাদের জীবন সমান্তরাল। দুজনেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান, দুজনেরই উপরে পিতামাতার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ও সর্বশুভকর। দুজনেই সংস্কৃত কলেজে বিদ্যারম্ভ করেন। আর শিক্ষাবিভাগেই দুজনে চাকুরি করিয়া শিক্ষাবিস্তারে সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন ; আর ঐ শিক্ষাবিস্তার-কল্পেই মূলত তাঁহাদের লেখনী ধরেন। মিলের বোধ করি এখানেই শেষ।

ভূদেব ও বিদ্যাসাগরের চেহারার অমিল অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু অমিলের ঐ শেষ নয়, সূত্রপাত। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি দুজনেরই ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে দুজনের মত ভিন্ন। বিদ্যাসাগর বেদান্তদর্শনকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন, ভূদেব বেদান্তদর্শন-শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া প্রভূত অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর প্রতি বিদ্যা-সাগরের অসীম অশ্রদ্ধা, তাহাদের দিয়া দেশের কাজ হইবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল ; ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রতি ভূদেবের শ্রদ্ধার অবধি ছিল না, তাহাদের উপরে আশাভরসাও রাখিতেন। বিদ্যাসাগরের আস্থা নব্যশিক্ষিতগণের উপরে, ভূদেব সে বিষয়ে নীরব। হিন্দু আচার সম্বন্ধে ভূদেব অসীম রক্ষণশীল, সেগুলি ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার জন্যই যেন বিদ্যাসাগরের জন্ম, তিনি কিছুই মানিতেন না। বিদ্যা-সাগর বিধবাবিবাহের অনুকূল, ভূদেব প্রতিকূল। ভূদেব স্ত্রীশিক্ষা বলিতে বোঝেন গার্হস্থ্যশিক্ষা, বিদ্যাসাগর সরাসরি বোঝেন ইংরেজী বাংলা লেখাপড়া শেখা ; ঘাটে ঘাটে অমিল। আয়ে-ব্যয়ে, কর্তব্যপালনে, দানে-ধ্যানে, মিতাচারে ও মিতব্যয়িতায় ভূদেব আদর্শ গৃহী ; বিদ্যাসাগর গৃহহীন। ভূদেবের শেষজীবন পুত্রপৌত্র-স্বজন-পরিবার-পরিবৃত, বিদ্যাসাগরের শেষজীবন স্ত্রীপুত্রপরিত্যক্ত, একক। ভূদেব হিন্দুসমাজের প্রতি কর্তব্যপালন করিয়া মানব-সমাজের প্রতি কর্তব্য করা যায় মনে করিতেন, বিদ্যাসাগর মানুষের প্রতি কর্তব্যপালন করিলেই হিন্দুসমাজের উপকার হইবে মনে করিতেন। ভূদেব আদর্শনিষ্ঠ, Idealist ; বিদ্যাসাগর কর্মনিষ্ঠ, Practi-cal। একজনের প্রশ্ন—Why ? অপর জনের জিজ্ঞাসা—How ? ভূদেব মানুষের মতো মানুষ, কিন্তু বিদ্যাসাগর নব্য মানুষ, modern man। মিলের মধ্যে কি প্রচণ্ড অমিল—অথচ দুজনেই বাংলাদেশের একই মাটিতে গড়া।

এখন এ রকম বৈচিত্র্য কেবল এ দুজনের ক্ষেত্রে নয়, প্রায় সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট। বৈচিত্র্যের অনুধাবন কিছু স্বরূপের সন্ধান দিতে পারে আশায় এতখানি বিস্তারে বলিলাম।

ভূদেবের প্রথম পুস্তক 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে, তখন তাঁহার বয়স উনত্রিশ বছর। তারপর নিয়মিতভাবে তাঁহার গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইতে থাকে। সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ পুস্তক। তাঁহার মৃত্যুর পরে, পূর্বে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাঁহার সাকুল্য পুস্তকসংখ্যা ১৫।১৬ খানির বেশি নয়।

তাঁহার পুস্তকগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, (১) বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত, (২) হিন্দু সমাজের জন্য লিখিত, এবং (৩) সাধারণের জন্য লিখিত।

পাঠ্যপুস্তক রচনার তাগিদে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম। জন্মলগ্নের এই লক্ষণ (—আর একটু হইলেই অভিশাপ শব্দটি প্রয়োগ করিতেছিলাম—) হইতে বাংলা সাহিত্য আজও মুক্তি পায় নাই। আর প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যিক কিছু কিছু "পাঠ্যপুস্তক" লিখিত বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন (পদ্যে), রবীন্দ্রনাথ তিন প্রধানের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের আসন একটু স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ সাহিত্যরচনা করিয়া অবসরকালে পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বাংলা গদ্যকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, পাঠ্যগ্রন্থ রচনার তাগিদ না থাকিলে বিদ্যাসাগর লেখনীধারণ করিতেন কিনা সন্দেহ! (অবশ্য বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিতর্ক উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অবশ্যই লেখনীধারণ করিতে হইত)। সাহিত্য বিদ্যা-সাগরের লেখনীর গৌণফল, মুখ্যফল পাঠ্যগ্রন্থরচনা। ভূদেবের আসন এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি। তিনি যে কলমে পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার সেই কলমই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। আমার বিশ্বাস পাঠ্যগ্রন্থরচনার তাগিদ না থাকিলেও তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিতেন। বিদ্যাসাগর ও ভূদেব ঘনিষ্ঠভাবে শিক্ষাবিভাগের সহিত সংযুক্ত থাকায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেন, সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা পাঠ্য-পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তবে একথা স্বীকার্য যে বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস বা শকুন্তলায় যে সাহিত্যরস আছে ভূদেবের পাঠ্যপুস্তকে তাহার অভাব।

হিন্দু সমাজের জন্য লিখিত গ্রন্থের মধ্যে পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২) ও আচার প্রবন্ধ (১৮৯৪) শ্রেষ্ঠ। এই দুখানিকে বাঙালী হিন্দু গৃহস্থের অবশ্যপালনীয় "গৃহ্যসূত্র" বলা যাইতে পারে, অন্তত সেই উদ্দেশ্য সাধনের আশাতেই লিখিত। এ

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, এগুলি কেবল তাঁহার মতামত মাত্র নয়। প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম বাঙালী হিন্দু গৃহস্থের যে-ভাবে বোঝা উচিত, যে-ভাবে পালন করা উচিত সেই ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে। তাছাড়া এগুলির সঙ্গে তাঁহার পরিবারের আচরণ জড়িত। 'ভূদেবচরিত' নামে সুলিখিত জীবনী পড়িলে পারিবারিক প্রবন্ধের সহিত তাঁহার পরিবারের, আচার প্রবন্ধের সহিত তাঁহার আচারের যোগাযোগ বুঝিতে পারা যাইবে। পারিবারিক প্রবন্ধের প্রায় প্রত্যেকটি নিবন্ধের মূলে ভূদেব-পরিবারের, পিতামহ সার্বভৌম ও পিতা তর্কভূষণের সংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ। বলা অন্যায় হইবে না যে, পারিবারিক প্রবন্ধের উপদেষ্টা ভূদেব স্বয়ং (কোন কাল্পনিক ব্যক্তি নয়)। পিতামহঠাকুর নিবন্ধের পিতামহ সার্বভৌম, পিতামাতা নিবন্ধের পিতামাতা বিশ্বনাথ ও ব্রহ্মময়ী। যে-ভাবে তিনি নিজে সন্তানপালন করিয়াছেন, পুত্র-কন্যার শিক্ষা দিয়াছেন, গৃহধর্ম পালন করিয়াছেন, প্রবন্ধগুলি তাহারই বিবরণ। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।" বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় এগুলি নীরস শাস্ত্রোক্তি হয় নাই, সরস হইয়াছে, অনেক সময়ে গল্পের রসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' নামের সহিত যে নৈরস্যের স্মৃতি সাধারণের মনে সঞ্চিত তাহা সমূলক নয়।

ভূদেবের সাহিত্যগ্রন্থগুলি দুইভাগে বিভক্ত—উপন্যাস ও প্রবন্ধ।

১৮৫৬ (?) সালে প্রকাশিত "ঐতিহাসিক উপন্যাস" নামক গ্রন্থে দুইখানি উপন্যাস আছে। সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়। গ্রন্থের ভূমিকায় ভূদেব বলিতেছেন "ইংরাজিতে 'রোমান্স অব্ হিস্টরি' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া সফল স্বপ্ন নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। অঙ্গুরীয় বিনিময় নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"

সফল স্বপ্ন উপন্যাসের নায়ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ সবক্তগীন। এই মুসলমান বীর-পুরুষের আদর্শ চরিত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অঙ্কিত।.

দ্বিতীয় উপন্যাস অঙ্গুরীয় বিনিময়ে শিবাজী ও আরংজেব-কন্যা রোশানারার প্রণয়-কাহিনী বর্ণিত। আজ এই উপন্যাসখানির মূল্য তেমন হয়তো নাই, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ইহার অসীম মূল্য বলিয়া আমার ধারণা। দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) জগৎসিংহ ও আয়েষার প্রণয়কাহিনীর চিত্রমূল শিবাজী ও রোশানারার প্রণয়কাহিনী। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে দূষিয়াছেন যে তিনি স্কটের উপন্যাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু হাতের কাছে বিদ্যমান অঙ্গুরীয় বিনিময়ের কথা কাহারও মনে পড়ে নাই কেন জানি না। শিবাজী ও জগৎসিংহের মধ্যে মিল

অধিক না হইতে পারে কিন্তু রোশানারা ও আয়েষার মিল স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেই প্রেমে অপ্রমত্ততা, প্রেমাস্পদের কল্যাণের জন্য সেই দুঃসহ আত্মত্যাগ, মানসিক ও কায়িক সৌন্দর্যের সেই বিচিত্র সমাবেশ, নারীদেহে পুরুষাধিক সেই বীর্য, এত মিল চোখে পড়িল না কেন তাই ভাবি। আবার অঙ্গুরীয় বিনিময়ে বর্ণিত আরংজেবের রঙমহলের বর্ণনা রাজসিংহে বর্ণিত ঐ প্রসঙ্গকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াও মনে হয়। আমার ধারণা সত্য হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের ও তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সহিত ভূদেবের উপন্যাসের প্রভাবাত্মক যোগাযোগ সূচিত করে। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য কি যথেষ্ট প্রমাণ হয় না। আর, দুইখানি উপন্যাসেই দেখিতে পাওয়া যায় ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ভূদেব যথার্থ হিন্দু ছিলেন বলিয়াই এমন সম্ভব হইয়াছে। যথার্থ হিন্দু পরধর্মবিদ্বেষী হইতে পারে না। কেবল পলিটিক্যাল হিন্দুর পক্ষেই পরধর্মবিদ্বেষ সম্ভব।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫)* পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিজয়ী হইলে ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস কি রকম হইতে পারিত তাহারই কাল্পনিক বিবরণ। লেখক কল্পনা করিয়াছেন যে শিবাজীর বংশধরের নেতৃত্বে, পেশবার পরিচালনায় ভারতবর্ষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক ও অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইত। উক্তরূপে সঙ্ঘবদ্ধ ভারতের বিবরণ ও সংবিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িলে লেখকের মনের গতিবিধি সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে। অঙ্গুরীয় বিনিময়ে নায়ক শিবাজী, এখানে নায়ক শিবাজীর বংশধর। বোঝা যায় যে, মহারাষ্ট্রশক্তির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও নির্ভর ছিল। ভূদেবের এক পূর্বপুরুষ ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যোগদানের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন, পূর্ব-পুরুষের মহারাষ্ট্রপ্রীতি উত্তরপুরুষে বর্তিয়াছে। বইখানার সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হোক, ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬) "কতিপয় তীর্থ দর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস-মার্কণ্ডেয়-সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য কথন।"

ভূদেবলিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস কিভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসকে ও প্রথম উপন্যাসকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াছি। পুষ্পাঞ্জলি ও আনন্দমঠ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ১৮৭৬ সালের পুষ্পাঞ্জলি ১৮৮২ সালের আনন্দমঠে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

---

* "ইহা এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ই কার্তিক হইতে প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যায় করিয়া প্রকাশিত হইত।"

আনন্দমঠের দেবীমূর্তি ভারতবর্ষ। * পুষ্পাঞ্জলিতে দেবীদর্শনান্তে "ব্যাসদেব প্রশ্ন করিলেন, ইনি কোন্ দেবী? মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না দিয়া ব্যাসদেবকে সঙ্গে করিয়া তীর্থদর্শন করাইতে কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী হইয়া কুমারিকা দিয়া কামাখ্যায় লইয়া গিয়া এই গ্রন্থের শেষে বলিলেন, এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্ত্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইলে।" অর্থাৎ ভারতবর্ষই অধিভারতী দেবীর ভৌতিক রূপ। তীর্থদর্শনেই তাঁহার 'পরিক্রমণ' করা হয়।"— [ভূদেবচরিত, ২৪শ অধ্যায়, ২য় ভাগ]

সন্দেহের কিছু অবশিষ্ট থাকে কি? থাকিলে পুষ্পাঞ্জলির অষ্টম অধ্যায় এবং আনন্দমঠের ১ম ভাগ ১১শ পরিচ্ছেদ পাশাপাশি পড়িলেই বাকি সন্দেহটুকু লোপ পাইবে। দুই স্থলেই দেবীমূর্তির ব্যাখ্যাচ্ছলে মাতৃমূর্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ মাতার আধিভৌতিক রূপ ভারতবর্ষ। তবে প্রভেদের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলিতে হিন্দু ধর্মের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে, আনন্দমঠে জোর দেওয়া হইয়াছে হিন্দু জাতীয়তার উপরে। আর প্রভেদ ভূদেব ও বঙ্কিমের সাহিত্যশক্তিতে। ভূদেব খনি হইতে সোনা তুলিয়াছেন, বঙ্কিম সেই সোনাতে রচনা করিয়াছেন অপূর্ব মূর্তি। ভূদেব শ্রমিক, বঙ্কিম শিল্পী, দু'য়ে মিলিয়া সম্পূর্ণতা।

ভূদেবরচিত রসসাহিত্যের মূল্য যাহাই হোক, তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মূল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রবন্ধ। শুধু তা-ই নয়, বইখানা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। এমন পুস্তকের বর্তমানকালে অনাদর বাঙালী পাঠকের মনোভাব সূচিত করে। কিন্তু এমন অনাদর সব সময়ে ছিল না। জন্মলগ্নে বইখানি মনীষিগণকর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিল।

রাজনারায়ণ বসু গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি এবং সম্মিলনের ও উদ্যমের মহামন্ত্র স্বরূপ।" ‡

সার চার্লস ইলিয়ট এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৩ সালের অধিবেশনে

* সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন—হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—ইত্যাদি। (৮ম পরিচ্ছেদ, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দমঠ)

‡ [ভূদেবচরিত, ৪৩ অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ।

বলিয়াছিলেন—"No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western phi'osophy have made an equal share."

এই মহাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান সম্ভব নয়, আর উচিতও নয়; একজন মনীষীর জীবন-অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ রত্ন যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করা আবশ্যক, সংক্ষেপে জানিয়া ফেলিবার চেষ্টা অশোভন। এই গ্রন্থে লেখক 'জাতীয়ভাব' শব্দের দ্বারা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমকে বুঝিয়াছেন। জাতীয়তা সম্বন্ধে এযুগে সকলকেই চিন্তা করিতে হইয়াছে; রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই জাতীয়তা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভূদেবের মতের সঙ্গে তাঁহাদের মতের মৌখিক মিল আছে সত্য (মতপ্রকাশে ভূদেব রাজনারায়ণ ছাড়া অন্য সকলের পুরোবর্তী), কিন্তু ভূদেবের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তাঁহার অভিমত পূর্ণাঙ্গ, সর্বতোব্যাপী। আর সকলে যাহা খণ্ডশ প্রকাশিত—ভূদেবে তাহা সর্ব-অবয়ব-সমন্বিত। ভূদেবের জাতীয়তা সম্বন্ধে ধারণাকে অনায়াসে উনিশ শতকের বাঙালী-মনীষীর ধারণা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে তাঁহার সিদ্ধান্ত উপসংহার উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

"ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারত-সমাজের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয়ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয়ভাবটি মনুষ্যহৃদয়ের খুব উচ্চভাব বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চভাব নয়। জাতীয়ভাব একটি মিশ্রপদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা দুইই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অতি উদার ভাব; আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাব। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় পণ্ডিতেরা ইহার উৎকর্ষের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যত বড় বড় লোক সকলেরই হৃদয় এই ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপে স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিবৎসল, তাঁহারাই নরকুলে দেবতা। নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকটা ঐরূপ। উঁহারাও স্বদেশ এবং স্বজাতি বাৎসল্যের যথেষ্ট গৌরব করেন—কিন্তু প্রাচীন গ্রীক এবং

রোমীয়েরা যতদূর করিতেন, ততটা করেন বলিয়া বোধ হয় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—স্বদেশানুরাগের মূল অভিমান; ইহার শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-বিটপাদি বাহ্য আড়ম্বর; ইহার কাণ্ড পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ; ইহার ফলপুষ্পাদি যেমন স্বদেশের সমৃদ্ধি, তেমনি পরদেশের পীড়ন; ইহা একটি দোষে-গুণে জড়িত উপধর্ম্ম মাত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জাতীয়ভাবটিকে উপধর্ম্ম বলিয়া নিন্দাও করেন নাই, আর উহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াও ব্যাখ্যাত করেন নাই। তাঁহারা এক পক্ষে স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশেই সমুদায় পবিত্র তীর্থের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বদেশেরই আপাদমস্তক মহাদেবী সতীর দেহদ্বারা বিনির্ম্মিত এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার স্বজাতীয় আর্য্যগণকেই প্রকৃত-জ্ঞানের অধিকারী, বিশুদ্ধ-আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃশরীর-প্রসূত বলিয়াছেন; আর ভারতবর্ষের বহির্ভাগকে অপকৃষ্ট দেশ এবং তদধিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গালি দিয়াছেন—পক্ষান্তরে, তাঁহারাই সর্ব্বত্র সাম্য এবং একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। জাতীয়ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে—উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতিসোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়।

জাতীয়ভাবটি হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক-ভিন্ন অপরজাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ—অগস্ট কোম্‌টির মতানুযায়ী-দিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে, আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর

যে জাতীয়ভাব সেটি আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীররক্ষার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্ব্বজনীন প্রীতিকে হৃদয়-নিহিত করিয়া ভারতবাসী স্বদেশীদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃপুরুষোত্তমের প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্ম্মসূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্রসহায়ে আপনার রক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যে কু শিক্ষালব্ধ স্বাতন্ত্রিকতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরিহার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন, এবং আত্মসমাজকেই ধর্ম্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ় ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে এই স্বজাতিবাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যাবৃদ্ধিকর, ধনবৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর কার্য্য সকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল ঐ সকল কার্য্য সত্যাবলম্বনে, সতেজে সুবিস্তৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকশিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতর আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পর-জাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত অংশকে মানিয়া লইতেন, কমা-সেমিকোলনটি অবধি বদল করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। রবীন্দ্র-নাথ বলিয়াছেন যে "হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও

জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল।" ভূদেব একথা সানন্দে মানিয়া লইতেন।

সামাজিক প্রবন্ধের আর একটি অংশ উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। অধ্যায়টির নাম নেতৃপ্রতীক্ষা। ভূদেব সর্বভারতীয় নেতার প্রয়োজন অনুভব করিতেন, তাঁহার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী বিশ্বাস করিতেন এবং ইতিমধ্যেই তিনি জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলে অচিরে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়াই মনে করিতেন। উক্ত নেতার গুণ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

"ভারতভূমি সত্যসত্যই রত্নপ্রসবা। এখানে প্রকৃত বড়লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদ্গত হয়। তাহা না হইলে এত শত শত নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে কেন? যাঁহারা ছোটখাট যেরূপ হউক এক একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু না কিছু মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে।

তবে কি যে কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে তাহারই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়? তাহাও নহে। কিন্তু বরং তাহাও ভাল, তথাপি কেহ কোন উদ্ভাবনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তাঁহার প্রতি অসূয়াবান্ হওয়া ভাল নয়। পরন্তু যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটি লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি-প্রয়াসী হইবেন। (২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। (৪) তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধপাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরই সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্নমাত্র পাইলেই ভগবদ্‌বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্‌যদ্‌-বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং ॥"

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পুর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাসমাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই, দেশমধ্যে যদি প্রকৃত বড়লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

আমার বোধ হয় যে, ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটি আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার উৎকর্ষসাধন, মনের সংশয়চ্ছেদন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভশান্তন করিবার জন্য স্বজাতিমধ্যে একজন নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে। সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক। কারণ ভগবদ্‌বাক্য আছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের উদয় হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।

ঐ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্য্যকলাপ, ব্যবহারপ্রণালী, এবং মনের ভাব তদনুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে।

নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কোথায় হইবে, কখন হইবে, তাহার কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব সেই ঘটনা তাঁহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই এরূপ মনে করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্ব্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইহা হইতেই আমাদের জন্মভুমি যশের মালা ধারণ করিতে পারেন, ইহা হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মধনের সম্বর্দ্ধন হইয়া মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে

পারে। কোন একটি মনুষ্যশিশুর ভাবী অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, বা কি হইতে পারে না, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাখিয়া আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের সুশিক্ষার প্রতি নির্দ্দিষ্টরূপে নিরন্তর যত্ন করিলে সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতেও নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয় সেইরূপ হৃদয়বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকাদেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। শিক্ষাকার্য্য ও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপি-কুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্দ্ধনচেষ্টার সহিত স্বজাতিবাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।"

সামাজিক প্রবন্ধের প্রকাশকাল ১৮৯২ সাল। রবীন্দ্রনাথ আরও পরবর্ত্তী কালে (১৯০৭) মহানেতার আবির্ভাব আসন্ন অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই নিশ্চিত জানিতেন না যে তাঁহাদের আশা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হইয়াছে—অপরিচয়ের অন্তরালে মহাপুরুষ নেতা তৎপূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছেন।

সামাজিক প্রবন্ধের ন্যায় গ্রন্থ ইউরোপীয় কোন প্রধান ভাষায় লিখিত হইলে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করিত, বাংলা ভাষায় অনূদিত হইত এবং কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে পঠিত হইত। বাংলা ভাষায় লিখিত বলিয়াই কি বাঙালীর সমাদরে বঞ্চিত থাকিবে এই বঙ্গগৌরব গ্রন্থখানি? কেবল কলেজের সাহিত্য-শ্রেণীতে নয়, সমাজবিদ্যা ও রাজনীতির শ্রেণীতেও ইহা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। আর বাঙালীর চিন্তার ফল সর্বভারতের ক্ষেত্রে যাঁহারা ছড়াইয়া দিতে আগ্রহী—এ. বইখানা তাঁহাদের উদ্যোগে প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হওয়া আবশ্যক। সাহিত্য আকাদামী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইলে বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে।

ভূদেব ও রামেন্দ্রসুন্দরকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বলা অন্যায় হইবে না। নিরলঙ্কার ঋজু ভাষা, জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, অটুট তথ্যনিষ্ঠা, বিচারভূয়িষ্ঠ অপ্রমত্ত গতি, যুক্তিশৃঙ্খলের অচ্ছেদ্য বন্ধন ও পরমত-সহিষ্ণুতা এই শ্রেণীর প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ গুণ। ভূদেব ও রামেন্দ্রসুন্দরে তাহার প্রভূততম বিকাশ। প্রাবন্ধিকের এত গুণ এত অধিক পরিমাণে আর কোন বাঙালীর প্রবন্ধে দেখিয়াছি মনে হয় না।

৭

বর্তমান সঙ্কলনে ভূদেবের প্রবন্ধের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে সামাজিক প্রবন্ধ। বাকি রচনাগুলি তাঁহার রসসাহিত্যের অন্তর্গত। মনীষী ভূদেব যে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে উপন্যাসসাহিত্যের পথ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সে কথা আজ বিস্মৃত। সেই কারণেও বটে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের পরিচয় দানের আশাতেও বটে, তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি মুদ্রিত হইল। সম্পাদকের আশা আছে যে, ভূদেবের উপন্যাস পড়িলে শুধু ভূদেবকে নয়, বঙ্কিমের উপন্যাসের সৃষ্টি ও বিবর্তনে তাহার প্রভাব সম্বন্ধেও একটা ধারণা হইবে। এই একই কারণে পুষ্পাঞ্জলিও এখানে সংগৃহীত হইল। ভূদেবের সাকুল্য মনের আভাস পাওয়া সম্ভব হয় এমনভাবে ভূদেব-রচনাসম্ভার সঙ্কলিত করিবার ইচ্ছা ছিল—কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি জানি না।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভূদেব-রচনাসম্ভার

সামাজিক প্রবন্ধ

গ্রন্থের আভাস

এই সামাজিক প্রবন্ধগুলি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে। এই কথার বিশেষ সমর্থনের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউরোপ প্রচলিত সমাজতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ এবং ভ্রম প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমন হওয়াতে যে যে ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, তৃতীয় অধ্যায়ে সেগুলির প্রকৃতি বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সংস্রব যে যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইংরাজ আগমনের পরবর্ত্তী ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। আমাদের সমাজের গতি, জাতীয় প্রকৃত্যনুযায়ী পথে রাখিবার নিমিত্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কথাগুলি হইতে অবশ্যই বোধ হইবে যে, একখানি সর্ব্বদেশ-সাধারণ সমাজতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোন প্রকার অন্দোলনের সহকারিতা করিবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে, সর্ব্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্ত্তব্যসূত্র অনির্দ্দিষ্ট, এবং কার্য্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে।

এই জন্য, ইংরাজ-রাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিদ্যা বিস্তারের উপাদান এবং এই অভূতপূর্ব্ব শান্তিসুখের অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্ত্তব্য অবধারণ কার্য্যের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি জ্ঞান করিব।

লেখক

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় ভাব—উপক্রমণিকা

কয়েক বৎসর হইল, বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একটি ইউরোপীয়ের সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল :—

তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা হারাইয়া জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমি বলিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্য খুঁজিতে হয়—জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের যে চেষ্টা, তাহাই কি ঐ হারানো জিনিসটির অনুসন্ধান নয়?

তিনি — কথাটি বেশ সূক্ষ্ম করিয়াই বলিলে বটে। ও কথার কোন সাক্ষাৎ উত্তর নাই—কিন্তু যাহা অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা যাহা কখনই হাতে ছিল না, তাহা খুঁজিতে যাওয়া কি বৃথা পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করা নয়? ওরূপে আয়াস করা অপেক্ষা অন্যরূপ চেষ্টা করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

আমি — অন্য কোন্ দ্রব্যের জন্য অথবা কোন্ প্রকার চেষ্টা করিতে বলেন তাহা বলুন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই শুনিব। কিন্তু আমরা যাহা খুঁজিতেছি, তাহা যে অতল জলে পড়িয়াছে তাহা ত জলে নামিয়া না দেখিলে নিশ্চয় হইতে পারে না। আর যে জিনিসটা হারাইয়া গিয়াছে মনে করিতেছি, তাহা যে পূর্ব্বে হাতে ছিল না তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। ও জিনিসটা এমন যে, উহা হারাইয়াছে মনে করিলেই উহা যে হাতে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়।

তিনি — তোমায় আমায় আর ওরূপ ছেঁদো কথায় কাজ নাই। আমি নিজ জীবনবৃত্তের কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিবে। আমার জন্মস্থান আয়র্লণ্ড দ্বীপ—আমার পিতা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—আমি ডব্‌লিন নগরে একটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম —১৮৪৮ অব্দে সমুদয় ইউরোপ ব্যাপক যে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়র্লণ্ডে আসিয়া লাগে এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েকজন সহাধ্যায়ীর সহিত ঐ উপদ্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের অত্যধিক উদ্রেক হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ উপদ্রব শান্ত

করিলেন। আমি জেলে গেলাম। পরে জেল হইতে পলাইয়া ফরাসীদিগের দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া বহু বৎসর ঐ দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর ইংলণ্ডে আসিয়া কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, আমার হৃদয়স্থিত সঙ্কীর্ণ আইরিশ জাতীয়-ভাবটি, সুবিস্তীর্ণ ব্রিটিশ জাতীয়-ভাবে পর্য্যবসিত হওয়াই উচিত। এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহা হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উত্থানোন্মুখ ভারতবর্ষীয়-ভাব ব্রিটিশ জাতীয়-ভাবে পর্য্যবসিত হওয়া বিধেয়।

আমি — তোমার জীবনবৃত্তের যে ব্যাপারগুলি শুনিলাম, তাহাতে দুইটি তথ্য উপলব্ধ হইল। এক তথ্য এই যে, তুমি আমাদিগের মনের ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় তথ্য এই যে, অনেকটাই বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারিবে যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, একবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া যাইতে চাহি না। বুঝিতে পারিবে না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্ততঃ বহুকালের জন্য তাহা চাহি না। তোমাদের মনে যেমন জাতীয়-ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৈস। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করিতে চাই না। আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীনে থাকিয়া যদি চাকুরী করিতে হয় তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করি। মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া, পশ্চিমের লোককে মেড়ুয়া বলিয়া, দক্ষিণাঞ্চলবাসীদিগকে কদাকার বলিয়া অশ্রদ্ধা করা অতিশয় দূষ্য মনে করি—আর সন্তান-সন্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান্ এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে যত্ন করি।

তিনি — ঐগুলি ত অতি সাধারণ কাজ বলিয়াই বোধ হয়। স্বজাতিবৎসল না হইলে কেহ স্বদেশবৎসল হইতে পারেন না। ঐ সকল কাজে জাতীয়-ভাব বর্দ্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীয়-ভাব উৎপাদনে উহাদিগের তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনৈতিক বিষয় বিচার করিবার জন্য সভা স্থাপন করা—প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা—পুস্তিকা বিরচন করা, এই সকল কার্য্যের প্রতি তুমি কি আস্থাশূন্য ?

আমি — ও সকল কাজে আমার আস্থা নাই, এমত নহে, তবে ওগুলির প্রতি আপনাদিগের যতটা আস্থা আছে বলিয়া মনে করি, আমার আস্থা বোধ হয় তত অধিক নয়। ওগুলি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং নিরব-

চ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষা প্রসূত, এই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য। আমি দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি, বক্তৃতাদি দ্বারা আন্দোলনের ফল কিরূপ হয়। প্রথমটি ফল আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে ইংরাজ-ভূম্যধিকারিগণের পক্ষপাতী ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে বৈদেশিক শস্যের আমদানী বন্ধ ছিল। সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের উপকার হইবে, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কব্‌ডেন সাহেব সভা সংস্থাপন, প্রকাশ্যে বক্তৃতা প্রদান এবং পুস্তিকা রচনাদি করাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরিশেষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিদল অগত্যা তাঁহার মতানুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ স্থলে ইংরাজে ইংরাজে কথা, অর্থাৎ লাভের ভাগীও ইংরাজ, আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ, আবার তাহাতে একটা দুর্ভিক্ষের সমাগম। যদি এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত না হইত তাহা হইলে কি কব্‌ডেন সাহেবের কৃত আন্দোলনে কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি, একটি বিফল অ ন্দোলনের। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র আপনারই জন্মভূমি আয়র্লণ্ড। এই আন্দোলনের কর্ত্তা কব্‌ডেনের অপেক্ষাও শতগুণে শ্রেষ্ঠ —বাগ্মিবর ওকোনেল সাহেব। আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাবতীয় ব্যক্তি ওকোনেলকে দেবতুল্য ভক্তি করিত—দুই দিন চারিদিন দশ দিনের পথ হইতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিত; তিনি হুকুম করিয়া পাঠাইলে ক্যাথলিক যাজকদল চতুর্দ্দিক হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমভিব্যাহারে আনিত ও লইয়া যাইত। তাঁহার অনুচরের এবং পরিষদের কোন অভাব ছিল না।—তিনি সমস্ত আয়র্লণ্ডের একাধিপতির স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকৃত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল কি হইল? পুলিশ হইতে যেমন পরওয়ানা বাহির হইল, অমনি লোকসমাগম থামিল—রাজ্যের উপদ্রাবক বলিয়া মহাত্মা ওকোনেল আদালতে অভিযুক্ত হইলেন—তিনি জেলে গেলেন—কয়েক বর্ষ সেখানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার বল, বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বাগ্মিতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল—তিনি পরে দেশত্যাগী হইয়া বন্ধুবান্ধববিহীন পররাজ্যে দেহত্যাগ করিলেন।

তিনি — ওকোনেল নিজের দোষেই সকল হারাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বাগ্মিপ্রধান, যদি তেমনি কার্য্যকুশল হইতেন, তবে আর দেশের লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। আয়র্লণ্ড অবশ্য স্বাধীনতা লাভ করিত।

এই কথাগুলি বন্ধুবর কিছু ব্যগ্রতা সহকারে এবং একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও তাঁহার নিজের মন হইতে জাতীয় ভাবটি অপনীত হয় নাই। সেই

যৌবনাবস্থার—সেই ৪৮ অব্দের অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই—উহা এত দিনের পর ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

জাতীয় ভাব—ইহার উপাদান

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে সরলচেতা, সাধুশীল, সত্যবাদী ইউরোপীয় মহাশয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জাতীয় আইরিশ ভাবটি, তাঁহার জাতীয় ব্রিটিশভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি সরল মনে কথা কহিতে কহিতে স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রকৃত জাতীয় ভাবের মূলটি অক্ষুন্ন রহিয়াছে—উপরে যতই চাপা পড়ুক, ভিতরে স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই।

বস্তুতঃ স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কাহারই কখন একেবারে যাইতে পারে না। অন্তঃকরণবৃত্তির সংগঠন ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত বাহ্যবস্তু নিচয়ের বিভূতি সমবায়েই জন্মে। সকল দেশেরই বাহ্যবস্তু সমূহের প্রকৃতিতে এক একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। একদেশজাত এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বাহ্য প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ পরস্পর সংস্পৃষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তিও একরূপ হইয়া যায়। এই এক-রূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার গূঢ় কারণ এবং সেই কারণ, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে কার্য্যকারী হওয়াতে, জাতীয় ভাবটি মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে অতি গূঢ়তর রূপেই অধিকার করিয়া থাকে।

উল্লিখিত কারণসম্ভূত মৌলিক জাতীয় ভাবটি জনগণের অন্তঃকরণ গঠনের বিশিষ্টতায় এবং নানা বাহ্য সাদৃশ্যে প্রকট হয়। তাহার মধ্যে (১) আকার এবং রূপ-সাদৃশ্য, (২) ধর্ম্ম এবং আচার-সাদৃশ্য, (৩) ভাষা এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্য, (৪) রাজ্যশাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য—এই কয়েকটি অতি প্রধান। তদ্ভিন্ন পরিচ্ছদে, গৃহনির্ম্মাণে, গৃহোপকরণে, ভোজনাদি সুবহু অনুষ্ঠানে একজাতীয় লোকের মধ্যে অনেক প্রকার সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়। এই সকল প্রধান এবং অপ্রধান উভয় প্রকার সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং তজ্জনিত একটি বিশেষ সহানুভূতি যে সকল লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই সকল লোকের হৃদয়ে জাতীয় ভাব বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত হইয়া আছে বলা গিয়া থাকে।

এস্থলে আর একটি কথা আছে। সাদৃশ্যের উপলব্ধি দুই প্রকারে হয়। উহা

বিধিমুখেও হয় আর নিষেধমুখেও হয়। অমুক অমুকের সদৃশ, এরূপে সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে পারে; আর অমুক অমুক হইতে যত বিসদৃশ, অমুক তত বিসদৃশ নয়, এরূপেও সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে পারে।

এখন এই ভারতভূমির প্রতি উল্লিখিত সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, এতদ্দেশবাসীদিগের জাতীয় ভাবে ঐ সূত্রগুলি খাটে কি খাটে না এবং কতদূর খাটে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। ইহাতে সমুদ্র এবং পর্ব্বত, উষরভূমি এবং উর্ব্বরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা, জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে—ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। ফলতঃ এইটিই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে অনন্যদেশসাধারণ একটি বিশিষ্টভাবের অধিষ্ঠান হইয়া আছে। ইহারা সংকীর্ণমনা হয় না, ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদারভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটি চমৎকার উদারতা আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে। ইহাদিগের সর্ব্ব প্রদেশেই সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ ভেদবুদ্ধির দোষ এবং উদারতার গুণকীর্ত্তন করেন। এই জন্যই ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ব প্রদেশেই এমনি আতিথেয় যে, এক কপর্দ্দকও পাথেয় সম্বল না লইয়া বিদেশীয়েরাও এই মহাদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয়দিগের এই মৌলিক বিশিষ্টতার বিকাশ, তাঁহাদিগের অত্যুদার ধর্ম্মপ্রণালীতে অতি সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের শাস্ত্রে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব একবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে, এবং অধিকারিভেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার গোলযোগের মূল্য পর্য্যন্ত একবারে নিরাকৃত হইয়া আছে। অপর কোন দেশের ধর্ম্মপ্রণালীতে অধিকারিভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্টতার এই চরম দৃষ্টান্ত।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, আচার লইয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বড়ই আঁটাআঁটি এবং ঝগড়া-ঝাঁটি দেখা যায় বটে, কিন্তু দুই একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ ভিন্ন ইহার কোন বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের সহিত অন্য বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। ইহাদিগের পরস্পরে যতই আচারভেদ থাকুক, অপরজাতীয়দিগের সহিত যত আপনাদিগের মধ্যে কুত্রাপি তত নয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু যখন সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যেরা সমস্ত দেশে ব্যাপক হয়েন নাই তখন ভারতবর্ষে যত ভাষা-ভেদ ছিল এখন আর তত নাই। এখনও যাহা আছে, তাহার প্রতি এক সংস্কৃত ভাষার শক্তি অনুক্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিহিত করিতেছে। কোন একখানি নব্য মহারাষ্ট্রীয়, কি তেলেগু, কি হিন্দী, কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কৃত হইতে আপনাপন উপজীব্য শব্দ সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং সকলগুলিই ভারত-বর্ষীয় মাত্রের আশু বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। উচ্চারণপ্রণালী সকল ভারত-বর্ষীয় লোকেরই যে একবিধ, তাহার অপর প্রমাণের প্রয়োজন নাই—এই বলিলেই হইবে যে সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয়; তামিল ভাষাতে সকল বর্ণের ব্যবহার হয় না বটে, প্রতি বর্গের আদ্য অক্ষর দ্বারা তদ্বর্গীয় সকল বর্ণের কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে, উচ্চারণের যেরূপ পার্থক্য বুঝায়, তাহা তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে, সুতরাং কালক্রমে সে পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। মুসলমানদিগের কতক শব্দের উচ্চারণ এরূপ যে সংস্কৃত বর্ণমালায় সেগুলি অবিকল লিখিত হয় না। কিন্তু খ এবং জ এই দুইটি মাত্র বর্ণ সৃষ্টি হওয়াতে সে ত্রুটি আর লক্ষিত হয় না। আর বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের কাব্যগ্রন্থাদিতে ঐ ত্রুটি তাঁহাদিগের নিকটেও ধর্ত্তব্য হইত না!

সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ঈশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াতে আমরা সকল ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্যবাসী বলিয়া আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপেই জানিতেছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশা, এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এতদূর না হউক, কখন কখন ভারত-বর্ষের অতি সুবিস্তৃত ভূমিভাগসকল একচ্ছত্রের অধীন হইত—মান্ধাতা, শ্রীরামচন্দ্র, যযাতি, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, অশোক প্রভৃতি আর্য্য নরপালগণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—আর আকবর শাহ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাটও ভারতভূমির অনেকানেক প্রদেশ আপনাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সমস্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগের পরস্পর সম্মিলনো-পায় অনেকদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার উপর এক্ষণে যে অচ্ছেদ্য, অভেদ্য আয়স শৃঙ্খলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ দৃঢ়সম্বদ্ধ হইল—ইহার ফল আরও অনেক অধিক হইবে এবং সত্বরেই ফলিবে।

সামাজিক রীতিনীতিও আচারপ্রণালীর ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে সমপ্রকৃতিক তাহা অপর জাতিদিগের রীতিপদ্ধতির সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। অপর জাতিদিগের সহিত আমাদের সকলেরই পার্থক্য যত অধিক—নিজেদের মধ্যে পৃথক্ ভাব তত নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই যাইবে সর্ব্বত্রই ঘর দ্বারের শ্রীছাঁদ, খাওয়া-দাওয়ার পারিপাট্য, ক্রিয়া-কলাপের রীতিপদ্ধতি মোটামুটি একই প্রকার দেখিতে পাইবে।

অতি সুবোধ এবং বহুদর্শী কোন ইউরোপীয়ের সহিত ১৮৬৩ অব্দে, এই সকল বিষয়ে আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পৃথক্‌ভাব আছে, তাহা কোন্ বৃহৎ সাম্রাজ্যে নাই?—রুশিয়ার ভিতরে, অষ্ট্রিয়ার ভিতরে ইহা অপেক্ষা অধিক না হউক ন্যূন নয়। এখন মৌলিক বর্ণভেদের পার্থক্য ধরিয়া ইউরোপে জাতি সংগঠনের কতক চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন্ লাটিন বংশীয় স্পেনীয় এবং ইটালীয়দিগকে ফরাসীদিগের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করাইতে চাহেন—রুশ সম্রাট শ্লাভ বংশীয় সকল লোককে রুশের সহিত সম্মিলিত হইতে বলেন—টিউটন্ বংশীয় জার্ম্মানেরা প্রুসিয়ার অধিনায়কতা স্বীকার করিয়া ডেন্‌মার্ক এবং হলণ্ডের প্রতি অতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জাতীয়দিগের স্ব স্ব বর্ণাত্মকতা লইয়া অনেকটা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি হইবে এবং ইউরোপীয়দিগের জাতি সংগঠনে কতকটা বর্ণাত্মকতা সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাব বর্ণাত্মকতাতেই নিবদ্ধ নয়। দেখ, মান্দ্রাজ প্রদেশীয় লোকেরা তোমার বর্ণের লোক নহে, সে বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা আমার সহিত তোমার মিল অধিক। কিন্তু মান্দ্রাজীদের সহিত তোমার ধর্ম্মে মিল, সামাজিক রীতিতে মিল, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আর একটি বিষয়ে মিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সর্ব্বপ্রধান বিষয়টি কি?" তিনি বলিলেন—"লোক সকলের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদকে নষ্ট করিয়া সম্মিলন এবং একতা জন্মাইবার অমোঘ উপায় এক রাজার শাসন এবং এক শাসনপদ্ধতি—এই উপায়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতিক, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণসম্ভূত জনগণের মধ্যেও জাতীয়ভাব জন্মে, কারণ এক শাসন-পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল জনগণের সমসুখদুঃখতা বা সহানুভূতি; এবং তাহাই জাতীয়ভাব জন্মিবার সর্ব্বপ্রধান কারণ এবং ঐ ভাবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।"

তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতকটা অবিকল ফলিয়াছে। তাঁহার

কথা যে ইউরোপ সম্বন্ধে আরও ফলিবে, তাহার অনেক চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও কি সুসিদ্ধ হইবে না? তাহারও কি অস্ফুট লক্ষণ দেখা যাইতেছে না? আমার বোধ হয় ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জাতীয়-ভাব গ্রহণের প্রকৃত অধিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, ইহাদিগের পরস্পর সহানুভূতি বাড়িতে থাকিবে, এবং তাঁহার অনুমান ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে।

জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান

আদমসুমারীতে বলে ভারতবর্ষের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান, অর্থাৎ প্রায় করদ এবং মিত্র এবং স্বাধীন সকল রাজ্যগুলির লোকসংখ্যার সমান। ইঁহাদিগের শাস্ত্র বেদ পুরাণ অথবা বেদপুরাণাদি প্রসূত কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নয়, ইঁহাদিগের সংস্কার-প্রণালী ভারতবাসী অপর সকল লোকের সংস্কারের রীতি হইতে বিশিষ্টরূপে পৃথকৃভূত। ইঁহাদিগের সামাজিক ব্যবস্থাও ভারতবাসী অপর সকল লোকের সহিত যতদূর মিলে, তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীয়দিগের সহিত যেন কিছু অধিকতর মিলে। ইঁহারা কোন সময়ে ভারতবর্ষ জয় করিয়া এখানে সর্ব্বঙ্কুশ কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, এবং আপনাদিগের সেই উন্নত অবস্থার স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত কতকটা জাগরূক রাখিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ নিবাসী অপর সকল লোকের পরস্পর সহানুভূতি অপেক্ষা কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়। সেদিন লর্ড রিপনের আমলে ইংরাজেরা যেমন সকলে একমনা হইয়া আপনাদিগের রক্ষণী-সভা সংস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন, মুসলমানেরাও তত শীঘ্র এবং তত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে সেইরূপ সভা সংস্থাপন করিলেও করিতে পারেন। কয়েক বৎসর মাত্র গত হইল, ভারতবর্ষের যাবতীয় মুসলমান, এমন কি তাঁহা-দিগের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষোপজীবীরাও রুশ-তুরস্কের যুদ্ধের সময়ে, তুরস্ককে অর্থসাহায্য করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রাভদ্র অনেক মুসলমান লাল টুপি পরিয়া, আপনারা যে তুরস্কের পক্ষপাতী, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে যখন ইংরাজদিগের সহিত পঞ্জাবের পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী সিতানা প্রদেশে আফ্রেদি প্রভৃতি দুর্বৃত্ত জাতিদিগের সংগ্রাম হয়, তখনও ভারতবাসী অনেক মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের অর্থসাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলকথা ভারতবাসী

মুসলমানেরা অনেকেই ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, এবং সকলেই হয় তুরস্ক-সম্রাট, নয় পারস্য-অধিপতিকে আপনাদিগের ধর্ম্ম-শাস্তা বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

ভারতবাসী মুসলমানদিগের এই ভাবের অনুরূপ বস্তু ইতিবৃত্তে নূতন নহে। প্রত্যুত ইহার দৃষ্টান্ত অনেকানেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়াই দেখ, ওখানকার অধিকাংশ প্রজা বিবিধ সম্প্রদায় সম্ভুক্ত প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী, কিন্তু অনেকগুলি ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীও আছে। ক্যাথলিকেরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের অনেকটা ভিন্নরূপ অনুবাদ করে, এবং উহাদের সংস্কারপ্রণালীও কিছু ভিন্নরূপ। উহারাও ইংলণ্ডের বহিঃস্থিত পোপ উপাধি বিশিষ্ট জনৈক যাজকপতিকে আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্তা বলিয়া স্বীকার করে। তজ্জন্য প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ইংরাজেরা তাহাদিগকে বহুকালাবধি এক প্রকার রাজদ্রোহী মনে করিত, এবং বহুদিন গত হয় নাই, কোনরূপ রাজকার্য্যে তাহাদিগের নিয়োগ হইতে দিত না। কিন্তু আজি কালি আর সেরূপ নাই। ইংরাজদিগের মন হইতে ধর্ম্মবিদ্বেষরূপ মোহের অনেকটা লোপ হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যদিও প্রটেষ্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের ছোটলোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব আছে এবং মধ্যে মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে, কিন্তু সুভদ্র ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্টের মধ্যে বিলক্ষণ সম্মিলন এবং সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডেও যেমন ধর্ম্মভেদ জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে।

হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে, তাহার সূত্রপাত অনেকদিন হইতেই হইয়া আসিতেছে। রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে মুসলমানদিগের চিরাভ্যস্ত নিয়ম এই যে, উহারা যে রাজ্য জয় করে সেই রাজ্যের স্ত্রীলোকদিগকে অধিক পরিমাণে বিবাহ করে; ভারতবর্ষেও তাহাই করিয়াছিল। তবে এখানে জাতিভেদ প্রথার প্রাবল্য নিবন্ধন অন্যান্য দেশে যে পরিমাণে ভদ্র ঘরের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিল, এখানে তাহা পারে নাই; এখানে অধিক পরিমাণেই নিম্নবর্ত্তী জাতীয়দিগের কন্যা সকল গ্রহণ করিয়াছিল। এখানকার ষোল আনা মুসলমানের মধ্যে বার আনা মুসলমান ঐরূপে উৎপন্ন। অপর চারি আনা মুসলমানও যে একবারে দেশীয় সংস্রবশূন্য, তাহা নহে। কতক মুসলমান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত আর্য্যগণের সন্তান আর কতক আর্য্যজাতীয়া-গর্ভসম্ভূত মুসলমান ঔরস। এই

ব্যাপার বহু শতাব্দী হইতে পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিয়া এক্ষণে ভারতবাসী মুসলমানমাত্রকে আফগান, পারস্য, আরব, তুরস্ক সকল দেশের মুসলমান হইতে একটি বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে—ইঁহারা আকার প্রকারে ভারতবাসী হিন্দুর যত সদৃশ হইয়াছেন বহিঃস্থ কোন জাতীয় মুসলমানের আর তত সদৃশ নাই।

আকার ইঙ্গিতেও যেমন, আচার ব্যবহারেও সেইরূপ। ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকানেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান, জ্যোতির্বিদ এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান এবং সমাদর না করেন—যেখানে গোবধ করিতে এবং গোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সঙ্কুচিত না হন—যেখানে হিন্দুদিগের পর্ব্বোৎসবে আমোদ প্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহাদি কার্য্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। বাঙ্গালার এবং দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই, ঐ ঐ প্রদেশবাসী অতি উচ্চবংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের নামে সঙ্কল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। অপর অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণ সজ্জনের অতিথি সৎকার করেন।

আরও দেখা যায় সামান্য মুসলমানদিগের মধ্যে পৈতৃক অধিকার সম্বন্ধে সুবহুস্থলে হিন্দুদিগের প্রথাই প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল মুসলমানদিগের কন্যাগণ মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে যে স্ব স্ব পিতৃধনভাগিনী সে কথা আর মনেও করে না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-বিভিন্নতা জন্য তীব্র বিদ্বেষ বেশী দিন থাকে না। বর্ণভেদ প্রণালী গ্রাহ্য থাকায় এখানে বৈবাহিক বিষয়ে ও আহারাদিতে মিলন না থাকিয়াও লোকের সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া চিরাভ্যস্ত। জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটি বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পরন্তু এইরূপ সম্মিলন ব্যাপার যে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পায়, তাহা নহে। যদি আরবাদি মুসলমান রাজ্য হইতে কোন মৌলবী এদেশে আসিয়া অথবা এখানকারই তেমন ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত এবং বিদ্যাসম্পন্ন কোন বড় মৌলবী মুসলমানদিগের উত্তেজনা করেন, তবে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছু কালের জন্য যতদূর পারেন হিন্দুর অনুকরণ ছাড়িয়া দেন। ১৮৪৮ অব্দের পর একবার ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ নামক একজন মৌলবী

আসিয়া বঙ্গদেশের মুসলমানদিগকে গোমাংস খাইতে, বিধবার বিবাহ দিতে, দেব পূজার দ্রব্য গ্রহণ না করিতে এবং হিন্দুর নিমন্ত্রণে না যাইতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐরূপ উত্তেজনার ফল অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। এবং দেখা যাইতেছে যে, ওরূপ উত্তেজনাও ক্রমে ক্রমে কালে দূরবর্ত্তী এবং প্রসারতায় স্বল্পস্থলব্যাপী হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিবার এবং তাহা বর্দ্ধিত করিবার অপর একটি প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার, কখন স্পষ্টাক্ষরে কখন ইঙ্গিতক্রমে, অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশে রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমানজাতি এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বকালের পারস্যভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচারসম্পন্ন সদ্ব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্দ্ধাংশ দেখা যাইত না। ছাপরা নগরবাসী কয়েকটি ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটি সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি, যে আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক মুসলমানদিগের মধ্যে এমনি উদারচেতা পবিত্রকর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম "উও ইয়ে হ্যায়" আমার বোধ হইল যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব্বপ্রদেশ-সাধারণ-প্রায় হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্ম্যশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্যরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমান-

দিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহাঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব সুবা এবং বাদশাহ প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটি ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া রাখিবার জন্য কোন কোন ইংরাজ আর একটি উপায় অবলম্বন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে ঐরূপ কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে দুরভিসন্ধিতে রাজ্য পালনের উপায় নাই—তাঁহারা জানেন যে, রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি এতদুভয়ের পার্থক্য বাহ্য মাত্র, আভ্যন্তরিক নহে। এই প্রকৃত তথ্য বুঝিয়াই মহারাজ্ঞীর নীতিবিশারদ মন্ত্রিবর্গ এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা পুনঃ পুনঃ স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কাহার কি ধর্ম্ম এবং কাহার কি জাতি তাহা বিচার না করিয়া সমস্ত প্রজাকে সমভাবে পালন করা হইবে। কিন্তু স্বল্পদর্শী অনেকানেক ইংরাজ উল্লিখিত উচ্চতম রাজনীতি সূত্রটি বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে অতি যত্নপূর্ব্বক প্রাচীন রোমীয়দিগের ভাষা, সাহিত্য, ব্যবস্থাশাস্ত্র এবং রাজনীতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যত বিজিগীষু জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে রোমীয় জাতির রাজনীতিই বিশিষ্টরূপে দৃঢ়সম্বদ্ধ বলিয়া ঐ সকল ইংরাজদিগের সংস্কার হইয়া থাকে। সেই বাল্যসংস্কার বশতঃ তাঁহারা মনে করেন যে, রোমীয়েরা যেমন শত্রু রাজ্যের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের সকলগুলিকেই জয় করিয়াছিল সেইরূপ প্রজায় প্রজায় মনের মিল হইতে না দেওয়াই বিজয়লব্ধ রাজ্য-পালনের বিধি। এই ভাবিয়া উহাঁরা সর্ব্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন না হইতে পায়, তাহার জন্য যত্ন করেন। কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন, এবং যখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন। এইরূপে ঐ সকল ইংরাজদিগের কখন এদিকে কখন ওদিকে ঝোঁক দেওয়াতে হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িতে পারে। ঐ সকল ইংরাজের এই কৌশলটি যে অপরিণমদর্শিতার ফল তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রাজনীতি থাকা সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির বলে রোমসাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই। অতএব এই রাজ-নীতি সর্ব্বতোভাবে দূষ্য। কিন্তু উহা যতই দূষ্য হউক ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ঐ সকল ইংরাজ, মুসলমানের আদর যতই করুন,

মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া যতই কথা কহুন, আর পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া যতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন—তাহাতে হিন্দুদিগের কোন মতেই ঈর্ষ্যা করা বৈধ নহে। ঈর্ষ্যা করিলেই উহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। আজি কাল মুসলমানের দিকে ঝোঁক পড়িতেছে। তুই চারিটি মুসলমানের ভাল চাকরী পাইবার পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে। আরও একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ইংরাজ বিবিরা একটি সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন মুসলমানেরা তাঁহাদিগের উদ্বাহযোগ্য। উহারা যদিও পেগম্বর মহম্মদকেই বিশিষ্টরূপে মান্য করে তথাপি ঈশা বেন মেরিয়ামকে একেবারে ফেলনা করে না। অতএব মুসলমানদিগের ভাগ্যে তুই চারিটি বিবি বিবাহও ঘটিতে পারে।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজ ভারতবাসীর মধ্যে যদি কাহাকেও অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে। মুসমলানের হাত হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্য লইয়াছেন এবং মুসলমানের মধ্যেই সম্মিলন-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অধিক আছে। বৈদেশিক রাজবলও মুসলমানদিগেরই পৃষ্ঠপূরক হইতে পারে। আর ভূতপূর্ব্ব সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে যদিও হিন্দু সৈনিকেরাই বিদ্রোহ ঘটনার সূত্রপাত করে, তথাপি মুসলমানই সাম্রাজ্যাসনে বসিয়া ছিলেন।

জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে খ্রীষ্টানাদি

সমুদয় ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় উনত্রিশ কোটী; খ্রীষ্টানের সংখ্যা আদমসুমারীতে সাড়ে বাইশ লক্ষ, অর্থাৎ একশত ত্রিশ জনে একজন মাত্র হইল; সুতরাং জাতীয়ভাবের বিচারে উহারা নগণ্য।

কিন্তু সংখ্যাতে কম বলিয়াই যে উহারা নগণ্য তাহা নহে। উহাদিগের ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের সহিত জাতীয়তা পরিবর্ত্তিত হয় না। ইউরোপীয় জাতিদিগের সাম্যবাদ, যদি মুসলমানদিগের সাম্যবাদের ন্যায় কথায় এবং কাজে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে দেশীয় কৃত-খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু ইউরোপীয় পাদ্রীরা শুদ্ধ খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই ছাড়িয়া দেন; মুসলমান বাদশাহ নবাব প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুর জাতি মারিয়া তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক আপনাদের ভাল ঘরে বিবাহ দেওয়া এবং কোন চাকরী, কি তাহার অন্নসংস্থানের কোন একটা উপায় করিয়া দেওয়া, কি তাহাকে লইয়া এক সঙ্গে খাওয়া বসা করা, ইহার কিছুই করেন না। তবে আজি

কালি হিন্দু এবং মুসলমানকে না দিয়া কৃত-খ্রীষ্টানদিগকে সকের ফৌজ বা ভলাণ্টিয়ার হইতে দিবেন বলিয়াছেন। তাহাতে ফল কি হয়, পরে বুঝা যাইবে। এ পর্য্যন্ত কৃত-খ্রীষ্টানেরা প্রায়ই জাতীয় ভাব পরিচ্যুত হইতে পারেন নাই। উঁহারা আর সামান্য ফিরিঙ্গিরা প্রায় একই ভাবাপন্ন হইয়া আছেন। উভয়েরই ইচ্ছা, ইউরোপীয়-দিগের নিকট ঘেঁসিয়া বসেন, কিন্তু ইউরোপীয়েরা উঁহাদিগের ঘেঁস কিছুমাত্র সহিতে পারেন না। কখন পারিবেন বলিয়াও বোধ হয় না—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয় জাতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তাঁহাদিগের হৃদয়ে অপর জাতির প্রতি ঘৃণা একটি মৌলিক ধর্ম্ম। এমন ইংরাজ জাতির ভাষা শিখিলেই বা কি আর তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই বা কি, আর তাহার পরিচ্ছদাদি ধারণ করিলেই বা কি—ইংরাজ কিছুতেই পরকে আপনার করিতে পারেন না। যদি ভারতবর্ষের রাজশক্তি ইংরাজের হস্তগত না হইয়া পোর্ত্তুগীজের কিম্বা ফরাসীর হস্তগত হইত, (কোন সময়ে তাহার উপক্রমও দেখা দিয়াছিল) তাহা হইলে ভারতবর্ষের কৃত-খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত, সেই সকল স্বধর্ম্মত্যাগী লোকের কতকটা গৌরব হইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকার্য্য সকল তাহাদিগেরই হস্তগত হইত, এবং উঁহারা একবারেই ভারতবর্ষীয় ভাব পরিহারপূর্ব্বক জন্মভূমির বক্ষঃস্থলে শেলস্বরূপ বিদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু ইংরাজ এখানকার রাজা হওয়ায়, কৃত খ্রীষ্টানেরা কোন বিশেষ অধিকার পায় নাই, অপর সকল ভারতবাসী যে পরিমাণে ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত হইয়া আছে, উঁহারাও সেইরূপ আছে;—সুতরাং জাতীয়ভাব পরিচ্যুত হইতে পারে নাই।

আমি দেখিয়াছি, যাঁহারা স্বয়ং খ্রীষ্টান হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মধ্বজী হইয়া দেশীয় ধর্ম্মপ্রণালীর নিন্দা করতঃ যেমন সকলকে ভজাইবার চেষ্টায় মত্ত হইয়া বেড়ান, কিছুদিন অতীত হইলে, তাঁহাদের আর ততটা তেজঃ থাকে না, স্বজাতীয় লোকের মত নম্রস্বরে বিনা নিন্দাবাদে খ্রীষ্টীয় গৌরব অন্তর্হৃদয়ের অন্তর মধ্যে নিহিত করিয়া দেশীয় লোকের সহিত এক পরামর্শী হইয়া বেশ চলিতে পারেন, এমন কি, গুরু-স্থানীয় পাদ্রী সাহেবদিগেরও স্বার্থ-চিন্তা এবং দাম্ভিকতার উল্লেখ করিতে পারেন। আর যাঁহারা কৃত-খ্রীষ্টানদিগের সন্তান, তাঁহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ভজাইবার চেষ্টা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। উঁহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মজনিত পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ একেবারেই জন্মে না বলিলেও চলে। উঁহারাও অপরাপর ভারত-বাসীর ন্যায় আপনাপন পিতৃমাতৃধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়াছেন—উঁহাদের সহিত অপর সকলের ইতর বিশেষ থাকিবে কেন?

কৃত-খ্রীষ্টানদিগের সন্তান সন্ততি, বঙ্গদেশ বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বা মধ্য প্রদেশ, এই সকল আর্য্যবহুল স্থানে যত দেখা যায় তাহা অপেক্ষা অনার্য্যবহুল মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং গোয়ানগরের সন্নিহিত পশ্চিমোপকূলে অনেক অধিক। ঐ সকল প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার কাথলিক যাজকবর্গের দ্বারা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। ঐ যাজকদিগের মধ্যে অনেক সাধুশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষি মুনি অথবা মহম্মদীয় ফকীর দরবেশদিগের ন্যায়, অতি বিনম্রভাবে পার্থিব বিভবশালিতা এবং ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন—যাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতেন, সেই হিন্দু মুসলমানের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া বাবুয়ানা করিতেন না, গেরুয়া বস্ত্র পরিতেন, কুটীরে থাকিতেন, শাকান্ন খাইতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যে সকল লোকের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহারাও সমধিক পরিমাণে অনার্য্যকুলসম্ভূত, ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচারে অপেক্ষাকৃত অসমর্থ। এই সকল কারণের সমবায়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলেই কৃত-খ্রীষ্টানের সংখ্যা অধিক হইয়া আছে।

এক দিন পন্দিচেরি হইতে তাঞ্জোর নগরে যাইবার পথে একটি তদ্দেশীয় খ্রীষ্টানের সহিত রেলের গাড়িতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া চিনিতেই পারি নাই, তাঁহার পরিচ্ছদ তদ্দেশে প্রচলিত পরিচ্ছদ হইতে অভিন্ন, মাথায় উষ্ণীষ—উষ্ণীষ খুলিলে, দেখা গেল যে মাথার কিয়দ্ভাগ ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা পরিষ্কৃত এবং মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ। নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "সুব্রহ্মণ্য"—তাহার অগ্রপশ্চাৎ 'জন' কি 'মাইকেল' কিছুই শুনিলাম না। অতএব জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" উত্তর করিলেন, "তা বই কি!" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা বই কি, বলিলেন কেন?" তিনি বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণবংশজাত কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী; আমার প্রপিতামহ খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, সেই অবধি আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন অপর জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন নাই, আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে খ্রীষ্টান।" "আপনি এখন কোথায় যাইবেন?" "তাঞ্জোরের মহাদেবের মন্দিরে যে মেলা হইবে তাহাই দেখিতে যাইব। আমার মাতা, ভগিনী, পিতৃষসা প্রভৃতি পরিবারবর্গ অপর গাড়িতে আছেন।" "স্ত্রীলোকেরা কি দেবতার নিকট পূজাদি মানসিক করিয়া থাকেন?" "কখন কখন করেন— আমরা ধর্ম্মই বদলাইয়াছি, জাতি বদলাই নাই।"

ভারতবর্ষের কৃত-খ্রীষ্টান ভিন্ন অপর যত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী আছেন তাহার মধ্যে ইউরেশীয় বা ফিরিঙ্গিরাই প্রকৃতপ্রস্তাবে এতদ্দেশবাসী। উহারা প্রায় ৬০ সহস্র পরিমিত। উহাদের একদল সম্প্রতি আহার, বিহার, গৃহ এবং পরিচ্ছদাদি দেশীয় মুসলমানদিগের অনুরূপ করিবার কথা তুলিয়াছেন। পাদ্রি টেলর সাহেবের ন্যায় কোন কোন ইউরোপীয়ের প্ররোচনায় যদি অতদূর করিয়া উঠিতে না পারেন, তথাপি উহাদিগের মধ্যেও যে জাতীয় ভাবের কথঞ্চিৎ প্রবেশ হইয়া আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

খ্রীষ্টান ভিন্ন বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে সকল লোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র পার্সি ভিন্ন অপর সকলেই আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের শাখাবিশেষ বলিয়া জানেন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় সহানুভূতি সম্পন্ন।

এতদ্ভিন্ন এই মহাদেশ মধ্যে অপর কতকগুলি লোক আছে যাহাদিগকে আদিমনিবাসী বলা যায়, তাহাদের সমষ্টিসংখ্যা ৯২ লক্ষ। ইহারা ভারতবর্ষের কোন এক প্রদেশে নাই। বনপর্ব্বতময় ভূমিতে এই সকল লোকদিগের বিভিন্ন গোষ্ঠীয়েরা বাস করে। শুনা যায়, তাহাদের ভাষাসংখ্যা ১৫০-এর অন্যূন। ঐ বিভিন্নজাতীয় লোকদিগের আকার, ভাষা ও আবাস সাদৃশ্যে প্রধানতঃ তিন দল ধরা যায়। এক দলকে হিন্দু-তাতার জাতীয় বলা যায়। ইহারা হিমালয়পর্ব্বতাঞ্চলবাসী এবং খস, গারো, ডফলা, নাগা, কুকি, ম্লেক, লেপচা প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দল কোলেরীয়। ইহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতাঞ্চলবাসী এবং সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডার, জুয়াং নামে অভিহিত। তৃতীয় দ্রাবিড়ীয় দল দাক্ষিণাত্যপর্ব্বতবাসী ও গোন্দ, তোড়া, ধাঙ্গড় প্রভৃতি নাম বিশিষ্ট।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা এই তিন দলের ভাষা-ভেদ নিরূপণ পূর্ব্বক উত্তরাঞ্চলবাসীদিগকে পৈশাচ-ভাষাভাষী, মধ্য-পর্ব্বতবাসীদিগকে প্রাকৃত-ভাষী এবং দক্ষিণাঞ্চলবাসী আদিমদিগকে রাক্ষস-ভাষা-ভাষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই সকল লোকের মধ্যে জাতীয় ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠীয় ভাবের অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু সর্বস্থানেই আদিমেরা ক্রমশঃ হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে গৃহীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অনুষ্ঠানবাহুল্য এবং অধিকারী ও জাতিভেদ স্বীকার নিবন্ধন সুবিস্তৃত ভিত্তিসম্পন্ন হিন্দুসমাজই আদিমদিগকে সভ্যাবস্থ ও উন্নত করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। হিন্দুসমাজ সেই উপযোগিতা এমন সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছে যে, ৯২ লক্ষ মাত্র এক্ষণে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে অবশিষ্ট আছে।

মুসলমানেরা প্রকৃত আদিমদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আর এখন খ্রীষ্টান পাদ্রিরাও যে আপনাদের মতবাদ অক্ষুন্ন রাখিলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহাও বোধ হয় না। আদিমদিগের মধ্যে জাতীয়-ভাবের উদয় হিন্দুসমাজের ভিতর আসিয়াই হইতে পারে এবং তাহাই হইবে।'

জাতীয় ভাব—ঐতিহাসিক প্রকৃতি ভেদ

জাতিভেদে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য রচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়। নিরক্ষর বর্ব্বর জাতীয়েরা আর কিছু না পারুক কয়েকটি কবিতা বিরচন করিয়া, আপনাদিগের জাতি সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া রাখে। বস্তুতঃ ঐরূপ কবিতাই সকল দেশের ঐতিহাসিক শাস্ত্রের মূল। ঐগুলির দ্বারা পূর্ব্বগত ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকে, সেই ঘটনাবলীর বিচার দ্বারা রাজনিয়মের এবং বীরতা, ধীরতা, চতুরতা প্রভৃতি গুণের আদর্শ প্রদত্ত হইয়া লোকশিক্ষার বিশিষ্টরূপ সহায়তা হয়। ঐ গীতীতিহাসগুলি জাতীয় উন্নতি সহকারে পরিস্ফুট হইয়া জাতীয় প্রকৃতির অতি সুস্পষ্টরূপ অভিব্যক্তি করিতে থাকে। দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথা স্পষ্ট হইবে এবং ভারতবাসীর জাতীয় ভাবের বিশিষ্টতা সপ্রমাণ করিবে।

তাতার বা তুরাণীয় জাতিদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইতিহাসগ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থগুলিতে কোন্ সময়ে কোন্ ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে —কিন্তু ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সময়ের পূর্ব্বাপর ক্রম ভিন্ন যে অন্য একটা গূঢ় বন্ধন আছে তাহা ঐ সকল ইতিহাসে ঘুণাক্ষরেও লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ সময়ের পরপূর্ব্বতা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অতি স্থূল চিহ্নমাত্র। তাতারজাতীয় লোকেরা যেমন অনুকরণ-প্রবণ এবং শিল্পনিপুণ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিচারে তেমন সূক্ষ্মদর্শীও নয় এবং তদনুযায়ী কল্পনাকুশলও নয়। তুরাণীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চীনীয় জাতির ইতিহাস গ্রন্থগুলি এইরূপে লিখিত—অমুক সম্রাটের রাজ্যকালে অমুক বর্ষের অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক প্রদেশে বিদ্রোহ হইয়াছিল, বা অমুক নদীর জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল বা সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হইয়াছিল। এরূপ ইতিবৃত্ত এক প্রকার পঞ্জিকা; এগুলিকে পঞ্জিকেতিহাস বলা যায়। ভারতবর্ষের যে যে প্রত্যন্ত ভাগে তাতার জাতীয় লোকের বসতি বা প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সে সকল ভাগেও এরূপ

পঞ্জিকেতিহাস বিরচিত হয়। যথা আসামে, নেপালে, কাশ্মীরে। কাশ্মীরদেশাগত রাজতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানিও এরূপ কোন পঞ্জিকেতিহাসেরই সংগ্রহগ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তাদিগের ইতিহাসগুলিতেও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বোধের উপায়, পরপূর্ব্ব সময়ের নির্দ্দেশ মাত্র, আর কিছুই নহে। প্রত্যুত ঘটনাবলীর বিবরণে, ঐ সম্বন্ধের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সর্ব্বস্থলেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন কারণের নির্দ্দেশ করা যেন অবৈধ জ্ঞান করিতেন। অমুক সেনাপতি এমত বীরপুরুষ হইয়াও অমুক নগরটি জয় করিতে পারিলেন না। আর অমুক তাহা অপেক্ষা অল্প-জ্ঞান এবং শান্তস্বভাব হইয়াও সেই কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারিলেন কেন? আরবীয় গ্রন্থকারের মনে, যদি কখন ওরূপ প্রশ্ন উদয় হইত, তিনি এক কথায় তাহার মীমাংসা করিতেন, বলিতেন—আল্লার কোদরৎ। আরবেরা যে একান্ত স্বধর্ম্ম-নিরত একমনা জাতি তাঁহাদিগের ইতিহাস গ্রন্থও সেই ভাব সুব্যক্ত করে।

য়িহুদীতে এবং আরবে অনেকটা মিল আছে। উভয়েই সেমেটিক বংশীয়, উভয়েই ঘোর একেশ্বরবাদী, উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্মনিরত, উভয়েই জাগতিক কার্য্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান স্বীকার করেন। উঁহাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক আরব শিখিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক ভোগ আছে; য়িহুদী সে কথা জানে না। সুতরাং কোন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যদি দুঃখ, কষ্ট, পরাভব প্রাপ্ত হয়, আরব বলিতে পারেন যে, উহা সয়তানের কারসাজি; মৃত্যুর পর, ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার সমস্ত মঙ্গল হইবে। য়িহুদীর পক্ষে ঐ পথ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি যদি দুঃখে পতিত এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, ইতিহাসে তাদৃশ ঘটনা নিবদ্ধ করিতে হইলে, য়িহুদী গ্রন্থকারকে একটি কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাকে বলিতে হয় যে, ঐ দৃষ্টতঃ পুণ্যবান ব্যক্তি অন্তরে পাপী ছিল। য়িহুদী অন্য কোন পাপের বড় একটা উল্লেখও করেন না—তাঁহার আপনার অভীষ্ট যাভেঃ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভয় যাহার কম বা নাই, সেই পাপাত্মা। ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়া য়িহুদী আপনার ইতিহাস গ্রন্থকে "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই একটি সূত্রে সম্বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, য়িহুদীর ইতিহাস তাঁহার জাতীয় প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ হইয়া আছে।

ভারতবর্ষীয়দিগেরও ইতিহাসের মূল সূত্র "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"—কিন্তু ভারত-বর্ষে ঐ সূত্রের গ্রন্থনপ্রণালী স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ

বোধে, পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা, অধিকতর নিপুণ। তাঁহারা, ঐ সম্বন্ধের স্থূল লক্ষণ যে, কারণের "পূর্ব্ববর্ত্তিতা" তাহার অপেক্ষা ঐ সম্বন্ধের যে গূঢ়তর লক্ষণ "অনন্যথা সিদ্ধি" তাহা বিশিষ্টরূপেই উপলব্ধ করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা সম্বন্ধের আরও অন্তর্ভেদ করিয়া দেখেন এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধেও কারণ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক ঐশী শক্তির সর্ব্বব্যাপিতা এবং সর্ব্বময়তা উপলব্ধ করেন। সুতরাং ইহাদের হস্তে "যতোধর্ম্ম স্তুতোজয়ঃ" সূত্রটি ভিন্ন ভিন্ন দুইটি থাই সংযুক্ত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ দুইটি থাইয়ের একটির নাম "প্রাক্তন" অর্থাৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী দৃষ্টাদৃষ্ট কারণ কূট; দ্বিতীয়টির নাম "পুরুষকার" অর্থাৎ ধর্ম্ম সহকৃত বর্ত্তমানকালবর্ত্তী বুদ্ধি বলাদি করণের প্রয়োগ। ঐ দুইটির অপর নাম "পূর্ব্বতপস্যা" এবং "বর্ত্তমান উদ্যোগ।" সুতরাং পূর্ব্বতপস্যা এবং বর্ত্তমান উদ্যোগ উভয়ের সমবায় না হইলে জয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ঐ ধর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ এবং 'পুরাণ' নামে বিখ্যাত।

কোন কোন স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় নব্য পণ্ডিতের মতে, আমাদিগের পুরাণোক্ত ব্যাপার সমুদয় পার্থিব ভূত সমূহের অথবা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির কিম্বা আধ্যাত্মিক ভাব সমুদয়ের, কবিব্যঞ্জনা মাত্র—প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। কিন্তু ঐ সকল পণ্ডিতের ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। প্রাকৃতিক বস্তুতে এবং প্রাকৃতিক শক্তি সকলে বিশিষ্ট সজীবতার এবং মানব ভাবের আরোপ হইবার মূল, ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। কবিদিগের হস্তে প্রকৃত নর, নারী, বস্তু, ঘটনাদি আসিয়া উপস্থিত হইবার পর, সেইগুলি উপমা, অত্যুক্তি, রূপকাদি অলঙ্কারে ভূষিত এবং সরস হইয়া কাব্যেতিহাস রূপে প্রণীত হয়।

তবে কি, যাঁহারা সৌরাদি ভাবের ব্যঞ্জনামাত্র বলিয়া পুরাণবর্ণিত ব্যাপার সকলের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের সকল কথাই অযৌক্তিক? তাহাও নয়। মূলে প্রকৃত ঘটনা থাকে, কালক্রমে লোকে সেই ঘটনার আনুষঙ্গিক অনেকানেক কথা বিস্মৃত হয়, তৎপরে কবিগণ, উহাদিগকে স্ব স্ব হৃদয়ভাবে রঞ্জিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। কবি-হৃদয়ে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় কবির হৃদয়ে, প্রাকৃতিক ভাব সবিশেষ প্রবল। এই জন্য ভারতবর্ষীয় কবির প্রণীত কাব্যেতিহাসগুলিতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিশেষ সংস্রব হইয়াই আছে। এস্থলে একটি তথ্যের স্মরণ করা আবশ্যক —জাগতিক বস্তু এবং কার্য্য মাত্রেই এবম্ভূত যে, তাহার প্রত্যেকটিতেই সকলটি থাকে। এই জন্য যে কোন ঘটনাই উপস্থিত হউক, কবির হৃদয়ে যে ভাব তৎকালে জাগরূক তাহাই ঐ প্রকৃত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পুরাণগুলিকে অলীক কাব্যরচনা মাত্র মনে করা ভুল। উহারা কাব্য বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক

কাব্য। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। পুরাণে কথিত আছে, ভগবান, বামনাবতারে বলি নামক অসুর রাজাকে পাতাল তলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ নগরের নিকট সাদ্রাস নামক স্থানে গিয়া দেখিয়া আইস, বলি রাজার পুরী সমুদ্রগর্ভস্থ হইয়া আছে। বামন = ত্রিবিক্রম = সূর্য্য ; বলি = পূজার উপহার। ইহা প্রাকৃতিক তথ্য ; পূজোপহারের সন্নিধানে ভগবান বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার ; নচেৎ পূজার সম্ভাবনা হয় না। ইহা আধ্যাত্মিক তথ্য। এই উভয় তথ্যের প্রকাশেই কবি-ব্যঞ্জনা লক্ষিত হয়। কিন্তু সুসমৃদ্ধ মহাবলিপুর যে সমুদ্রতলস্থ বা পাতালপ্রবিষ্ট এটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

ভারতবর্ষে কাব্যেতিহাসের প্রণয়ন বৌদ্ধদিগের সময়ে পূর্ণ হয় নাই—তবে ঐ সকল গ্রন্থ পূর্ব্বে যত শিথিল-সম্বদ্ধ হইত, বৌদ্ধ সময় হইতে তাহা অপেক্ষাও কিছু অধিকতর শিথিল-সম্বদ্ধ হইয়াছে, বোধ হয়। কিন্তু রচনা-প্রণালী মূলতঃ একই রূপ আছে। রামায়ণের মহাভারতের এবং বৃহৎ কথার কাঠাম ভিন্ন নয়—প্রাক্তনবাদ, পুরুষকারবাদ এবং পরকালবাদ, এই ত্রিকালবাদিতা সকলগুলিতেই সমান। মুসলমানদিগের অধিকারকালেও যে কতকগুলি পুরাণ এবং উপপুরাণের রচনা হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐ সময়ে সংস্কৃত রচনা অনেক কম হইয়া আসিয়াছিল এবং হিন্দি প্রভৃতি প্রচল ভাষার বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। হিন্দি ভাষার সর্ব্ব-প্রধান যে কাব্যেতিহাস চাঁদ কবির বিরচিত, তাহাও সর্ব্বতোভাবে পুরাণ-লক্ষণাক্রান্ত। ইহার পর হইতে আর ঐ লক্ষণাক্রান্ত কোন বৃহৎ গ্রন্থের রচনা হয় নাই। যে দুই একখানি গ্রন্থ একাধিক প্রদেশব্যাপক হইয়াছে তাহা পূর্ব্বকালের কথা লইয়া কাব্যগ্রন্থ মাত্র ; উহাদিগের কোনটিতে ঐতিহাসিক ভাব নাই। তবে দাক্ষিণাত্যে দুই একখানি ঐতিহাসিক কাব্য মুসলমানদিগের পরেও প্রণীত হইয়াছে। ইংরাজদিগের অধিকারের সময় ওরূপ গ্রন্থাদি কি সংস্কৃতে কি কোন চলিত ভাষায় আর প্রণীত হয় না, শুদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ অথবা অনুবাদ-সদৃশ ইংরাজী ছাঁচে ঢালা পুস্তক বিরচিত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয়েরা, ইতিহাস বলিতে গ্রীকদিগের এবং তদনুকারী রোমীয়দিগের ইতিহাসই বুঝেন ; আর আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়া, য়িহুদীদিগের গ্রন্থেও সন তারিখের কোন উল্লেখ থাকে না। গ্রীক এবং রোমীয়েরা বিশিষ্টরূপেই স্বদেশবৎসল ছিল। স্বদেশবাৎসল্যই তাহাদিগের মুখ্য ধর্ম্ম। তাহারা ঐ সূত্রে আপনাদিগের ইতিহাসমালিকা সমস্ত অতি সুন্দররূপেই গ্রথিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, স্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব

ঘোষণা। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) গ্রীক গ্রন্থকার লিখিলেন, মারাথনের যুদ্ধক্ষেত্রে দশ সহস্র পরিমিত গ্রীক সৈন্য, তিন লক্ষাধিক পারসীক সৈন্যের পরাভব করিয়াছিল। আমরা বাল্যকালে উহা পাঠ করিলাম, গ্রীক গৌরবে মুগ্ধ হইলাম, এবং ওরূপ ঘটনার কারণও শুনিলাম যে, গ্রীকেরা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর অধীন থাকাতেই ওরূপ অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল। বয়স হইলে পারসীকদিগের বিরচিত ইতিহাসে ঐ ব্যাপারের কিরূপ বর্ণনা আছে, দেখিবার যত্ন করিলাম। কিন্তু "মারাথনের" এবং ঐরূপ অত্যদ্ভুত যুদ্ধ ব্যাপার সমস্তের কোন উল্লেখ পাইলাম না। (২) গ্রীক গ্রন্থকার স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের চরিত্র বর্ণন করিলেন। কি অত্যদ্ভুত চরিত্র! মানুষ কি অমন সাধুশীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে? মানিলাম গ্রীকেরা সত্য সত্যই দেবপ্রকৃতিক ছিল। পরে জানিলাম, জর্ম্মন ঐতিহাসিকেরা বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, লাইকর্গস-নামা কোন ব্যক্তি কখন স্পার্টা নগরে জন্মিয়াছিল কিনা, তাহার নিশ্চয়তা নাই! এইরূপে গ্রীক এবং রোমীয় ইতিহাস বিবৃত ঘটনা সমস্তের সত্যাসত্য বিচার অতি কঠিন ব্যাপার এবং সর্ব্বতোভাবে সন্দেহসঙ্কুল। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হয় যে, যেমন গ্রীকদিগের শিল্পকার্য্য সমূহে মানুষভাবের প্রাধান্য, প্রাকৃতিক ভাবের অপ্রাধান্য, ইতিহাসেও তদ্রূপ। অসত্য ঘটনাগুলিও ঠিক সত্যের অনুরূপ করিয়া বর্ণিত। সেগুলি প্রাকৃতিক ভাবে রঞ্জিত হইয়া অমানুষরূপ গ্রহণ করে নাই।

নব্য ইউরোপীয় জাতীয়দিগের ইতিহাসগ্রন্থ সকল গ্রীক এবং রোমীয়দিগের হইতেই অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত। এই জন্যই উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ অল্প। নব্য ইউরোপীয়দিগের ইতিহাস প্রায় সকল গুলিই একই ধরণের। আর উঁহারা পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক, এই জন্য উঁহাদিগের ইতিবৃত্তে অসত্য বর্ণনাও কিছু কম হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতির ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি ঠিক একই ভাবে লিখিত নহে। চীনীয়দিগের কাল-নিষ্ঠতা, আরবদিগের ঈশ্বরপরায়ণতা, য়িহুদীদিগের ঐহিক-নিষ্ঠতা, ভারতবর্ষীয়দিগের কার্য্যকারণপ্রবণতা এবং গ্রীকদিগের স্বদেশ-বাৎসল্য, যেমন ঐ ঐ জাতির বিশিষ্টভাব ব্যক্ত করে, কতক পরিমাণে জার্ম্মানদিগের অনুসন্ধিৎসা, ফরাসীদিগের নিপুণতা এবং ইংরাজদিগের কার্য্যপরতা তত্তজ্জাতীয় ইতিহাসগ্রন্থগুলিতেও বিশিষ্টরূপেই প্রকট হয়।

ফলতঃ সকল জাতির কাব্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্রাদি তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রদর্শন করে। অধিকারিভেদ ও বর্ণভেদ অপর কোন ধর্ম্ম বা সমাজে স্বীকৃত হয় না, সে জন্য কি আমাদের ধর্ম্ম বা সমাজ নাই বলিবে? সেইরূপ ভারত-

বাসীদিগের ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় গ্রীক বা ইউরোপীয়দিগের ইতিহাসের অনুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর ইতিহাস নাই, একথাও অসঙ্গত। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থ না থাকিলে যে জাতীয় ভাবের অসদ্ভাব বুঝায় সে কথা ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ ইতিহাস আছে। কোন সুবোধ ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের গ্রন্থগুলি পৃথিবীর অপর সকল জাতির গ্রন্থ হইতে বিচিত্র—ইহাই তোমাদিগের জাতিত্বের অনপনেয় চিহ্ন—যতদিন রামায়ণ থাকিবে, ততদিন হিন্দুজাতিও থাকিবে।"

জাতীয় ভাব—উহা সম্বর্দ্ধনের পথ

কর্ম্মে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করায় ফলাফল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্দ্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।

কিন্তু নিষ্কামতা যদিও মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী এবং শিক্ষণীয় এবং শাস্ত্রসম্মত তথাপি সকামতাই মনুষ্যের মনে অত্যন্ত প্রবল। সদুপদেশ এবং সুশিক্ষার বিশেষ ফল না পাইলে, আমরা কেহই বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিতে চাই না। যে কাজটি করিব, তাহা সফল হইবে কি না হইবে তাহা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখি, এবং ভাবিয়া যদি মনে মনে বুঝিতে পারি যে, কার্য্যটি সফল হইবে, তাহা হইলেই তাহাতে হাত দিয়া থাকি। জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের চেষ্টায় আমরা সফল হইতে পারিব কি না, উহার যে সকল ব্যাঘাত এবং অন্তরায় উপস্থিত হইয়া আছে বা হইতে পারিবে, তজ্জন্য বিফলপ্রয়াস হইব কি না—এই প্রশ্ন সহজেই উঠে, এবং উহার সদুত্তরপ্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক। চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা বোধ হইলেও আপনাদিগের কর্ত্তব্য অবশ্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে হইবে বটে—কিন্তু যদি উহা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অধিকতর আনন্দ এবং উৎসাহ জন্মিবে সন্দেহ নাই। অতএব একবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে, কালক্রমে ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব বিশিষ্টরূপে সম্বদ্ধ এবং দৃঢ়তর ও গাঢ়তর হইতে পারিবে, না উহা এখন যতদূর আছে তাহাই থাকিবে; না আরও শিথিল, দ্রবীভূত এবং উদ্বায়ী হইয়া যাইবে।

ভবিষ্যৎকালে কোন্ বস্তুর অবস্থা কি হইবে, তাহার অনুমান করিতে হইলে, দেখিতে হয় যে, যাহা আছে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সেইটির অনুকূল কি প্রতিকূল। প্রকৃতিই চিরস্থায়ী; সুতরাং উনি যাহার অনুকূলে তাহার স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধি, এবং উনি যাহার প্রতিকূলে তাহারই ক্ষয় এবং বিনাশ। প্রকৃতি-শক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের জাতীয়-ভাবের অনুকূলে না প্রতিকূলে? কোন্ জাতি সম্বন্ধে প্রকৃতির ভাব কিরূপ, তাহা জানিবার উপায় সেই জাতির ইতিবৃত্ত। বিভিন্ন জাতির ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী তত্তজ্জাতীয় লোকের প্রতি প্রযুক্ত যাবতীয় প্রকৃতি-শক্তিরই ফল। অতএব ভারতবর্ষের অতীত ইতিবৃত্ত হইতেই, ভবিষ্যতে আমাদিগের জাতীয়-ভাবের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সুব্যক্ত হইতে পারে।

ইতিবৃত্ত বলেন—এই মহাদেশে, বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কোলেরীয়, দ্রাবিড়ীয়, তাতারীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসম্ভুক্ত বিভিন্নাকার লোক সকল বাস করিত, উহাদের মধ্যে ভাষার ভেদ বহুশতাধিক ছিল, এবং উহাদিগের ধর্ম্মভেদেরও পরিসীমা ছিল না—গোষ্ঠী ভেদে উপাস্যদেবতার ভেদ ছিল।

ইতিবৃত্ত বলেন যে, উল্লিখিত বিভেদ সমুদয়, আর্য্য জাতিদিগের সংসর্গ প্রভাবে অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুলোম বিবাহপ্রণালীর বলে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পর আকারবৈলক্ষণ্য ন্যূন করিয়া দিয়াছে, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যদিও ততটা হয় নাই, কিন্তু সেখানেও অনেকদূর হইয়াছে। পূর্ব্বে যে অসংখ্য ভাষাভেদ ছিল, তাহাও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এক্ষণে যে দশটি বা দ্বাদশটি প্রদেশীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে সেগুলিও সর্ব্বকৃশ সংস্কৃতের প্রভুত্বে পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। আর পূর্ব্বপূজিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দেবদেবীসমূহ, আর্য্যশাস্ত্রকৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক রূপগুণে সংঘটিত হইয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিভূতিত্ব-রূপে পরিণত হইয়াছে। মৌলিক বর্ণভেদ এক্ষণে জাতীয় সম্প্রদায় ভেদ রূপে পরিণত হইয়াছে।

ইতিবৃত্ত বলেন—উপরি উক্ত রূপে অযোধ্যা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলিতে কতকটা আকারাদির বৈলক্ষণ্য ন্যূন হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অভ্যুত্থিত হইয়া হঠাৎ-কারে বর্ণভেদের বিলোপ চেষ্টা, কর্ম্মকাণ্ডের দোষোদ্ঘোষণ, এবং জ্ঞান ও উপাসনার গুণকীর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সম্রাট্‌দিগের অধীনে একচ্ছত্র প্রায় হইয়া একবার দেখিয়াছিল, আপনার বীর্য্য এবং প্রভাবশালিতা এবং মহিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের পীড়ন করিতে লাগিল। স্বজাতিবিদ্বেষ যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল। যেটুকু সম্মিলন

জন্মিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না।

ইতিবৃত্ত বলেন—শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী কর্তৃক বৌদ্ধনিরসন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের তাদৃশ একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এমন কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিল, যাহা মনে উঠিবার বিষয় মাত্র হইয়াছিল, কার্য্যে সম্পাদিত হইবার বিষয় হয় নাই। এই জন্য বৌদ্ধ স্বয়ং হীনতেজঃ হইয়া বিনষ্ট হইল। কিন্তু শঙ্কর স্বামী বৌদ্ধবাদের মূলকথা যে, কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান এবং তপস্যা প্রধান, তাহার অন্যথা করেন নাই, স্বয়ংই তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণেতর লোকদিগেরও জ্ঞানমার্গে অধিকার স্বীকাব করিয়া গিয়াছেন।

ইতিবৃত্ত বলেন—মুসলমানেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইহারই কেন্দ্রীভূত ভাষাটিকে সর্ব্বপ্রদেশে প্রচলিত প্রায় করিয়া দিয়া এই মহাদেশেব একতা সাধনের উপায় করিয়াছেন, আর সাম্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অন্ত্যজ জাতীয়দিগেরও অপব সকলের সহিত সাদৃশ্য লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখনও স্বজাতি-বিদ্বেষ দোষে দূষিত হয়েন নাই, এবং হিন্দুদিগের মধ্যে যে পানদোষ ছিল না, মুসলমানেরা সে দোষ বিন্দুমাত্রও বর্দ্ধিত করেন নাই। ঐ সকল বিষয়ে এবং স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগেব প্রতি একান্ত সহানুভূতি সম্বন্ধে উঁহারা হিন্দুদিগের আদর্শ হইয়া আছেন।

ইতিবৃত্ত বলেন—বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, ইহাও একটি সুলক্ষণ যে, ইউরোপীয় অপর কোন জাতীয় লোকের হস্তগত না হইয়া ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের একতা প্রাপ্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে বই ন্যূন হয় নাই। শুদ্ধ রাজা এক হইয়াছে বলিয়া নয়—দেশময় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নয়—সর্ব্বস্থান আয়সশৃঙ্খল স্বরূপ লৌহবর্ত্ম যোগে পরস্পব সম্বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও নয়—ইংরাজ ভারতবাসী সকলকেই নির্ব্বিশেষে সমান পরিমাণে দূরস্থ করিয়া রাখেন, সুতরাং সকলেই আপনা আপনি সংযত হইবে, তাহা বলিয়াও নয়—ইংরাজ রাজনীতি বিষয়ে, পৃথিবীর অপর সকল জাতির আদর্শস্থলীয়, ইংরাজ শুদ্ধ বিচারমার্গ অবলম্বন করিয়া যাহা ভাল বা উচিত, তাহা করেন না, প্রকৃত যোগ্যতার প্রমাণ না পাইলে কাহার বন্ধন অল্প পরিমাণেও শিথিল করিয়া দেন না, আবার যোগ্যতার প্রমাণ পাইলেই দেন—সুতরাং ইংরাজের সংসর্গে রাজনীতি শিক্ষার উপায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সমাজের বল পোষিত এবং সুসম্বর্দ্ধিত না হইতে হইতে ইংরাজাধিকারে কোন অসাময়িক চেষ্টারও সাফল্য-

সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই অতি প্রধান ঘটনাগুলির সমালোচনায় দেখা গেল যে, প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটি যেন একটি স্থিরলক্ষ্যের প্রতি অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে একটু একটু বাঁকিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু নদীও সাগরসঙ্গমে যাইতে, বাঁকিয়া ঘুরিয়া যায়—গাছও আকাশ-মুখে উঠিতে মোড় খাইয়া উঠে—ছেলেরাও বাড়িবার সময় একবার মোটায় একবার রোগায়—সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্যের গতিই ঐরূপ।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে সম্মিলন-প্রবণতা এবং বিচ্ছেদ-প্রবণতা উভয় শক্তিরই কার্য্য হইয়া আসিতেছে—এবং তন্মধ্যে সম্মিলনপ্রবণতাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিতবল হইতেছে। ইতিহাস হইতে ইহাও দেখা যায় যে হিন্দুদিগের মধ্যে স্বজাতিবিদ্বেষ দোষটি অতি প্রবল এবং ঐ দোষেই ইহাদিগের বিচ্ছেদ প্রবণতা এবং পরাধীনতা জন্মিয়াছে। ইংরাজের দৃঢ়-মুষ্টির ভিতরে পড়িয়া অবধি আর বিচ্ছেদ-প্রবণতা তাদৃশ প্রকট হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু স্বজাতিবিদ্বেষের ভূরি ভূরি লক্ষণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ সমুদয় ভারতবর্ষকে এক শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে সকল ভেদের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। প্রদেশীয় ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ রাখিবার জন্য, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা প্রজ্বলিত করিবার জন্য, হিন্দু সমাজের অন্তর-মধ্যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করিবার জন্য, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরুদ্ধ স্বার্থ জন্মাইবার জন্য, দলাদলির রাজনৈতিক সূত্রে পরিষিক্ত-হৃদয় কোন কোন ইংরাজকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ যত্নশীল বলিয়াই বোধ হয়। অতএব যেমন ইংরাজ থাকাতেই এক পক্ষে সম্মিলনপ্রবণতার বৃদ্ধি হইতেছে, আবার পক্ষান্তরে, তাহার কোন কোন কার্য্যের ফলে ঐ বিচ্ছেদপ্রবণতার বীজগুলিতে কিছু কিছু বারিসিঞ্চন হইতেছে। অতএব প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান ইংরাজের কার্য্য উভয়েই আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে—যথা,

(১) জাতীয়ভাব সংসাধনার্থ হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে।

(২) ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব, অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি এবং রাজভক্তি করিতে হইবে।

(৩) ইংরাজের স্থানে আত্মসমাজের প্রতি উপচিকীর্ষা তাঁহাদের বাহ্য দলাদলির ভাব পরিবর্জ্জিত করিয়া শিখিতে হইবে। আপনাদিগকে ইংরাজ-সমাজের

অন্তর্ভূত মনে করিয়া তাঁহাদের দলাদলিতে মিলিত হইবে না এবং তাঁহাদের মুখাপেক্ষিতা যতদূর সম্ভব পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অবধারণ করিতে হইবে।

(৪) হিন্দুকে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতীয় সহানুভূতিকেই পরম ধন জ্ঞান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু সমাজ

ভারতবর্ষ মহাদেশে যে জাতীয় ভাবটি আর্য্যসমাগম-কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত এবং অঙ্কুরিত হইয়া মুসলমান প্রবেশে অসঙ্কুচিত, প্রত্যুত প্রবলীকৃত হইয়াছে এবং ইতিহাসাদিতে যাহার মহীয়সী ছায়া দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কল্পবৃক্ষের সুমহৎ কাণ্ড—হিন্দু সমাজ।

এই সমাজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রধান বলিয়াই গণ্য। ভূমণ্ডলস্থ সমগ্র মনুষ্যসংখ্যা যত, এক হিন্দুসমাজেই তাহার অষ্টমাংশ; আর যদি ধর্ম্মপ্রণালীর এবং নীতিশাস্ত্রের সাদৃশ্য লইয়া গণনা করা যায়, তবে স্থূলতঃ হিন্দুপ্রকৃতির এবং মূলতঃ হিন্দুধর্ম্মের লোক পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার দশ আনারও অধিক হইয়া উঠে, সমস্ত ইউরোপীয় জনগণের সমষ্টি চারি আনার বেশী হইবে না। কিন্তু বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এই ভারতভূমির অন্তর্নিবিষ্ট হিন্দুসমাজ কিরূপ বস্তু, তাহাই একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

সমাজমাত্রেই অতি গুরুতর বস্তু। বৌদ্ধেরা সমাজকেই 'সংঘ' বলিয়া এবং কোমটিস্টরা 'হিউমানিটি' বলিয়া অতি পূজনীয় পদার্থই বিবেচনা করেন। যুক্তি এবং শাস্ত্রমতেও সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ, প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজটি অতি গৌরবেরই বস্তু। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধনপ্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র, এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু হিন্দু সমাজ এখনও অটুট এবং অটল। ইহার

অন্তরে কোন অতি উচ্চতম তথ্য না থাকিলে ইহা কি এত দিন স্থায়ী হইত ?

কিন্তু সমাজ যেমনই হউক, মানুষ সমাজ গঠন করিতে পারিয়াই মানুষ হইয়াছে ; সমাজসম্ভুক্ত না থাকিলে, বন্য পশু হইত। যিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় পালিত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর যেমন সে দেশের জলবায়ুর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তেমনি যে ব্যক্তি যে সমাজে জন্মিয়া তন্মধ্যে পালিত হয়েন তাঁহার মনের গঠনও সেই সমাজের প্রকৃতি গ্রহণ করে। সকল সমাজের প্রকৃতি একরূপ হয় না ; যেমন প্রতি ব্যক্তির একটি বিলক্ষণতা আছে, তেমনি প্রতি সমাজেরও এক একটি বিশেষ লক্ষণ আছে, এবং তদন্তর্গত লোক সকল বিশিষ্ট রূপেই তল্লক্ষণাক্রান্ত হয়। কোন সমাজের লোক শ্রমশীল এবং কার্য্যনিপুণ, কোন সমাজের লোক দানশীল এবং আড়ম্বর-পরায়ণ। সকল প্রকার লোকেই সকল সমাজে থাকে, কিন্তু সমান পরিমাণে থাকে না ; আর যে সমাজের যেটি মূল-প্রকৃতি তাহা প্রায়ই সমাজান্তর্গত সকল লোককে কিছু না কিছু রঞ্জিত করিয়া রাখে। এইজন্য সমাজতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের কর্ত্তব্য কোন্ সমাজের মূল-প্রকৃতি কি, তাহা নিরূপণ করিবার যত্ন করা। কোন সমাজের মূল-প্রকৃতি অবধারিত হইলে, ঐ সমাজস্থ জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি কোন্ মুখে যায়, এবং উহাদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি কি প্রকার জীবন-যাত্রার আদর্শ গ্রহণ করে, তাহা বিশিষ্ট-রূপেই বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহা বুঝিতে পারিলেই কোন্ সমাজ কোন্ মুখে চলিলেই ভাল চলিতে পারিবে, তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের মূল-প্রকৃতি কি ? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানের চেষ্টা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক করাই আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজ বহুকালাবধি পরজাতীয় লোকের অধীন হইয়া রহিয়াছে ; এক্ষণে ইংরাজের, তাহার পূর্ব্বে মুসলমানের অধীন ছিল। ইংরাজের অধীন কিরূপে হইয়াছে, তাহার বিশেষজ্ঞ একজন সূক্ষ্মদর্শী ইতিহাস-বেত্তা বলেন যে, ইংরাজেরা অস্ত্রবলে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, এটি মিথ্যা কথা ; ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে আপনারাই জয় করিয়া ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, ইহাই সত্য কথা। মুসলমানদিগের বিজয় ঠিক ওরূপ ব্যাপার নহে। উহারা আপনারই অস্ত্রবলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগ সকল ক্রমে ক্রমে জয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও যে পারিয়াছিল, তাহার মুখ্য কারণ এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অন্তর্ব্বিবাদে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং যুদ্ধ কার্যটিকে আপনাদিগের সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। যখন ওরূপ করে নাই, অর্থাৎ যখন যুদ্ধ করা প্রজাসাধারণের কার্য্য বলিয়া

মনে করিয়াছিল, তখনই মুসলমানেরা পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিবজীই মহারাষ্ট্র দেশে ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অতি বিশ্বস্ত পারিষদ, যিনি সিংহগড়-বিজেতা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, সেই টানাজী মালশ্রীকে বিজয়পুররাজ-সেনাপতি একদা জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদিগের সৈন্য কোথায়? মালশ্রী লাঙ্গলবাহী কৃষকদিগকে দেখাইয়া বলেন, ইহারাই আমাদিগের সৈন্য। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের কৃষিজীবী এবং কারুকার্য্যব্যবসায়ী সাধারণ প্রজাব্যূহ কখনই সংগ্রাম কার্য্যে ব্যাপৃত হইত না এবং সেইজন্যই ভারতবর্ষের রাজ্য জয় করা অপরের পক্ষে অল্পায়াসসাধ্য হইত। প্রসিদ্ধি আছে যে স্বজাতীয়ের মধ্যেই হউক, আর বিদেশীয়দিগের সহিতই হউক, যখন ভারতবর্ষের মধ্যে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত, তখন কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য অবাধে সম্পাদিত হইতে থাকিত। যে সমাজ অন্তঃশাসনে শাসিত, সুতরাং ভাবিতে পারে যে, রাজ-শক্তি এক হাত হইতে অন্য হাতে গেলেই সমাজের ব্যাঘাত হয় না, সেই সমাজেই সংগ্রামকার্য্যটি সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আর ইহাও বলা যায় যে, যথায় সংগ্রাম কার্য্যটি সম্প্রদায় বিশেষের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে, তথায় জনসাধারণের মধ্যে শান্তি-প্রবণতা জন্মে। ইউরোপীয় ইতিহাসেও দেখা যায় যে, যখন ঐ খণ্ডের বিভিন্নদেশীয় সমাজ সকল দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া উঠিল, তখনই যুদ্ধকার্য্যটি একটি ব্যবসায় বিশেষের ন্যায় হইল, তবে ইউরোপে ভৃতিভুক্ সেনাদল জন্মিয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ অস্ত্র-পিশাচিকা কখন জন্মে নাই। সমাজ-বন্ধনের গুণে পূর্ব্বাবধিই এখানে বীরধর্ম্মা ক্ষত্রিয়জাতীয়েরা যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ফলতঃ হিন্দু সমাজের এই লক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা অন্তঃশাসনে শাসিত এবং শান্তিপ্রবণ। সমাজের এই অন্তঃশাসন এবং শান্তিপ্রবণতা গুণেই অত্যল্পসংখ্যক ইংরাজ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন এবং এই রাজ্য আপনাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা সিপাহি হইয়াছিল বলিয়াই ইংরাজের জয় হয় নাই—হিন্দু সমাজবন্ধনের অবশ্যম্ভাবী ফল যে, অন্তঃশাসনশীলতা এবং শান্ত-প্রকৃতিকতা, তজ্জন্যই ওরূপ হইয়াছিল। সেদিন গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব জাঁক করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে এক একটি ইংরাজ এক একটি বৃহৎ রাজ্য শাসন করিতেছেন, অতএব ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বেতন অধিক, এ কথা মনে করিতে নাই। ইংরাজ নিজের গুণ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না, হিন্দু-সমাজবন্ধনের গুণেই যে দেশে শান্তি রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাইলেন না, আপনার মহিমাই দেখিলেন। এই স্থলে যদি কেহ এমন কথা বলেন যে, যে সমাজবন্ধনে এমন সর্ব্বনেশে শান্তপ্রকৃতিকতা জন্মে, সে সমাজবন্ধন ভাল নয়, তাঁহাকে দুইটি কথা

বলিব। এখানে কোন্ সমাজ ভাল, কে মন্দ, তাহার বিচার হইতেছে না। আর কোন সমাজ অন্য কর্ত্তৃক বিজিত হইলেই যে তাহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, তাহাও নয়। মূর্খ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, অসভ্য মাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল, বন্য তাতারীয়েরাও সুসভ্য চীনীয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল, অসভ্য বর্ব্বরজাতীয়েরা রোম-সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, পাশুপাল্যোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসামদেশ অধিকার করিয়াছিল। যে যুদ্ধে হারে, সেই হীন, এটা গোঁয়ারের কথা—বিচক্ষণ লোকের কথা নয়। হিন্দুরা তাঁহাদের ভালর জন্য হউক, আর মন্দের জন্যই হউক, গুণের জন্যই হউক, আর দোষের জন্যই হউক, অতিশয় শান্তপ্রকৃতিক। দেখ দুর্ভিক্ষপীড়ায় পীড়িত হইয়াও ইঁহারা কখনও রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়েন না। অন্য দেশে ইহার শতাংশ হইলেও চুরি ডাকাইতি এখানে যত বাড়ে তাহার শতগুণ বাড়িয়া যায়, বড় মানুষের গৃহাদি ভগ্ন করা হয় এবং অতি ভয়ানক রাজদ্রোহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। এখানে কোন উচ্চবাচ্য হয় না বাললেই চলে। লোক সকল না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়—রাজার দোষ দেয় না—কাহারও দোষ দেয় না, আপনাদের কর্ম্মফল বলিয়া সকল দুঃখই সহ্য করে।

অন্য সমাজের লোকের কাছে তাহাদিগের ধর্ম্মের বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের নিন্দা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মারিতে উদ্যত হয়। এই সেদিন, একটি গ্রন্থকার, পয়গম্বর মহম্মদের তাদৃশ গুণকীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া বোম্বাই নগরের মুসলমানেরা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া ফেলিল, আর বাঙ্গালী মুসলমানেরা ঐ প্রকার একটা কথা লইয়া কতই বকাবকি করিলেন। মিশরে, অস্ট্রিয়াতে, ইটালিতে, আয়র্লণ্ডে ঐরূপ ধর্ম্মবিদ্বেষজনিত কতই ঝগড়া-ঝাঁটির কথা সর্ব্বদাই শুনা যায়। কিন্তু হিন্দু সমাজের বুকে বসিয়া কত লোকে কত দেবতার নিন্দা, শাস্ত্রের নিন্দা এবং কত প্রকারে হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছে এবং করিতেছে—হিন্দুরা কিছুই বলেন না। পরকালের উপর নির্ভর করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের কথায় এবং আচারে দৃক্‌পাতও করেন না। ইউরোপীয় সমাজের লোকেরা সহিষ্ণুপ্রকৃতি নয়, এই জন্য ইংরাজেরা হিন্দুদিগের সহনশীলতার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন না; আর দেশীয় ইংরাজীশিক্ষিত লোকেরাও কতকটা ইংরাজদিগের অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ইউরোপীয় সমাজগুলিরই কিছু কিছু বিবরণ জানেন, আর কিছুই জানেন না; সুতরাং স্বদেশীয়দিগের সহনশীলতা কেমন ধর্ম্মনিষ্ঠতার চিহ্ন তাহা বুঝিতেই পারেন না। উহা বলহীনতার লক্ষণ মনে করেন।

ভারতবাসী অতি দরিদ্র। ইহাদিগের মধ্যে চারি পাঁচ কোটি লোক একাশনে দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু তাহা কেহ জানিতেও পারে না—দৌরাত্ম্য নাই—কাতরোক্তি নাই—আপনার কর্ত্তব্যপালনে যথাশক্তি ত্রুটিও নাই। অন্য কোন সমাজে, এত দুঃখ যন্ত্রণা এমন নিঃশব্দে সহ্য হইতে পারে না। অন্য কোন সমাজে, এতটা দুঃখসত্ত্বে, এত দানশীলতাও থাকিতে পারে না। ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেশের এই দুরবস্থা কিছুই না বুঝিয়া এবং নিতান্ত মমতাশূন্য হইয়া আতসবাজী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি তামসিক ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনবান লোকদিগের দান-কার্য্যের মুখ ফিরাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আজি কালি যেন ঐ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি একটু খুলিতেছে। এখন অবধি প্রকাশ্য সভায় চাঁদা তুলিয়া যে সকল দানকার্য্য চলিবে, তাহার সমস্তই ইংরাজ রাজপুরুষের সন্তোষ সাধনার্থই ব্যয় হইবে না—যেন কতকটা দেশের লোকের উপকারেও লাগিবে। "জুবিলী" উপলক্ষে যে দান হইল, তাহার অনেকটা শিল্প-শিক্ষালয়ের নিমিত্তও হইয়াছে। কলিকাতায় রাজ-পৌত্রের শুভাগমন উপলক্ষে যে চাঁদা উঠিয়াছে তাহার কতক টাকা কোন স্থায়ী হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবার কথা উঠিয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রে, ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ আছে। সেই আচারে পবিত্রতা, ধর্ম্মভীরুতা, আত্মসংযম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি শান্তিময় ঋষিচর্য্যা শিক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দুসমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুসমাজের প্রকৃতি—শান্তি। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন। একজন বহুদর্শী ইংরাজের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল, অপর সকল সমাজের ছোট লোকেরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদিগের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্য ভাবাপন্ন।"..."কিন্তু ভারতবাসীর সুখ কৈ?"..."সত্য সত্যই জগতে সুখের পরিমাণ অধিক নয়—আর মানুষের সুখ, বাহ্য বিষয় লইয়া অধিক, না আন্তরিক ভাবের অবস্থা লইয়া অধিক? ঐ তাড়িখানায় তাড়ি খাইয়া যাঁহারা গোলমাল করিতেছে, তুমি কি তাহাদিগকে বিশেষ সুখভোগী মনে কর? কিন্তু উহারাও ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের অপেক্ষা অল্প দুর্ব্বৃত্ত—সুতরাং অল্প দুঃখভাগী।"

কোন্ সমাজের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা সেই সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট কতকগুলি

লোককে ভাল করিয়া দেখিলেই এক প্রকার মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। সমাজের মূল-প্রকৃতি এমনই প্রবল বস্তু যে, উহা বহির্ভাগেও উঠে। কিন্তু উহা ভিতরেই গাঢ়তর রূপে দৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজের মূল-প্রকৃতি যে অন্তঃশাসন এবং শান্তি, তাহা হিন্দুদিগের ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থাতে যেমন দেখা যায়, ঐ সমাজের নিয়ামক শাস্ত্রসমূহের মূল বিচারপ্রণালীতে তাহা স্পষ্টতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু এবং অপরাপর সমাজ

মানুষ এই বাহ্য জগতের এবং তাহার নিজের অন্তর্জগতের সম্বন্ধে মনে মনে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই সকল প্রশ্নের উত্তরসম্বলিত গ্রন্থের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র বিভিন্ন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে উল্লিখিত মানস প্রশ্ন সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। একটি মানস প্রশ্ন এই—"জগতে এত বৈষম্য কেন? মানুষে মানুষেই বা এত বৈষম্য কেন?" কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অনুশীলনতৎপর আর্য্য ঋষিগণ বলিলেন—কাল ত্রিধা বিভাজিত; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; বর্ত্তমানে যাহা দেখা যায়, তাহা অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই ফল, আর বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে, ভবিষ্যৎ তাহারই ফল প্রসব করিবে। এটি আমগাছ এবং ওটি তেঁতুল গাছ কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ? একটি আমের আঁটি হইতে হইয়াছে, তাই আমগাছ, আর ওটি তেঁতুলের বীজ হইতে হইয়াছে, তাই তেঁতুল গাছ। মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য উপলব্ধ হয় তাহার প্রতিও ঐরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নির্দ্দেশ কর, দেখিতে পাইবে যে, পূর্ব্বগত ঔৎপত্তিক কারণ সমূহের ভেদ বশতঃই কোন মানুষ এক প্রকার, কেহ অপর প্রকার। এই পূর্ব্বগত কারণ সমূহের নাম 'প্রাক্তন'। ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধেও ঐ বিচার-প্রণালী চলিল, এবং সেটির নামান্তর হইল 'পরকাল'।

এই ভিত্তিমূলের উপর হিন্দুদিগের নীতিশাস্ত্র সংস্থাপিত। সেই শাস্ত্র শিখাইলেন যে, বর্ত্তমানে প্রাক্তনের ফলভোগ এবং পরকালে বর্ত্তমানের ফলভোগ হয়। এই শিক্ষা পল্লবিত হইয়া সমাজস্থিত জনসমূহকে একটি সান্ত্বনার এবং একটি উত্তেজনার বাক্য বলিল—প্রাক্তনের সুকৃত থাকে—বর্ত্তমানে ভাল থাকিবে, দুষ্কৃত থাকে—ভাল থাকিতে পারিবে না; আর বর্ত্তমানে সুকৃত করিতে পার—পরকালে ভাল থাকিবে, সুকৃত না করিতে পার, ভাল থাকিবে না। এখন দেখ, প্রাক্তনবাদী হিন্দুর পক্ষে কোথাও অসন্তোষের কারণ রহিল না। তাঁহার প্রাক্তনবাদ তাঁহাকে শান্ত করিল; কারণ নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে চলিবে

কেন? আর পরকাল ইহকালের আয়ত্ত হওয়াতে চেষ্টা শক্তিরও যথোচিত উত্তেজনা হইল। এইরূপে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা-নিবদ্ধ হিন্দুর নীতিশাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইল। ইহাতে ধৈর্য্য, ক্ষমা, নিরহঙ্কারতা, উদ্যোগ—সকলেরই স্থান হওয়াতে এবং কার্য্যকারণ চিন্তার দিকে মনের প্রবণতা হওয়াতে বিদ্বেষাদিভাব বিনষ্ট হইয়া সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

বৌদ্ধ শাস্ত্র হিন্দু শাস্ত্রেরই সন্তান। ঐ শাস্ত্রেও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার বিচার, হিন্দুশাস্ত্রের বিচারের ন্যায়—অতি দৃঢ়সম্বদ্ধ। তবে বৌদ্ধেরা নিকৃষ্টাধিকারীর অর্থাৎ মোগলাদি বর্ণসম্ভূক্ত নিকৃষ্টশ্রেণীস্থদিগের উপযোগী করিবার জন্য হিন্দু-শাস্ত্রেরই বিচারপ্রণালীকে আধ্যাত্মিক অংশে সংকুচিত করিয়া বলিল যে, কার্য্য দেখিলেই, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, ইহা দেখিলেই তাহার কারণের অনুমান করা আবশ্যক, নচেৎ যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, এইরূপ মনে করাই ভাল। বৌদ্ধেরা কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে যান না, আবার জাগতিক কার্য্যে আত্মত্বারোপ পূর্ব্বক এক অচিন্ত্যানন্ত মহাশক্তির অনুভব করেন না। উঁহারা যদি কোথাও একত্ব দেখেন, তাহা আকাশে। উঁহারা জগতে যত কার্য্য দেখেন তাহাতে রূপান্তরতা মাত্র দেখেন, এবং তাহা দ্রব্যশক্তি হইতেই হয় বলেন; বৌদ্ধেরা জগতের সাদিত্ববাদ পরিহার করেন। ফলতঃ আর্য্যজাতীয় হিন্দুর হৃদয়ে বিচারশক্তি এবং কল্পনাশক্তি, এই উভয়ের যে সামঞ্জস্য আছে, মোগলজাতীয় লোকদিগের হৃদয়ে সেই সামঞ্জস্যের অভাব। উহাদিগের চিন্তাশক্তি যেমন দ্রব্যনিষ্ঠ তেমন ভাবনিষ্ঠ নয়। এই জন্যই হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উঁহাদিগের পরিগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া আছে। উঁহাদিগের নীতিশাস্ত্রও প্রাক্তনবাদ স্বীকার বশতঃ হিন্দু নীতি-শাস্ত্রের ন্যায় শান্তিপ্রদ। কিন্তু দ্রব্যশক্তি হইতেই কার্য্য হয়, মানুষও দ্রব্য, অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের মানুষশক্তির অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য। উহাতে পুরুষকারের তেজ প্রবলতর। চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশীয়দিগের মধ্যে হীনাবস্থ লোকেরাও শান্তশীল এবং সৌজন্যপূত। তাহারা স্ব স্ব জাতীয় যাজকবর্গের শাসনে সুশাসিত, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে নেতৃবর্গের বশীভূত থাকিয়া বিশ্বস্ত মনে তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত কার্য্য সকল সাধন করে। এই শান্তশীলতা এবং বশ্যতার গুণে এবং পুরুষকারের প্রাধান্যবোধ নিবন্ধন, চীনীয়, জাপানীয়, শ্যামীয় প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতীয়েরা অতিশয় কার্য্যসাধনশীলরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং সাধনশীলতা বা স্বাতন্ত্রিকতা ঐ সকল জাতীয়দিগের মূল প্রকৃতি বলিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রত্যুত, একজন ফরাসী

সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উল্লিখিত বৌদ্ধজাতীয় সমাজগুলিকেই পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে ঐগুলিতে শান্তি এবং স্বচেষ্টা দুইই যথাপরিমাণে আছে। উঁহাদিগের শান্তি আছে, অতএব ইউরোপীয়-দিগের ন্যায় ঈর্ষ্যানলে এবং সুখলালসায় জ্বলিত হইয়া আপন আপন সমাজ মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ করে না, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র মার-কাট করিয়া ছুটিয়া বেড়ায় না ; আর স্বচেষ্টা আছে বলিয়া যখন যাহা করা প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা সত্বরে সম্পন্ন করিয়া লইতে পারে। ফরাসীরা আনাম প্রদেশ হইতে বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া উঠিল, অমনি চীনীয় সৈন্য এমন সুশিক্ষিত হইয়া দাঁড়াইল যে, ফরাসীদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিল। রুশীয়, আমেরিক, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজ সকল সময়ে সময়ে জাপানে যাইয়া উপদ্রব করিতে লাগিল, অমনি জাপানীয় ভূম্যধিকারীরা সকলে একমত হইয়া উঠিলেন, ভূমিসম্পত্তির লভ্যাংশ রাজা মিকাডোর হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা সুশিক্ষিত সৈন্যদল এবং সুবৃহৎ পোতবাহিনী প্রস্তুত করাইলেন। চীন, জাপান, কিয়ৎপরিমাণে শ্যামদেশও অতি স্বল্পকাল মধ্যে ইউরোপীয় প্রবল জাতীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল হইবার হেতু, ঐ সকল জাতীয়দিগের মূল প্রকৃতি স্বাতন্ত্রিকতা বা সাধনশীলতা।*

* হিন্দু জাতির সহিত উহাদের পার্থক্য দুই বিষয়ে। হিন্দুরা ইচ্ছাশক্তি এবং প্রাক্তন মানিয়া পুরুষকারের গৌরব একটু অল্প করিয়াছে, আর এক্ষণে উহাদের ন্যায় স্বজাতীয় অধিনায়কের অধীনে নাই। বিজাতীয় অধিনায়কের অধীন হইয়া রহিয়াছে। যদি ভারতবর্ষ আজি রাজনীতি সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত না হইত, তবে কি ইহারও সুশিক্ষিত সৈন্য, সুদৃঢ় পোতবাহিনী এবং ইউরোপীয় বিষয়-বিদ্যায় সুবিদ্বান লোক সকলের অভাব থাকিত? কিছুরই অভাব থাকিত বলিয়া বোধ হয় না। কাজ অপরে করিয়া দিলে, কাজ করিবার সম্বল অপহরণ করিলে, কাজ করিতে পারি না বলিয়া অনুক্ষণ ভর্ৎসনা এবং অবজ্ঞা করিলে, কাজ করিবার উপক্রমমাত্র মাথার উপর বসিয়া টিক টিক করিলে কেহই কোন কাজ করিতে পারে না। আজ হিন্দুরা সেই জন্যই শুদ্ধ শান্তশীল হইয়া আছেন, সাধনশীল হইয়া উঠিতেছেন না। হিন্দুর অপেক্ষা কোন গুণই চীনীয়, জাপানীয়, শ্যামীয় প্রভৃতির নাই। উহারাও যেরূপ অবলীলাক্রমে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা গ্রহণ করিয়াছে, ছাড়া থাকিলে হিন্দুরাও সে সমকক্ষতায় নামিয়া আসিতে পারিত সন্দেহ নাই। নামিয়া আসিতে পারিত বলিবার কারণ এই যে, ইউরোপীয় সমাজগুলির প্রকৃতি হিন্দু সমাজের প্রকৃতি অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিম্নবর্ত্তী।

যেমন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়দিগের মূল প্রকৃতি এক বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল, সেইরূপ খ্রীষ্টমতানুগামী বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিদিগেরও স্থূলতঃ এক-প্রকৃতিকতা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম যে মূল হইতে উৎপন্ন খ্রীষ্টধর্ম্ম সে মূল হইতে উঠে নাই। উহা প্রাক্তন মানে না। মনুষ্য আপনার আত্মত্বারোপশক্তির প্রয়োগ দ্বারা জগৎকার্য্যে যে ইচ্ছাশক্তির উপলব্ধি করে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সেই ইচ্ছাশক্তিকেই জগতের এবং জাগতিক সমস্ত কার্য্যের কারণ বলিয়া মানে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সাদিবাদী এবং একেশ্বরবাদী। তাহারা অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মবাদী নহে। উহারা প্রাক্তন মানে না, সুতরাং শান্তিপ্রবণ বা সন্তুষ্টচিত্ত নহে। উহাদিগের সমাজগুলি তদন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুদ্ধক্ষেত্রস্বরূপ। উহারা যে সম্বদ্ধ এবং সংঘট্ট হইয়া এক একটি প্রবল জাতি হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বাহিরের চাপে যত হইয়াছে, আন্তরিক সহানুভূতির বলে তত হয় নাই। প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতিকে আপন আপন চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী অপরাপর জাতীয়ের সহিত অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং তাহা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব অন্তর্ভেদ অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। সামরিক হইয়া থাকিতে হইলেই দলবন্ধন দৃঢ় করিতে হয়; এবং দল দৃঢ় করিতে হইলেই কতকগুলি নীতিসূত্রের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—যথা নেতার বশ্যতা, নিজ দলের পক্ষপাতিতা ইত্যাদি।

খ্রীষ্টানেরা পরকাল মানে। কিন্তু উহারা যেরূপে পরকাল মানে তাহাতে নীতিসূত্রের সমধিক পোষণ হইতে পারে না। উহারা পরকালের সুখ দুঃখকে ইহকালের সুকৃত দুষ্কৃতের অবশ্যম্ভাবী ফল বলে না। সে সুখ দুঃখও ঈশ্বরের যথেচ্ছ অনুগ্রহ নিগ্রহের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে—আর সে অনুগ্রহ নিগ্রহও পুণ্য পাপের বিচার জনিত না হইয়া বিশেষ বিশেষ মতবাদের প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাসবশতঃই হয়।

ইহলৌকিক যাবৎ বৈষম্যের কারণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরেচ্ছা—এরূপ মতবাদের সূক্ষ্ম এবং গূঢ় তাৎপর্য্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিরা যাহাই বুঝুন, কিন্তু সাধারণ অবিদ্যা, অবুদ্ধি, আত্মম্ভরিভাব লোকের মনে উহা অবশ্যই স্বৈরাচারের*

---

* ঈশ্বর স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মানুষে মানুষে বিষম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ বিনা কারণে কাহাকেও সুখভাগী কাহাকেও দুঃখভাগী করিয়াছেন, একথা বলিতে গেলেই তাঁহার ন্যায়ানুগামিতা নষ্ট হয়; কিন্তু ইউরোপীয়েরা ঐ কথাই বলে। মানুষ আপনার হৃদয়ে যে সকল ধর্ম্মভাব অনুভব করে তাহারই উচ্চভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি গঠন করিয়া থাকে। ইউরোপীয় হৃদয়ে যদি তেমন

প্রবর্ত্তক এবং পরিবর্দ্ধক হইবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সাধারণ ইউরোপীয় লোকের মনে স্বৈরাচার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলীয়সী; উহাদিগের মত অনিষ্টাচার, দুর্দ্দান্ত, অবিমৃশ্যকারী, স্বার্থপরায়ণ লোক পৃথিবীর আর কোন সমাজে নাই। ইহারা স্ব স্ব দেশেই ত বিবাদ, বিসম্বাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সন্তানহত্যা করিয়া থাকে—ইউরোপীয়েতর জাতির প্রতি উহাদের ব্যবহার নিষ্ঠুরতা এবং শঠতায় পরিপূর্ণ—অন্যের পীড়ন এবং ধর্ষণ করায় উহাদিগের অন্তরাত্মা যেন আনন্দাভিষিক্ত হয়। সাধারণ ইউরোপীয়গণ যে ভাবে চলে, তাহা দেখিলেই উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অনেকেই জলদস্যু ছিল, এবং নির্ভীকহৃদয়ে সমুদ্র ভেদ করিয়া আসিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিকে লণ্ডভণ্ড করিত, সেই সকল কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। তাহারা রোম সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা-পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং সেই সাম্রাজ্যের যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহাই কুড়াইয়া লয়। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকৃত না থাকায় খ্রীষ্টধর্ম্ম উহাদিগের দস্যুভাব দমনে সমর্থ হইতে পারে নাই। সমর্থ না হইবার অপর কারণ উহাদিগের ঔৎপত্তিক ধৃষ্টতাও বটে আর উহাদিগের পরিগৃহীত রোমীয়দিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রের দোষও বটে। অধস্তন রোমীয়দিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে ধনের গৌরব এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব বিশিষ্টরূপেই সমর্থিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবস্থাশাস্ত্র গ্রহণ করে, এবং ধনের অত্যধিক গৌরব করিতে শিখে। যাহারা ধর্ম্মশাসনে অশাসিত, অথবা অল্প শাসিত এবং অর্থলোভে আকৃষ্ট তাহাদিগের যে প্রকৃতি হয়, সাধারণ ইউরোপীয়দিগের সেই প্রকৃতিই হইয়া আছে। তাহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ এবং আত্মসুখান্বেষী হইয়াছে। উহারা বলপ্রয়োগ এবং প্রাণিবধে অসঙ্কুচিতচিত্ত এবং সুখলালসা তৃপ্তির জন্য অপরিসীম ধনাকাঙ্ক্ষী। উহাদিগের শাস্ত্রের আদেশ—পৃথিবীর সকল লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত কর—কিন্তু উহারা ধনলাভ করিবে বলিয়াই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে। পূর্ব্বপুরুষদিগের জলদস্যুতা এখন বাণিজ্যপরতা দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র। ইউরোপীয়দিগের মূলপ্রকৃতি ধৃষ্টতা এবং সুখলালসা।

খ্রীষ্টধর্ম্ম যে-ইহুদীধর্ম্ম হইতে রোমসাম্রাজ্যের পূর্ণ বিস্তৃতির সময়ে জন্মিয়াছিল, মুসলমান ধর্ম্মও সেই ইহুদীধর্ম্ম হইতে রোমসাম্রাজ্যের ভগ্নদশার জন্মে—উভয়েই

ন্যায়পরতার অঙ্কুর থাকিত তাহা হইলে উহারা ঐ প্রকার অন্যায়কারী ঈশ্বরের অনুভব করিত না।

প্রাক্তনবাদ নাই, এবং জগতের আদিত্ব, একেশ্বরবাদ, এবং ইচ্ছা-শক্তির সর্ব্বময়তা স্বীকার আছে। সুতরাং উভয় সমাজই মূলতঃ শান্তিবিহীন এবং স্বেচ্ছাচার-নিরত। প্রভেদ এই, মুসলমানেরা রোমসাম্রাজ্যের ব্যবহারশাস্ত্র গ্রহণ করে নাই—আর রোমের বিশিষ্ট ভগ্নদশায় অভ্যুত্থিত হইয়াছিল বলিয়া রোমের উপধর্ম্মমিশ্রিত ভোগসুখপরতাও প্রাপ্ত হয় নাই। উহারা নষ্টপ্রকৃতিক গ্রীক এবং লাটিন পণ্ডিতদিগের সংশয়বাদও কানে স্থান দেয় নাই। উহারা স্বধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য যখন আরবদেশ হইতে বাহির হইল, তখন ঐ সুযোগে আপনারা লুটপাট করিয়া ধনশালী হইবে বলিয়া মনে করে নাই। আজিও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অনেকানেক মুসলমান কাহাকেও টাকা ধার দিয়া তাহার সুদ খান না। মুসলমানেরা ধর্ম্মোন্মাদে মত্ত, অর্থপিশাচও নয়, আর রক্তপিপাসুও নয়। আরবেরা স্বধর্ম্মে এতই বিশ্বাসবান্ এবং ভক্তিমান হইয়াছিল যে, মনে করিত তাহাদের বীজ-মন্ত্র গ্রহণমাত্রে মানুষের সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত তাহারা অমনি তাহাকে আপনাদিগের সমতুল্য জ্ঞান করিত, তাহাকে আপনাদের সৈনিক-দলভুক্ত করিত অথবা রাজকার্য্য প্রদান করিত—কোনরূপে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিত না। স্বধর্ম্মে সুগভীর ভক্তিমূলক এই যে উদারতা, ইহাই মুসলমানদিগের অভূতপূর্ব্বরূপ বিজয়ের প্রকৃত কারণ। উহারা পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে যে কাজ করিয়াছে, আর কোন বিজিগীষু জাতি তেমন অল্পকাল মধ্যে তেমন কাজ করিতে পারে নাই। উহারা ত মূর্খতম তুরস্কজাতিদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছে, আবার সুসভ্য পারসীক, মিসরীয়, সিরীয় প্রভৃতি খ্রীষ্টান এবং অখ্রীষ্টান অনেকানেক জাতিকে তাহাদিগের স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থ এবং আচারপদ্ধতি ছাড়াইয়া আপনাদিগের কোরান এবং হদীস ধরাইয়াছে। সাম্যবাদের একটি অতিমনোহর শক্তি আছে। মুসলমানধর্ম্ম সেই সাম্যবাদবলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্যধর্ম্মী। ফলতঃ মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা। অতএব দেখা গেল যে—

(১) প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শান্তিপরায়ণ, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং অনাসক্তচিত্ত।

(২) ঐরূপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু দ্রব্যগুণবাদতৎপর বৌদ্ধজাতীয়েরা শান্ত, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং সাধনশীল।

(৩) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খ্রীষ্টধর্ম্মী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, উদ্যমশীল এবং ভোগসুখলিপ্সু।

(৪) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী মুসলমান অশান্ত, স্বৈরাচার এবং সাম্যধর্ম্মী।

সামাজিক প্রকৃতি—ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ

ইউরোপখণ্ডে বিজ্ঞানচর্চ্চার বড়ই বাহুল্য, এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলও ইউরোপীয়েরা বিশিষ্টরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে ফললাভ হয়, তাহার সমাদরও বেশী। এই জন্য ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সামাজিক তত্ত্ব বিচারেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে ভালবাসেন।

কিন্তু বিজ্ঞান বলিলেই বিজ্ঞান হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ হওয়াতে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক বিচার প্রচলৎ হওয়াতে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে বেকনের স্থানে সমষ্টীকরণ বা সূত্রনির্দ্ধারণ প্রণালী নূতন করিয়া শিখিতে হইয়াছিল, আবার যেন সেইরূপ নূতন শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিতেছি মনে করিয়া অনেকানেক ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা আপনাদিগের কল্পনাশক্তিকেই বিশেষ করিয়া খাটাইয়া লইতেছেন। বিশেষতঃ এখনকার ইতিবৃত্ত রচনা প্রণালীতে অনেক পরিমাণে ঐ দোষের আশ্রয় হইয়াছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক বিভিন্ন জাতীয় লোকের প্রকৃতি বর্ণন করিতে গিয়া তাহাদিগের মৌলিকবর্ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ এবং নীতিশাস্ত্রের কোন উল্লেখ করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। তাহাদিগের দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিচার করিয়াই সেই সেই জাতির স্বভাব এবং দোষগুণ সমুদয় স্থির করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অমন সকল স্থলে বাস্তবিক করা হয় কি? দেশের ভৌগোলিক অবস্থা জানা আছে, দেশের লোকের প্রকৃতিও, যাহা হউক, একটা মনে করা আছে; কল্পনার বলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একটা কার্য্যকারণ ভাব ঘটাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। ওরূপ করায় কোন প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার হয় না, কোন কুসংস্কার দূর করা হয় না, অজ্ঞের অজ্ঞতা বৃদ্ধি করা হয়; মানুষের চেষ্টাশক্তিকে খর্ব্ব করা হয় এবং সংস্কারের পথ একেবারে রুদ্ধ করা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—ঐতিহাসিক বলিলেন স্পেনদেশবাসীয়েরা অতিশয় ঔপধর্ম্মিক। তাহার কারণ, কাথলিক ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব অথবা পূর্ব্বকাল হইতে মুরজাতীয়দিগের সহযোগে কল্পনাপ্রবণতা কিম্বা বিগত প্রাধান্যের সহিত বর্ত্তমানের পতিত দশার তুলনায় দৈবোপদ্রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এ সকল কিছুই বলিলেন না। ওগুলি বলিলে, ঐতিহাসিক কার্য্য-

কারণের অভিব্যক্তি হইত। তিনি বলিলেন স্পেনে ভূমিকম্পের আতিশয্য, এই জন্যই স্পেনের লোকেরা ঔপধর্ম্মিক। কিন্তু জাপানেও স্পেন অপেক্ষা ভূমিকম্প অনেক অধিক, এমন কি গয়ড় প্রতিদিন একটি। কিন্তু জাপনীরেরা ঔপধর্ম্মিক হওরা দূরে থাকুক, কিছুমাত্র দৈববল স্বীকার করে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্ত্তার মনের প্রকৃত কথা কি এই নয় যে, স্পেনীয়েরা ঔপধর্ম্মিক বলিয়া আমি জানি, আর তাহাদের দেশে যে ভূকম্প হয়, তাহাও জানি। আমি ঐ দুয়েতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব।

এ প্রণালীর ইতিবৃত্ত রচনা অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি ওরূপে বিচার না করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশে অধিক ভূকম্প হয় তাহা জানিতে পারিতেন, এবং সেই সেই দেশবাসী সকল লোকের স্বভাব জানিতেন, এবং সেই সেই স্বভাবে কোনও একটি বিষয়ে মিল দেখিতেন, এবং তাহা দেখিয়া ভূকম্পনের আধিক্য তাদৃশ স্বভাবের কারণ হইতে পারে কি না চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে কতকটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচার হইল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিত। ফল কথা, এখনও ঐতিহাসিক বস্তুজ্ঞান অনেক বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। যখন তাদৃশ বস্তুজ্ঞান জন্মিবে, তখন কোন একটি জিলায় একটি পাহাড় থাকাতে বা একটি বালুকাময় নদী থাকাতে সেখানকার লোকের মতিগতির কি বিশিষ্টতা জন্মিয়াছে, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারিবে। । ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এখন ঐ অবস্থার স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র।

ভারতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয়শিখর—ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র সদৃশ শুভ্রসলিলা স্বর্ণদী—ইহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহু-প্রসৃত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত—এই মহাদেশে বাস নিবন্ধন হিন্দু জাতীয়দিগের মহিমা যে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ বলা যায়। ইহাদিগের নীতি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন—কিন্তু এই সাধারণ মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইলেও এই মহিমশালী সমাজের মধ্যে প্রত্যেক সামাজিক নিয়মাদির সম্বন্ধে ভৌগোলিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ নিরতিশয় গবেষণা ব্যতিরেকে করিতে যাওয়া কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত? তাহা নয়।

কিন্তু নব্য ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের যে সকল সূত্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রযুক্ত হয় তাহার ভাব অন্যরূপ। ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা করাই সেই সকল সূত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে, ঐ সকল সূত্রে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করিলেই যে, মানুষের বা মনুষ্যসমষ্টি সমাজের কার্য্যগুলিকে,

কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার বহির্ভূত মনে করা হয়, এমত নহে। জাগতিক সকল ব্যাপারই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অন্তর্ভূত। তবে মানুষ এবং মনুষ্যসমাজের কার্য্যকলাপ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতম অশেষবিধ শক্তির ফল। সুতরাং স্থূল দর্শনে সে সমুদয় শক্তি নির্ব্বাচিত এবং অবধারিত হয় না। ইউরোপীয়দিগের ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এখনও অতি শৈশবাবস্থ। উহাতে কয়েকটা স্থূল সূত্রমাত্র আছে এবং সেই স্থূল সূত্রগুলিও গ্রীকশিষ্য ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তৃগণের স্ব স্ব জাতিগৌরব-সূচকমাত্র। সেই জন্য সূত্রগুলিতে ব্যভিচারের স্থলও অশেষ।

এই নব্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, অতএব এখানকার লোকেরা অলসপ্রকৃতিক হইবে। গ্রীষ্মাতিশয্যে শারীরিক শ্রম যে অপেক্ষাকৃত ক্লেশকর হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু আরব দেশও গ্রীষ্মপ্রধান, চীনের দক্ষিণাংশও গ্রীষ্মপ্রধান। ঐ সব দেশের লোকেরা ত অলসস্বভাব নয়। আর শীতপ্রধান ইউরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী জর্ম্মনেরাও ত পূর্ব্বকালে অধিক শ্রমশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিল না। ইংরাজদিগের আদিপুরুষেরা ত খুব পেট ভরিয়া মদ্য মাংস খাইত এবং সলোম পশুচর্ম্মাদি আচ্ছাদিত হইয়া খুব ঘুমাইত। অতএব গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক হইলেই অলস হয় এবং শীতপ্রধান দেশের লোক হইলেই শ্রমশীল হয়, এই সূত্র ধরিয়া ভারতবাসীকে অলসপ্রকৃতিক বলা একটা অপসিদ্ধান্ত। সমাজবন্ধনের গুণে এবং সামাজিক শিক্ষার গুণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও আলস্যদোষের পরিহার হইয়া থাকে।

ঐরূপ আর একটা কথা শুনা যায়। ভারতবর্ষের ভূমি অধিক স্থলেই অতিশয় উর্ব্বরা—এখানে অতি অল্প পরিশ্রমেই জীবিকার অর্জ্জন হয়, এই জন্য এখানকার লোকেরা অল্পমাত্র পরিশ্রম করিয়া সন্তুষ্ট থাকে—অধিক পরিশ্রমে মন দেয় না। এটাও একটা মিছা কথা। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মাত্রেই ভারতবর্ষীয় কৃষিজীবীদিগকে পরিশ্রমশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। চীনীয়দিগের শ্রমশীলতা ইউরোপীয় এবং আমেরিকদিগের ভীতিজনক হইয়াছে। মিশরের কৃষকেরাও অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব উর্ব্বরদেশনিবাসী হইলেই অল্প পরিশ্রমী হয়, এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। ফলতঃ উর্ব্বর-দেশবাসীরা দেশের উর্ব্বরতা নিবন্ধন পরিশ্রমে কাতর হয়, ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অর্জ্জনস্পৃহার বিরুদ্ধ কথা এবং একান্ত অশ্রদ্ধেয়। তবে যদি উর্ব্বর-দেশবাসীর সামাজিক নিয়ম অথবা রাজনিয়ম এমন হয় যে তাহার পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ নিজ ভোগে না আইসে, তাহা হইলে তাহার শ্রমবিমুখতা সহজেই জন্মিয়া যায়। ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে

সময়ে সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই সকল প্রদেশে নূতন বন্দোবস্তের তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র সকল অনাবাদী এবং পতিত করিয়া রাখা লোকের অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে বটে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, উর্ব্বরদেশবাসীরা বিলক্ষণ শ্রমশীল হইতে পারে। দেশের উর্ব্বরতা নিবন্ধন অধিক অন্নোৎপত্তি হয়। অন্নোৎপত্তি অধিক হইলেই প্রজার সংখ্যা বাড়ে। প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই সুব্যবস্থিত সমাজে আরও অন্নবৃদ্ধির প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং সেই প্রয়োজন সাধনার্থ অধিকতর শ্রম সহকারে অন্নোৎপাদনের আবশ্যকতা হয়। চীন এবং ভারতবর্ষবাসীরা যে শ্রমশীল তাহার কারণ ঐরূপ।

আরও একটি কথা আছে। সে কথাটাতে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান কিছু গাঢ়তর। ভারতবর্ষবাসীরা ভাত খায়—ভাতের শরীর-পোষণ-শক্তি কম, এই জন্য ভারতবাসীরা দুর্ব্বল এবং শ্রমবিমুখ। কিন্তু ভারতবাসীরা সকলে ভাত খায় না—সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অর্দ্ধেক লোকের কিছু অধিক লোকে ভাত খায়, নচেৎ গোধূম, জনার, অপরাপর শস্যই অধিক লোকের খাদ্য। তবে গোধূমের রপ্তানী বাড়িয়া অবধি দিন দিন ভাত খাওয়া বৃদ্ধি পাইতেছে বটে। ভারতবাসী দুর্ব্বলও নয় আর শ্রমবিমুখও নয়। তবে আজি কালি অনেকে অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে বলিয়া যাহাই হউক।

ঐরূপ আর একটা কথা এই,—ভারতবাসীরা মাংস খায় না বলিয়াই বলহীন এবং সাহসহীন। কিন্তু স্পার্টিয়েরা মাংস খাইত না—অথচ গ্রীকদিকের মধ্যে উহারা অপর সকল লোকের অপেক্ষা বলবান ছিল। ভারতবর্ষে নিরামিষ-ভোজী ভোজ-পুরীয়েরা, অযোধ্যাবাসীরা ও পাঞ্জাবী জাতেরা পৃথিবীর মধ্যে অতি বলশালী লোকের সমকক্ষ। ইউরোপখণ্ডের সকল লোক ত ইংরাজদিগের সমান মাংসাশী নয়, জর্ম্মন ও ফরাসীরা ইংরাজের অপেক্ষা কম মাংস খায়; কিন্তু জর্ম্মন এবং ফরাসীরা ইংরাজের অপেক্ষা হীনবল নয়, যদিও ফরাসীরা কিছু কম হন, জর্ম্মনেরা ত কম নহে। আর যদি মাংস না খাইলে বল কম হইত, তবে কি একজনও ইংরাজ মাংস বর্জ্জনের যে নব-বিধান হইতেছে, তাহাতে যোগ দিত? ফল কথা, যে দেশে শস্যোৎপত্তি অধিক হয়, সেখানকার লোকেরা অধিক শস্য খায়—মাংস অল্প খায়। হিন্দু সমাজেও তাহাই হয়; শস্য খাওয়া অধিক হয়, মাংস খাওয়া কম হয়। শূকরের বসা খাওয়া হয় না বটে, কিন্তু ঘৃত ভোজন হয়; মাংস খাওয়া হয় না বটে, দুগ্ধ খাওয়া হয়। সকল প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ডাক্তারের এক্ষণে মত এই যে,

তৈলবৎ স্নেহদ্রব্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খাদ্য আর কিছুই নাই। অন্যের কথা কি, আর্য্যশাস্ত্রেই লিখিত হইয়াছে "আয়ুর্বৈ ঘৃতং"।

একজন ইংরাজ একদিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন'—"তোমাদিগের দেবদেবীর এত অধিক হাত কেন, তাহা এতদিনে আমি বুঝিয়াছি।"..."কি বুঝিয়াছেন?"..."বুঝিয়াছি, যে এক একটি নদীতে অনেকানেক উপনদী আসিয়া পড়ে, তাই দেখিয়াই দেবদেবীর শরীরে বহু-হস্ত কল্পিত হইয়াছে।"...আমি বলিলাম, "গ্রীক জাতীয় দেবদেবীগুলির সকলেরই দুইটি করিয়া হাত, গ্রীস দেশের নদীগুলির বুঝি উপনদী নাই?" ভৌগোলিক তথ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল এবং উপহাসাস্পদ।

সামাজিক প্রকৃতি নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আর এক প্রকার বিচার আছে। ইহা মনুষ্যের মৌলিক বর্ণভেদ অবধারণের দ্বারা হইয়া থাকে। এ বিচারের সারবত্তা আছে। এ বিচারে পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃতি হইতে পরবর্ত্তী পুরুষের প্রকৃতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয়। সুতরাং ইহা প্রকৃতরূপে বিজ্ঞান মূলক। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ঐ বিচারসূত্র প্রযুক্ত হইয়া জানা গিয়াছে যে, এই এই জাতির অনেকগুলি লোক ককেসীয় বর্ণ সম্ভূক্ত আর্য্য, আর কতক লোক অনার্য্য—অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয়, কোলেরীয়, তাতারীয় প্রভৃতি অপরাপর বর্ণ সম্ভূক্ত। ঐ আর্য্য এবং অনার্য্যের মিশ্রণে এক্ষণকার হিন্দু-জাতি—এবং তাহার মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এবং গলায় উপবীত ধারণ করে বা করিবার যোগ্য, তাহাদিগের শরীরে আর্য্যশোণিত অধিক—এবং ব্রাহ্মণের শরীরে ঐ শোণিত বিশিষ্টরূপেই অধিক। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকের অনুমানে অবিমিশ্র অথবা অবিমিশ্র-প্রায় আর্য্যের সংখ্যা, দেড় কোটির অনধিক, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই দেড় কোটি এবং প্রাচীন ক্ষত্রিয় স্থানীয় বর্ত্তমান রাজপুত এবং প্রাচীন বৈশ্য স্থানীয় বর্ত্তমান বণিকাদি জাতীয়েরা আর্য্যের মধ্যে গণ্য এবং অনেক সদ্বংশোদ্ভব মুসলমানও আর্য্যজাতীয়, তখন ভারতে আর্য্যের সংখ্যা অত অল্প হইতে পারে না। আর্য্যজাতীয় লোকের বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, চাতুর্য্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং সেই আর্য্য লোকই হিন্দুজাতির সারভূত, এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনার্য্যেরাও সমাজশাসনের গুণে অনেকানেক ম্লেচ্ছদিগের অপেক্ষা আচার-পূত এবং ধর্ম্মভীরু হইয়া আছে। অতএব প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে ভারতবাসিগণ যে অতি উচ্চপ্রকৃতিক, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সামাজিক প্রকৃতি—উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ

ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ত্ব একটি নূতন শাস্ত্র। ইহার অতি স্থূল সূত্রগুলিও এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে অবধারিত হয় নাই। কেহ কেহ সমাজগুলিকে এক একটি সুবৃহৎ পরিবারের স্বরূপ মনে করিয়া সমাজ সম্বন্ধে তদনুযায়ী বিচার করেন, কেহ কেহ বা সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যেন কখন একটা বিশেষ চুক্তি ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া বিধিব্যবস্থা দেন, আর কেহ কেহ বা ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রকেই সমাজতত্ত্বের মূল বলিয়া তদনুযায়ী নিয়ম সকল স্থাপন করিতে চান। আবার যাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালীর বিশেষ ভক্ত তাঁহারা সমাজ পদার্থটির নিদান কিরূপ তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈবাহিক প্রণালীকে সমাজবন্ধনের মূলসূত্র বিবেচনা করিয়া প্রতি পরিবারকেই সমাজের মৌলিক অণুস্বরূপ ভাবেন। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বীরা সমাজ মধ্যে বিশ্বসিত সর্ব্বপ্রকার মতবাদের এবং সমাজ-কর্ত্তৃক পরিগৃহীত সর্ব্বপ্রকার আচারের হেতু প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু যতই হউক, এখনও পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ অনেক; এখনও সমাজতত্ত্বের বিচারে উপমাত্মক ন্যায়ানুযায়ী বিচার, অতি উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় অতি বড় বড় নব্য পণ্ডিতেরাও অনেকে সমাজশরীরকে প্রাণি-শরীরের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণি-শরীর যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুসকলের সমষ্টি—সমাজশরীরও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুল পরিবারের সমষ্টি; তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণিশরীরাবস্থিত সকল অণুগুলিতেই জীবধর্ম্ম আছে, সমাজ-শরীরাবস্থিত প্রতি পরিবারও জীবনীশক্তিসম্পন্ন; তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন প্রাণিশরীর হইতে অণু সকল নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে, এবং নূতন অণু সকল আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেছে, সেইরূপ সমাজ-শরীর হইতেও লোক সকল মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে, আবার নূতন লোক সকল জন্মিয়া সমাজের পোষণ করিতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সাদৃশ্য উপলব্ধ হওয়াতে পণ্ডিতেরা উপমাত্মক প্রমাণের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সমাজশরীর অবিকল প্রাণিশরীরের তুল্য, ঐ দুইটিতে কোন ইতরবিশেষই নাই।

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই সমাজিক নিয়মাদির উল্লেখ হইয়া থাকে। তাঁহাদের

মতগুলি—(১) সকল সমাজেরই জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়, জরা, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; কারণ, প্রাণিশরীরের ঐ সকল দশা-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। (২) সমাজ-সংস্কারের সাময়িক প্রয়োজন আছে, কারণ বাল্যের পরিধেয়, যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থায় খাটে না। (৩) সমাজ জীবৎ শরীর, আহারের ন্যায় যাহা উপযোগী উহা তাহাই গ্রহণ করে, যাহা অনুপযোগী তাহা ত্যাগ করে।

এইরূপ অনেকানেক কথা আছে, এবং সে কথাগুলি উপমাত্মক ন্যায়মূলক বলিয়া এমনি পিচ্ছিল যে, অনায়াসেই লোকের গলাধঃকৃত হইয়া যায়। কিন্তু প্রাণিশরীরের সহিত সমাজশরীরের অনেকানেক মৌলিক বিষয়ে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। (১) প্রাণিশরীরের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী; তাহার কারণ, প্রাণিশরীর যে বলে জীবিত থাকে তাহার প্রতিকূল শক্তি সকলের কার্য্যকারিতাগুণে প্রাণিশরীরের বিনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু ওরূপ কোন চিরস্থায়ী শক্তি, সমাজশরীরের প্রতিকূলরূপে কার্য্য করিতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয় না। মানুষের সাহজিক স্বার্থপরায়ণতা সামাজিক অবস্থার প্রতিকূল বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নয়। সমাজবন্ধনের গুণে স্বার্থপরতাও সুসংস্কৃত হইয়া ঐ বন্ধনের অনুকূল হই প্রতিকূল হয় না। মানুষ সমাজসম্বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বার্থসাধন করিতে পারে, সমাজচ্যুত হইলে তেমন পারে না। তদ্ভিন্ন সাহজিক সহানুভূতি সমাজবন্ধনের অনুকূল শক্তি। এই জন্য সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী কোন স্থায়ী কারণই নাই। তবে পৃথিবী যদি কোন কালে মানুষের বাসোপযোগী না থাকে, (যেমন লোমশ হস্তী প্রভৃতি যুগান্তরজাত জীবদিগের সম্বন্ধে হইয়াছে) তাহা হইলে মনুষ্যজাতির বিধ্বংসের সহিত সমাজেরও বিলোপ হইবে।

সময়ে সময়ে সমাজের কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মের সহিত মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। নিয়মগুলি সমাজের অন্তর্ভূত বস্তু, পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় বাহির হইতে আনীত বস্তু নয়। উপমার দ্বারা উহাদিগের প্রকৃতি বুঝিতে হইলেও ঐগুলিকে সমাজরূপ গৃহের কড়ি, বরগা, ইষ্টকাদির ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। কোনটি মচকাইলে বা ক্ষত হইলে বা লোনা ধরিলে বদলাইতে হয়, কিন্তু সেরূপ দূষিত না হইলে, শুদ্ধ বদলাইতে হয় মনে করিয়া বদলাইতে যাইতে নাই। আর বদল করিবার সময়েও খুব সাবধানে ঠেকো দিয়া এবং কোনরূপ বিভ্রাট না ঘটে, তাহার উপায় করিয়া তবে বদলাইতে হয়। প্রাণিশরীর হইতে সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য এই, উহা আপনার বহির্ভাগ হইতে আহারের ন্যায় কিছুই গ্রহণ করে না। উহার পোষণ উহার আপনার ভিতর

হইতে হয়। বাহির হইতে কিছু আনিয়া সমাজের গাত্রে লাগাইয়া দিলে, উহা প্রাচীরে ঘুঁটে দিবার ন্যায় গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রাচীরের বিস্তৃতি কিছুই বাড়ায় না। এই জন্য সামান্য অনুকরণ জাত সমাজসংস্কার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়।

ফলতঃ যদি উপমার দ্বারাই বুঝিতে হয়, তবে সমাজশরীরকে প্রাণিশরীর না ভাবিয়া উহাকে দেবশরীব মনে করাই শ্রেয়ঃ *। দেবশরীরের আদ্যারম্ভ নাই, তেমনি কোন্ সমাজ পৃথিবীতে কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। যেমন দেবতারা চিরকাল যৌবনাবস্থ, তেমনি সমাজও চিরকাল যৌবনাবস্থ। আপনা হইতে সমাজের জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু নাই। যেমন দেবতাদিগের এক একটি বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান, তেমনি প্রত্যেক সমাজ আপনাপন মূল প্রকৃতি লইয়াই চিরকাল চলিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, আর্য্যশাস্ত্রকারেরা দৈব, পৈত্র্য এবং আর্ষ্য বলিয়া মানুষের যে তিনটি ঋণেব উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দৈব ঋণটি আত্মসমাজের নিকটেই ঋণ; উহা যজ্ঞদ্বারা অর্থাৎ সমাজান্তর্গত ব্যক্তি সকলের সুখ সম্বর্দ্ধনের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্য্যশাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগের বিবিধ গূঢ়ভাবব্যঞ্জক শাস্ত্রে যেমন সমস্ত লোক-সমষ্টিকেই কোথাও ব্রহ্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি সমাজবস্তুটিকেই দেবশরীব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

দেবশরীরের সহিত সমাজশরীরের আরও একটি সাদৃশ্য আছে। দেবশরীব আপনা হইতে নষ্ট হয় না; সমাজও আপনা হইতে মরে না। কিন্তু দেবশরীর যেমন দৈত্যদানবাদি কর্ত্তৃক বিনষ্ট না হউক, কিন্তু অধঃপাতিত হইতে পারে, সমাজশরীরও সেইরূপ অন্য সমাজের প্রতিকূল বলে বিনষ্ট না হউক, কিন্তু অধীনীকৃত এবং হতপ্রভ হইতে পারে। আড়াই শত বৎসর গত হইল, পেগু প্রদেশ জয় করিয়া বর্ম্মীরা অনুজ্ঞা করিল যে, পেগুদেশীয়েরা আপনাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে না—আর ধর্ম্মব্যবস্থাও ব্রহ্মেব প্রধান ফুঙ্গীর স্থানে লইবে। পেগুর আর স্বাতন্ত্রিকতা রহিল না। এই সেদিন, পোলণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিয়া রুশিয়া আজ্ঞা করিল, কোন বিদ্যালয়ে পোলদিগের ভাষা শিক্ষিত হইবে না, আর হাটে বাজারে কেহ কোথাও প্রকাশ্যভাবে পোলভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

* "Society is a moral individual essentially different from a physical individual"—Vattel.

রুশিয়া অপরাপর ইউরোপীয় রাজ্যের ভয়ে বলিতে পারিল না যে, পোলদিগের ধর্ম্ম-ব্যবস্থাও আর রোমান কাথলিক থাকিবে না, রুশীয় প্রজাদের ন্যায় গ্রীক সম্প্রদায়ের অনুযায়ী হইবে। ঐটি পারিলেই, বর্ম্মীরা যাহা পেগু প্রদেশে করিয়াছিল, তাহা করা হইত এবং ধর্ম্মলোপ ও ভাষালোপ এই দুইটি করিতে পারিলেই সমাজের যে বিশিষ্টরূপ অধঃপতন হয়, নব্য ইউরোপে তাহার একটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উপমাত্মক ন্যায়ের প্রয়োগ দ্বারা আর একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সমাজের রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, সে সমাজেরও ধ্বংস হইয়াছে মানিতে হয়। তাঁহাদের মতে রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হইবার চিহ্ন, সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে অধিকার লোপ। কিন্তু ইহা কোন প্রকৃত কথা নয়। যদি ইহা সত্য হইত, তবে সমাজ পদার্থটি অজর অমর না হইয়া নিতান্তই ঠুন্‌কো জিনিস হইত। তাহা হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্য মাত্রকেই অন্তঃশাসন লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, অথবা সাম্রাজ্য-বন্ধন কখন ভগ্ন হইতে পারিত না। তাহা হইলে, রুশিয়াকে পোলণ্ড লইয়া, ইংলণ্ডকে আয়র্লণ্ড লইয়া, তুরস্ককে তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইয়া চিরকাল বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত না এবং অস্ট্রিয়াকেও হঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইতে হইত না। রাজশক্তি গেলেই সমাজ যায় না—আর সমাজ থাকিলেই রাজশক্তি লাভের আশা এবং সম্ভাবনা থাকে। ইটালী এবং গ্রীস যে আবার এক একটি স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল, তাহার মূল কারণ উহাদিগের সমাজ ছিল এবং সেই জন্যই মাথা গজাইল। সমাজলোপের সহিত ধর্ম্মের লোপ, ভাষার লোপ এবং জাতিরও লোপ হয়।

ইহাতে বোধ হইবে যে, কোন সমাজ প্রাণিশরীরের ন্যায় জরা মৃত্যু প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী বিধ্বংসের নিয়মাধীন নয়। সমাজের অনিষ্ট, তাহার বহিঃস্থিত অপরাপর সমাজের সম্বন্ধ জন্যই হইতে পারে। সুবহু স্থলেই সেই সম্বন্ধ, অরি-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেখানে মিত্র-সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়, তথায় কারণ বিশেষ, যথা কোন সাধারণ শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ, দুইটি বা ততোধিক বিভিন্ন সমাজকে কিছু কালের জন্য মিত্রতাসূত্রে সম্বদ্ধ রাখে। অথবা যেমন একটি দেবশরীর অপর দেবশরীরে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ কোন কোন স্থলে একটি সমাজ অপর সমাজের সহিত মিলিয়া ক্রমে দুইটিতে এক হইয়া যায়। ভরতবাসী অনার্য্য লোক সকল আর্য্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক হিন্দু সমাজ হইয়াছে। ইংলণ্ডবাসী, ওয়েল্‌স্ প্রদেশবাসী এবং স্কটলণ্ডনিবাসী লোক সকল ক্রমে ক্রমে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতেছে; পরন্তু বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাধারণতঃ অরি-সম্বন্ধ থাকিলেও

তত্তৎ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় এবং সৌহার্দ্দ জন্মিতে পারে। কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মানুষে মানুষে স্বভাবতঃ শত্রুসম্বন্ধ বলবৎ—একজন আর একজনকে দেখিলে মনে মনে বিতর্ক করে, আমি উহাকে খাইতে পারি, না ঐ ব্যক্তি আমাকে খাইয়া ফেলিতে পারে! বাস্তবিক তাহা নয়, মনুষ্যদিগের মধ্যেও মনুষ্যজাতিত্ব নিবন্ধন বিশেষ একটি সহানুভূতি আছে। বোম্বাই নগরে যখন প্রথম কাপড়ের কল বসিল, তখন একজন গম্ভীর-প্রকৃতি ইংরাজকে আমি সত্য সত্যই সুখী হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি।

কিন্তু ওরূপ যতই হউক, স্থূল কথা এই যে, বিভিন্ন সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ, অরি-সম্বন্ধ। এইরূপ হইবার মূল কারণ, ভূমণ্ডলব্যাপক অতি মহান্ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই নিয়মের প্রভাবে এক প্রকার উদ্ভিদ অন্য জাতীয় উদ্ভিদকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষেত্র অধিকার করে, এক প্রকার জন্তু অপর প্রকার জন্তুর স্থান লয়, এক সমাজের মনুষ্য অন্য সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে। এ নিয়মটিও সমাজ মাত্রের সাহজিক বৃদ্ধি বই আর কিছুই নহে। মানুষ যদি সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকে, তবে পৃথিবীতে মনুষ্যবিনাশের কারণ এত বহুমুখ, যে মানুষের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বাড়িতে পায় না; রোগে, অনাহারে, হিংস্র জন্তুগণের দৌরাত্ম্যে, আর পরস্পর যুদ্ধে, অনেকে মারা যায়, কিন্তু সমাজবন্ধনের গুণে শ্রম বিভাগের প্রথা জন্মে, তাহাতে খাদ্য সামগ্রী বৃদ্ধি হয়, অকাল এবং অপঘাত মৃত্যু ন্যূন হয়, মানুষ সংখ্যায় বাড়ে, এবং সংখ্যায় যত বাড়ে, অনায়াসে তদুপযুক্ত আহার পায় না, এই জন্য বিস্তৃত হইয়া অপর সমাজের অধিবাসভূমিতে প্রবেশ করে। সমাজে সমাজে অরি-সম্বন্ধ জন্মিবার এইটিই মূল কারণ। অন্য কারণও আছে; যথা, কোন সমাজের অর্থলোভপ্রবণতা—কাহারও বিজিগীষা—কাহারও অহঙ্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কারণ, ঐ মূল কারণেরই সহায় বা প্রকটরূপ মাত্র; মূল কারণ না থাকিলে, উহারা কার্য্যকারী হইত না।

সামাজিক প্রকৃতি—ব্যবস্থাসূত্র

মানুষ সমাজ-সম্বদ্ধ হইয়া থাকিলেই সংখ্যায় বাড়িয়া যায়। সংখ্যায় বাড়িলেই, আর অযত্নসম্ভূত বন্য ফলমূলাদি কিম্বা মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষীর মাংস হইতে আহার্য্য-প্রাপ্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় না। এই জন্য সমাজবন্ধন হইলেই আহার্য্যবৃদ্ধির উপায় করা আবশ্যক হয়, এবং সেই আবশ্যকতা হেতু সামাজিক ব্যবস্থা সকল জন্মে।

শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যাদিতে স্বত্বাধিকারের জ্ঞান, পূর্ব্ব হইতেই ঈষন্মাত্রায় জন্মিয়া থাকে। সেই জ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হয়, এবং তাহা সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। কারণ স্বত্বাধিকার সংস্থাপিত হইলে, দ্রব্যাদির অপচয় নিবারণ এবং তাহাদিকের সমধিক উৎপাদন, উভয় কার্য্যই জনগণের স্বার্থ-সাধক হইয়া উঠে। এই জন্য সকল সমাজেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, সমাজের প্রকৃতি ভেদে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া ব্যবস্থিত হইতে থাকে। প্রথমেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার প্রতিব্যক্তিনিষ্ঠ না হইয়া উহা গৃহস্বামীতে অথবা গোত্রস্বামীতে একান্তনিষ্ঠ থাকে। যিনি বাটীর বা গোত্রের প্রধান, তিনি সেই বাটী বা গোত্রস্থ সকল নরনারীরও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বাটীর বা গোত্রের দ্রব্যাদি তাঁহার বই আর কাহার হইবে? এই অবস্থাটির প্রকৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা অনেকেই এইটিকে দাসত্বের অবস্থা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক, সমাজের ঐ অবস্থায় দাসত্বের আধিক্য হয় বটে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যাহাকে দাসত্ব বলিয়া বুঝেন, সে দাসত্বে এবং এ দাসত্বে অনেক প্রভেদ। ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব অতি ভয়ানক বস্তু। সে দাসত্বে ভিন্নধর্ম্মা এবং ভিন্নজাতীয় দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি, অর্থলালসা-প্রদিপ্ত অতি প্রবলতর মনুষ্য, পশুবৎ এবং পিশাচবৎ নৃশংস ব্যবহার করে। এ দাসত্বে বলবান মনুষ্য, দুর্ব্বল মনুষ্যকে নিজ গোত্র বা নিজ পরিবারসম্ভুক্ত করিয়া তাহাকে বহিঃশত্রু হইতে এবং নিরন্নদশা হইতে রক্ষা করে। সে দাসত্বে দাস ক্রীতপশু অপেক্ষাও হীন, এ দাসত্বে দাসে এবং পুত্রে বা কনিষ্ঠভ্রাতায় নির্ব্বিশেষ। ইউরোপীয় দাস কাফ্রি জাতীয় টম, তাহার মনিব তাহার বুকের মাংস সাঁড়াশি দিয়া ছিঁড়ে; এসিয়াখণ্ডে মুসলমানের দাস সবক্তগীন্, কুতবুদ্দীন, আলতমস, যাহারা আপনাপন প্রভুর জামাতা এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। চীনীয়দিগের দাসেরা মনিবদিগের শিং উপাধি প্রাপ্ত হয়; ভারতবর্ষে আর্য্যের দাসেরা নিম্নতর বর্ণে ব্যবস্থাপিত হইলেও আর্য্যের গোত্রাধিকারী। দাসত্ব দশাটি সমাজ সম্বর্দ্ধনের একটি মুখ্য উপায়। উহা যথাকালে অর্থাৎ গোত্রস্বামীর সর্ব্বাধিকারিত্বের সময়ে, গোত্রসম্বর্দ্ধকরূপেই প্রচলৎ হইয়া থাকে। একজন অতি বড় ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিৎ দাসত্ব দশার উপকারিতা স্বীকারে বাধ্য হইয়া বলিয়াছেন—"দাসত্ব-দশাও ভাল; কারণ, দাসত্বের প্রবৃত্তি হওয়াতে নর-মাংস ভোজনটার নিবৃত্তি হয়।" এরূপ নরচিত্তানভিজ্ঞতা নৃশংসস্বভাব লোকেরই উপযুক্ত; ফলতঃ মানুষ মানুষকে পাইলে তাহাকে আপনার করিয়া

লইতে চায়, তাহাকে পুষিতে চায়, খাইতে চায় না।

দাসাদি গ্রহণ দ্বারা সমাজ সম্বর্দ্ধিত এবং কৃষিকার্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ হইলে, স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থাসূত্রের একটি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়। গৃহস্বামী বা গোত্রস্বামীর সর্ব্বাধিকারিত্বের অভ্যন্তরে নূতন একটি ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে। তিনি যেন পরিবারটির বা গোত্রটির প্রতিভূস্বরূপ বলিয়াই সর্ব্বাধিকারিত্ব উপভোগ করেন, এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া যায়। ঐ প্রতীতি হইতে সম্মিলিত স্বত্ব ও স্বত্বাধিকার এবং তাহার বাহ্যরূপ স্বরূপ সম্মিলিত পরিবার দেখা দেয়। সর্ব্বাধিকারিত্বের সময়েও সম্মিলিত পরিবার, এখনও তাই। কিন্তু সর্ব্বাধিকারিত্বের সময় সম্মিলিত পরিবারগুলি যত দৃঢ়সম্বদ্ধ এখন আর সেরূপ নহে। এ সময়েও দাস ব্যবহারের প্রথা প্রচলৎ থাকে। কিন্তু কুলগুলি পূর্ব্বেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় দাসেরা আর কুলবর্দ্ধকরূপে গৃহীত হয় না। উহারা ক্ষেত্রসংসৃষ্ট পশুবৎ গণ্য হয়। উহাদিগকে অপকৃষ্ট স্বতন্ত্রাবাস প্রদত্ত হয়। কোথাও কোথাও, যথা অধস্তন রোমীয়দিগেয় মধ্যে, উহারা দিবাভাগে ক্ষেত্রে খাটে, রাত্রিতে কারাগৃহে নিরুদ্ধ থাকে। চীন সাম্রাজ্যে এবং প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশে, দাসদিগের কখনই ওরূপ দুরবস্থা হয় নাই। ঐ সকল দেশে সর্ব্বাধিকারিত্ব একেবারে নষ্ট হয় নাই। কিন্তু অধস্তন রোমীয়দিগের মধ্যে পৃথক স্বত্বের প্রাদুর্ভাবে সম্মিলিত স্বত্বের ভাবও বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কৃষিপ্রধান অবস্থাতেই কিছু কিছু শিল্প এবং বাণিজ্যেরও অঙ্কুরোদয় হয়। যেখানে শিল্পের এবং বাণিজ্যের বিশেষ আধিক্য হয়, তথায় সম্মিলিত স্বত্বাধিকারের নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকে না—পৃথক স্বত্বের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া উঠে। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং অধস্তন রোমীয়দিগের স্থানে লব্ধ ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র উভয়েই এই পৃথক্‌স্বত্বের বিশেষ পক্ষপাতী। এত পক্ষপাতী যে, ইউরোপের মধ্যে কোথাও কোন একটি জিনিস অস্বামিক থাকিতে পায় না। ইংলণ্ডে গোচারণ-স্থানগুলি বহুকাল অস্বামিক ছিল। কিন্তু আর নাই বলিলেই হয়। ঐ অস্বামিকতা পরিহারের চেষ্টায় ভারতবর্ষেও বনভূমি সকল গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অধিকার-সম্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং গরিব লোকেরা একটি পাতা কুটা কাঠি কুড়াইতে গেলেও রাজপুরুষদিগের কর্তৃক নিবারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যাহাই হউক, স্বত্ব-পার্থক্যের এতদূর বাড়াবড়ি হওয়াতে ইউরোপে একটি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে। জাগতিক কোন বস্তুতেই নশ্বর মানুষ-দেহধারী কাহারও সম্যক্ স্বত্ব হইতে পারে না, এই ভাব অনেক লোকের মনে উঠিয়াছে, এবং

তাহারা মানুষমাত্রেই সকল দ্রব্যের ভোগে সমান অধিকারী হইবে, এইরূপ সমাজনিষ্ঠ স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে চাহিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল দ্রব্যেরই মূল্য সমাজের অস্তিত্বনিবন্ধন হয় এবং অনেকানেক স্থলে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বও শুদ্ধ বলাৎকার অথবা বঞ্চনার ফল; ইহা ভাবিয়া দেখিলে একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব অপেক্ষা বরং সমাজনিষ্ঠ স্বত্বই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যদিও ঐ মতানুযায়ী কোন বিশেষ কাজ এখনও হয় নাই বটে, কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় ঐ মতানুগামী লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

সম্প্রতি এই সমাজনিষ্ঠ স্বত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে স্বত্বাধিকারের এই ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারিত্ব, সম্মিলিতাধিকারিত্ব আর পৃথগধিকারিত্ব। এই তিনটিরই কিছু কিছু চিহ্ন সকল সমাজেই থাকে। সমাজের প্রকৃতিভেদে কাহারও কোনটি দুর্ব্বল হয়। সর্ব্বাধিকারিত্বের প্রধান চিহ্ন, জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা। সম্মিলিতাধিকারের প্রধান চিহ্ন, অবিভক্ত ধনাধিকারের ব্যবস্থা। আর পৃথগধিকারের প্রধান লক্ষণ, বিভাজিত ধনাধিকারের ব্যবস্থা। যেখানে জ্যেষ্ঠাধিকার, যথা উর্দ্ধতন রোমীয়দিগের মধ্যে এবং (ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে) ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর রুশিয়ার ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে, তথায় যুদ্ধধর্ম্ম প্রবল। যেখানে অবিভক্ত ধনাধিকার; যথা চীনে এবং ভারতবর্ষে, তথায় কৃষি-কার্য্যের বিশষ প্রাধান্য। বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠাধিকার ছিল, শূদ্রদিগেরই সমাধিকার ছিল; কিন্তু বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে সমাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যথায় বিভাজিত ধনাধিকার, যথা মার্কিন এবং ফরাসী এবং ইটালীয় প্রভৃতি নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে, তথায় বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ সমাদর। ইংলণ্ডে ভূমিসম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা, অপর সকল সম্পত্তিতে পৃথক্ এবং সমাধিকারের ব্যবস্থা।

যেমন সমাজের প্রকৃতিভেদে স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হয়, সেইরূপ সমাজের প্রকৃতিভেদে বৈবাহিক ব্যবস্থাও ভিন্ন হইয়া থাকে। স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকারের বিধিব্যবস্থার দ্বারা আহার্য্যসামগ্রীর বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সমাজসম্ভুক্ত জনসংখ্যার যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, কালক্রমে খাদ্যসামগ্রীর সম্বর্দ্ধন সে পরিমাণে হইয়া উঠে না। মানুষ সমাজসম্বদ্ধ হইয়া থাকিলেই সংখ্যায় অতি সত্বরে বাড়িয়া যায়। এই জন্য সকল সমাজের প্রথবাবস্থায় জনসংখ্যাসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যতটা উৎসাহ থাকে, কালে সেই উৎসাহ হ্রাস হইয়া আইসে, এবং জনসংখ্যা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত নানা সমাজে নানা প্রকার ব্যবস্থা অবধারিত হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়,

মনুসংহিতার সময় এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেও ভারতবর্ষে জনসংখ্যা সঙ্কোচ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত কতকটা চেষ্টা হইয়াছিল। স্পষ্টতঃ কোন শাস্ত্রকারই জনসংখ্যা কমাইতে হয়, এরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদিগেব অনেকানেক কথার তাৎপর্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। বেদে উক্ত হইয়াছে, উপর্য্যুপরি অধিক সন্তান হইলে তাহাদের অনেকে অকালে মারা যায়। মনু বলিয়াছেন, প্রথমজাত পুত্রই পুত্র, পববর্ত্তীরা কামজাত, অতএব অপ্রশস্ত। তিনি একথাও বলিয়াছেন, বিনা পুত্রোৎপাদনেও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। এক দিকে গৃহস্থাশ্রমেব প্রশংসা পক্ষান্তবে এই সকল কথা, উভয়েব মীমাংসা করিয়া দেখিলে তাৎপর্য্যার্থ এই হয় যে, বিবাহ করিয়া গৃহী হইবে, সমাজকে আপনার শিষ্টাচরণের জামিন দিবে, কিন্তু অধিক সন্তান জন্মাইয়া সমাজকে দুঃস্থ করিবে না, এবং সেই প্রীতিভাজনদিগেব অকালমৃত্যুদর্শনযন্ত্রণা হইতে স্বয়ং মুক্ত থাকিবে।

সমাজের প্রথমাবস্থায় বৈবাহিক নিয়ম অতি সামান্যরূপই থাকে, অথবা ও বিষয়ে কোন নিয়মই থাকে না বলিলেও হয়। আর যে নিয়মগুলি ঐ অবস্থায় প্রচলিত হয়, তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিভিন্ন পরিবার এবং বিভিন্ন গোত্রদিগকে পরস্পব সম্বদ্ধ করিয়া সমাজশরীরকে বিস্তৃত এবং দৃঢ় কবা, জনগণকে শাস্ত্রশীল করা, এবং তাহাদিগকে গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট করা। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা যাহাতে অতিবর্দ্ধিত হইতে না পায়, তৎপ্রতিও দৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রথমে একপত্নীকত্বের প্রশংসা, অনন্তর একপত্নীকত্বই নিয়ম হয়; কোথাও শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা হয়, কোথাও কার্য্যতঃ হইয়া যায়। তাহার পর, ব্যবস্থার দ্বারা বিবাহযোগ্য বয়স উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়—কোথাও এত উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়, অথবা হইয়া উঠে যে চারি পাঁচটি সন্তান হইবার বয়স অতিক্রান্ত না হইলে আর কন্যাকাল গত হইয়া বিবাহযোগ্যতা জন্মে না। সাধারণতঃ বয়োধিক বিবাহের নিয়ম, যুদ্ধবৃত্তি এবং বণিকবৃত্তি প্রধান সমাজের মধ্যেই প্রচলিত হয়। যে সকল কৃষিপ্রধানদেশে ব্যবস্থাতঃ অথবা ব্যবহারতঃ সম্মিলিত স্বত্বাধিকারের প্রথা প্রচলিত থাকে, সে সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অধিক সন্তান জননের প্রতিবন্ধক নিয়ম সকল ব্যবস্থাপক এবং পণ্ডিতবর্গের প্রমুখাৎ নির্গত হইতে থাকে। কোথাও বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় (যথা, শাস্ত্রতঃ ভারতবর্ষীয় উচ্চজাতীয়দিগের মধ্যে এবং ব্যবহারতঃ চীনীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে), কোথাও (যথা, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে) উদ্বাহকার্য্য

বয়োধিকে নির্ব্বাহিত হয়, কোথাও মৃতপত্নীক পুরুষের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ নিন্দিত হয় (যথা, রুশীয় যাজকদিগের মধ্যে), কোথাও চিরকৌমার ব্রতধারণের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় (যথা, ভারতবর্ষে, বৌদ্ধ দেশমাত্রে, কাথলিক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে), আর কোথাও এক পত্নীর বহুপতিত্ব ব্যবস্থাপিত হয়, (যথা, তিব্বত, ভোট, সিকিম এবং কানেরা প্রদেশে)।

বিবাহ প্রণালীর সংকোচ ভিন্ন, লোকসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার উপায় আর কিছুই নাই। কিন্তু সে উপায়ও সম্যক্ কার্য্যকারী বলিয়া বোধ হয় না। নর-পশুদিগেরও ইন্দ্রিয়গ্রাম অতি বলবান। সুতরাং বিনা বিবাহবন্ধনে যৌবনাবস্থা অতিবাহিত হইতে দিবার নিয়ম, সামান্যতঃ নানা দোষের আকর হইয়া উঠে। মানুষ বিবাহিত হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক জীব হয়, নচেৎ অনেকে উচ্ছৃঙ্খল এবং দুষ্ট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রাচীন সমাজগুলির ব্যবস্থাপকেরা সামান্যতঃ বিবাহ-প্রতিষেধের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং সেই জন্য প্রাচীন সমাজ মাত্রেই একটি অতি ভয়াবহ দুষ্ট প্রথার প্রবর্ত্তনা হইয়া গিয়াছিল। প্রথাটি এই—সন্তানের প্রাণবিনাশ করিত।

পিতা মাতা আপনাদিগের সন্তানকে মারিয়া ফেলে এটি বড়ই লোমহর্ষণ ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই, যে সমাজে সাক্ষাদ্রূপে অথবা পরোক্ষভাবে ঐ কার্য্য না হইয়াছিল, এবং এখনও না হইয়া থাকে। ইউরোপে অনূঢ়াবস্থায় অনেকের সন্তান জন্মে। সেগুলিকে মারিয়া ফেলে বলিয়া ঐ খণ্ডের সকল দেশেই "ফৌণ্ডলিং হস্পিটাল" নামে গূঢ়জাবাস সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আবাসগুলির সংখ্যা তত অধিক নহে। এক একটি প্রদেশের মধ্যে এক একটি বই নয়। ঐ প্রদেশীয় সকল গূঢ়জ সন্তান কি ঐ এক আবাসে আনীত হয়, না তথায় স্থান পায়? তদ্ভিন্ন, কেহ মারিয়া ফেলুক আর নাই ফেলুক, শিশু সন্তান সামান্য যত্নের অভাবে মরে কত? ইংলণ্ডে, প্রতি শতে একুশটি শিশু আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত আফিমের জল খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে। আফিম, শিশুশরীরের অতিশয় অনুপযোগী বস্তু। কিন্তু গরিব দুঃখী লোককে খাটিয়া খাইতে হয়, ঘরের কাজকর্ম্ম দেখিতে হয়, ছেলে কাঁদিলে সে কিছুই করিতে পারে না, তাই একটু একটু আফিমের জল মুখে দিয়া রাখে, ছেলে বেশ ঘুমাইয়া থাকে। তবে উহার যে আয়ুঃ শেষ হয়, বাপ মা তাহা জানেই না।

গ্রীক এবং রোমীয় বড় বড় ব্যবস্থাপকেরা এবং পণ্ডিতেরা, যথা, সোলন,

লাইকর্গস, প্লেটো, আরিস্টটল, নুমা, সিসিরো প্রভৃতি সকলেই ভ্রূণহত্যার এবং শিশুহত্যার বিধি প্রদান এবং প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। তবে আরিস্টটলের মতে শিশুহত্যাটি দোষ, কিন্তু গর্ভধারণের চারি মাসের মধ্যে ভ্রূণহত্যা করা অবৈধ নয়। পক্ষান্তরে, রোমীয় প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুহত্যা অবৈধ।

হিন্দু সমাজেও ছেলে মারা ছিল। তবে যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি এ স্থলেও হিন্দু সমাজের পন্থা ভিন্নরূপ। হিন্দুরা যদি ছেলে মারিত, তাহা দেবোদ্দেশে; অধিক ছেলে রাখিব না, দুর্ব্বল ছেলে রাখিব না, পালনে কষ্ট হইবে, সমাজে দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইবে, দরিদ্রতা জন্মিবে, এ সকল স্বার্থসম্বন্ধবিশিষ্ট কোন কারণে নয়। আপনাদিগের সুখবৃদ্ধি কিম্বা দুঃখনিবৃত্তির জন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে গেলেই তাহার পাপ গুরুতর হয়। সমাজের হিতসাধন মনে করিলে স্বার্থসম্বন্ধশূন্য হয় না। এই জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে সমাজের হিতসাধন প্রচ্ছন্ন করিয়া হিন্দুর ব্যবস্থা। চীনীয়দিগের মধ্যেও ছেলে মারা আছে। তথায় কোন কোন হ্রদ এবং নদীর ধারে সাইনবোর্ডের ন্যায় প্রস্তরফলকে লেখা থাকে—"এই স্থানে ছেলে ডুবাইয়া মারিবে না।"

এইরূপে সকল সমাজই কতকটা জ্ঞাতসারে এবং কতকটা অজ্ঞাতসারে জন-সংখ্যার সংকোচ চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে।

যে প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া ঐরূপ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে অনেক দিন গত হইল, একটি ফরাসী ডাক্তারের সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"পৃথিবীতে সুখ অধিক নয়, দুঃখই অধিক। যেখানে সুখবোধ হয়, সে সুখও ভ্রমমূলক; প্রকৃত জ্ঞান হইলেই আর সুখবোধ থাকে না। মনে কর, একটা গারদে পাঁচ শত লোক বদ্ধ আছে। তাহাদের খাবার সামগ্রী ঐ পাঁচ শতেরই উপযুক্ত। সেই গারদে প্রতি মাসে পঞ্চাশৎ পঞ্চাশৎ করিয়া নূতন নূতন কয়েদী প্রবিষ্ট করা যাইতে লাগিল, কিন্তু খাবার সামগ্রী উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া গেল না। ঐ কয়েদীদিগের দশা কেমন হয়?—পৃথিবীতে মনুষ্যের, মনুষ্য বলি কেন, জীব মাত্রের কি সেই দশা নয়? আর সেই কয়েদী সমূহের বুভুক্ষাজনিত ক্ষিপ্তাবস্থায় কুকার্য্য সকল দমন করিয়া রাখিবার উপায়ের নাম কি দণ্ডবিধি নয়?" আমি বলিলাম—"শুদ্ধ দণ্ডবিধিরই উল্লেখ করিলেন কেন, দানের বিধিও ত আছে।" তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"দানের নিয়ম আছে বটে, কিন্তু উহা কি?—উহাতে মানুষ যে প্রকৃতির দোষ নিবারণে উন্মুখ ইহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু মানুষ

যে তাহা পারে, ইহার ত প্রমাণ হয় না। কয়েদীদিগের মধ্যে একজন আর একজনকে এক মুঠা ভাত দিল, তাহার প্রাণ বাঁচাইল, কিন্তু গারদের ভিতরে ত ঐ ভাত মুষ্টি বাড়িল না! দানবিধি ধর্ম্মবিধিই থাকা উচিত—উহাকে সামাজিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে আনিতে নাই।" আমি বলিলাম—"আপনার উপমাটি বেশ চৌচাপটে লাগে বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবী কয়েদীর জেলখানাই হউক, আর বিলাসীর আবাসনিকেতনই হউক, আর ধর্ম্মাত্মার কর্ম্মক্ষেত্রই হউক, বাহির হইতে ইহার ভিতরে কিছুই আইসে না। আপনি যাহাদিগকে কয়েদী বলিলেন, তাহারাই বিলক্ষণ জানিয়া শুনিয়া আপনাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহারা যদি ভোগসুখের বৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে না করিয়া, ধর্ম্মবৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, এবং ধর্ম্মের অতি প্রধান অঙ্গ যে ইন্দ্রিয়সংযম, তাহা সম্যক্ অভ্যস্ত করে, তাহা হইলে সংসারে দুঃখ কষ্ট কম হয়, অত্যাচার এবং পাপাচার কম হয়, দারিদ্র্য যন্ত্রণা কম হয়, পরপীড়ন এবং পরস্বাপহণ কম হয়, দণ্ডবিধি এবং দানবিধি উভয়েরই প্রয়োগস্থল কম হয়, অকাল মৃত্যু ঘটনা কম হয়, যুদ্ধের প্রয়োজন কম হয়, অস্ত্রঃবিদ্যার চর্চ্চা কম হয় এবং মনুষ্য ধর্ম্মচর্য্যায় এবং জ্ঞানচর্য্যায় নিরত হয়। যে সমাজ ইন্দ্রিয়দমন শিক্ষা দেয়, সেই সমাজই উৎকৃষ্ট।—তোমাদের ফরাসী জাতি বিনা রাজব্যবস্থার সাহায্যে যে স্বদেশে লোকসংখ্যার অযথাবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক সচ্ছলতারূপ কতক ফললাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি উহারা ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুযায়ী হইয়া পবিত্র শিক্ষার প্রভাবে চলিতে পারিত, তাহা হইলেই উহাদিগের প্রকৃত মনুষ্যত্ববৃদ্ধি হইত, এবং ফরাসী জাতিই ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান জাতি হইত।" কিন্তু ফরাসীরা শুধু ঐহিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের লোভে সন্তানসংখ্যার বৃদ্ধিনিবারণ জন্য পাপাচরণেও সঙ্কুচিত না হওয়াতে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এই ফল হইয়াছে যে, উহাদের মধ্যে সন্তানের সুপালন জন্য কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়নের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং দেশে জনসংখ্যা বৎসর বৎসর হ্রাস হইতে আরম্ভ হওয়ায় ভবিষ্যতে জাতীয় অস্তিত্বের বিষয়েই সন্দেহ দাঁড়াইতেছে।

সামাজিক প্রকৃতি—অধিকার পালন

সমাজের মধ্যে যত প্রকার বিধি ব্যবস্থা হয়, তাহার একমাত্র মূল জনসংখ্যার সহিত তাহাদিগের উপজীব্যের সামঞ্জস্য বিধান। ঐ কারণ হইতেই স্বত্বের

উৎপত্তি, ভূম্যধিকারের নিয়ম, পৈতৃক ধনাধিকার, বৈবাহিক ব্যবস্থা, সন্তান পালনের বিধি এবং দণ্ডবিধি ও দানবিধি। কিন্তু এই সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াও কোন সমাজ সর্ব্বতোভাবে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, এবং এক সমাজের লোক অন্য সমাজের অধিকারে প্রবেশ করিতে যায়।

কোন সুচতুব ইংরাজ গ্রন্থকার রুশীয়দিগের সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, কৃষিজীবী বলিয়া উহাদিগের নূতন নূতন কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন হয়; এই জন্যই রুশীয়রা নিরন্তব আপনাদের ভূম্যধিকার বিস্তৃত করিয়া চলিতেছে। গ্রন্থকার এই কথাটিকে একটি নূতন কথার ন্যায় কবিয়া এবং রুশীয়দিগের প্রতিই খাটে, এমত ভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু পাশুপাল্যোজীবী তাতার জাতীয়দিগের সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ বলা যায়। তাহাদের পশুচারণের নিমিত্ত নূতন নূতন ভূমিখণ্ডেব প্রয়োজন হয়; এবং তাতারীয়েরাও সেই নিমিত্ত আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। অপরন্তু, বাণিজ্যব্যবসায়ী জাতীয়েরাও আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার স্থান খুঁজিয়া বেড়ান, এবং সেই জন্য পৃথিবীর অতি দূর দেশ সকলেও গিয়া অধিকার এবং উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। প্রকৃত কথা এবং স্থূল কথা এই যে, প্রধান উপজীবিকা যাহাই হউক, সমাজমাত্রেই আপনাপন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইতে চায়, এবং তজ্জন্য অপবাপর সমাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করে।

পরন্তু, সকল সমাজের সংঘর্ষ-প্রবণতা সমান নয়। কোন কোন সমাজ এমন সুব্যবস্থিত এবং ধর্ম্মশাসনে সুশাসিত যে, আপনার নিবাসভূমি অতিক্রম করিয়া গিয়া অন্যের প্রতি উপদ্রব করে না। হিন্দু সমাজ কখন ভারতবর্ষের বহির্ভাগে অধিকার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কিন্তু চীনীয়েরাই এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। উহারা একবার মাত্র তিব্বত, তাতার, আনাম এবং ব্রহ্মদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য বাহির হইয়াছিল, আর কখন স্বদেশের বহির্ভাগে, যদিও প্রয়োজন পড়িলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কিন্তু দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হয় নাই। উহাদিগের মধ্যে লোকসংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় নাই। এক চীন সাম্রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসী-সংখ্যার পঞ্চমাংশ। কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফল এই হইয়াছে যে, দেশের ভিতর কোথাও অনাবাদী ভূমি পড়িয়া নাই—পাহাড়ের শিরোভাগ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়াছে—অনুর্ব্বর স্থান সকল জলসঞ্চারের দ্বারা শস্যশালী এবং মনুষ্যের বাসোপযেগী হইয়াছে, এবং অন্যান্য সমাজে গবাদি

পশুদিগের দ্বারা যে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, চীন দেশে তৎসমুদয় অধিক পরিমাণে মনুষ্যের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে এবং পশুর পালন বিশিষ্টরূপেই ন্যূন হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপখণ্ডে ইহার ঠিক বিপরীত কার্য্য হইয়াছে। বিভিন্নজাতীয়দিগের শিল্পের এবং বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যন্ত্রাদির প্রয়োগ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের শ্রম করিবার স্থল অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের একটা কলে এক হাজার লোক খাটে—কিন্তু বিশ হাজার লোক খাটিয়াও যত কাজ না করিতে পারিত তত কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং লোক সকল বেকার হইয়া পড়ে, আপনাদের আহার্য্য সংস্থান করিতে পারে না, এবং ভূরি পরিমাণে স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীর অপরাপর সমাজের প্রতি আক্রমণ করিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপীয়েরাই অতিশয় সংঘর্ষশীল। কিন্তু খাস ইউরোপের ভিতর যদিও যুদ্ধাদি ব্যাপারের প্রসঙ্গ অনুক্ষণই হইয়া থাকে, তথাপি ঐ যুদ্ধগুলি ঠিক সমাজ-সংঘর্ষের লক্ষণাক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ যুদ্ধগুলি সকল স্থলেই ভূম্যধিকারের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পরিসমাপ্ত হয় না। তাহার কারণ, ইউরোপখণ্ডের বিভিন্নজাতীয় জনগণের মধ্যেও একপ্রকার ব্যবস্থাশাস্ত্র চলে। ঐ শাস্ত্রের মূল কথা—বিভিন্ন রাজ্যের বল-সামঞ্জস্য, অর্থাৎ কোন একটি সমাজকে তাহার পার্শ্বস্থ অপর সকল সমাজ অপেক্ষা এমন অতি-প্রবল হইতে না দেওয়া যাহাতে অপরের বিশেষ শঙ্কা জন্মে। কিন্তু কিছুকাল হইতে ইউরোপে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ঐ ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন মৌলিক বর্ণসাদৃশ্য লইয়া জাতি সংঘটনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। রুশিয়া সকল শ্লাভবর্ণের লোককে, ফরাসীরা সকল লাটিনজাতীয়দিগকে, প্রুসিয়া সমুদয় জর্ম্মনজাতীয়দিগকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে যুদ্ধাবসানে ভূম্যধিকার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সেই সকল পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় বিভিন্ন সমাজের আপনাপন দলের পোষণ ইচ্ছা মাত্রই বুঝায়।

পৃথিবীর যে যে ভাগে কতকগুলি সমপ্রকৃতিক বিভিন্ন রাজ্য এক সময়ে জন্মিয়া থাকে, সেই সেই স্থানেই এক এক প্রকার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও জন্মিয়া যায় এবং বিভিন্ন সমাজস্থ লোকদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দেয়। গ্রীসদেশে, রোমের অত্যুৎকট প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ইটালীতে, ভারতবর্ষে, ঐরূপ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা জন্মিয়াছিল। নব্য ইউরোপে ঐ ব্যবস্থার অনেক শাখাপল্লব বাহির হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে ঐ ব্যবস্থাশাস্ত্র লইয়া অনেক তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ইউরোপের বহির্ভাগে এবং ইউরোপীয়েতর

জাতিদিগের প্রতি ঐ সকল ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োগ হয় না। তবে আজি কালি চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের বল বর্দ্ধিত হইয়া অবধি ঐ দুইটি জাতির সহিতও ইউরোপীয়দিগের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক দাঁড়াইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মরাজ থীবা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি সহ একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গজাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্ষিপ্রকর্ম্মা ইংরাজ তাঁহাকে উহা করিতে দিলেন না। ফল কথা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এক সমাজের প্রতি অপর সমাজের দৌরাত্ম্য কতকটা নিবারণ করিয়া রাখে।

কতকটা করিতে পারে—যদি পূর্ণমাত্রায় পারিত তাহা হইলে বিভিন্ন সমাজগুলি আপনাপন অধিকার মধ্যে সুস্থির হইয়া থাকিত, এবং যে যেরূপে যতদূর পারিত জনসংখ্যার সঙ্কোচ এবং আহারসামগ্রীর সম্বর্দ্ধন করিত। আর সকলেই ধর্ম্মসঙ্গত বাণিজ্যকার্য্যদ্বারা পরস্পরের ভোগসুখ বৃদ্ধি করিত।

যদি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপ্রণালী পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ হইত, তাহা হইলে ইউরোপীয়েরা যে বাণিজ্যব্যাপারের সূত্র ধরিয়া পৃথিবীস্থিত অপর সকল দেশকে উদ্বেজিত করিতেছে, তাহা করিতে পারিত না। বাণিজ্য পদার্থটি কি? কোন দ্রব্য আমি চাই, কোন দ্রব্য তুমি চাও, যেটি আমি চাই, তাহা তোমার আছে, যাহা তুমি চাও তাহা আমার আছে, এস দুই জনে বিনিময় করি, উভয়েরই ভোগসুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ইউরোপের সহিত বাণিজ্য সেরূপ সহজ ব্যাপার নয়। ইউরোপীয় বলে, তুমি চাও আর নাই চাও, তোমাকে আমার জিনিস লইতে হইবে, আর আমি যাহা চাই তাহা তোমার স্থানে লইব—এ বন্দোবস্তে সম্মত না হও, যুদ্ধং দেহি। ইউরোপীয় বলে, তুমি ভিন্ন দেশের রাজা, অবশ্য স্বাধীন পুরুষ; কিন্তু তুমি হীনবল আর ইউরোপীয় নও, অতএব অসভ্য; তোমার দেশে আমার যে সকল লোক বাণিজ্য ব্যাপার করিতে আসিয়া থাকিবে, তাহারা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, তুমি তাহাদিগের দোষাদোষ বিচার করিতে পাইবে না, সে কর্ম্ম আমার নিয়োজিত কর্ম্মচারীরাই করিবে। আর আমাদের ধর্ম্ম-প্রচারকেরা তোমাদের ধর্ম্ম-প্রণালীর এবং সামাজিক রীতিনীতির নিন্দা করিবে এবং তোমাদের লোকসকলকে ভজাইতে থাকিবে। এ সব কেবল গায়ের জোর বই আর কিছুই নয়, সুতরাং ধর্ম্ম্য বিচারের একান্ত বহির্ভূত। এই জন্য সামান্যতঃ সমাজে সমাজে সংঘর্ষ হইয়া কি হয়, তাহার বিচার কোন এক দেশীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাশাস্ত্র হইতে হইবার যো নাই—ইতিবৃত্ত হইতেই সে বিচার করা আবশ্যক।

প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসীক প্রভৃতি জাতীয়েরা এক এক সময়ে খুব

প্রবল হইয়াছিল। তাহাদিগের রাজারা অথবা সেনাপতিরা অপর দেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিত। কিন্তু জয় করিয়া আর কিছু করিত না, তাহাদিগের ধন ধান্যাদি, গো মহিষাদি, রত্ন সুবর্ণাদি লুঠ করিয়া স্বদেশে আনিত। কখন কখন ঐ বিজিত রাজ্যের রাজাদিগকেও বন্দী করিত এবং বিজিত দেশে আপনাদিগের মতানুগামী কোন কোন ব্যক্তিকে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিত এবং তাহার স্থানে বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু কর লইত। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বিজয় ব্যাপার আরও সরল ছিল। বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী অমাত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইত, যুদ্ধে পরাভূত রাজকুলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাজধর্ম্ম পালনের যোগ্য। যিনি যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেন, তাঁহাকেই রাজাসন অর্পিত হইত। বিজেতা কিছু কর গ্রহণ করিতেন, স্থাপিত রাজার সহিত কোন কোন নিয়ম অবধারণ করিতেন—কিন্তু বিজিত রাজ্যের ধর্ম্ম-প্রণালী আচারব্যবহার রীতিনীতি কিছুতেই হস্তার্পণ করিতেন না। তাহা করা হিন্দুর আন্তর্জাতিক শাস্ত্রানুসারে দোষ বলিয়া গণ্য হইত।

এই সকলের পর অতি প্রধান বিজিগীষু লোক রোমীয়েরা। ইহারা পররাজ্য জয় করিয়া তাহার উপর কর সংস্থাপন করিয়াই ছাড়িয়া দিত না। বিজিত রাজা এবং রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া আপনাদিগের লোকজন দিয়া বিজিত দেশের রাজকার্য্য চালাইত, স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত করিত, আপনাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিত, এবং বিজিত জনপদের ধর্ম্মব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর অন্তর্ভূত করিয়া লইত।

রোমীয়দিগের পর মুসলমানেরা বিশিষ্ট রূপেই প্রবল হয়। ইহারা যে দেশ জয় করিত, সে দেশের ধর্ম্ম এবং ব্যবস্থা-শাস্ত্র উঠাইয়া দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ব্যবস্থা-শাস্ত্র চালাইত। উহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ ব্যতিরেকে কেহই কোন রাজকার্য্য পাইত না। বিশেষ কারণে মুসলমানদিগের এই নীতি ভারতবর্ষে অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের পর নব্য ইউরোপীয় জাতীয়েরা। তন্মধ্যে পূর্ব্বে স্পেনীয়েরা এবং সম্প্রতি ইংরাজেরা প্রধান। স্পেনীয়দিগের প্রণালী অনেক পরিমাণে মুসলমানদিগের সদৃশ। উহারাও বিজিত জনপদবাসীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিত, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে পীড়ন করিত, এবং বিজিত দেশে আপনাদের বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিত। ইহারাও মুসলমানদিগের ন্যায় একজন যাজক-নরপালের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বিদেশ জয় করিতে যাইত।

ইংরাজেরা কোন রাজা বা যাজকের কথায় দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েন না। ইঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে অথবা বাণিজ্য করিতে বাহির হয়েন। যেখানে উপনিবেশ করেন, সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগের সমূলোচ্ছেদ করেন। যেখানে বাণিজ্য করেন, সেখানে শুদ্ধ আপনাদের লাভ ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যদি বহুজনপূর্ণ মহাদেশ ইঁহাদিগের করতলে আইসে, তাহার ধর্ম্মের প্রতি ইঁহারা কোন সাক্ষাৎ অত্যাচার করেন না। সে দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাদির প্রতিও কোন সাক্ষাৎ ব্যাঘাত করা হয় না। কিন্তু রাজকর্ম্ম সমুদয় আপনাদের হাতেই রাখেন। ইঁহারা বিজিত দেশ হইতে ধন শোষণ করিতে পাইলেই তুষ্ট। ইংরাজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া অবিকল ঐ পথানুবর্ত্তী হইয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিয়োজিত গবর্ণর ডাল্‌হৌসী সাহেব দেশীয়দিগের সর্ব্বপ্রকার অধিকার নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর যখন সিপাহী-বিদ্রোহের পর দেখা গেল যে এই রাজনীতি ভারতবর্ষের যোগ্য নয়, তখন মহারাজ্ঞী এই সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ-কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সময় ঘোষণা প্রদান করিলেন যে, ইংরাজ এবং দেশীয় লোক নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্য সমাপন করিবেন, ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে স্থান দিবেন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের হিতসাধন করাই রাজকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ইহাদিগের কোন অধিকারে হস্তার্পণ করা হইবে না। ইংরাজ কি ভাল বা উচিত তাহা সামান্যতঃ বিচার করিয়া কাজ করেন না এবং অন্যের পক্ষে কি ভাল কি মন্দ, তাহা আদবেই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যেখানে যোগ্যতা দেখেন সেইখানেই আপনার প্রকৃতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারেন এবং যে সকল অনুষ্ঠানে আপনার ভাল হইয়াছে মনে করেন, অন্যের পক্ষেও তাহাতে ভাল হইবে মনে করিয়া তাহাদের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইংরাজ স্বার্থপর এবং সহানুভূতিশূন্য হউন, কিন্তু তিনি বীরপুরুষ। তিনি সক্ষমের সমাদর করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য ভাব—ইংরাজ-সমাগম

হিন্দুসমাজের প্রকৃতি শান্তি-প্রবণতা, ইংরাজসমাজের প্রকৃতি ভোগসুখানুসন্ধানে কার্য্যতৎপরতা। হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ কৃষ্যুপজীবী, ইংরাজ প্রধানতঃ শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী; হিন্দুসমাজ মিলিতস্বত্ব এবং মিলিত স্বত্বাধিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জ্যেষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক্ স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ইংরাজসমাজে বয়োধিকে বিবাহই নিয়মিত। হিন্দু সামাজিক অন্তঃশাসনের পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার পালনে রাজশাসনকেই সর্ব্বস্ব করিতে উন্মুখ।—ভারতবর্ষে এই-দুইটি পরস্পর ভিন্নধর্ম্মী সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ কার্য্যতৎপর, কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী এবং লোভী; হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচেতা। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইংরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল হয়।

কিন্তু তাহা হয় না। শিক্ষাকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ। অনুকরণ করিতে গেলে, দোষ এবং গুণ দুইই অনুকৃত হইয়া যায়। তবে দোষের অনুকরণই সহজ। এই জন্য হিন্দু ইংরাজের স্থানে সাহঙ্কার ব্যবহার শিখিতেছে, এবং আপনার জাতি-সুলভ নম্রতা পরিত্যাগ করিতেছে। হিন্দুর সন্তুষ্টচিত্ততাও তিরোহিত হইয়া ইংরাজ-সাহচর্য্যে লোভ-পারবশ্য জন্মিতেছে। হিন্দুর হৃদয়ে পরার্থ-জীবনতা যতদূর উঠিয়াছিল, পৃথিবীর অপর কোন জাতির হৃদয়ে উহা ততদূর উঠে নাই, ইংরাজের হৃদয়ে স্বার্থপরতা যেমন বলবান পৃথিবীতে আর কোন জাতির হৃদয়ে তত প্রবল নয়; আবার বলি, এরূপ দুইটি সমাজের পরস্পর সংস্রবে হিন্দুর স্বভাবে পরিবর্ত্ত না ঘটিয়া যদি ইংরাজের স্বভাবেই পরিবর্ত্ত ঘটিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।

কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। ক্রমে ক্রমে পরার্থচিন্তা তিরোহিত হইয়া ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দুর হৃদয় স্বার্থচিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। আমি ইংরাজী কলেজে শিক্ষিত কোন যুবাকে বলিতে শুনিয়াছি, "মহাশয়! অমুক কার্য্যটিতে আমার স্বার্থ আছে, তবে আমি ঐ কার্য্যটি করিব

না কেন?"…"করিবে না এই জন্যই যে, ঐ কাজটি করায় পরার্থ নষ্ট নয়।" …"পরার্থ রক্ষা করিয়া চলায় আমার ইষ্ট কি?"…"ঐ পরার্থ রক্ষাই তোমার ইষ্ট।"…"পরার্থ রক্ষায় পরের ইষ্ট, তাহাতে আমার ইষ্টসিদ্ধি নাই।" বিচার ফুরাইল। বুঝিলাম, এতকাল ধরিয়া পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষার মহিমায় হিন্দুর হৃদয়ে যে পরার্থজীবনে ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে ভাব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক পুরুষেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর একদিন একটি নব্য উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে, তাঁহারা যে একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটু তর্ক উপস্থিত হইল। উকীল বাবু স্বীকার করিলেন যে পাত্রটি অভিনন্দনের যোগ্য নহে। অনন্তর বলিলেন, "আমরা ত সত্য সত্যই তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া অভিনন্দনপত্র প্রদান কবিতেছি না। উঁহাকে তুষ্ট করিলে আমাদের একটি স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে—তাই এ কার্য্য করিতেছি।" এ স্থলেও বিচার ফুরাইল।

বর্ষ কতিপয় গত হইল, কোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ দুই প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিলেন। একজন সভাসদ প্রস্তাব করিলেন——"সভার কার্য্যবিবরণ বাঙ্গলা ভাষাতে লিখিত হউক।" অমনি একজন 'কৃতবিদ্য' গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য সহকাবে ঐ কথার প্রতিবাদ পূর্ব্বক ইংরাজীতে বলিলেন—"বাঙ্গালা ব্যবহার প্রবৃত্ত করিলে, দেশটি দুই সহস্র বর্ষ পাছু হইয়া যাইবে।" ভাবিলাম, এখনকার দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ত সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের সন্নিহিত সময়—সে সময়ে পঁহুছিলে দেশটি পাছু যায়, না আগু হয়? কৃতবিদ্য মহাশয়ের অগ্রপশ্চাৎ বোধটি বড় সুপরিস্ফুট হয় নাই।

কোন জিলায় একটি 'কৃতবিদ্য' মুনসিফ হইয়া আসিয়া তথাকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটী বাটী গিয়া তাঁহাদিগের সম্মানরক্ষা এবং বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল ঐ নগরে যে একটি মহারাজা থাকিতেন, তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, প্রত্যুত দেশীয় কোন বড় লোকেরই নিকট গমন করেন নাই। নিজেই অপ্রাসঙ্গিক রূপে ঐ কথার উত্থাপন করিলে, ওরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—"রাজা বেটা কি করিতে পারে? আর দেশীয় লোকে কেই বা কি করিতে পারে?"—'কৃতবিদ্য'টির সাম্যজ্ঞান এবং সৌজন্যবোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়া গিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম।

ইংরাজীশিক্ষিত অনেকানেক যুবার মন যে স্বার্থপ্রবণ, বুদ্ধি অগ্রপশ্চাৎ-বোধশূন্য, চিত্তবৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্য বোধ বিরহিত এবং ব্যবহার অবিনীত হয়, তাহার কারণ কি, ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। ইংরাজীশিক্ষিতেরা মুখে যাহাই বলুন, আর মনে মনেও আপনাদের মন না বুঝিতে পারিয়া যাহা ভাবুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা অপরিসীম ইংরাজভক্ত। তাঁহাদিগের ভক্তিটি মুখের ভক্তি নহে —অন্তরের অন্তস্তল ভাগের ভক্তি। এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। রোমজাতীয় বাগ্মীপ্রধান সিসিরো কোন সময়ে সিলিসিয়া নামক একটি প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া রোমনগরে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার কোন বিপক্ষ ব্যক্তি সেনেট সভায় বলিয়াছিলেন যে, সিসিরো একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পাইয়া কোন কাজই করিতে পারেন নাই, একটি যুদ্ধও জয় করেন নাই, একটি শত্রুও বিনাশ করেন নাই। সিসিরো তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন—"আমি সিলিসিয়া প্রদেশে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে ঐ প্রদেশবাসীরা চিরকালের জন্য রোমের দাসানুদাস হইয়া থাকিবে। আমি রোমীয় ভাষা (লাটিন) শিক্ষার নিমিত্ত এক শত চল্লিশটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একেবারে রোমীয় মন্ত্রে দীক্ষিতের ন্যায় হইবে, কখনও রোমীয় ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনাদের আদর্শস্থলীয় মনে করিতে পারিবে না।" সেনেট সভা সিসিরোর বাক্যগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন কবিয়াছিলেন। অতএব কেবলমাত্র ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে যে ইংরাজই হিন্দুজাতীয় যুবকদিগের আদর্শ-স্থলীয় হইয়া উঠিবে, ইহা সাধারণ-মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ। কয়েক বর্ষ গত হইল ইংরাজীতে অতি ব্যুৎপন্ন কোন বন্ধুবরের বিরচিত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজকে আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এই মাত্র দেখাইয়াছেন যে, উহা ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকর্ত্তার মনের মানদণ্ড ইংরাজ। অতএব ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে ইংরাজ আমাদিগের আদর্শ পুরুষ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিলেও বলা যায়। ইংরাজী শিক্ষার বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে। আমি দেখিয়াছি আজি কালি কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি আপনাদিগের পুত্রকন্যার শিক্ষায় ঐ পথ

অবলম্বন করিতেছেন—উহাদিগকে ইংরাজী পড়াইবার পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইয়া লয়েন, এবং সংস্কৃতের চর্চ্চা ইংরাজী শিক্ষার সহিত বরাবর প্রচলৎ রাখেন।

আর এক প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিলেও ইংরাজের প্রতি অযথা ভক্তি কিছু কম হইতে পারে। ইংরাজ তাঁহার বৈজ্ঞানিক উন্নতির অন্যূন বার আনা ভাগ অপরাপর জাতীয়দিগের স্থানে পাইয়াছেন। তাঁহার বৈদ্যুতিক আলোক আমেরিকা হইতে, তাঁহার সামরিক উপকরণ ফ্রান্স হইতে, তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র হলণ্ড হইতে,—এইরূপ প্রধান প্রধান সকল যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্রাদি ইংরাজ অন্যের স্থানে পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা পাইয়াছেন বলিয়া যে ঐ সকল জাতির কিছুমাত্র গৌরব করেন তাহা নহে। আমরা যদি ঐ পথ অবলম্বন করিতে পারি, অর্থাৎ ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির স্থানে যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ কৌশল এবং প্রয়োগ বিধান শিখিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে অনেকটা অযথা ভক্তির হ্রাস হয়। এইজন্য হ্রাস হয় যে, যন্ত্রাদি প্রয়োগ এত বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ থাকে না, প্রত্যুত অতি স্থূল ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হয় এবং তাহা হইলেই বাহ্য চৈক্কণ্যে এবং বাহ্য উন্নতিতে এতটা মোহ জন্মে না। মনুষ্যের দুইটি কর্ম্ম আছে—বাহ্য জগৎকে জয় করা আর অন্তর্জ্জগৎকে জয় করা; সে দুইটি কার্য্যের মধ্যে যাহা ইংরাজেরা করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ বাহ্য জগতের উপর কতকটা প্রাধান্য লাভ, তাহা আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয়। এই প্রকৃত তথ্যের জ্ঞানোদয় হইলেই আর ইংরাজের অনুকরণেচ্ছা অতি প্রবলা হইতে পারে না, ইংরাজ আর আদর্শস্থলীয় থাকে না এবং তাহার রীতি-চরিত্রের সংসর্গদোষে ভোগসুখেচ্ছা বর্দ্ধিত হইয়া জনগণকে স্বার্থপর করিয়া তুলে না। চীনীয় এবং জাপানীয়েরা ইউরোপীয়দিগের স্থানে কলকৌশল এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ-প্রণলৌ শিক্ষা করিতেছে; কিন্তু ইউরোপকে আপনাদের আদর্শস্থলীয় মনে করে না। আমরা ইংরাজ-রীতির প্রতি অতিভক্তিমান হইয়াছি এবং ভারতবর্ষকে কিরূপে ইংলণ্ড করিয়া তুলিব তাহা ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রবিদেরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, ইউরোপ নিতান্ত অসুখময় হইয়া উঠিতেছে, ওখানে একটা অতি ভয়ানক সমাজবিপ্লব অবশ্যই ঘটিবে। সেই বিপ্লব নিবারণার্থ কোম্‌ৎ হিন্দু সমাজের ন্যায় যাজকপ্রধান সমাজ সংগঠনের পরামর্শ দিয়াছেন, আর সোপেনহোর ভারতবর্ষীয়দিগকেই ইউরোপের আদর্শস্থলীয় করিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু ঐ সকল মহামহোপাধ্যায় দার্শনিক মহোদয়দিগের কথা যেরূপ, সাধারণ ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গেরর কথা সেরূপ নহে। উহারা ইংরাজমাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই শতমুখ —উহারা ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বলিতেছে, ইংরাজ তাহাদিগকে কত কি শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছে, এবং ইংরাজপ্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য মহান্ ভাব সকলের প্রভাবে ভারতবর্ষ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। দেশীয় 'কৃতবিদ্যেরা'ও ঐ সকল কথা কণ্ঠস্থ করিতেছেন, এবং আপনাদিগকেই পাশ্চাত্যভাবের অধিকারী জানিয়া সেই সকল ভাবের ভাবে একান্ত গদ্‌গদ হইতেছেন।

কোন ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে একটি আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছেন—"কি আশ্চর্য্য গো! লোকটার মস্তিষ্কে একটাও পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না"—

আমি স্বয়ং যত দূর ভাবিয়া বা অন্যের সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য ভাবগুলির সকলই এদেশে সম্পূর্ণ নূতন কি পুরাতনেরই বেশপরিবর্ত্তন মাত্র, এবং উহারা স্বতঃই কতদূর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, আমাদের সমাজের উপকার বা অপকার করিবার যোগ্য, জাগতিক নিয়মাবলীর সহিত কতদূর সংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট, এই সকল বিষয় প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিবার বিশিষ্ট প্রয়োজনই আছে বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্যভাব বলিয়া যেগুলির উল্লেখ হয়, তাহা নিম্নবর্ত্তী পদার্থের মধ্যে কোনটি না কোনটি হইয়া থাকে, যথা,—

(১) স্বার্থপরতা (২) উন্নতিশীলতা (৩) সাম্য (৪) ঐহিকতা (৫) স্বাতন্ত্রিকতা (৬) বৈজ্ঞানিকতা (৭) শাসনকর্ত্তার সমাজপ্রতিভূত্ব।

পাশ্চাত্য ভাব—স্বার্থপরতা

অহং জ্ঞানটি সকল সংজ্ঞার মূলে অবস্থিত। কীটাণু হইতে মহর্ষি পর্য্যন্ত যাহার সংজ্ঞা মাত্র আছে, তাহারই আত্মবোধও আছে। শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, আত্মজ্ঞানটি "প্রতিবোধবিদিত" অর্থাৎ সকল বোধের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু অহং জ্ঞানটি যেমন মৌলিক বস্তু "নাহং" জ্ঞানটিও তেমনি মৌলিক। বস্তুতঃ ঐ দুইটি বোধ পরস্পর-সাপেক্ষ। উহাদিগের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব আছে বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। 'নাহং' বোধ ব্যতিরেকে 'অহং' বোধ হয় না, আর 'অহং' জ্ঞান না জন্মিলেও 'নাহং' বোধ হইতে পারে না। উহারা যমজ প্রায়। এই জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারেরা

স্বার্থে এবং পরার্থে অভেদবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত বার বার ভূরি ভূরি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি কি এবং আমি কি নই, কিছু দূর পর্য্যন্ত এই বিচার লইয়া গেলেই দেখা যায় যে, অহং এবং মমতার ভাব ক্রমশঃই অতিব্যাপক হইয়া, অবস্থা, শিক্ষা এবং সংস্কার গুণে সমুদয়কেই আমি এবং আমার করিয়া দেয়, স্বার্থে এবং পরার্থে ভেদ রাখিতে দেয় না, এবং যাহা পরার্থ নয় তাহাতেও আর স্বার্থ বোধ থাকে না। কিন্তু ঐ অত্যুচ্চ শাস্ত্রীয় বিচার ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যায় যে, অজ্ঞানান্ধ শিশুর স্বার্থ যেমন সঙ্কুচিত পদার্থ, বয়োধিকের স্বার্থ তেমন ক্ষুদ্র বস্তু নহে; এবং যাহার জ্ঞান যেমন অধিক তাহার স্বার্থও তেমনি সুবিস্তৃত হয়। তদ্ভিন্ন, প্রায় সর্ব্ব স্থানেই দেখা যায় যে, মানুষ যখন আপনার সুখ, গৌরব এবং ঐশ্বর্য্যানুসন্ধানে নিবিষ্টচিত্ত তখনও আপনাকে অন্যের চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য এবং গৌরব অন্যের চক্ষুতে না দেখিতে পারিলে কিছুই থাকে না, সুখেরও ভোগ অন্যের সহানুভূতি হইতেই অধিক পাইতে হয়।

হিন্দুর স্বার্থ অতি সুবিস্তৃত বস্তু; হিন্দু জানেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", হিন্দু জানেন "সর্ব্বভূতময়ো হি সঃ।" হিন্দু প্রধানতঃ বৈদান্তিক, অতএব একাত্মবাদী। হিন্দুর আত্মপর নাই। ইংরাজের স্বার্থ বড়ই সঙ্কীর্ণ পদার্থ—ইংরাজের বিষয়জ্ঞতা অধিক, ইংরাজ নানা দিগ্দেশে গমন করেন, নানা প্রকার সমাজ দেখেন, বিবিধ অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, কিন্তু তিনি যেমন আপনার রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে একান্ত দৃঢ়সম্বদ্ধ, এমন আর কোন জাতি নয়। তিনি নিজেও কাহারও হইতে পারেন না, কাহাকেও আপনার করিতে পারেন না।

ফরাসী পণ্ডিত নিজ শিষ্যমণ্ডলীকে নীতি শিখাইলেন—"পরার্থে জীবন যাপন করিবে।" ইংরাজ দার্শনিক ঐ কথার খুঁত ধরিয়া বলিলেন, "আত্মার্থে জীবন ধারণ না করিলে জীবন থাকে কৈ?—অতএব আত্মার্থেই জীবন ধারণ করিবে।" ফরাসী পণ্ডিতের তাৎপর্য্য এই—"এরূপ করিয়া জীবন ধারণ কর যে, জীবনের সমস্ত কার্য্যই যেন পরের উপকারে আইসে; যাহাতে পরের উপকার তাহাতেই আপনার প্রকৃত উপকার।" কিন্তু ইংরাজ দার্শনিক ও সকল তাৎপর্য্য ভাবিয়া বুঝিতে অশক্ত। ইংরাজ জন্মগুণেই স্বার্থবাদী।

কিন্তু ইংরাজের স্বার্থপরতায় একটি অদ্ভুত বৈচিত্র্য আছে, এবং সেই জন্য, অজ্ঞানকৃত পাপের ন্যায় অনেক স্থলেই স্বার্থপরতার সকল দোষ ইংরাজকে স্পর্শ করে না। সে বৈচিত্র্যটি এই। ইংরাজের স্বার্থবোধ অতি গাঢ়তম তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাঁহার মনের যাবতীয় ভাব ঐ স্বার্থবোধে নিমজ্জিত। যেটিতে তাঁহার

স্বার্থ, সেটি তাঁহার মনে চিরকাল ধর্ম্মজ্ঞানের অবিরোধিরূপেই প্রতীয়মান হয়। এই ঘোর স্বার্থপরতার প্রভাবে, ইংরাজ একেবারেই সহানুভূতিশূন্য। তিনি বুঝিতেই পারেন না যে, যাহাতে তাঁহার স্বার্থ সেটি কেমন করিয়া ধর্ম্ম-ব্যাঘাতক অথবা অপরের অনিষ্টজনক হইতে পারে। তিনি যাহাতে সুখী, সমুদয় জগৎ তাহাতেই সুখী নয় কেন?—এইরূপ একটি বালসুলভ মোহময় ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান। যাঁহারা ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথাগুলির ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, ইংরাজ যতক্ষণ উপকার বা সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, ততক্ষণই খুব ভাল বাসেন, আর যেই উপকার প্রাপ্তি থামিয়া গেল মনে করেন, অমনি পূর্ব্বোপকৃতি স্মরণ করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন। ইংরাজের ইতিহাসে ঐ স্বার্থপরতার এবং কৃতোপকার-বিস্মৃতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল কথার বিশেষ উল্লেখ না করিয়া ইংরাজের যে প্রগাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন স্বার্থবোধের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই দুই একটি উদাহরণ দিব।

১৮১৫ অব্দ হইতে গ্রীকজাতীয় লোকের অধ্যুষিত আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইংরাজের অধীন ছিল। পরে ১৮৩০ অব্দের পর গ্রীকদেশ স্বাধীন হইয়া উঠিলে আইওনীয় দ্বীপনিবাসী গ্রীকজাতীয় লোকেরাও গ্রীসের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিল। ইংরাজ ওরূপ ইচ্ছার হেতু বুঝিতেই পারিলেন না। তিনি বলিলেন "আমার অধীনতা ত্যাগ করিতে চাহিবে কেন?—এত সুখ আর কোথায় পাইবে?" ইংরাজ বলেন, "আফগান জাতীয়েরা আমাকে ভালবাসে। আমি তাহাদের দেশে প্রবেশ করিয়া অনেক উপদ্রব করিয়াছি বটে, এবং উহারাও আমার অনেক লোকজনকে যুদ্ধ করিয়া এবং প্রতারণা করিয়া হত্যা করিয়াছে বটে, কিন্তু আফগান তবু আমাকে ভালবাসে। আমার গুণ কত! আর কেহ কি আমার সঙ্গে তুলনার যোগ্য!"

ইংরাজ আপনার দেশ হইতে দুর্বৃত্ত দস্যু প্রভৃতি অপরাধীকে অস্ট্রেলিয়া অথবা কেপে প্রেরণ করিত। ওখানকার লোকেরা যতই নিষেধ করুক কিছুতেই শুনিত না; বলিত, ও সকল আপত্তি দুই চারি জন দুষ্ট লোকের রটনা মাত্র। পরে যখন ঐ সকল স্থানের ঔপনিবেশিকেরা জাহাজ হইতে ঐ প্রকার ইংলণ্ডের ময়লা স্বদেশে নামাইতে দিল না, তখন ইংরাজ বুঝিল, তাই ত, সত্য সত্যই যে উহারা ময়লা লইতে অস্বীকৃত; তবে আর দিয়া কাজ নাই।

ইংরাজ কানেডায় উপনিবেশ করিল। ওখানে পূর্ব্ব হইতে ফরাসীর উপনিবেশ

ছিল। সুতরাং ফরাসী ও ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের পরস্পর মনোমালিন্য নিবন্ধন রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজ সে সকল কথায় বিশ্বাস করিল না। ইংরাজ যাহা করে তাহাতে কি কোন ত্রুটি বা দোষ থাকিতে পারে! পরিশেষে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল—একটি ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটিল, কতকটা রক্তপাত হইল। ইংরাজের চেতনা হইল, বুঝিল উপনিবেশগুলিকে অত দৃঢ়বন্ধনে রাখিলে চলিবে না। উহাদিগকে আভ্যন্তরিক বিসম্বাদ সামঞ্জস্য করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ইংরাজ বলেন, ব্রহ্মদেশীয়েরা আমাকে পাইবার জন্য উর্দ্ধবাহু হইয়া ছিল। যাই ব্রহ্মরাজ থীবা পদচ্যুত হইল, আর উহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বর্ম্মীদিগের মধ্যে যাহারা আমাকে চায় না, তাহারা বিদ্রোহী দস্যু, ডাকাইত! অপরাপর লোকে ইংরাজের ঐ সকল কথাকে ভণ্ডতা মনে করিতে পাবেন, এবং রাজনীতিজ্ঞ বড় লোকদিগের পক্ষে এবং হৃদয়বান ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ওগুলি ধূর্ত্তপনাই বটে, কিন্তু ইংরাজ জাতি-সাধারণ যদি একান্ত স্বার্থ-বিমুগ্ধ না হইত, তবে রাজনৈতিক কৌটিল্যও ঐ পথ অবলম্বন করিত না। ফরাসীরা আলজিরিয়া এবং টুনিস্ প্রদেশ মুসলমানদিগের স্থানে লইয়াছে। রুশিয়াও মধ্যআসিয়াখণ্ডে তুর্কিমানদিগের স্থানে অনেক ভূমি অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ঐ দুই জাতীয় লোকের রাজনৈতিকেরাও বলিয়া বেড়ান না যে, মুসলমানেরা এবং তুর্কিমানেরা আমাদিগকে পাইবার নিমিত্ত বড়ই আগ্রহান্বিত ছিল এবং আমাদিগকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

ইংরাজ সত্য সত্যই মনে করেন যে, যে সৌভাগ্যক্রমে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে, সে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। ইংরাজের হৃদয় স্বার্থপরতায় পূর্ণ; উহাতে অপরের হইয়া চিন্তা করিবার একটুকুও স্থল নাই। একজন একটা পায়রা ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল দেখিয়া কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পায়রাটা লইয়া কি করিবি?" সে উত্তর করিল, "পুষিব।"—"আহা কৃষ্ণের জীব হত্যা করিবি কেন? আমাকে দে, আমি পোড়াইয়া খাব।" ইংরাজের মনের ভাবটি যেন অবিকল এইরূপ। তিনি পোড়াইয়া খাইলেও হত্যা হয় না—অন্যে পুষিবার চেষ্টা করিলেও হত্যা করিতেছিল বলেন। ইতিহাসে ইংরাজের একটা অস্বার্থপর কার্য্যের উল্লেখ আছে এবং ইংরাজ গ্রন্থকারেরা সর্ব্বদাই সেই কার্য্যটির ব্যাখ্যা বাহির করিয়া থাকেন। ১৮৩২ অব্দে ইংরাজ নিজ ঘর হইতে দুই কোটি টাকা খরচ করিয়া ওয়েস্টইণ্ডিসের কাফ্রিজাতীয় লোকগুলির দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। কাজটি খুব

উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ কাজটির প্রবর্ত্তক ইংরাজ নহেন। ১৮২২ অব্দ হইতে ব্রেজিল দেশে কাফ্রিজাতীয় দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই অবধি প্রতিবর্ষে তথায় রাজস্বের ষষ্ঠাংশ ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে এবং ১৮৯২ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য চলিলে দাসত্বমোচন সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইবে এইরূপ স্থির থাকে। কিন্তু ব্রেজিল সাম্রাজ্যে ঐ মহৎ কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া যে, ইংরাজকৃত কার্য্যটির মাহাত্ম্য একেবারে নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে টাকা খরচ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে অধিক যায় নাই, অর্থাৎ স্বজাতীয় চিনি করদিগের হাতেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্যও কাজটির মাহাত্ম্য কমে না। ইংরাজ আমেরিকায় অপদস্থ হইয়া অবধি আপনার ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি যে যত্ন করিতে শিখিয়াছেন উল্লিখিত দাসমোচন কার্য্যটি তাহারই একটি অঙ্গ বলিয়া অবশ্য ধর্ত্তব্য হইতে পারে।

আর দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে, ইংরাজের স্বার্থপরতা অতি ঘোর তমোগুণে একান্ত সমাচ্ছন্ন। হিন্দুর হৃদয়ে কি ওরূপ তমোগুণের প্রাবল্য জন্মিতে পারে? হিন্দু জাতির সহজাত গুণ পর-চিত্তজ্ঞতা এবং পরের ইষ্টানিষ্ট বোধ। হিন্দুর মন কোন সময়েই সম্যক্ বিমূঢ়তা চায় না। * হিন্দু, মৃত্যুও সজ্ঞানে হয়, ইহার প্রার্থী। আমি জানি, কোন ব্যক্তির অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইলে ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে ক্লোরোফরম্ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা করিতে চাহিয়াছিলেন। পীড়িত ব্যক্তি বলিলেন, "সাহেব, যদি কাটা ছেঁড়া করিতে করিতে মরিয়া যাই!" সাহেব উত্তর করিলেন—"মরণ-যাতনাও জানিতে পারিবে না।"...রোগী বলিল—"তাহাতে আমার কোন লাভ নাই—আমি সজ্ঞানে মরিতে চাই—তুমি অস্ত্র চালাও আমি সহ্য করিব—আমি অজ্ঞানাবস্থায় মরিব না।" অস্ত্রচিকিৎসা সজ্ঞানেই হইল; একবারও কাতরতার চিহ্ন প্রকটিত হইল না। দেখিলাম, বাঙ্গালীর মধ্যেও 'রেগুলস্' আছেন। কথা হইতেছে এই যে, হিন্দুর একান্ত জ্ঞানলোলুপ হৃদয়ে কি ইংরাজের ন্যায় অশেষ স্বার্থপরতার স্থান হইতে পারে? কখনই পারে না। সুতরাং ইংরাজ-সংসর্গে যদি হিন্দুর স্বার্থপরতা বর্দ্ধিত হয়, তবে সে স্বার্থপরতা ইংরাজের স্বার্থপরতার ন্যায় একান্ত অন্ধ হইবে না। হিন্দু যেমন পরচিত্ত বুঝিতে পারে তেমনি আপনার চিত্তও বুঝিতে পারে। স্বয়ং স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কি করিতেছে তাহা হিন্দুর চক্ষে ঢাকা থাকে না, সুতরাং হিন্দু

---

* সেই জন্য হিন্দু কোন কালেই তেমন মাদকসেবী হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার শাস্ত্রের বিধি তাঁহার স্বভাবেরই অনুযায়ী।

স্বার্থপর হইলে, জেনে শুনেই স্বার্থপর হইবেন। তাঁহার পাপ, জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—উহার অবশ্যম্ভাবী ফল অধঃপতন।

কিন্তু ইংরাজের স্বার্থজ্ঞানে একটু সতেজ রজোগুণের মিশ্রণ আছে। ইংরাজ আপনার জাতির স্বার্থে এবং নিজের স্বার্থে অনেকটা অভিন্নতা দেখিতে পায়। কোন জেলায় একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, দেশী ছুতারেরা কাজে দেরী করে ও খারাপ কাজ করে বলিয়া, কোন ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টর কোম্পানীকে কার্য্যভার দিলেন। কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী আসিল এবং স্থানীয় ছুতার দ্বারাই কার্য্য নিষ্পন্ন করিল। দেরী এবং কাজের ধরণ পূর্ব্ববৎই হইল, কিন্তু বিল হইল দ্বিগুণ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "তা হউক, টাকাগুলা ভদ্রলোকের হাতে যাইতেছে, হাভাতে কেহ ত পাইল না!" ইংরাজ সর্ব্বদাই স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানে মনোযোগী, স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ ও উদ্যত-প্রহরণ। তাঁহার চরিত্র হইতে এই স্বজাতি-বাৎসল্যটি শিখিতে পারিলে ভারতবর্ষে ইংরাজের সমাগম হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মবর্দ্ধক হইতে পারে। ইহার কতকটা বাহ্যলক্ষণও সম্প্রতি দেখা দিতেছে। ঐ লক্ষণগুলি ক্রমশঃ জনগণের হৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেলে ভারতবাসীর অনেক দুঃখ ঘুচিবার পথ মুক্ত হইবে। যাহাকে ইংরাজের উন্নতি বলা যায় তাহার হেতু ইংরাজের স্বার্থপরতা নয়, ইংরাজের স্বজাতিবাৎসল্য। ইংরাজের যদি অবনতি হয় তাহা ঐ স্বার্থপরতার জন্যই হইবে। অতএব ইংরাজের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া কাজ নাই। ওরূপ স্বার্থপরতা আমাদের স্বভাবের বিপরীত। হিন্দু যদি ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতিদোষপ্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

পাশ্চাত্য ভাব—উন্নতিশীলতা

১

নব্য ইউরোপীয়েরা বলেন, মনুষ্য উন্নতিশীল। পশুপক্ষ্যাদি পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। তাহাদিগের কাহারও আকারগত, আবাসগত, উপভোগগত কোন একটি বিষয়েও পূর্ব্বাপেক্ষায় বিশেষ উৎকর্ষ হয় নাই, মনুষ্যের

তাহা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, মানুষ ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে ও করিবে এবং এখনও যে সকল কাজ মানুষের অসাধ্য হইয়া আছে, কালে সে সকল কাজও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

এইরূপে মনুষ্যজাতিসাধারণের ক্রমোৎকর্ষের কথা বলিয়া ইউরোপীয়েরা বলেন যে, আমরাই পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্যজাতি অপেক্ষায় অধিক উন্নতিশীল;—অর্থাৎ মনুষ্য, পশুপক্ষ্যাদি হইতে যে গুণে বড়, আমরা অপর সকল মনুষ্য হইতে সেই গুণেই বড়। সুতরাং অপর কাহাকেও উন্নতিশীল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

নব্য ইউরোপীয়দিগের এই মতবাদের পৃষ্ঠপূরক স্বরূপ, যদি কতকগুলি বাহ্যবৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, এবং বার্ত্তাশাস্ত্রিক কথার উল্লেখ না হইত, তাহা হইলে উঁহাদিগের এই মতবাদের বিচার করিবার প্রয়োজন হইত না। গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় এবং চীনীয় প্রভৃতি জাতীয়েরা যেমন অপর সকলকে "বর্ব্বর" "ম্লেচ্ছ" এবং "প্রান্তবাসী অন্ত্যজ" বলিয়া গালি দিয়াছেন, ইউরোপীয়দিগের "অনুন্নতিশীল" শব্দটিও সেইরূপ অপর জাতিদিগের প্রতি গালিদান বলিয়াই ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী ইউরোপীয় শুদ্ধ গালিদান করিয়া নিবৃত্ত হয়েন না; তিনি যাহা বলেন তাহার প্রমাণার্থ যুক্তি প্রদর্শনও করিতে চেষ্টা করেন।

সুতরাং সেই যুক্তিগুলির বিচার করা আবশ্যক। ইউরোপীয় বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের আধুনিক প্রচলিত মত পরিণামবাদ। পরিণামবাদ বলেন যে, কি সজীব, কি নির্জীব সকল প্রকার পদার্থই আপনাপন পরিবৃতির প্রভাবে নিরন্তর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণিশরীরেও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধন হইয়া এক প্রকার শরীর অন্য প্রকার হইয়া উঠিতেছে। বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের এই প্রচলিত মতবাদটিকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পূর্ব্বকালের নিকৃষ্ট-দেহ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে এখনকার উৎকৃষ্ট-দেহসম্পন্ন মনুষ্যগণ জন্মিয়াছে। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যথা, যে সকল মনুষ্য বহুপূর্ব্বগত "প্রস্তর যুগে" জন্মগ্রহণ করিয়া ভূগর্ভ বা পর্ব্বতগহ্বর মধ্যে বাস করিত, তাহাদিগের মৃত শরীরের কঙ্কাল দেখিয়া নিশ্চিত হইয়াছে যে, ইহারা এখনকার ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা খর্ব্বকায়, দুর্ব্বলাস্থি, এবং ক্ষুদ্রতর-করোটি-বিশিষ্ট ছিল। সুতরাং উহারা বলবীর্য্যে, আয়ুষ্মত্তায় এবং বুদ্ধিমত্তায় হীন ছিল।

কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্র, উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। বিজ্ঞান বলেন, যাহার যেরূপ পরিবৃতি সে ক্রমশঃ সেই পরিবৃতির যোগ্য হইয়া আইসে। পরিবর্ত্তন হইলেই যে উৎকর্ষ হয়, এমন কথা বিজ্ঞানে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, যে প্রকার খর্ব্বকার, দুর্ব্বলাস্থি, এবং ক্ষুদ্র-করোটি-বিশিষ্ট মনুষ্যের কঙ্কাল প্রস্তর যুগের বলিয়া পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ আকার প্রকারের মনুষ্য এখনও পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে। তৃতীয়তঃ, অতিবৃহৎ-শরীর ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও বৃহত্তর শরীরের কঙ্কাল অতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেরও কোথাও কোথাও পাওয়া গিয়াছে। চতুর্থতঃ, পর্য্যটকেরা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন কোন ভাগে ইউরোপীয়দিগের হইতেও বৃহত্তর শরীর সম্পন্ন লোক সকল এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যশরীরের ক্রমোৎকর্ষশীলতার যে বৈজ্ঞানিক মূল বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, সেরূপ কোন বৈজ্ঞানিক মূলই বাহির হয় নাই। প্রত্যুত অতি ঘোর পরিণামবাদী একজন ইউরোপীয় দার্শনিক ইহার বিপরীত মতবাদই খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এইরূপ।—"অপরাপর প্রাণিশরীর যেরূপে পরিণত হইয়া কাহারও কশেরুর সংখ্যার বৃদ্ধি, কাহারও বা কশেরুর দীর্ঘতা বৃদ্ধি, কাহারও বা এক-শফত্ব গিয়া দ্বি-শফত্ব, কাহারও বা অঙ্গুলির উদ্গম, কাহারও বা দন্ত লোমাদির বিলোপ, কাহারও বা পক্ষোদ্গম, কাহারও বা চর্ম্মাবরণ হইতে শল্কসম্ভূতি ইত্যাদি ইত্যাদি পরিণতি ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, মনুষ্যদেহপ্রাপ্ত জীবনের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহাই হউক, কিন্তু ঐ দেহ প্রাপ্তির পর হইতে আর তেমন কিছু হয়ও নাই, হইতে পারেও না। কারণ মনুষ্যের মস্তিষ্ক বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত বুদ্ধির প্রাখর্য্য, এতদূর জন্মিয়া গিয়াছে যে, পরিণতির পথ ঐ দিকেই অর্থাৎ মস্তিষ্কের অন্তশ্চক্রের বৃদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি সম্বর্দ্ধনের দিকেই, উন্মুক্ত হইয়াছে; সুতরাং দেহের সম্বন্ধে পরিণতি একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" অতএব অতি ঘোর পরিণামবাদীও বলিতে পারেন না যে মস্তিষ্কভাগ ভিন্ন মনুষ্যশরীর উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বা করিতে পারে। যত দিন যায়, মনুষ্য ততই শারীরিক উৎকর্ষ-লাভ করে এরূপ কোন নিয়ম বিজ্ঞানে নাই।

ক্রমোৎকর্ষের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন বটে যে, নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন মিসরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে ওরূপ কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমে ধর শারীরিক বলবীর্য্য;—সে সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সকল প্রাচীন জাতীয়দিগের সৈনিকেরা অতি গুরুভার বর্ম্ম এবং অস্ত্রাদি ধারণ করিত এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে প্রত্যহ বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ চলিতে পারিত। নব্য ইউরোপীয় সৈনিকেরাও উহা অপেক্ষা অধিক পারে না। নব্য

ভারতবর্ষীয় সৈনিকেরাও তাহাই পারে। অথচ এখনকার ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা বলবীর্য্যে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে করেন না। কখন শুনা যায় নাই যে, ইংরাজের গোরা ফৌজ, সিপাহীদিগের অপেক্ষা অধিক বেগে বা অধিক দূর পর্য্যন্ত গিয়া সিপাহীদিগকে পাছু ফেলিয়াছে। সেনাপতি লেক সাহেব কোন সময়ে বড়ই দৌড়কুচ করিয়াছিলেন—গোরা এবং সিপাহী বরাবর এক সঙ্গে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গসৌষ্ঠব ;—সে বিষয়েও বলিতে পারা যায় যে প্রাচীন জাতীয়দিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোপীয়েরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই। প্রত্যুত যদি গ্রীকজাতীয়দিগের চিত্রপট এবং ভাস্করীয় মূর্ত্তি তজ্জাতীয় লোক সকলের শরীরাদর্শ হইতে জন্মিয়াছে মনে করা যায়, এবং তাহা করাই ন্যায্য, তাহা হইলে নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন গ্রীকদিগের অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠবে কমিয়াছেন বই বাড়েন নাই। তাহার পর বুদ্ধিমত্তার কথা ; —সে বিষয়ে তুলনা করিতে গেলে মনে রাখা আবশ্যক যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে, সমাজ সংঘটনে, গ্রন্থাদি বিরচনে এবং অন্যান্য প্রকারে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট রচনাই বুদ্ধিমত্তার স্থায়ী এবং উচ্চতম আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক প্রভৃতির রচনাপ্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে নব্য লেখক মাত্রের আদর্শ হইবার যোগ্য এবং তাহাই হইয়া আছে। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয় ;—এ বিষয়ে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক তন্ন তন্ন করিয়া বিচার পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালের অপেক্ষা এখনকারের লোকেরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তখনকার লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় এত উচ্চ হইয়া উঠিতেন যে, এখনকার অত্যুচ্চ ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের সমকক্ষরূপে গণ্য নহেন। তাঁহার মতে প্লেটো আরিস্টটল আর্কিমিডিস এবং আণ্টনাইনসের সমান লোক নব্য ইউরোপে জন্মে নাই, আর জন্মিতে পারেও না ; কেন না তখনকার শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ হইত; এখনকার শিক্ষা ঐকদেশিক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যে সামান্য একটু শিক্ষার বাহুল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহাদের স্বভাবের উন্নতি বা ধর্ম্মের বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই।

অতএব কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কেহই দেখান না যে, নব্য ইউরোপীয়েরা মনুষ্যজাতির যেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কথা বলেন সেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কোন নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। এক্ষণে সমাজতত্ত্ব, অথবা ইউরোপীয় মতে সমাজতত্ত্বের অস্থিকল্প বার্ত্তাশাস্ত্র বলেন, সমাজবন্ধন যত দৃঢ় হয়, সমাজ মধ্যে শ্রমবিভাগের নিয়ম ততই

বিস্তৃত হইয়া উঠে, এবং সেইজন্য সমাজের কতক লোক দৈহিক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু গতানুগতিকতা ও অর্থলোভ, আর বিভিন্ন সমাজের পরস্পর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন শ্রমবিভাগের শুভময় ফল যে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব তাহা শ্রমজীবীদিগের ভাগ্যে কিছুই ফলে না। দেখ ইউরোপে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার কি ফল হইয়াছে? যে শ্রমবিভাগের গুণে প্রথমাবস্থায় অবসরলাভ, বিদ্যাচর্চ্চার উপায়, এবং ধনের বৃদ্ধি হইয়াছে, পরে সেই শ্রমবিভাগেরই প্রভাবে মানুষ একেবারেই অবকাশ-শূন্য, জ্ঞানচর্চ্চায় অশক্ত, মনুষ্যত্ববিহীন যন্ত্র স্বরূপ এবং কতকগুলি লোক অপরিসীম ধনী এবং অধিকাংশ লোক সর্ব্বতোভাবে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ ভীষণ বৈষম্য হইতে অতি তীব্র অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষের অবশ্যম্ভাবী ফলে সমাজের উপপ্লব আসন্ন হইয়াছে। যাহাতে সমাজের বৃদ্ধি, তাহা হইতেই উহার যেন বিনাশেরও সূত্রপাত হইতেছে। অতএব প্রাকৃতিক কার্য্যের অপরাপর সকল স্থলে যে লক্ষণ, * মনুষ্যের সমাজতত্ত্বেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান। সৃষ্টিশক্তি স্থিতিশক্তি এবং লয়শক্তি—এ তিনটি বিভিন্ন শক্তি নয়—এক শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সুতরাং কোথাও ঋজু রৈখিক পথ নাই—সর্ব্বস্থলেই বৃত্তাকার পথ, চক্রনেমির পরিবর্ত্ত।

অতএব বিজ্ঞানশাস্ত্রও যেমন ক্রমোৎকর্ষের নিয়ম দেখায় না, তেমনি ইতিহাসও তাহা দেখিতে পায় না, এবং ইউরোপীয় বার্ত্তাশাস্ত্র তাহার বিপরীত ভাবই প্রদর্শন করে—মনুষ্যের ক্রমোৎকর্ষের পথটিকে বিলক্ষণ বক্র হইয়া অপকর্ষে পরিণত হইতে দেখায়।

---

* বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে ক্রমে বীজ দেখা দেয়, কিন্তু যে প্রাকৃতিক কার্য্যের মাহাত্ম্যে বীজ অঙ্কুর রূপে এবং অঙ্কুর বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, অবিকল সেই প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রভাবেই বৃক্ষ অন্তঃসারশূন্য, শুষ্কমূল এবং পতনপ্রবণ হয়; যে প্রাকৃতিক কার্য্য শিশু-শরীরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার দেহযষ্টিকে দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে এবং যৌবনকালের শোভায় বিভূষিত এবং প্রৌঢ় বয়সের বলে বলীয়ান করিতেছে, অবিকল সেই প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রভাবেই বৃদ্ধ বয়স আসিতেছে এবং অস্থি কঠিন, স্থিতিস্থাপকতাশূন্য এবং ভঙ্গপ্রবণ হইতেছে। পৃথিবীর এবং অপরাপর গ্রহনক্ষত্রাদির যে তাপবিকিরণ গুণে জীবনশালিতা ও জীবনোপযোগিতা জন্মিতেছে সেই তাপবিকিরণ গুণেই উহারা চন্দ্রাদি উপগ্রহের ন্যায় শীতল জলবিহীন, বায়ুবিহীন ও জীবশূন্য হইতেছে।

পাশ্চাত্য ভাব—উন্নতিশীলতা

২

তবে কি মনুষ্যজাতির ক্রমোৎকর্ষের কথা সর্ব্বতোভাবেই মিথ্যা—ঐ কথার কি কোন মূলই নাই ?—আমার বোধ হয় উহা নিতান্ত অমূলক নয়। প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থ হইতে মনুষ্যের একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রকৃতির অপর কোথাও পরিস্ফুট আত্মবোধ নাই—মানুষে সেই আত্মবোধ এবং তজ্জনিত একটি চেষ্টাশক্তি * আছে। অতএব প্রাকৃতিক কার্য্যের সর্ব্বস্থলে যে চক্রনেমি ক্রম দেখা যায় যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম সম্ভবে, তাহা মানুষের কার্য্যে, এবং তাহা মানুষের ঐ আত্মবোধজনিত বিশেষ চেষ্টাশক্তিব যথাযথ প্রয়োগেই জন্মিতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত বার্ত্তাশাস্ত্রীয় সূত্রে ঐ আত্মবোধজনিত বিশেষ চেষ্টাশক্তির প্রয়োগে কি হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। যদি ইউরোপীয়েরা মনে করেন যে শ্রমবিভাগের এবং যন্ত্রাদি প্রয়োগের শুভময় ফলই ফলাইব, ইহার অশুভ ফল ফলিতে দিব না, তাহা হইলে তাঁহারা সমুদয় পৃথিবীময় বল ছলের প্রয়োগে আপনাদেব শিল্পজাত বেচিয়া বেড়াইবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বদেশেব ব্যবহারের ও সরল বাণিজ্যের জন্য যাহা উপযোগী সেই পরিমাণমাত্র শিল্পজাত প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে পৃথিবীর অপরাপর লোকেও উদ্বেগ পায় না এবং তাহাদিগের কারিগরেরাও দুই চারি ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করিয়া অব্যাহতি পায়; এবং অবসরকালটি বিদ্যার চর্চ্চায় নিযুক্ত করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্ব সাধন করিতে পারে। চীনীয় মহামহোপাধ্যায় মেনসিয়স্ এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের ক্রমোন্নতি সংযম এবং ধর্ম্মের পথে, লোভ এবং অধর্ম্মের পথে নয় অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে চিরস্থায়ী উন্নতি হয় না। প্রবৃত্তি যদি নিবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে যে উন্নতি জন্মে তাহা স্থায়ী হইতে পারে।

বস্তুতঃ মনুষ্যের ক্রমোন্নতির নিয়ম যাহা আছে তাহার পথ একমাত্র মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব বিচারের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইতে পারে। মনুষ্য অনেকগুলি সমপ্রকৃতিক বস্তু দেখিয়া তাহাদিগের সকলগুলির গুণবিশিষ্ট এবং সকলগুলির দোষবিরহিত একটি চিত্তাদর্শ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন। শুদ্ধ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন

---

* আত্মবোধ বিকাশের সাক্ষাৎ ফল কি তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

এমত নহে। সেই চিত্তাদর্শের প্রতি তৎ-স্রষ্টা মনুষ্যের প্রীতিও জন্মে, আর সেই প্রীতিও বহুকাল বন্ধ্যা থাকে না, প্রায়ই সে চিত্তাদর্শের অনুরূপ বাহ্য ব্যাপারের জননী হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিনির্ম্মিত ঐরূপ অনেকগুলি চিত্তাদর্শ প্রত্যক্ষীভূত হইলে, আবার তাহাদিগের প্রত্যেকের হইতে উৎকৃষ্টতর একটি চিত্তাদর্শ জন্মে। সেরূপ আদর্শের অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া গেলে, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর আদর্শ জন্মিয়া যায়। এইরূপ বহুকাল ধরিয়া চলিতে পারে এবং তাহা চলিলেই ক্রমোৎকর্ষের পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু এই কথার প্রতি একটি প্রতিবাদ আছে। মানুষের উৎকর্ষবোধটি সকল সময়ে একরূপ থাকে না। সুতরাং অবস্থাভেদে চিত্তাদর্শের প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া যায়, এবং যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট তাহাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ না হইয়া অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্তুকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষার কোন সমীচীন উপায় নাই। তবে যাহা যাহা পূর্ব্বাগত তাহার প্রতি দৃঢ়ভক্তি এবং যাহা অভিনব তাহাকে সেই পূর্ব্বাগতের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে তুলনা করিয়া দেখিলে চিত্তাদর্শের হঠাৎকারে অপকর্ষ জন্মিতে পারে না।

ইহাকেই রক্ষণশীলতা বলা যায়, এবং এই কার্য্যটি সংস্কারকার্য্য হইতে স্বল্পতর যত্নসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটিকে আরও কিছু স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিব। এখনকার ভাগ্যবান লোকদিগের বৈঠকখানায় গিয়া দেখ, প্রায়ই দেখিতে পাইবে, ইউরোপজাত বেলজিয়ান গালিচা সকল বিছান আছে। কিন্তু ওগুলি কি পারস্যদেশজাত গালিচার সমতুল্য, না জব্বলপুর নগরেও যে গলিচা সকল প্রস্তুত হইতেছে সেগুলির সমান? বাস্তবিক বেলজিয়ান গালিচা জব্বলপুরী গালিচা হইতেও শতগুণে নিকৃষ্ট। এইজন্য যে-বাটীতে ঐ উৎকৃষ্টতর বস্তু দুই একখানি থাকে, সেখানে বেলজিয়ান্ গালিচার প্রবেশ হইতে পারে না। সেখানে গৃহস্বামীর সঙ্গতিবৃদ্ধির সহিত পারস্য অথবা জব্বলপুরী গালিচারই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

উচ্চতর বিষয় লইয়া আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। যে বাটীতে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা থাকে, যেখানে গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রীর চিত্তক্ষেত্রে, শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর চিত্ত স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া আছে, সে বাটীর ছেলেরাও ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজকে আপনাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করিতে পারে না। কারণ তাহাদিগের চিত্তাদর্শ ইংরাজপ্রদর্শিত সকল আদর্শ অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর।

তবে কি প্রাচীন আদর্শই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলে মনুষ্যের উন্নতির পথ মুক্ত থাকে? তাহাও নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিবেচনা পূর্ব্বক অথবা অনুকৃতিপরবশ

হইয়া পরিত্যাগ করিলেই দোষ। যদি কোন নূতন ভাব আইসে, তাহা ঐ প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। যদি ঐ ভাব তাহাতে সম্মিলিত করিলে পূর্ব্ব চিত্তাদর্শের জ্ঞানচক্ষে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়, তবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ উহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। বাল্মীকিকর্ত্তৃক চিত্রিত শ্রীরামচন্দ্রচরিত্র ভবভূতির হস্তে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বিভিন্নজাতীয় লোকের সভ্যাবস্থাব প্রকারভেদ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা কোন জাতিকে নিকৃষ্ট সভ্যাবস্থ বলেন, কাহাকেও বা অসম্পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ সভ্যাবস্থ বলেন, কাহারও সভ্যাবস্থা স্থগিতগতি বলেন, আবার কাহাবও অর্থাৎ আপনাদিগেব সভ্যাবস্থাকে উন্নতিশীল বলেন। বিভিন্নজাতীয় লোকের সভ্যাবস্থার এরূপ ইতর-বিশেষ কি জন্য জন্মে, এই প্রশ্নেব উত্তরও নানাবিধ হইয়াছে। কোন ইংবাজ গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, সংশয়বাদেব বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার উন্নতি, শ্রদ্ধাভক্তিব বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার অবনতি! একজন মার্কিনজাতীয় বলিলেন, সাম্য রক্ষাতে সমাজেব সভ্যাবস্থা বর্দ্ধিত হয়, বৈষম্য দেখা দিলে উহার অবনতি জন্মে! একজন ফরাসী গ্রন্থকর্ত্তা বলিলেন, শান্তিরক্ষাপূর্ব্বক উন্নতির দিকে অগ্রসব হইবার চেষ্টা কবাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এ কথাটি বেশ বটে; কিন্তু কিরূপে ঐ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে তাহার কোন উপদেশ ইউরোপীয় পণ্ডিত দেন নাই।

ইউবোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গ বিভিন্ন প্রকার সভ্যাবস্থাব যে বিবিধ নামকবণ করিয়াছেন সেই নামগুলি হইতে কি প্রকৃত তাৎপর্য্যের বোধ হওযা উচিত তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহা না করিলে ওগুলি কেবল কথাই থাকিয়া যায়। আমার বিবেচনায় কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতির উপর সভ্যতার তারতম্য বিচার করা অবিধেয়। কেহ মনোমধ্যে একটি উচ্চ আদর্শ গঠন করিয়া অথবা প্রাপ্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় প্রবেশ করিল। তাহার মনে যদি ঐ আদর্শ ই প্রোজ্জ্বল থাকে অথবা উহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ প্রস্তুত হয় এবং তৎপ্রতি প্রীতির খর্ব্বতা না হইয়া তৎসাধনচেষ্টা প্রবল থাকে তবে সে ব্যক্তি উন্নতিশীল হইয়া উঠে। যদি আদর্শ অপকৃষ্ট হয় অথবা মনটি ভিন্ন দিকে প্রধাবিত হওয়াতে উহার প্রতি স্থির লক্ষ্য না থাকে কিম্বা কোন কারণে চেষ্টাশক্তির হীনতা হইয়া যায় তবে সে ব্যক্তি উন্নতিশীল থাকে না, সামান্য লোকের মত পশুজীবন ধারণ করে অথবা দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া পৈশাচিকবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

সমাজ সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ হইতে দেখা যায়। গ্রন্থাদি হইতে, বিশেষতঃ

ধর্ম্মগ্রন্থ সকল হইতে আদর্শ নরনারীর চিত্রগুলি বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। ঐ সকল আদর্শ যাহার যত উৎকৃষ্ট সে জাতির উদ্দেশ্য তত উচ্চ হইয়া থাকে। ঐ আদর্শগুলির প্রতি যে জাতির যেমন শ্রদ্ধাভক্তি সে জাতি তত ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়। ঐ আদর্শগুলির অনুরূপ হইবার জন্য যে জাতীয় লোকের যত চেষ্টা, সে জাতি তত উন্নতিশীল হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জাতীয় চিত্তাদর্শের উৎকর্যাপকর্ষ লইয়া বিচার করিলেই শ্রেণীবিভাগ অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে। যথা—

(১) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ অল্পসংস্কৃত সে জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থা হীন।

(২) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শের উৎকর্ষ আংশিক সে জাতির সভ্যাবস্থাও পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইতে পারে না। তাহার সভ্যাবস্থা আংশিক।

(৩) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ সুসংস্কৃত তাহাদিগের সভ্যাবস্থা উৎকৃষ্ট।

(৪) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ অপরের সংস্রবে বা অন্য কারণে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার সভ্যাবস্থা উন্নতিশীল।

(৫) যাহার চিত্তাদর্শ সমভাবাপন্ন থাকিলেও তৎপ্রতি অনুরাগ এবং তাহার সাধনচেষ্টা থাকে, সে জাতির সভ্যাবস্থা সজীব।

(৬) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ সমভাবাপন্ন কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ ন্যূন হইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতনপ্রবণ।

(৭) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা মলিন হইয়া যাইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতনশীল।

(৮) যে জাতির চিত্তাদর্শ সুসংস্কৃত এবং তৎপ্রতি অনুরাগও বলবান কিন্তু তাহার সাধনচেষ্টা কম, সে জাতির সভ্যাবস্থা উৎকৃষ্ট কিন্তু স্থগিতগতি।

জাতীয় চিত্তাদর্শের উৎকর্ষ এবং পূর্ণতার তারতম্য, তৎপ্রতি অনুরাগের তারতম্য এবং তৎসাধনচেষ্টার তারতম্য এই তিনটি তারতম্যের বিচার করিয়া জাতীয় সভ্যাবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। কেহ আপনাকে উন্নতিশীল বলিলেই সে উন্নতিশীল ইহা প্রমাণ হয় না।

ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের আদর্শ বলিয়া যদি যীশু এবং মেরিকে ধরা যায়, তবে বলিতে হয়, আদর্শ দুইটি অতি অসম্পূর্ণ। যীশু এবং মেরির প্রতি ইউরোপীয়দিগের যে এখন আর বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি আছে তাহাও বোধ হয় না। উঁহাদিগের জীবন অনুকরণীয় বলিয়া ইউরোপীয়দিগের কখনই বোধ হয়

নাই। কেমন করিয়াই বা হইবে? যীশুর জীবনযাত্রা তাঁহার যৌবনদশাতেই নিঃশেষিত, তাঁহার বিবাহ নয় নাই। কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করেন নাই। তাঁহারা জীবনবৃত্ত সাধুশীলের জীবন বটে, কিন্তু কোন গৃহস্থাশ্রমী সামাজিকের আদর্শীভূত হইতে পারে না। যীশুর জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ একান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া ইউরোপীয়দিগের কোন পবিত্র-জীবনাদর্শ নাই। তাঁহারা লোভাদি রিপুবর্গের বশ। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টাশক্তি অতি প্রবলা, সুতরাং তাঁহাদের সভ্যতা অসম্পূর্ণ হইলেও অতি ত্বরিতগতি। নরজীবনের উচ্চচিন্তাদর্শ না থাক, দ্রব্যসামগ্রী সম্বন্ধে উচ্চচিন্তাদর্শ তাঁহাদের আছে এবং দ্রব্যসামগ্রী গঠন করায় তাঁহাদের ক্ষমতা কম নয়। এই জন্য বাহ্যদৃষ্টে উঁহাদের সভ্যাবস্থা যে কোন্ শ্রেণীর তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আচারব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি আসল জিনিসের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে, ইউরোপে সভ্যাবস্থা পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ সূত্রের অন্তর্গত। উহা আংশিক ও পতনপ্রবণ।

হিন্দুজাতিসাধারণের আদর্শ নর নারী শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা। হিন্দুজাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং শিরোভূত ব্রাহ্মণদিগের আদর্শ মহর্ষি বশিষ্ঠ। ঐ আদর্শগুলির অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীর আর কোন দেশে কোন কালে সৃষ্টি হইয়াছে কি? কোথাও হয় নাই। অতএব হিন্দুর সভ্যাবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই অবধারিত হইল। হিন্দুর হৃদয় হইতে ঐ আদর্শের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার কিছু হ্রাস হইয়াছে কি? কিছুই হ্রাস হয় নাই। অতএব হিন্দুকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। হিন্দু আপনাপন কার্য্যে ঐ আদর্শের অনুকরণের চেষ্টা করেন কি? আমার বোধ হয় আজ কাল অতি অল্পই করেন। হিন্দুর চেষ্টাশক্তির খর্ব্বতা হওয়াতে হিন্দু অতি উৎকৃষ্ট সভ্যাবস্থ এবং পরম ধর্ম্মশীল হইলেও তাহার সভ্যাবস্থা স্থগিতগতি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যাবস্থা অষ্টম সূত্রের অন্তর্গত; অর্থাৎ উহা উৎকৃষ্ট কিন্তু স্থগিতগতি। কিন্তু কোন সমাজই স্থগিতগতি হইয়া অধিক কাল থাকিতে পারে না। হয় চতুর্থ বা পঞ্চম সূত্রের অন্তর্গত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে নচেৎ ষষ্ঠ বা সপ্তম সূত্রের অন্তর্গত হইয়া হীন হইয়া যায়।

মুসলমান জাতিদিগের সম্বন্ধে দেখা যায় যে মহম্মদ এবং আয়েসা অথবা আলি এবং ফতেমার চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর ন্যায় পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ না হইলেও ঐ চরিত্রগুলিতে অনেকটা উৎকর্ষ আছে। অতএব তাঁহাদের সভ্যতাও উচ্চ সভ্যতা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ঐ আদর্শ চরিত্রের প্রতি মুসলমানদিগের প্রীতিভক্তিও অতি তেজস্বিনী এবং তাঁহাদের চেষ্টাশক্তিও নিতান্ত অল্প নয়। এই সকল কারণে

মুসলমানজাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা পঞ্চম সূত্রের দ্বারা বিচার্য্য—উহা সজীব।

বৌদ্ধজাতীয়দিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে জাপানীয়েরা ইউরোপীয়ের সংসর্গে ও অনুকরণে চিত্তাদর্শ ছোট করিয়া ফেলিতেছে। জাপানীয় সকলেই একবাক্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এরূপ কথাও উঠিতে পারিয়াছে! চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও এখন আর বুদ্ধদেবের উন্নত চরিত্র অবিকৃতভাবে চিত্তাদর্শ স্বরূপ নাই! সুতরাং বৌদ্ধজাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা তৃতীয় ও সপ্তম সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কিন্তু পতনশীল।

যদি কেহ মনে করেন যে, ক্রমোৎকর্ষের যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা সমাজগত নহে, শুদ্ধ ব্যক্তিগত, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক যে, প্রতি ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সূত্র খাটে, ব্যক্তিসমষ্টি সমাজের সম্বন্ধেও সেই সূত্র অবশ্য খাটিবে। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পথ। সামাজিক ব্যবস্থায় শান্তির প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, উন্নতির চেষ্টা ব্যক্তিগত করিতে হয়। ব্যক্তিগত উন্নতি কিয়ন্মাত্রায় উঠিলেই সমাজ আপনা হইতে উন্নত হইয়া উঠে।

উপসংহারে বলি। সমাজ মনুষ্যের সম্মিলন-জাত। সুতরাং অন্তঃসম্মিলন যত দৃঢ় হইবে সমাজ ততই সবল হইবে, এবং উহার ক্রিয়াশক্তিও ততই বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে সহানুভূতির বৃদ্ধি হইতে, সম্মিলন বাড়ে স্বার্থত্যাগ হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে। অতএব যেখানে যতদিন যতদূর ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ততদিন ততদূর সমাজেরও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে থাকে। সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুদ্ধ কল কৌশলের সৃষ্টিতে হয় না, শুদ্ধ সস্তা দরে উপভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারিলেও হয় না, আর আত্মমুখে আত্মগরিমা খ্যাপন করিলেও হয় না। যে সমাজে মনুষ্যের চিত্তাদর্শ যত উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্তি এবং তৎসাধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত চেষ্টা, সে সমাজ সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সভ্যাবস্থ, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং উন্নতিশীল।

পাশ্চাত্য ভাব—সাম্য

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদয় দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কতকগুলি ধর্ম্মপ্রণালীর মূল, প্রকৃতির পর্য্যালোচনা। এই গুলিকে প্রকৃতিমূলক বা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলা যায়। অপর কতকগুলি মনুষ্যমনের ভাব-

পর্য্যালোচনা হইতে সম্ভূত। এইগুলিকে ভাবমূলক বা ভাবিক বলা যায়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরব্রহ্মে মানুষের আত্মত্বারোপ অল্প হয়, ভাবমূলক ধর্ম্মে ঐরূপ আত্মত্বারোপ অধিক হয়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরব্রহ্ম নির্গুণ—অর্থাৎ তাঁহাতে দয়া, মমতা, ক্রোধ প্রভৃতি মনুষ্যহৃদয়ের ভাবসকল আরোপিত হয় না। ভাবমূলক ধর্ম্মে পরব্রহ্ম সগুণ—অর্থাৎ মনুষ্যহৃদয়ের যাবতীয় পরস্পর সাপেক্ষ ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষপথ, ভাবমূলক ধর্ম্মে ভক্তিই মুক্তির উপায়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ভাবমূলকধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম কঠোর, ভাবমূলক ধর্ম্ম কোমল। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে একমাত্র কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া সুখপ্রাপ্তির এবং দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিতে হয়। ভাবমূলক ধর্ম্মে উপাসনার পথ সুবিস্তৃত, ইহাতে অনুগ্রহের আশা এবং নিগ্রহের ভয় করিতে হয়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে স্বর্গনরকাদি সুখদুঃখব্যঞ্জক পদার্থ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধমূলক কর্ম্মফল-ভোগ মাত্র। ভাবমূলক ধর্ম্মে উহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সমুদ্ভূত। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে দুষ্কৃতি করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় দুঃখ। ভাবমূলক ধর্ম্মে দুষ্কৃতির সাক্ষাৎ ফল হয় ঐশ বিরাগ এবং সেই বিরাগের ফল হয় দুঃখ। ফলকথা, প্রাকৃতিক ধর্ম্মে কারণ ও কার্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী সংকল্প-বিকল্পাত্মক ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। * "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা ?" ভাবমূলক ধর্ম্মে তাদৃশ ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরমাত্মার অপাপবিদ্ধত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হয়। ভাবমূলক ধর্ম্মে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ ব্যাখ্যাত হয়।

ধর্ম্মপ্রণালীর এই মৌলিক ভেদ যদিও খুব স্পষ্ট এবং কোথাও কখন সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় না, তথাপি উভয় প্রণালীই যেন কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর সম্মিলনপ্রবণ বলিয়া বোধ হয়। সকল প্রকার প্রাকৃতিক ধর্ম্মেই পরমাত্মার অবতার অথবা তাদৃশ কোন পদার্থের স্বীকার আছে। আবার ভাবমূলক ধর্ম্মেও ঈশ্বরস্বভাব মনুষ্যের আত্মত্বারোপ যে অন্যায্য এবং অবৈধ তাহাও মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালীতে যে অবতারাদি স্বীকৃত হয়, তাহার মূল, ধর্ম্মনীতির অনুরোধ মাত্র। ধর্ম্মনীতি দেখেন যে, শুদ্ধ বিধিনিষেধের দ্বারা যে কার্য্য হয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর ফললাভ হয়। এই জন্য যেন ধর্ম্মনীতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই প্রাকৃতিক ধর্ম্মগ্রন্থে অবতারাদির অবতারণা

* God is, but he is not the Christian God, He is not the arbitrary dispenser of grace.—Mazzini

হইয়া থাকে। ভাবমূলক ধর্ম্মে যে ঈশ্বরে মনুষ্যের আত্মত্বারোপ পরিত্যাগ করিবার কখন কখন চেষ্টা হয় তাহার কারণ সত্যের অববোধ মাত্র। প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে অবতারাদির ভক্ত হইতে শিখেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের মনের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে হয়, তাঁহারা আর বিধিনিষেধের সূত্রসকল খাটাইয়া আপনাদিগের চরিত্র সংঘটন করিতে পারেন না। তাঁহাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে বুঝা যায়। ভাবমূলক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে আত্মত্বারোপ পরিহারের চেষ্টা করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের প্রকৃতি সতেজ হইয়া উঠিতেছে অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করবাদ এবং স্মার্ত্তচার যত ন্যূন হইয়া রামানুজাদি বিখ্যাত দ্বৈতবাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতি প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছে, ততই হিন্দুর চিত্তে দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতেছে। আর মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদ (সুফিমত) এবং খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও নির্গুণবাদ (আগনষ্টিক মত) যতটুকু বিস্তৃত হইতেছে, ততই উঁহাদিগের চিত্তের বল অনুভূত হইতেছে। জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে যাওয়া কিম্বা প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালী ছাড়িয়া ভাবিক ধর্ম্মপ্রণালীতে পদার্পণ করা, ইহা উন্নতির চিহ্ন নয়, অবনতির লক্ষণ।

অতএব স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালী ভাবিক ধর্ম্মপ্রণালী হইতে উৎকৃষ্টতর। কিন্তু একটি স্থলে আপাতদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালী হইতে ভাবমূলক ধর্ম্মপ্রণালী যেন উৎকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হয়। ঐ স্থলটি সাম্যবাদ বিষয়ক এবং তাহাই এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়।

জগতের কোথাও সাম্য নাই। গাছের একই ডালের দুইটি পাতাও পরস্পর সমান হয় না। একটি বালুকারেণুও অপর কোন বালুকারেণুর সমান নয়। একটি বৃষ্টিবিন্দুও অপর কোন বৃষ্টিবিন্দুর সমান নহে। জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতে মনুষ্যহৃদয়ে সাম্যজ্ঞানের উদ্বোধ হইয়া যায়। গাছের দুইটি পাতা লইয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একটি যদি অপরটি হইতে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন না হইত, তাহা হইলেই দুইটিতে ঠিক সমান হইত। সাম্যজ্ঞান এইরূপ প্রত্যক্ষীভূত সাদৃশ্যমূল হইতে জন্মিয়া সাদৃশ্যবোধ হইতে ভিন্ন অপর একটি ভাবরূপে লক্ষিত হয়।

ভাবমূলক ধর্ম্মপ্রণালীতে এই সাম্যবোধের বিলক্ষণ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। মানুষের হৃদয়-সম্ভূত-সাম্যভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া শুদ্ধ জগৎকার্য্যের মীমাংসায় গোলযোগ বাধাইয়া দেয় এমত নহে, ঈশ্বরকেও যেন বিচারের অধীন

করিয়া তুলে। সেই জন্য ভাবিকদিগকে অনেক কষ্টকল্পনা করিয়া মনুষ্যের সমীপে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষের পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার ন্যায়পরতা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে হয়। সাম্যভাবের আরোপ নিবন্ধন, ঈশ্বর এমন করিলেন কেন, ঈশ্বর তেমন করিলেন কেন, এতে আর ওতে এত পৃথক করিলেন কেন, এইরূপ প্রশ্ন-সকলের দ্বার অবারিত হইয়া থাকে, এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভাবিকগণকে ঈশ্বরের সকল অভিপ্রায় কল্পনাবলে জানিয়া রাখিতে হয়।

সাম্যভাবের আরোপ নিবন্ধন ধর্ম্মবিচারে এই সকল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু সাম্যবাদীরা বলেন, উহার দ্বারা জনসমাজে সমূহ উপকার দাশয়াছে। মানুষে মানুষে সমান, এই ভাব হইতে পরপীড়নের হ্রাস হইয়াছে, সাধারণের অবস্থার উৎকর্ষ-সাধন-চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, সকলের হৃদয়ে আপনাপন উন্নতির আশা প্রদীপ্ত হইয়াছে, এবং সমাজের চেষ্টাশক্তি জাগরিত হইয়াছে। সাম্যবাদের যে কতকটা ঐরূপ শুভ ফল আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, এবং উহার ঐ সকল শুভ ফল আছে বলিয়াই দুঃখজীবী জনসাধারণের কর্ণে সাম্যবাদ বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়। উহা এত মধুর যে, যথায় উহা সত্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সেই ইংরাজের মুখেও আজিকালি ভারতবাসীর মনোহরণ করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সাম্যবাদের যেমন এক কক্ষে পীড়ননিবারণ-প্রবণতা আছে, উহা তেমনি পক্ষান্তরে দয়াবৃত্তির সংকোচপ্রবণ। যেমন সকলের মনে স্ব স্ব উন্নতি বিষয়ক আশার আলোক প্রকাশ করিতে পারে, তেমনি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ এবং দুরাকাঙ্ক্ষার অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্র দগ্ধ করিতে থাকে। যেমন সমাজে অধ্যবসায় বর্দ্ধিত করে, তেমনি সন্তোষাদি গুণের বিলোপ করিয়া দেয়।

সাম্যবাদ হইতে সমাজের মধ্যে আর এক প্রকারে অসন্তোষ এবং অসুখের কারণ উপস্থিত হয়। মুখে যিনিই যাহা বলুন, সামান্যতঃ মানুষ মানুষের অপেক্ষা বড় হইতে চায়। অতএব একপক্ষে সাম্যধর্ম্ম পালন, পক্ষান্তরে অন্য মানুষ অপেক্ষা আপনি বড় হইবার প্রয়াস, এই দুয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়া উঠে না। সাম্যবাদটা কথায় মাত্র থাকে, ব্যবহারে বড়ই বৈষম্য উপস্থিত হইয়া যায়। যে সমাজে সাম্যের ভান নাই, সে সমাজে বৈষম্য রক্ষার জন্য নিরন্তর যত্নও অধিক নাই। মার্কিনেরা চাকরদিগকে চাকর বলেন না, সহায় বা সাহায্যকারী বলেন, কিন্তু মার্কিনদিগের ধনবত্তার গৌরব ইংরাজদিগের অপেক্ষাও অধিক। ইংলণ্ডে তবু কতকটা বংশ-মর্য্যাদা আছে, আমেরিকায় ধন ভিন্ন আর কিছুরই মর্য্যাদা নাই। বিদ্যার গৌরবও

অতি অল্প। ভাবিক সাম্যবাদটা যেমন অপ্রকৃত বস্তু তেমনি উহা কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য। ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ—দাস নিয়োগ। মুসলমানেরা সাম্যবাদী, কিন্তু উহাদের কেনা গোলাম থাকে। খ্রীষ্টান জাতীয়েরা সাম্যবাদী, কিন্তু অল্পকাল গত হইল উহাদেরও সকলের দাস রাখা ছিল। সম্প্রতি দাস রাখিবার প্রথাটা অনেক উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহা বাকী আছে তাহাও উঠিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহা উঠাইবার কারণ সাম্যবাদ নয়। বার্ত্তাশাস্ত্রের একটি সূত্র এই যে, দাসদিগের শ্রম অধিক ব্যয়সাধ্য। ইউরোপীয় সমাজে শ্রমজীবী লোকেরা যে অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে দাস অপেক্ষা উহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য ন্যূন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সাম্যবাদের সম্মিলন হওয়াতেই, দাস-ব্যবসায় বর্জ্জন সম্বন্ধে সাম্যবাদ কার্য্যকারী হইতে পারিয়াছে।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মেও সাম্যবাদ আছে। কিন্তু সে সাম্যবাদ অতি ঘোরতর বস্তু। প্রকৃতিক সাম্যবাদ মৌলিক একত্ববোধ মূলক। উহা নিবিষ্টচেতা-জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে স্বতঃই উদ্ভূত হয়। উহা সমস্ত জগৎকে একেরই বিভূতি স্বরূপে প্রতীয়মান করিয়া কোথাও কোন মৌলিক ভিন্নতা লক্ষ্য করে না। প্রাকৃতিক সাম্যবাদে শুদ্ধ মনুষ্য মনুষ্যের সমান, এই কথা বলে না, সকলেই সকলের সমান, এই কথা বলে। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিতে এবং কুক্কুরেতে সেই একমাত্র শক্তি বিরাজমান দেখিয়া উভয়ের সমতা অনুভব করে, কোথাও কোন পার্থক্য দেখে না। উহা যে ভিন্নতা দেখে তাহা ব্যবহারিক ভিন্নতা এবং সংসারযাত্রার উপযোগী—পারমার্থিক ভিন্নতা অথবা কোন চিরস্থায়ী বস্তু বলিয়া মনে করে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম যে ভিন্নতা দেখে তাহা কর্ম্মপ্রসূত বলিয়া জানে এবং বল ছলাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহার উচ্ছেদ চেষ্টা অবিধেয় বলিয়া মনে করে। ভাবিক ধর্ম্ম মৌলিক একতা দেখিতে পায় না—উহা কর্ম্মসূত্রেরও তাদৃশ বিস্তৃতি অনুভব করে না—উহা সাদৃশ্য দর্শন হইতে সাম্যের ভাব মাত্র গ্রহণ করে এবং ভিন্নতার প্রতি বিরূপতাবলম্বন করাকেই ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত বলিয়া খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রাকৃতিক সাম্যবাদে মৌলিক তথ্য নিহিত এবং ভাবিক সাম্যবাদে মৌলিক সাম্য প্রকট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ বলেন সকলই মূলতঃ এক, কর্ম্ম ভেদে পৃথগ্‌ভূত। ভাবিক সাম্যবাদ প্রত্যক্ষের অপনয়ন করিয়া বলেন সকলেই জন্মতঃ সমান, সামাজিক ব্যবস্থাদির পক্ষপাত দোষে পৃথক্‌কৃত। এইজন্য প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সমাজের মধ্যে অপ্রকৃত এবং অশান্তিকর সাম্যবাদের প্রবেশ হইতে দেন না। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে সমাজের মধ্যে বড় ছোট থাকিবেই

থাকিবে। * সমাজের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সেই উচ্চাবচ ভাবটি লোকের গুণানুসারিণী করিবার জন্তই সকল সমাজে চেষ্টা হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় ব্যক্তিগত মান্তস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যক্ত হইয়াছে—

বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী
এতানি মান্তস্থানানি গরীয়োযদ্যদুত্তরং।

বিদ্যাবত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; তাহার নীচে কর্ম্মশালিতা; তাহার নীচে বয়োধিকতা; তাহার নীচে সম্পর্ক অথবা আভিজাত্য; তাহার নীচে ধনবত্তা। এই পঞ্চবিধ মান্তস্থানই সকল সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজভেদে এই পাঁচটির মধ্যে কোনটির প্রতি বিশেষ সমাদর হয়। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে নব্য ইউরোপে ধনবত্তার গৌরব বাড়িতেছে। এদেশেও ইংরাজ-সমাগম হইয়া তাহাই হইবার কতকটা উপক্রম হইয়াছে। এই তুইয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সাহজিক গুণবত্তার প্রতি বিশেষ আস্থা বশতঃ মনে করেন যে, সামাজিক বৈষম্যের ব্যবস্থা বংশমর্য্যাদানুসারিণী হওয়াই ভাল, বিভবানুসারিণী হওয়া ভাল নয়। বিভবানুসারিণী বৈষম্য যদিও চেষ্টা-শক্তির উত্তেজক, তথাপি লোভ, ঈর্ষা, শঠতা, অস্থৈর্য্য প্রভৃতি অনেকানেক দোষের আকর।

আমি দেখিয়াছি, আমাদিগের অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকর্ত্তাও সাম্যবাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় ভেদটা পরিষ্কার রূপে না বুঝিয়া যীশু এবং মহম্মদের সহিত বুদ্ধদেবকেও সাম্যবাদী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতবাদ ভাবিক নয়, প্রাকৃতিক; সুতরাং উহাতে সামাজিক সাম্যবাদের বীজ মাত্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ক্রমোৎকর্ষ ও ক্রমাবনতির নিয়ম স্বীকার করিয়া মানুষের মধ্যে সাহজিক উৎকর্ষাপকর্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধ মতবাদে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া আছে, এবং এদেশে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ করিলেই সাম্যবাদ রক্ষা করা হইতেছে বলিয়া অনেকে বোধ করেন। নব্য গ্রন্থকর্ত্তৃগণ ঐরূপ ভ্রমে পড়িয়াই বুদ্ধদেবকে সাম্যবাদীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া থাকিবেন।

যাহাই হউক, ভারতবর্ষে যে সামাজিক বর্ণভেদের ব্যবস্থা আছে, তাহার প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা অতি উদার উদ্দেশ্য

---

* সমাজের অন্তর্গত যে সাম্য তাহা কর্ত্তব্যসাধনে সম্বন্ধ অর্থাৎ কি উচ্চ কি নিম্ন-পদস্থ সকলেই আপনাপন কর্ত্তব্যসাধনে সমানরূপে বাধ্য।—ম্যাজিনি

সাধনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, জাতিভেদটা কেবল গৃহস্থাশ্রমের মধ্যেই প্রবল, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলে জাতিভেদ মানিতে হয় না। অপরাপর আশ্রমের সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশেষ এই যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহ আছে, অন্যান্য আশ্রমে বিবাহ নাই। আর একটি বিশেষ এই যে, গৃহস্থাশ্রমে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ব্যবসায় অবলম্বন আছে, অপরাপর আশ্রমে তাহা নাই। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত লোকের মধ্যে বিবাহ হইলে জাতিপাত হয়। অথচ জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অপ্রায়শ্চিত্তিক কোন দোষ হয় না। জাতিভেদ-প্রথা মুখ্যতঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রতিষেধের জন্যই প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া আছে। বিবাহপ্রতিষেধ দৃঢ়সম্বদ্ধ করিবার জন্যই খাওয়া-দাওয়ার বিষয়েও আঁটাআঁটি হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ বিবাহপ্রতিষেধক বর্ণভেদ প্রথার নৈসর্গিক কারণ আছে। উহা এদেশে অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই এখানে জন্মিয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে সে কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ধনের গৌববটা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না। জাতি ধনের আয়ত্ত নয়। স্তুতরাং যে সমাজে জাতিভেদের ব্যবস্থা থাকে, সে সমাজে ধনই সকল সম্মান ও গৌরবের আস্পদ হয় না। ধনের প্রতি লোভ যে কারণেই হউক, কিছু কম হইয়া থাকিলে সমাজ ভালই থাকে, লোকের প্রকৃত সুখও অধিক হয়।

তৃতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ভারতবর্ষেব সমুদায় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়া আছে, এবং সমস্ত পৃথিবীতে উহা তুলনা-রহিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ জাতিভেদ থাকায় লোকেরা আপনাপন অভিলাষানুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না বলিয়া একটা কথার কথা মাত্র আছে। মনুসংহিতার মতে 'বৃত্তি-কর্ষিত' হইলে একমাত্র ব্রাহ্মণের ব্যবসায় ভিন্ন অপর সকল ব্যবসায়ই সকলে অবলম্বন করিতে পারে, এবং তাহাই চিরকাল করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষক। শিক্ষকের মস্তিষ্কে পৈতৃক ব্যবসায় জনিত দোষও পরিহার করা বিধেয়।

পঞ্চমতঃ একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ ভিন্ন আর কাহারও অপেক্ষা অন্য বর্ণের লোকেরা আপনাদিগকে তেমন অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না। বাঙ্গালার নবশাখেরা আপনাদিগকে কায়স্থদিগের অপেক্ষা জাতিনিবন্ধন নিকৃষ্ট মনে করে না। মান্দ্রাজের পারিয়া নামক অস্পৃশ্যজাতীয়েরা বলে যে, তাহারা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, স্তুতরাং

আপনাদিগকে হেয় জ্ঞান করে না। বোম্বাইপ্রদেশীয় মাড়েরা তথাকার অস্পৃশ্য জাতি; কিন্তু উহাদিগেরও আত্মগৌরব আছে। উহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতি অপেক্ষা শুচি এবং শুদ্ধ বলিয়া জানে।

ষষ্ঠতঃ জাতিভেদ প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই অনেকটা আত্মগৌরব রক্ষা করে। অতএব পরাধীন জাতির পক্ষে এই প্রথা বিশেষ শ্রেয়স্করী।

পাশ্চাত্য ভাব—ঐহিকতা

অতি বালককালে একবার শিকারী পাখীর শিকার-শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। একজন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটা টিয়া পাখী সেই মাত্র পলাইয়া নিকটবর্ত্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া ছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিকরে বসিয়া ছিল, সে বোধ হয়, আমার দৃষ্টির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল এবং তাহার শিকরেকে ছাড়িল। তীরবেগে শিকরে গিয়া টিয়ায় উপরে পড়িল, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকারী বুঝিতে পারিল যে, টিয়াটি পোষা। সে একটি শিশ দিল, শিকরে অমনি টিয়াকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপরে আসিয়া চঞ্চুপুট দিয়া আপনার পক্ষ কুট্টন করিতে লাগিল—কে বলিবে যে এই শিকরে সেই শিকরে।

বাল্যকালের ঐ অদ্ভুত দর্শন চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কখনও অপনীত হয় নাই। অতএব বয়োধিক হইয়া যখন প্রবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট কি নিবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট, ব্রাহ্মণসন্তানের হৃদয়ে এই বিচার স্বতঃই উত্থিত হইল, তখন জর্ম্মনদেশীয় রিখ্‌টর নামক একজন গ্রন্থকর্ত্তার শ্যেন পক্ষীর শিকার সম্বন্ধীয় উপমাটি বড়ই মিষ্ট লাগিল, এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসাও সেই উপমাটির বলে সম্পাদিত হইয়া গেল। রিখ্‌টর বলেন শ্যেন পক্ষী যেমন স্বীয় প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে শিকারের প্রতি ধাবমান হয়, আবার ইঙ্গিত মাত্রে ফিরিয়া আইসে, মনুষ্যের মনও সেইরূপে শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবে, মানুষ তাহাই একান্ত মনে এবং সর্ব্ব প্রযত্নে সম্পন্ন করিবে, আবার বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিনা বিলম্বে এবং বিনা ক্ষোভে সেই বিষয়

তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। সমুদয় আর্য্যশাস্ত্রের শাসনও ঐরূপ। ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিয়ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ। ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই সামঞ্জস্যবিধান হইয়া দুঃখের হ্রাস, চিত্তের প্রাসর্য্য, এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে। ইহাই ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়ের সাধনোপায়। ঐহিক সাধনের প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ"।

কিন্তু শাস্ত্রের মত এইরূপ পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত হইলেও আমাদিগের দেশে কতকটা ভিন্নরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির পথ এবং নিবৃত্তির পথ দুইটিকে মিলাইয়া যে উভয়লোকহিতকরী ব্যবহারপদ্ধতি জন্মে, তাহা এখন আর তেমন যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া লওয়া হয় না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বাহ্যজগতের আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ন্যায় পরস্পর বিপরীত হইলেও যে যুগপৎ কার্য্যকারী তাহা একেবারে বিস্মৃত হওয়া হইয়াছে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, যাহারা প্রবৃত্তির পথে যাইতেছে, তাহারা ক্রমে অধোগত হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, আর যাহারা নিবৃত্তির পথে যাইতেছে মনে করে, তাহারাও অনেকে ভ্রষ্টাচার এবং স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে।

মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটি পা স্থির থাকে, অপরটি অগ্রসর হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্ব্বেরটি অগ্রবর্ত্তী হয়। অতএব গমন রূপ একটি কার্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব দুইটিই বিদ্যমান থাকে। জীবনবর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তিপ্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তিপ্রভাবে বিশ্রাম। প্রাণিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চরিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তিত শোণিতধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্তপ্রবহণ ব্যাপারে সঙ্কোচন এবং প্রসারণ রূপ বিপরীত উভয় কার্য্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষাও ঐ প্রকারে হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হইতে কর্ম্মরূপে বহির্ভাগে আইসে। ফলতঃ জগতের সকল বস্তুতেই দুইটি পরস্পরবিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব থাকে। আকর্ষণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষণ বা তাপের প্রভাবে পরমাণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইত, আবার বিপ্রকর্ষণ বা তাপ যদি কিছু মাত্র না থাকে, তাহা হইলে কোন দ্রব্যেরই বিস্তৃতি সম্ভবে না, সংঘাতের অশেষ বলে সকলেই একেবারে রূপবিহীন হইয়া পড়ে। অতএব দুইটি

বিভিন্ন এবং বিপরীত শক্তির যুগপৎ অবস্থানই জগতে প্রতীয়মান হয়, একমাত্র শক্তির কার্য্য কোথাও স্থূল দৃষ্টিতে দৃশুমান হয় না।

কিন্তু ব্যষ্টীভূত জগতের নিয়ম এইরূপ হইলেও, শাস্ত্রকারেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই উভয় শক্তির মধ্যে সাধারণতঃ প্রবৃত্তির বলই অধিক। ভগবান ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। * সেই জন্য তাঁহাদিগের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয়। প্রবৃত্তি প্রবলা—নিবৃত্তি দুর্ব্বলা। শাস্ত্রকারেরা উহাদিগের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশে যেটি দুর্ব্বলা, উপদেশাদি দ্বারা সেইটির সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অপরাপর জাতির শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা আর্য্যশাস্ত্রকারেরা নিবৃত্তি পক্ষের শিক্ষাদানে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহারা কেবল মাত্র নিবৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানেই পটু। এরূপ ভ্রমানুমানের আরও একটি কারণ আছে। আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, যথা ভগবান শঙ্করস্বামী, নিবৃত্তিমার্গের চরম ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং আর্য্যশাস্ত্রের মূলীভূত অধিকারীর ভেদ-বিচার বিষয়ে একান্ত অজ্ঞতা প্রযুক্ত, অনেকেই আর্য্যশাস্ত্রকে ঐহিকতার বিরোধী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদিগের শাস্ত্রের শিক্ষা লোকদ্বয়ের শুভসাধিনী—শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতিসাধিনী নহে।

কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাস্ত্র শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রস্তুত হইতে পারে না। কোন সুদূরদর্শী শাস্ত্রকারের চক্ষে পারলৌকিক সুখসমৃদ্ধি, ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধি হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেও পারে না। অপ্রত্যক্ষ স্বর্গনরকাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া "ইহৈব নরকং স্বর্গঃ" এই কথা লইয়াই যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও সংসার মধ্যেই পূর্ব্বলোক, বর্ত্তমান লোক এবং পরলোক তিনটি লোকই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদিগের পূর্ব্বগত পুরুষেরা আমাদিগের পূর্ব্বলোক, আমরা বর্ত্তমানলোক, এবং আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা পরলোক। যদি বর্ত্তমানের লোকেরা দৈহিক এবং মানসিক গুণে উৎকৃষ্ট হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পুরুষেরা বর্ত্তমান লোকদিগের অপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিতে পারিবেন না।

ফলতঃ পরোক্ষপ্রিয়, দেব-স্বভাব আর্য্য-শাস্ত্র, বর্ত্তমান-লোককে ভাবী বা পরলোকের সাক্ষাৎকারণ স্বরূপ জানিয়া এবং সেই পরলোকের প্রতি বিশিষ্টরূপে

* "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভূঃ।"

স্নেহবান হইয়া তাহারই হিতার্থে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শম-দম-যমাদির উপদেশ পরোক্ষদৃষ্টিমূলক, কিন্তু উহা ইহলোকেরও হিতসাধক। উহাদিগের উপদেশে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান হইয়া আছে।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবাসী কিম্বা চীনদেশবাসীদিগের ব্যবহারের এবং কথাবার্ত্তার সহিত ইউরোপীয় জাতীয় লোকের ব্যবহারাদি এবং বাক্যালাপের তুলনা করিয়া দেখিলে ইউরোপীয়েরা যে সত্য সত্যই পরকালে বিশ্বাস করেন, তাহা বোধই হয় না। তাঁহাদিগের মধ্যে চিরকালাবধি ঐহিকতার প্রাবল্য; আজি কালি উহা আরও প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এখন উঁহাদিগের মধ্যে যে মতবাদ সাধারণে পরিগৃহীত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সারভাগ এই—

সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখ প্রাপ্তির কাল বর্ত্তমান। সুখ প্রাপ্তির স্থান এই পৃথিবী। *

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে অবিকল ঐরূপ ঐহিকতা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছিল। চার্ব্বাক বা লোকায়তিক মতের সারাংশ সংগৃহীত হইয়া উক্ত হইয়াছে—

স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, পারলৌকিক আত্মাও নাই।...যতদিন বাঁচিবে সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবে। শরীরটা পুড়িয়া ভস্ম হইলে উহার আর প্রত্যাগমন কোথায়? * *

অতএব ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যভাবের অবয়বীভূত ঐহিকতার প্রবেশে কোন একটা নূতন ভাবের প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখনকার ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ-সংসর্গ পূর্ব্বকালের সেই লোকায়তিক মতবাদের পুনঃ প্রাবল্যসাধন করিতেছে মাত্র। বাস্তবিক সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, পাশ্চত্য ভাবের প্রভাবে যতগুলি ব্যাপার সংস্কারকার্য্য বলিয়া উল্লিখিত এবং

* Happiness is the only good.
The time to be happy is now.
The place to be happy is here.

* * ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ
... ...
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

আন্দোলিত হইতেছে, তাহার একটীও মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধির অনুকূল নহে। সকলগুলিই অত্যধিক পাশবভাবের অনুকূল, একটিও দিব্যভাবের অনুকূল নয়। একটিও ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধের পক্ষ নহে। সকলগুলিই ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদক।

একজন অতি প্রধান মুসলমান মৌলবীর সহিত কথোপকথন কালে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে ইংরাজীনবিসেরা যত সংস্কারকার্য্যের উল্লেখ করেন, তাহার একটিও কঠোর ব্যবহারের অনুকূল হয় না কেন? হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান গুণই এই যে, এই জাতীয় লোকেরা অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা ইন্দ্রিয়দমনে সুশিক্ষিত—ইহারা কখনই নিতান্তই ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ হয় না। এই গুণ থাকাতেই হিন্দু জাতি এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে—এই গুণ থাকাতেই মুসলমানদিগের ভগ্নাবস্থা হইলেও হিন্দুদিগের ভগ্নাবস্থা হয় নাই; তাহারা পুনর্ব্বার তেজ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এইবারে বুঝি হিন্দুর সেই চিরসঞ্চিত গুণের লোপ হইবে—হিন্দু একান্ত ঐহিকতার দাসত্ব পাইবে। ইন্দ্রিয়দমনমূলক না হইলে প্রকৃত সংস্কারকার্য্য হয় না।" কথাটি অনেক দিনের কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের অনুরূপ। বোধ হয় সেই জন্য এখনও মনে রহিয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য ভাব—স্বাতন্ত্রিকতা

সকল সমাজেই দুইটি বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার একটির নাম সামাজিকতা, অপরটির নাম স্বাতন্ত্রিকতা বলা যায়। যে শক্তির প্রভাবে সমাজান্তর্গত পরিবারসমূহ পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং কিয়ৎ পরিমাণে একপ্রকৃতিক এবং একাকার হইয়া যায় তাহার নাম সামাজিকতা। আর যে শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক পরিবার আপনাপন সুখদুঃখ, হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারপূর্ব্বক পরস্পর পৃথক্‌ভূত থাকে, এবং যাহার প্রাবল্যে কখন কখন সমাজবিধির পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যায়, তাহার নাম স্বাতন্ত্রিকতা।

সমাজভেদে দুইটি শক্তির তারতম্য দৃষ্ট হয়। সময়ভেদে কোন সমাজে সামাজিকতার আধিক্য, আর কোন সমাজে স্বাতন্ত্রিকতার আধিক্য হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজে বহুকালাবধি সামাজিকতার সবিশেষ প্রাবল্য ছিল। ঐ সকল লোকেরা জন্মভূমি এবং আত্মসমাজকেই সমুদয় ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং

প্রেমের আস্পদ স্বরূপে জানিত। উহাদিগের হৃদয়ে আত্মসমাজটিই যেন সাক্ষাৎ পরমেশের স্থানীয় হইয়াছিল। ইহাদিগের বিবেচনায় সমাজের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা উদারতর ধর্ম্মকার্য্য আর কিছুই হইতে পারিত না এবং উহাই অক্ষয় স্বর্গলাভের এবং পুরুষার্থসাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইত। উহাদিগের আরাধ্য এবং উপাস্য দেবদেবীগুলিও সমাজান্তর্গত বিশেষ বিশেষ শক্তির অথবা স্বদেশীয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রতিরূপ স্বরূপ ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া কোন বিচক্ষণ দার্শনিক স্থির করিয়াছেন যে, উহাদিগের সামাজিকতাই অতি দৃঢ়ীভূত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নব্য ইউরোপীয় সমাজগুলির গঠন কতকটা গ্রীক এবং রোমীয়ের ছাঁচেই হইয়াছে—কারণ নব্য ইউরোপের শিক্ষা গ্রীস এবং রোম হইতে। কিন্তু নব্য ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র ইউরোপের বাহির হইতে আসিয়াছে। ঐ শাস্ত্র তাঁহাদিগের নিজ সমাজপ্রসূত বা তাহারই ছায়াভূত নহে। উহা রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের চরম দশায় প্রাদুর্ভূত এবং সর্ব্বজনীন প্রায়। এই জন্য ইউরোপীয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেমের পদার্থ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট বস্তুতেই নিবদ্ধ হয় নাই। গ্রীক এবং রোমীয়ের চক্ষে আত্মসমাজই যেমন সর্ব্বপ্রধান এবং অতিব্যাপকরূপে প্রতিভাত হইত, নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে, সমাজ সেরূপে প্রতিভাত হয় না। উহারও দোষ গুণ বিচার করিবার উপযোগী একটা মানযন্ত্র নব্য ইউরোপীয় পাইয়াছেন এবং সেইজন্য সমাজের সংস্কারকার্য্য তিনি আপনার সাধ্যায়ত্ত জ্ঞান করেন। গ্রীক এবং রোমীয় মনে করিতেন যে, সমাজ আপনার নিদানভূত সকল ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বংকষ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন এবং ব্যক্তিবিশেষের সুখ, সমৃদ্ধি, জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের সংরক্ষণ এবং পুষ্টিসম্বর্দ্ধনার্থ গ্রহণ করিতে পারেন। নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে সমাজের ততটা অধিকার সম্যক্ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এইজন্য ইউরোপীয় সমাজে গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সমাজ অপেক্ষা স্বাতন্ত্রিকতার অধিকার সমধিক বিস্তৃত।

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গ তাঁহাদিগের প্রাচীন এবং নব্য সমাজের মধ্যে এই প্রভেদটি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সকল প্রাচীন সমাজের প্রকৃতিই গ্রীক এবং রোমীয়দিগের কতকটা অনুরূপ হইবে, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজেও সামাজিকতার অত্যাধিক্য এবং স্বাতন্ত্রিকতার অতি ন্যূনতা অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা সেইজন্যই বলিতেছেন যে, ইংরাজ-সমাগমে ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষের সমূহ উপকার হইতেছে।

উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের কথাটি দুইদিক হইতে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। একদিক এই—সামাজিকতা এবং স্বাতন্ত্রিকতার পরস্পর মর্য্যাদা কিরূপ? অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে কোন একটি সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কি না? অন্য দিক এই—ভারতবর্ষে ঐ দুই শক্তির মধ্যে কোনটি অযথা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আছে কি না? যদি থাকে সেটি কোন্ শক্তি? এই দুইটি কথার বিচার করিলেই ইংরাজসমাগমে আমাদিগের সামাজিকতার এবং স্বাতন্ত্রিকতার কিরূপ সীমানিবেশ হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের মধ্যে উদারতম ধর্ম্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। উহারা জানিত যে, আপনাপন সমাজের হিতসাধনার্থে সকল কাজই করিতে পারা যায়—অর্থাৎ অপর সমাজের হানি করায় কোন দোষ হয় না। গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঐ জাতীয় লোকেরা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগের দেশাচার ও কুলাচার এবং দেশব্যবহার ও কুল-ব্যবহারকেই ধর্ম্মের নিদানভূত বলিয়া মনে করিত এবং ঐ আচার এবং ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিলেই তাহারা আপনাদিগকে সাধিত-পুরুষার্থ বলিয়া জানিত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ঐ কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও উহার কতকটা যাথার্থ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ হইয়া থাকে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভেও মনুষ্যের অবস্থা সেইরূপ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া প্রথমতঃ কুলাচারে পরে দেশাচারে এবং সামাজিক বিধিতে নিবদ্ধপ্রায় লক্ষিত হয়। ধর্ম্মজ্ঞানের উদ্বোধক প্রীতি। সম্যক্ ন্যায়পরতার বিকাশও প্রীতিমূলক। প্রীতিটি প্রথমে স্বজনদিগের প্রতিই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। উহা আত্মপরিবার গোত্র এবং সমাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। আজি পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ঐ অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে নাই। নিজ সমাজের বহির্ভূত বর্ব্বর জনগণের প্রতি গ্রীকেরা এবং প্রাথমিক রোমীয়েরা যেরূপ নির্দ্দয় আচরণ করিত নব্য ইউরোপীয়েরাও কি ইউরোপীয়েতর জনগণের প্রতি কতকটা সেইরূপ আচরণ করেন না? কিন্তু তাহা করিলেও নব্য ইউরোপীয়দিগের মনে ধর্ম্মবুদ্ধির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি এবং উদারতা জন্মিয়াছে; এবং যে পরিমাণে তাহা জন্মিয়াছে সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের সমাজতন্ত্রতাও কিছু শিথিল হইয়াছে। পরবর্ত্তী বন্ধনের বলে পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধনের দৃঢ়তা ন্যূন হয়। অতএব উদারতর সহানুভূতির উদ্গমে

পূর্ব্বাবস্থার তীব্রতর সহানুভূতি স্তিমিততেজঃ হইয়াছে। এখন লোকে কুলাচার বা দেশাচার বা সমাজবিধি লইয়াই ন্যায়ান্যায় বিচারের পরিসমাপ্তি করিতে পারে না—ঐ সকলের পরেও একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিধি দেখিতে পায় এবং কতকটা তাহার অনুযায়ী হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে গ্রীক এবং রোমীয়ের সুদৃঢ় সামাজিকতার অভ্যন্তরে একটু স্বাতন্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হইয়া নব্য ইউরোপীয় সমাজকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর করিয়া তুলিয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় সামাজিকতা কি গ্রীক বা রোমীয়দিগের সমাজতন্ত্রতার ন্যায় অতি দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং আপনার অন্তর্নিবিষ্ট জনগণ ভিন্ন অপর সকলের প্রতি সহানুভূতিশূন্য? এ কথা মুখেও আনিবার যো নাই। সর্ব্বময় ব্রহ্মবাদপরায়ণ হিন্দু—অপর দেশীয় মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সকল জীবের প্রতিই সহানুভূতিবিশিষ্ট। সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রতি, দেশাচারের প্রতি এবং কুলাচারের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধাভক্তি অতি প্রোজ্জ্বল বটে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ঐ গুলিতেই সম্বদ্ধ নহে। ঐগুলি তাঁহার মূল ধর্ম্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলিয়াই উহারা ধর্ম্ম এবং পালনীয়। মনু ধর্ম্মের লক্ষণে সদাচার এবং শাস্ত্রীয় বাক্যেরও অতীত একটি পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং নিবোধত॥

ঐ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বিশেষণটির দ্বারা শাস্ত্রশাসনের এবং সাধু আচারের ঊর্দ্ধবর্ত্তী ধর্ম্মলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং অপর বিশেষণগুলির দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারণ হইল, অর্থাৎ যে কেহ আপনার হৃদয় কর্ত্তৃক কোন কার্য্যে অভ্যনুজ্ঞাত হইলেই যে তাহা ধর্ম্মকার্য্য হইবে না একথাও বলা হইল। ফলতঃ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বলায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব ধর্ম্মতত্ত্বের উন্নতি প্রভাবে সামাজিকতার বন্ধন যতটুকু শিথিল থাকার প্রয়োজন তাহা হিন্দু সমাজে হইয়া আছে। সুতরাং স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অনুদার কোন ধর্ম্মমতবাদের সংস্রবে সম্পাদিত হইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ মধ্যে স্বাতন্ত্রিকতার আর একটি স্থল আছে। কুলাচার, দেশাচার এবং সমাজবিধির বশীভূত থাকিতে থাকিতে ঐগুলি এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, আর উহাদিগের হেতুর বা তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান হয় না। এরূপ হওয়াতেও এক প্রকার দোষ প্রখ্যাপিত হইয়া উক্ত হইয়াছে "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। ভারতবর্ষে যখন দেশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল, তখন যে প্রদেশে

যেরূপ প্রয়োজন পড়িত, তদনুযায়ী নূতন নূতন ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রবর্গের দ্বারা প্রণীত ও রাজাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। কোন কোন স্থলে নব নব সংহিতাও জন্মিত; কিন্তু অধিক স্থলেই পুরাতন সংহিতারই নূতনরূপ ব্যাখ্যা হইত। আর কখন বা মহাত্মব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়া বহুপ্রদেশব্যাপক ব্যবস্থার পরিবর্ত্ত এবং নূতন বিধির প্রণয়ন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর ঐরূপ হইতে পায় না। এখন এদেশের বিধিব্যবস্থা ইংরাজ-রাজেরই ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। তাহাতে দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা জন্মিতে পারে না। যদি দেশীয় জনগণের প্রয়োজনানুরূপ সামাজিক ব্যবস্থাপনকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সমাজের মুখাপেক্ষী মহানুভব ব্যক্তিদিগের সম্মিলন এবং চেষ্টাসম্ভূত হয় এবং সেই সকল বিধি জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাজশাসনের বলেই পরিগৃহীত এবং প্রতিপালিত হয় তাহা হইলেই সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার জীবন্তাব বিদ্যমান হইতে পারে। এক্ষণে যেরূপ হইতেছে তাহাতে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।

পরন্তু যাঁহারা ইংরাজ সমাগমে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়াছে বলেন, তাঁহারা সামাজিকতার অন্তর্ভূত উল্লিখিত দ্বিবিধ স্বাতন্ত্রিকতার মধ্যে কোনটির কথাই মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে ভিন্নজাতীয় রাজার অধিকারে অবস্থিত হইয়া আত্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিব্যবহারাদির প্রতি অব্যাঘাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন, সেই স্বাতন্ত্রিকতার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ঐ স্বাতন্ত্রিকতাটা অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। সকল সমাজেই আহার, বিহার, লোকলৌকিকতা, রীতিব্যবহারাদির এক একটা পদ্ধতি পড়িয়া যায়। ওগুলি প্রায়ই তত্তদ্দেশের যথাযোগ্য হইয়া থাকে। ওগুলির পরিহারে বা পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকার নাই। প্রত্যুত পরিহার এবং পরিবর্ত্ত চেষ্টায় সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ হয় মাত্র, এবং সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যভাবে ধর্ম্মবুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত হইয়া যায়। কারণ ধর্ম্মবুদ্ধি সহানুভূতি হইতেই উদ্গত এবং সহানুভূতির প্রকৃত ক্ষেত্র আত্মসমাজ। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ত পানভোজনাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি প্রচলিত নাই। তথাপি উহারা স্ব স্ব সমাজ প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করেন না। কোন ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া হ্যাট কোট ছাড়িয়া পাগড়ী চাপকানের ব্যবহার করেন না; তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, পাগড়ী চাপকানই এদেশের যোগ্যতর পরিচ্ছদ। মদ্যপান স্বাস্থ্যের হানিকর জানিয়াও প্রায় কোন ইংরাজ তাহা ভোজকালে পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ

সমাজপ্রচলিত নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া চলাই ভাল।

স্বাতন্ত্রিকতার যেরূপ প্রবৃত্তিতে সামাজিকতার ব্যাঘাত হয় না, তাহার উদাহরণ বর্ত্তমান জাপানীয়দিগের ব্যবহার দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানীয়রা এক্ষণে ইউরোপীয় অনুকরণে রত। কিন্তু উঁহারা যে ইউরোপীয় ব্যবহারের অনুকরণ করেন, তাহা প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্রাট এবং সচিব সভার অনুমোদিত হইলে, তবে অনুকরণ করেন। যাহার মনে যাহা আসিবে সে তাহাই তৎক্ষণাৎ অনুকরণ করিবে জাপানীয়দিগের মধ্যে এ প্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জাপানীয়দিগের ইচ্ছা হইল যে, ইউরোপীয়দিগের ন্যায় টুপি ব্যবহার করে; তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন করিলে, সম্রাট তদর্থে অনুমতি পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইউরোপীয় অনুকরণে টুপির ব্যবহার তাঁহার অনভিমত নহে। তাহার পর জাপানীয়রা ইউরোপীয় ধরণে টুপি পরিতে লাগিল। এইরূপে স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ। প্রতি ব্যক্তিকৃত অনুকরণে সমাজের অবমাননা হয়, সমাজকৃত অনুকরণে অনেক স্থলে তাহার সজীবতাই বুঝা যায়।

চীনীয়দিগের মধ্যেও কখন কখন সমাজবিধির প্রয়োজনোপযোগী অন্যথা করা হয়। কিন্তু তাহাও সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাসম্ভূত হয় না। চীনীয় সম্রাট্ সকল বিধিব বিধাতা। তিনি স্বশরীরে সমুদয় সমাজশক্তি ধারন করেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সমাজবিধির পরিবর্ত্ত হইতে পারে। দেবতাদিগের পূজাবিধিও তাঁহার আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট-সভাও প্রচলিত সমাজবিধির অন্যথা এবং নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ।

প্রত্যুত সকল সমাজেই কোথাও না কোথাও একটি শক্তির স্থান আছে। পরাধীনতা নিবন্ধন ভারতবর্ষে সেই শক্তি আর সমস্ত সমাজ ব্যাপক হইয়া নাই— উহা সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয় সমাজের স্বাতন্ত্রিকতা অতি বিস্তৃতরূপ হইয়া সমাজের পূর্ণ সজীবতার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি কখনই অপকারক বই উপকারক হইতে পারে না। এখন সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে বশ্যতা, পরস্পর সহানুভূতির আধিক্য এবং সম্মিলনই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতা অবশ্য পরিহার্য্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই (১) যথায় সামাজিকতা নিবন্ধন অপরাপর সমাজান্তর্গত লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ হয়, তথায় ধর্ম্মজ্ঞানপ্রণোদিত স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। (২) যে সামাজিকতার প্রভাবে সামাজিক

নিয়মগুলির মূলীভূত হেতুসমূহ সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদিগেরও মন হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, তথায় হেতুবাদ প্রকট করিয়া উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক নিবারণ করা আবশ্যক। (৩) সমাজবিধির পরিবর্ত্ত, সমাজের প্রতি পূর্ণ-সহানুভূতিসম্পন্ন, সুদূরদর্শী মহাত্মাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। অপর সকলের সমাজ-সংস্কার চেষ্টায় পাশবভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বৃদ্ধি হয়, সামাজিক এবং দেশাচারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকটিত হয় এবং লোকের মুখাপেক্ষতার প্রতি তাচ্ছিল্য হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধির ক্ষীণতা জন্মায়।

এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল যে, প্রথম সূত্রের উল্লিখিত যে স্বাতন্ত্রিকতা তাহা হিন্দুর যেমন আছে, ইউরোপীয়দিগেরও তেমন নাই। ইংরাজপ্রদত্ত শিক্ষায় পুরাতন প্রথার প্রতি অশ্রদ্ধা সঞ্চারে ঐ সকল প্রথার মূলীভূত হেতুসমূহ প্রকট হইতেছে না। অন্ধ-অনুকরণ-স্রোত মাত্র চলিতেছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতারই বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রোল্লিখিত প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক হইতেছে না।

পাশ্চাত্য ভাব—বৈজ্ঞানিকতা

১

বিজ্ঞান অতি প্রধান বস্তু। ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রভাবে ধন এবং বলের বৃদ্ধি করিয়া পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্য অপেক্ষা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। মিশর-যুদ্ধের সময় একজন ইংরাজ আপনাদিগের পোত-বাহিনীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"এসিয়া এবং আফ্রিকাখণ্ডের মধ্যে এমন একটিও জাতি নাই, যাহা কর্ত্তৃক এই রণতরীগুলির আক্রমণ সহ্য হইতে পারে।" বস্তুতঃ পৃথিবীর অপর কোন ভাগের লোকেরাই আর ইউরোপীয়দিগের প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ নহে। দেখ, একমাত্র স্টান্‌লী সাহেব, তিনি কোন দেশের রাজা বা রাজপ্রতিভূ কিম্বা প্রধান রাজপুরুষ কিছুই নহেন, তথাপি কয়েক শত ইউরোপীয় সখের ফৌজ সঙ্গে লইয়া আফ্রিকাখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই ভূভাগকে ওতপ্রোত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেও দুইজন পাঁচজন ইউরোপীয় বা তদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি অকাতরে চলিয়া যায়—আদিম নিবাসীদিগের বৃহৎ বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি সম্মিলিত হইয়াও তাহাদিগের গতিরোধে সমর্থ হয় না।

যুদ্ধে যেমন অপ্রতিহত প্রভাব, বাণিজ্য ব্যাপারেও ইউরোপীয় তদ্রূপ। তাহাদের স্বার্থবাহ বণিক্ এবং বাণিজ্যপোত ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, এবং যেখানে যাইতেছে সেই দেশেই প্রভুত্ব লাভ করিতেছে। ইউরোপের এক একটি বণিক্ সম্প্রদায় অপরাপর দেশে রাজচক্রবর্ত্তী। ইহার উদাহরণ, এক ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের আধিপত্য শুদ্ধ অপরাপর মানুষের উপরেই হয়, এমন নহে। উহারা বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে যেন ভূতলকে নূতন করিয়াই গড়িতেছে। সুয়েজ প্রণালী দ্বারা আফ্রিকাখণ্ডকে একটি দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, পানেমা প্রণালী দ্বারা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে দ্বিভাজিত করিতেছে, সেনিসের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া আল্পস্ পর্ব্বতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছে, আর সাহারা মরুতে একটি অভিনব সাগরের প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া ঐ বালুকাময় ভূভাগের প্রকৃতি পরিবর্ত্ত করিবার উদ্যম করিতেছে। বাষ্পীয় তরী, বাষ্পীয় শকট এবং তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা দূরত্ব এবং কালের ব্যবধানও অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছে।

কিন্তু ইউরোপের বাহিরে ইউরোপীয় মহিমা যে উৎকটভাব ধারণ করে, ইউরোপের অভ্যন্তরে উহার ভাব তেমন বিস্ময়ব্যঞ্জক নহে। ইউরোপের বহির্ভাগে জন কয়েক ইউরোপীয় সম্মিলিত হইলেই এক একটি জাতিকে পদদলিত করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের ভিতরে কোন এক জাতির লোক অপর জাতির অপেক্ষা তেমন প্রবল হইতে পারে না। সেখানে যদি কোন দেশ দুইখানি রণতরী অথবা দুই পাঁচ সহস্র সৈনিকের বৃদ্ধি করিয়া তুলে, অমনি অপর সকল দেশকে সাবধান হইয়া আপনাপন বলবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। তুরস্কও যদি কিছু সেনার বৃদ্ধি করে, রুশিয়া ও অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে তজ্জন্য সতর্ক হইতে হয়। আর আজি কালি দৃষ্ট হইতেছে যে, ইউরোপের বহির্ভাগেও যদি কোন্ জাতি ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে, ইউরোপীয়েরা তাহাকেও কিছু ভয়, ভক্তি, এবং সম্মান করেন। চীন-ফরাসী যুদ্ধে বিলক্ষণ সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ইউরোপীয়েতর জাতিরাও ইউরোপের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সংগ্রামস্থলে ইউরোপীয়ের সমকক্ষ হইয়া উঠে। চীনেরা ফরাসী সৈন্যের পরাভব করিয়াছে। ইংরাজ কর্ত্তৃক শিক্ষিত সিপাহীরাও পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের কল আনাইয়া বোম্বাইয়ের পারসি এবং হিন্দু বণিকেরা চীন, জাপান, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে ইংরাজ বণিকদিগের অপেক্ষাও সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিতেছে।

ফলতঃ ইউরোপের যে প্রকার প্রাধান্য তাহা উহার শিক্ষা এবং কল-কৌশল হইতে জন্মে। সেই শিক্ষা এবং কল-কৌশল সমস্তই বিজ্ঞানমূলক, সুতরাং বিজ্ঞান অতিশয় আদরের এবং গৌরবের বস্তু। যত্নপূর্ব্বক উহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যদি ইংরাজের সংস্রবে আমাদিগের প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিদ্যালাভ হইয়া থাকে, এমন হয়, তবে অনেক লাভই হইয়াছে, স্বীকার করা যায়।

প্রথমে দেখা যাউক, বিজ্ঞানটি কি, পরে দেখিব উহা আমরা পাইতেছি কি না।

মনুষ্য আপন হৃদয়ে যে পরাৎপর আদর্শ পুরুষের অনুভব করে, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞতার আধার বলিয়াও ভাবে। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয় 'সর্ব্ব'। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, এবং যাহা হইবে, মানুষ তৎসমুদায়ই জানিতে চায়। জানিবার উপায়ের নাম প্রমাণ। জ্ঞাতব্য বিষয়ের ভেদ-অনুসারে প্রমাণেরও একটা স্থূল ভেদ হয়। যাহা আছে, তাহার প্রমাণ একরূপ, যাহা হইয়াছিল, তাহার অন্যরূপ, এবং যাহা হইবে, তাহার প্রমাণও ভিন্নরূপ হয়। কিন্তু প্রমাণের ত্রিবিধতা এইরূপে মনোগত হইলেও প্রমাণ বস্তুতঃ ত্রিবিধ নহে। যে প্রমাণ অতীত বিষয়ে খাটে তাহা অপর দুই স্থলেও খাটে—যাহা বর্ত্তমানে খাটে, তাহাও অপর দুই স্থলে খাটে, এবং যাহা ভবিষ্যতে খাটে তাহাও অপর দুই স্থলে খাটে। শুদ্ধ তাহাই নয়, সকল প্রমাণগুলিরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে একমাত্র মূল, এবং ভূত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্য সকলই একমাত্র সূত্রে গ্রথিত। সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের মূল এবং উপজীব্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত অতি বিশিষ্টরূপে সম্বদ্ধ যে প্রমাণ তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

শরীরের পোষণ যেমন ভক্ষ্যগ্রহণের দ্বারা হয় তেমনি জ্ঞানের পোষণও প্রত্যক্ষের দ্বারা হয়। সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া জ্ঞানের উপায়ান্তর কিছুই নাই। প্রত্যুত অনুমানাদি অপর যে সকল প্রমাণ বা জ্ঞান-সাধনোপায়ের নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার একটিও বিনা প্রত্যক্ষে কার্য্যকারী নহে। প্রমাণের সংখ্যা দর্শন এবং শাস্ত্রকারেরা জনগণের বোধসৌকর্য্যার্থে বিস্তৃত করিয়াছেন, প্রত্যুত সকলগুলিরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ এবং সকলগুলিরই নির্ভর একমাত্র প্রত্যক্ষের উপর।

যেমন রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ব্বেরটির উপরে পরেরটি ব্যবস্থিত, যেমন একতালার উপরে দোতলা, তাহার উপর তিনতলা, উপর্য্যুপরি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সকলগুলির চাপই ভিত্তিমূলের উপর, সেইরূপ অনুমান, শাব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি,

সাম্ভবিক, ঐতিহ্য প্রভৃতি যতগুলি বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের নাম হইয়া থাকে, তাহারা কেহই স্বতন্ত্র নয়—প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত তাহাদিগের কাহারও অন্য কোন ভিত্তি নাই। এই জন্যই কোন দর্শনকার উহার মধ্যে কোন কোনটিকে ছাড়িয়া দিয়াও আপনার শাস্ত্রীয় মতবাদ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। রেখাগণিতের মধ্যে যদি কোন একটি বা দুইটি বা ততোধিক প্রতিজ্ঞাকে উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও মূল হইতে ধরিয়া লইয়া তাহাদিগের পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলির প্রমাণ হইতে পারে। এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব যখন দেখা যায় যে, কোন শাস্ত্রকার অষ্টপ্রমাণবাদী, * কেহ বা তিন প্রমাণবাদী, কেহ বা দুই, কেহ বা একমাত্র প্রমাণবাদী, তখন ইহাই বুঝিতে হয় যে, উঁহারা সকলেই সকল প্রমাণই মানেন, তবে কেহবা কোনগুলিকে অন্তর্নিবিষ্ট মনে করায় অধিক সুবিধা বোধ করেন মাত্র। এস্থলে সংক্ষেপতঃ একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্যদর্শন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং শাব্দ এই তিন প্রমাণ স্বীকার করেন; তিনি ন্যায়দর্শনের স্বীকৃত উপমান নামক প্রমাণটিকে অনুমানেরই অন্তর্ভূত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু শাব্দ প্রমাণও যে, অনুমানেরই অন্তর্গত তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। শাব্দ প্রমাণের তাৎপর্য্য আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস। কিন্তু কোন্ বাক্য বিশ্বাসযোগ্য আর কোন্ বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ বা ভূয়োদর্শন বই আর কিছুই নাই। অতএব প্রত্যক্ষ দ্বারাই প্রথমে আপ্তবাক্যতা সিদ্ধ হয়, তাহার পর একটি অনুমান এইরূপ হয় যে, যে বাক্য সর্ব্বস্থলে বিশ্বাসযোগ্য, সে এই বিশেষ স্থলেও বিশ্বাসযোগ্য। এইরূপে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই শাব্দ প্রমাণ সর্ব্বতোভাবে সংস্থাপিত। সুতরাং উহার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে যে, বিচারে দোষ হয়, এমত নহে। আবার দেখা যায় যে, অনুমান প্রমাণও ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান ভূয়োদর্শন বা প্রত্যক্ষ জনিত। অতএব অনুমানও প্রত্যক্ষ হইতে স্বতন্ত্র নহে। ফল কথা সকল প্রকার প্রমাণের প্রত্যক্ষতন্ত্রতা অতি বিস্পষ্ট এবং তাহা আর্য্য দার্শনিকেরাও স্বীকার করিতেন। শুদ্ধ তাহাই স্বীকার করিতেন এমত নহে তাঁহারা ইহাও মনে করিতেন যে, যে প্রমাণটি প্রত্যক্ষ হইতে যত দূরবর্ত্তী সেটি তত অল্পবল, এবং

*প্রত্যক্ষমিতি চার্ব্বাকাঃ, অনুমিতিরপীতি কাণাদবৌদ্ধৌ, উপমিতিরপীতি নৈয়ায়িকৈকদেশিনঃ, শব্দোপীতি নৈয়ায়িকাঃ, অর্থাপত্তিরপীতি প্রাভাকরাঃ অনুপলব্ধিরপীতি ভাট্টবেদান্তিনৌ সাম্ভবিকৈতিহ্যকাবপীতি পৌরাণিকাঃ চেষ্টাপীতি তান্ত্রিকাঃ।

তাহা বিষয়বিশেষেই নিবদ্ধ। সকল প্রকার প্রমাণ সমপরিমাণে সবল নহে।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রমাণগুলি অষ্টম সংখ্যা পর্য্যন্ত যে ভাবে পর পর উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহারা যে ক্রমশঃ হীনবলরূপেই এবং বিষয়ভেদেই গ্রাহ্য এইরূপে শাস্ত্রকারদিগের প্রতীত হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। নবম প্রমাণ "চেষ্টা" বা স্পন্দন সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে উহা প্রথম প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভূত। *

কিন্তু যদিও মূল দার্শনিকদিগের বিবেচনা এইরূপ যথাযথ হইয়াছিল বোধ হয়, তথাপি তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী টীকাকার এবং নব্য ব্যাখ্যাতৃগণ যেন বিভিন্নসংজ্ঞক প্রমাণগুলিকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষের বিরোধী প্রমাণকেও গ্রহণ করিতে তেমন সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

সাধারণতঃ ইউরোপীয় দার্শনিকেরা ওরূপ করেন না। প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষের বিরোধী কোন প্রমাণই তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। অপর একটি রূপেও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রত্যক্ষের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সামান্য ইন্দ্রিয়বোধকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। ** যেমন মোকদ্দমায় সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর একটি মাত্র কথা শুনিয়াই মীমাংসা করিলে অর্থাৎ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে এবং অন্য সাক্ষীর কথার সহিত মিলাইয়া না বুঝিলে বিচার ঠিক হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের মৌলিক এবং সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ যে প্রত্যক্ষ, তাহাকেও বিশিষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই কার্য্যে অতিশয় পটু। তাঁহারা সর্ব্বদা সমূহ

* পূর্ব্বকালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রূপে ইহার গণনা হয় নাই। এই জন্য প্রত্যক্ষের মধ্যে গ্রহণ না হওয়াতেই উহা তান্ত্রিক মতবাদিগণ কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে বোধ হয়। ফলতঃ আকাশ, কাল, শক্তি, অহং এই চারিটি বোধ ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া যে গোলযোগ হইয়া আছে, যদি শারীর চেষ্টা সম্পাদনকে পূর্ব্বাবধি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ন্যায় বোধের একটি স্বতন্ত্র পথ বলিয়া ধরা হইত, তাহা হইলে সেরূপ গোলযোগ হইত না। ঐগুলি লইয়া কি এদেশে কি ইউরোপে অসাধারণ কষ্টকল্পনা এবং অদ্ভুত কল্পনা সকল হইয়াছে।

** আমাদের দর্শন শাস্ত্রেও সামান্য ইন্দ্রিয়বোধে এবং প্রকৃত প্রত্যক্ষে ভেদ করা আছে। কিন্তু তাহা দুইটি বিশেষণ দ্বারা করা হইয়াছে। সামান্য প্রত্যক্ষকে "নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ" এবং প্রকৃত প্রত্যক্ষকে "সবিকল্প প্রত্যক্ষ" বলা হইয়াছে।

যত্নে প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর স্থানে তৎকর্ত্তৃক বক্তব্য সমস্ত কথা শুনিয়া লয়েন, এবং বহু প্রকারে তাহার প্রতি জেরা করেন। এই কার্য্যপ্রণালীকে পরীক্ষাবিধান বলে। ইহাতেই প্রত্যেকের স্থানে প্রকৃত সদুত্তর প্রাপ্তি হয়, এবং ইহা হইতেই বৈজ্ঞানিকতা জন্মে। ভারতবর্ষীয়েরা বাহ্যজাগতিক ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা স্বল্পতর পরীক্ষাবিধান করিয়াছেন, কিন্তু আন্তর্জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাদের পরীক্ষা-বিধান অধিকতর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাদৃশ পরীক্ষাবিধান হইতেই হঠযোগ এবং রাজযোগের সূত্রসকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাঁহারা ওগুলিকে কাল্পনিক বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করেন মাত্র। যোগসাধনাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অনুশীলন হয়।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার অভ্যন্তরে আর একটি সূক্ষ্মতর বিষয় আছে। সেটিও প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃতিনিষ্ঠ। প্রত্যক্ষ কার্য্যটি নিতান্ত অবিমিশ্র সরল ব্যাপার নহে। যেমন ভক্ষ্যগ্রহণ হইতে ভক্ষিত পদার্থের শোণিতে পরিণতি পর্য্যন্ত বহুবিধ শারীর কার্য্য হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যক্ষের প্রারম্ভ হইতে তজ্জনিত ভাবাদির উদ্বোধ পর্য্যন্ত বহুপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার সাধন হয়। খাদ্যদ্রব্য মুখবিবরস্থ হইলেই খাওয়া হয় না। উহার চর্ব্বণ, লালামিশ্রণ এবং উদরস্থ হওয়া আবশ্যক। বস্তুও ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলেই প্রত্যক্ষীভূত হয় না। উহার ইন্দ্রিয়গোচরত্ব এবং উহার দেশকালাদি সম্বন্ধে অবস্থান, পরিমাণ প্রভৃতির অনুভব সহকৃত চিত্তাগামিত্ব সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এই চিত্তাগামিত্বের কার্য্যগুলিকেই মনোযোগ বলে; কারণ, ঐ কার্য্যগুলির দ্বারা ইন্দ্রিয়বোধের সহিত মানসিক কার্য্যের সংযোগ বুঝায়। তাহার পর যেমন পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে উহাতে শরীরস্থ নানাপ্রকার রসের সংযোগ হয় এবং উহা ক্রমশঃ কাহারও সহিত সম্মিলিত কাহারও হইতে পৃথককৃত হইয়া সর্ব্বশেষে শোণিতরূপে নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় চিত্তস্থ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি প্রভৃতির যোগে সমষ্টীকৃত এবং ব্যষ্টীকৃত হইতে থাকে এবং পরিণামে ভাবরূপ (বৌদ্ধেরা ইহাকে বিজ্ঞান বলেন) ধারণ করে। শারীর কার্য্যটির নাম পরিপাক, মানস কার্য্যটির নাম জ্ঞান-লাভ বা ভাব-গ্রহ। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, শোণিতও যেমন ভক্ষিত দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ভূত, শোণিতেও যেমন শরীরজ রস অনেক মিলিত, সেইরূপ মনোভাবেও মানসধর্ম্মের যথেষ্ট বিমিশ্রণ। প্রত্যক্ষ ব্যাপারটি ভাবের উদ্বোধক মাত্র, উহা স্বয়ং ভাব নহে। ভক্ষিত দ্রব্যও শোণিত জননের উপযোগী, উহা স্বয়ং শোণিত নয়।

এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুতে এবং তৎকর্তৃক উদ্বুদ্ধ মনোভাবে যে পার্থক্য, তাহা ইদানীন্তনকালে ভারতবর্ষে সুপরিস্ফুটরূপে বিবেচিত না হওয়ায়, পদার্থবোধ সম্বন্ধে এক প্রকার দোষ জন্মিয়াছে—যেন ভাবের সহিত দ্রব্যের গোল বাধিয়া গিয়াছে। ইউরোপেও অন্যরূপে গোল বাধিয়া মনোভাব সংঘটনে মনের যে কার্য্যকারিতা আছে, সমুদায়ই যে ইন্দ্রিয়-গোচরত্ব মাত্রেই নহে, এই তথ্যের অনেকটা বিস্মৃতি হইয়াছে। শেষের দোষটি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের ব্যাঘাতক হইলেও উহা বাহ্য-বৈজ্ঞানিকতার তত হানিকর হইতে পারে না। প্রথম দোষটি বাহ্য-বিজ্ঞানের হানিকর; শেষোক্ত ভ্রম সত্ত্বেও বাহ্য-বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্করণে সামর্থ্য থাকিতে পারে; কারণ উহা দ্রব্যের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাতক হয় না। প্রথম দোষে দ্রব্যের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হইয়া মনোমধ্যে যেন স্বপ্নময়তার একটা ছায়া পড়িয়া যায়।

এইরূপ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে বক্তব্য এই যে, বৈজ্ঞানিকতা বলিলে মনের এমন ভাবটি বুঝিতে হয়, যাহাতে—

(১) প্রত্যক্ষই সকল প্রমাণের মূল বলিয়া স্বীকৃত।

(২) প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া প্রমাণান্তর গৃহীত।

(৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমগ্রভাবে গ্রহণের জন্য পরীক্ষা-বিধানে আবশ্যকতা স্বীকৃত।

(৪) ব্যবহারিক বিষয়ে যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচারে ভাবপদার্থে এবং দ্রব্যপদার্থে বিবেক সংরক্ষিত।

এইরূপ মনের ভাব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংরক্ষিত না হওয়ায় আমাদিগের বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকাংশেরই উন্নতি বহুকাল হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং উল্লিখিতরূপে বৈজ্ঞানিক ভাব উদ্রিক্ত হওয়াতেই নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বাহ্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন হইতেছে।

পাশ্চাত্য ভাব—বৈজ্ঞানিকতা

২

প্রত্যক্ষের এবং তাহারই অঙ্গীভূত পরীক্ষা-বিধানের সহিত নিরন্তর ঘনিষ্ঠ সংস্রবাধীন বৈজ্ঞানিকদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সাধারণতঃ কয়েকটি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। তাহার দুই একটির উল্লেখ করা আবশ্যক।

(১) প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান অতি সুস্পষ্ট হয়। উহা মধ্যাহ্নসূর্য্যের আলোকে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অপচ্ছায়াবিহীন হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহার অবগতি হয়, তাহাতে সন্দেহের স্থল নাই বলিয়াই ধারণা হয়, অর্থাৎ সমুদায়ই পরিষ্কার এবং পরিস্ফুট ভাবে বুঝিলাম বলিয়া মনে হয়, সুতরাং কল্পনাবলে বুঝিবার প্রয়োজন থাকে না। এইরূপ অভ্যাসবশতঃ বৈজ্ঞানিকভাবাপন্ন পুরুষ যাহা বুঝেন, তাহা পরিষ্কার এবং পরিস্ফুটরূপেই বুঝিবার চেষ্টা করেন। একটা কিছু যেন জানিলাম মনে করিয়া তাঁহার মনের তৃপ্তি হয় না।

(২) প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশেষতঃ তাহার অন্তর্গত পরীক্ষাবিধানে বস্তুর সহিত সম্বন্ধটা অতি ঘনিষ্ঠ হয়—উহার অন্তর্ভাগে দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, উহার গায়ে হাত দিয়া নাঁড়াচাড়া হয়। তাহাতে যে শুদ্ধ বস্তুগ্রহই উত্তমরূপ হয়, এমত নহে, উহার অভ্যন্তরে কিছু লুক্কায়িত ভাবে রহিল, এরূপ ভাবনারও অবসর হয় না। সুতরাং কল্পনাশক্তি সংযত হইয়া পড়ে।

(৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণটি মূলতঃ বর্ত্তমান লইয়া থাকে। বর্ত্তমানের ভূত এবং ভাবীকে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। ইহা হইতেই মূলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের বোধ জন্মিয়া যায়। যাহা এখন দেখিতেছি, পূর্ব্বে এবং পরেও তাহাই ছিল এবং থাকিবে—এইরূপ সাদৃশ্যোপলব্ধি হইতে কার্য্য-জগৎ যে নিয়মের অন্তর্ভূত এই জ্ঞানটি জন্মে। এইজন্য নিয়মাবধারণ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রকৃতি।

(৪) নিয়মাবধারণপ্রবণতা হইতে আর একটি শুভময় ফল জন্মে। প্রকৃতির শক্তিগুলির সহিত সমধিক পরিচয় হয়। তাহাতে ভীতির ন্যূনতা হয়, এবং পরিণামে এমন একটি বিশ্বাস জন্মিয়া আইসে যে, মানুষ আপনিই আপনার সুখদুঃখের কর্ত্তা হইতে পারেন।

কথার অধিক বাহুল্য না করিয়া উল্লিখিত কয়েকটিকেই বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ সামান্যতঃ মনে করা যাউক যে, বিজ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষায় বস্তুগ্রহ পরিস্ফুট না হইলে সন্তোষ হয় না; কল্পনাশক্তি সংযত হয়; নিয়মাবধারণে বিশিষ্ট প্রবণতা জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ শিক্ষা হইলে চিত্তেরও কতকটা বিশিষ্টতা ঘটে। যাহা-তাহাতে বিশ্বাস হয় না, দ্রব্যগুণে হইল অথবা কালমাহাত্ম্যে হইল অথবা দেবাবির্ভাবে হইল এরূপ বন্ধ্য কারণের কল্পনাও হয় না, আর অদ্ভুত রসাস্বাদনের সুখানুভূতিও অতি প্রবলা হইয়া থাকে না, এবং স্বাবলম্বনজনিত বাহসিকতা বাড়ে। বৈজ্ঞানিক চিত্তের এই গুলি অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির এবং চিত্তবৃত্তির এই সকল লক্ষণের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ পর্য্যন্ত কোন দেশে বা কোন কালে ঐ সকল লক্ষণপূর্ণ কোন জাতিসাধারণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। অশিক্ষিত প্রাকৃত লোকেরা চিরকালই এবং সর্ব্বত্রই হুজুকে ভুলে, অযথা স্থলে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যাহা কিছু অসাধারণ এবং অদ্ভুত, তাহার চিন্তাতেই বিশেষ দুঃখী, সুখী, ভীত বা আনন্দিত হয়, আর অদৃষ্ট কারণাদির ধ্যানে রত হয়। ভারতবর্ষের ছোট লোকেরা বিশ্বাস করিতে না পারে, এমন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ত কিছুই নাই বলিলেই চলে। অনধিক কাল গত হইল, ইংলণ্ডের মধ্যেও প্রিন্স-নামা একব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রচারিত করিয়াছিল যে, সে খ্রীষ্টীয় ত্রিদেবের মধ্যে পিতৃদেবের সাক্ষাৎ অবতার। ত্রিশ হাজারের অধিক ইংরাজ ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার শিষ্য এবং আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। ফ্রান্স দেশে প্রতি দশখানি গ্রামের মধ্যে এমন একটি গ্রাম পাওয়া যায়, যেখানে দেবানুগ্রহ নিবন্ধন কোন কুমারী বা অপর ব্যক্তি গায়ে হাত বুলাইয়া অথবা দৃষ্টিমাত্র প্রদান করিয়া রোগীদিগের অত্যুৎকট রোগ শান্তি করেন। জর্ম্মনদিগের মধ্যে এখনও ডাকিনীর নজর দোষে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে, সুতরাং ঝাড়ন মন্ত্রাদির প্রয়োগও আছে।

এই সকল উদাহরণ প্রদর্শনের তাৎপর্য্য এই যে, কোন দেশে বৈজ্ঞানিকতার প্রকৃত আবির্ভাব বুঝিতে হইলে সেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহা বুঝিতে হয়—অশিক্ষিত প্রাকৃত জনগণ সকল দেশেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবের বহির্ভূত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় তিনটি। এক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, অপর, আরবী ফারসী অভিজ্ঞ মৌলবীর দল, তৃতীয়, ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়। প্রথমোক্ত দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা আছে কি না, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। যদি থাকে তাহা ইংরাজী শিক্ষা বা ইংরাজসংস্রবের গুণে হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইংরাজীশিক্ষিত দলের লোকেরা কি প্রণালীতে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহাই প্রথমে বিচার্য্য। যদি তাঁহাদিগের শিক্ষার রীতি এমত হয় যে, তদ্দ্বারা বস্তুবোধ এবং ভাবসংগ্রহ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে, তবে ঐ শিক্ষা বৈজ্ঞানিকতা জননের অনুকূল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, এখানকার লোকেরা অতি শৈশবাবধি অতি কঠিন এবং বৈয়াকরণ নিয়মে অসম্বদ্ধপ্রায় বিজাতীয় ইংরাজী ভাষায় সমুদয় শিক্ষালাভ করেন। মাতৃভাষার শিক্ষায় বস্তুজ্ঞান যেমন পরিস্ফুট হয়, বিজাতীয় ভাষার শিক্ষায় কখনই তেমন হইতে পারে

না। ভিন্নদেশপ্রণীত গ্রন্থে সর্ব্বদাই এমন সকল পদার্থের নামোল্লেখ থাকে, যাহা পাঠকবর্গের কখনই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, যে সকল ইংরাজী পুস্তক এখানকার বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবে, সেইগুলি হইতে এতদ্দেশে অপ্রচলিত এবং লোকের অপরিজ্ঞাত বস্তু সমস্তের নাম উঠাইয়া দেওয়া ভাল। কিন্তু শুদ্ধ অপরিজ্ঞাত বস্তুর নামই যে বিদেশীয় ভাষার পুস্তকে থাকে, তাহা নহে। অপ্রচলিত বিজাতীয় ভাবও যথেষ্ট থাকে। সে ভাবগুলির সমগ্ররূপে পরিগ্রহ হইতে পারে না। কারণ পিতৃ মাতৃ প্রভৃতিব কথোপকথনাদিতে ঐ সকল ভাবের সংস্রব না থাকায় সেগুলিও ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষে অপরিজ্ঞাতপ্রায় থাকিয়া যায়। পুস্তকে গঠিত ভাবের সহিত বাহিরের কথায় মিল দৃষ্ট হয় না। এই জন্য বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী কোন সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, ইংরাজীর শিক্ষা নিতান্ত শৈশবে আরম্ভ না হইয়া প্রথমে মাতৃভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা হয় এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার বয়স হইলেও কিছুকাল ইংরাজী ভাষা মাত্র শিক্ষিত হয়, অপর সকল বিষয় মাতৃভাষাতেই শিক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু ঐ চেষ্টা সফলা হয় নাই। না হইবার কারণ এই যে, এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, ওরূপ করিলে ইংরাজী শিক্ষা মাত্রায় অল্প হইবে এবং ইংরাজীর উচ্চারণ সদোষ হইবে। অতি শৈশবে ইংরাজী না ধরাইলে ছেলের "ঢং" টি ইংরাজী হইবে না! অতএব ইংরাজীশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের লোকগুলির বাল্যাবধিই সুপরিস্ফুটরূপে বস্তু এবং ভাব গ্রহণ করা অনভ্যস্ত। উঁহারা যাহা কিছু শিখেন তাহার কিয়দ্ভাগ আন্দাজি বুঝিয়াই রাখেন। এইটি বড়ই কুঅভ্যাস এবং ইহা বৈজ্ঞানিকতা প্রাপ্তির পরম অন্তরায়। তাহার পর, বয়োধিক হইলে কালেজগুলিতে যে শিক্ষা হয়, তাহাতে বৈজ্ঞানিকতার বিশেষ সহায়তা করে না। কালেজগুলিতে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজাদি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া যে সকল ব্যক্তি অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হয়েন, তাঁহারা অধিকাংশই বিজ্ঞানবিদ্যায় তেমন বিদ্যাবান নহেন। যদিও কেহ কেহ গণিতবিদ্যায় মন্দ না হয়েন; তথাপি পরীক্ষাবিধান কার্য্যে প্রায় কেহই পটু নহেন। পরীক্ষাবিধান ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের শিক্ষা বিড়ম্বনামাত্র। শিক্ষার অবস্থা এইরূপ হওয়াতে অধীত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বার্ষিক পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ এদেশে বিজ্ঞান-প্রসূত শিল্পাদির কল-কারখানাও নাই বলিলেই হয়; সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং উহার প্রয়োগজাত বস্তুর প্রত্যক্ষ কি কালেজে, কি বাহিরে, কোথাও হয় না—পুস্তকে পঠিত বৈজ্ঞানিক

কথাগুলি যথাসাধ্য অনুভব করিয়াই বুঝিতে এবং কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। ফলকথা, ইউরোপীয় পুস্তক এবং ইউরোপীয় শিক্ষকের বাক্যের উপরেই নির্ভর করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে।

ফলও তদনুরূপ হয়। ইউরোপীয় পুস্তকাদির বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া পরিগৃহীত, কণ্ঠস্থ, এবং ক্রমে হৃদ্‌গতপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তিব প্রতি বিজ্ঞানানুশীলনের যে বিশেষ প্রভাব আছে তাহা অতি অল্পমাত্রাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সামান্যতঃ বিদ্যাচর্চ্চার যে সাধারণ ফল তাহা ইংরাজী শিক্ষাতেও ফলিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এবং আরবীতে কৃতবিদ্য মৌলবীর অশিক্ষিত প্রাকৃত জনসমূহ হইতে যে প্রভেদ, ইংরাজীশিক্ষিতদিগেরও তাহা কিয়ৎপরিমাণে হইয়া থাকে এবং ভূগোল ইতিহাসাদি পাঠ নিবন্ধন একটু কূপমণ্ডূকতাও ন্যূন হয়, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ কোন ফলই ফলে না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চ্চার যেগুলি ভিত্তি এখানকার ইংরাজী শিক্ষায় সে ভিত্তিগুলির অভাব। বস্তুগ্রহের উপায় নাই, ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মাইবার যত্ন নাই, পরীক্ষাবিধান নাই—সংস্কৃত এবং আরবীয় ব্যাকরণের সূত্র এবং পদসাধন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের নাম এবং তাহাদিগের ব্যাখ্যা শুনা হয় মাত্র। এরূপ শিক্ষায় বৈজ্ঞানিকতা জন্মিবে কেন ?

তবে কি ইংরাজীশিক্ষিত এবং স্বদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ হয় নাই ? হইয়াছে। কিন্তু সে প্রভেদ, বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে নয়—শাব্দ প্রমাণের ভেদ সম্বন্ধে। পূর্ব্বে ছিল দেশীয় শাস্ত্রাদি আপ্তবাক্য, এখন হইয়াছে ইউরোপীয় শাস্ত্রাদি আপ্তবাক্য। ইউরোপের বাহ্যবিজ্ঞানশাস্ত্রগুলি দেশীয় বাহ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শাস্ত্র যাহা কিছু আছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীসম্পন্ন। আমরা সেই উৎকৃষ্টতর বাহ্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের সূত্রগুলি অভ্যাস করিতে পাইয়াছি। অথবা প্রকৃত বাহ্যবিজ্ঞানের কতকগুলি গল্প শিখিয়াছি মাত্র। যদি তাহা হইতেই কোন কালে বৈজ্ঞানিকতা জন্মিবে এরূপ বলা যায় তাহাতে আপত্তি করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে বা জন্মিতেছে এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম।

একবার মনে করিয়া দেখা যাউক, আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় কত অতথ্যে তথ্য বোধ করিয়া মধ্যে মধ্যে মাতিয়া থাকেন। ইঁহারা সহস্র সহস্র প্লাঞ্চেট যন্ত্র ক্রয় করিয়া সেই যন্ত্র যোগে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন—ইঁহারা যেখানে পাঁচজন একত্র হইয়াছেন, সেইখানেই স্পিরিট নামাইবার জন্য টেবিল ঘেরিয়া

বসিয়াছেন—ইঁহারা ইংরাজী ভাষায় বাগ্মিতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের পুত্রবিশেষ বলিয়াও মনে মনে স্বীকার করিয়া কেবল ইংরাজের নিকট লজ্জা পাইবার ভয়ে সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই—ইঁহারা ইউরোপীয়ের ঘরে লিঙ্গশরীরী তিব্বতীয় মহাত্মাদিগেব আবির্ভাবের কথা ইউরোপীয়ের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন! ইঁহারা দেশী হাতচালা ছাড়িয়া বিলাতী হাতচালা ধরিয়াছেন, ইঁহারা দেশী ভূত ছাড়িয়া বিলাতী ভূত লইয়াছেন, ইঁহারা দেশী অবতার ত্যাগ করিয়া বিলাতী অবতার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সকলেই এইরূপ করেন নাই সত্য, কিন্তু দুইজন দশজন করেন নাই বলিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ের মুখরক্ষা হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের এবং কৃতবিদ্য মৌলবীদিগের মধ্যে প্রায় কেহই ঐ সকল হুজুকে যোগ দেন নাই।

পাশ্চাত্য ভাব—বৈজ্ঞানিকতা

৩

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে, এতদ্দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার প্রবেশ হয় নাই, তাহা ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালী এবং ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গতিমতির পর্য্যালোচনা দ্বারা যেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়, দেশের কৃষিশিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থা বিচারপূর্ব্বক বুঝিলেও বিস্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

কৃষি সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, ইউরোপেও কৃষি-বিষয়ে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োগ শিল্প-বিষয়ের অপেক্ষায় অনেক কম। ভূমির কর্ষণ, তাহাতে জল সেচন, যথাকালে তাহার জল নিঃসারণ, ভূমিতে সার যোজন, ভূমিভেদে সারের প্রভেদ সাধন এবং ফসলের পরিবর্ত্তন, এইরূপ কয়েকটি স্থূল স্থূল কার্য্যেই কৃষি-বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়; আর হল চালাইবার, শস্য কাটিবার, নিস্তুষ করিবার জন্য কয়েকটি কলের ব্যবহার হয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারগুলি ইউরোপেও হয়, এ দেশেও হয়। ইউরোপে যত ভাল রকমে হয় এখানে তত ভাল হয় না, তথাপি অনেকানেক বিচক্ষণ ইউরোপীয় পর্য্যটকের মত এইরূপ যে, ভারতবর্ষের কৃষকদিগের পক্ষে ইউরোপীয়ের স্থানে স্বদেশোপযোগী কৃষি সম্বন্ধে নূতন কিছুই শিখিবার নাই। দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং নবাগত ইউরোপীয় নীলকর প্রভৃতির মধ্যে একটু মতান্তর আছে বটে। তাঁহারা মনে করেন যে এ দেশেও ইংলণ্ডের ব্যবহৃত লাঙ্গলের অনুরূপ লাঙ্গল প্রয়োজনীয়, মনে করেন যে ইংলণ্ডে মৃত্তিকাদি লইয়া

পরীক্ষা করিয়া যেমন বলা হয়, এ মাটিতে অমুক অমুক রাসায়নিক পদার্থ এত এত পরিমাণে আছে, ইহাতে এই এই ফসল ভাল হইবে, ইহাতে এইরূপ বা ঐরূপ সার দেওয়া আবশ্যক, এখানেও সেইরূপে কৃষকবর্গের পথপ্রদর্শক কৃষি বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন। কিন্তু শুনা গিয়াছে এবং দেখাও গিয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রদেশভেদে যেখানে যেখানে মৃত্তিকার প্রকৃতি ভিন্ন সেই সেই স্থানে বিভিন্নরূপ লাঙ্গলের ব্যবহার চিরপ্রচলিত আছে, আর কৃতকর্ম্মা কৃষকগণ পারম্পর্য্যোপদেশানুবর্ত্তী হইয়া মৃত্তিকার প্রকৃতি বুঝিতে বিলক্ষণ সক্ষম এবং তাহা বুঝিয়া আপনাদিগের সামর্থ্যানুসারে সারের এবং বীজের ভেদ করিয়াও থাকে।

তথাপি মৃত্তিকাদির রাসায়নিক পরীক্ষাবিধান হইলে যে ভাল হয় না, এমত নহে। কিন্তু তাহা ত করা প্রায়ই হয় না, এবং যে যে স্থলে পরীক্ষাবিধানে অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিগণ তাহা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেখানেই ঠকিয়াছে। অনন্তর দেশীয় প্রাচীন কৃষকদিগের স্থানে তাহাদিগকে শিখিতে হইয়াছে কোন্ জমিতে কোন্ ফসল ভাল হইবে, কোন্ জমিতে কোন্ সার লাগিবে। যিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিবেন যে সাধারণতঃ এদেশের কৃষিকার্য্যে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকতা বিন্দুমাত্রও লব্ধপ্রবেশ হয় নাই। উদ্যানশোভাজনক ফুল-ফলের চারা প্রস্তুত করায় এ দেশের মালীরা ইংরাজ মনিব প্রভৃতির স্থানে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছে মাত্র।

আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ইউরোপীয় শিল্প শিক্ষা। আমাদের দুই চারি জন যায় ইংলণ্ডে কৃষি শিক্ষার জন্য। তাহারাও দেশে আসিয়া প্রায়ই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়!

বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ প্রভাব কৃষির উপর নহে, শিল্পেরই উপর। শিল্প সম্বন্ধে আদৌ বক্তব্য এই যে, শিল্প অতি বহুবিধ। যাহা কিছু উপভোগ-যোগ্য, তাহারই সহিত শিল্পের সংস্রব আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে শিল্পের নাম কলা। তাহা চতুঃষষ্টি প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইউরোপীয়েরা শিল্পের দুইটি স্থূলভেদ করেন। একপ্রকার শিল্প মনুষ্যশরীরের সাক্ষাৎ উপভোগ্য বস্তুজাত প্রস্তুত করণে নিযুক্ত; অপর প্রকারের শিল্প হইতে মানস সুখপ্রদ দ্রব্যজাত ও কার্য্যকলাপ জন্মে। প্রথম প্রকারের শিল্পকে উপভোগ্য শিল্প এবং দ্বিতীয় প্রকারের শিল্পকে সুকুমার শিল্প * বলা যায়। সুকুমার শিল্পগুলিতে উৎকর্ষলাভ সহৃদয়তা এবং ইন্দ্রিয়পটুতা-মূলক।

* কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য, বাস্তু এই কলা পাঁচটিকে ইংরাজীতে 'ফাইন আর্টস্' বলে, এ কলা-পঞ্চককে সুকুমার শিল্প বলিয়াই অভিহিত করা গেল।

উহাদিগের সহিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের ততটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নয়। ঐ সকল শিল্পে ভারতবাসীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এখনও কতকটা আছে। পূর্ব্বোন্নতির প্রমাণ দেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষতঃ যে ভাগে চিত্রভাস্কর্য্য-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের অধিকার অতি প্রবল হয় নাই, সেই দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেবমন্দির প্রভৃতিতে অতি জাজ্বল্যমানরূপেই আছে। উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরের প্রধ্বস্তাবশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, এমন দিব্যগঠন মন্দির, প্রাসাদ এবং ভাস্করীয় মূর্ত্তি সকল আছে যে, তাহা দেখিয়া অনেকানেক ইংরাজ বলিয়াছেন যে ওগুলি গ্রীক্ কারিগর ভিন্ন আর কাহারও হস্তবিনির্ম্মিত হইতে পারে না। * বাস্তবিক ঐ সকল কীর্ত্তি নব্য ইউরোপীয় কারিগরদিগেরও অনায়াসসাধ্য এবং উৎকর্ষসাধ্য নয়। মতুরা নগরের ত্র্যম্বক নায়কের প্রাসাদ বলিয়া যে সুন্দর ভবনটি বিদ্যমান আছে, তাহার সহিত তুলনায় আধুনিক ইংরাজ এঞ্জিনিয়র কর্তৃক নির্ম্মিত পুণা সন্নিহিত গণেশখণ্ডের গবর্ণমেণ্ট হৌস এবং ইন্দোরের নব রাজভবন অপকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয়।

কিন্তু এই সকল উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যে বিজ্ঞানের প্রভাব তাদৃশ নহে। উপভোগ্যজনক শিল্পের উপরেই বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপ প্রভাব। সেইগুলির প্রতিই যন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল শিল্পজাত সম্বন্ধেও একটি কথা বক্তব্য এই যে, উত্তম কারিগরের হস্তবিনির্ম্মিত শিল্প হইতে যন্ত্রপ্রসূত শিল্প উৎকৃষ্ট হয় না। আজিকালি অনেকানেক ইউরোপীয়েরাও ইচ্ছা হইয়াছে যে, তাঁহারা যত দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার করেন, তাহার সকলগুলিই হস্তপ্রসূত না হইয়া শিল্পীদিগের হস্তপ্রসূত হয়। এদেশেও যাঁহারা দেশীয় এবং বিলাতী উভয় প্রকার বস্ত্রাদির ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, যন্ত্রপ্রসূত বিলাতী কাপড় অপেক্ষা হস্তপ্রসূত দেশীয় ভাল কাপড় শতগুণে উৎকৃষ্ট। স্থূল কথা, যন্ত্রপ্রসূত শিল্পজাত অল্পমূল্য বলিয়াই এত সমাদৃত।

যন্ত্রপ্রসূত দ্রব্য অল্পমূল্য হয় কলের গুণে। কলে উৎকৃষ্ট হউক, অপকৃষ্ট হউক,

---

* কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমার কাছে ঐ কথা বলিলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, কুমারসম্ভবাদি যে সকল কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃতে বিদ্যমান আছে, সেগুলি কোন্ কোন্ গ্রীক কবি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তাহা জানিতে বড়ই কৌতূহল হয়; কারণ ওগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী অতিশয় পরিপাটী এবং সমীচীন সহৃদয়তার ও সুরুচির ব্যঞ্জক। যাজপুর নগরের সুন্দর শৈলস্তম্ভটির সম্বন্ধেই কথা উঠিয়াছিল।

যেরূপ শিল্পোপাদান প্রদত্ত হউক, যন্ত্রের প্রভূত বলে উহা কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। অপকৃষ্ট উপাদানের মূল্য কম হয়, এই জন্য তজ্জাত দ্রব্যেরও মূল্য কম হয়। মূল্য ন্যূন হইবার অপর কারণ, কলের প্রয়োগে মনুষ্যের বল অল্প লাগে, সুতরাং মজুরির খরচ কম হয়। এই দুই কারণে খরচের লাঘব হয় বলিয়া যন্ত্র-প্রসূত শিল্পজাত স্বল্পমূল্য হয়।—আমাদের দেশে যন্ত্রের বহুল প্রচার হইলে মজুরদার লোকের কর্ম্ম কমিয়া যাইবে বলিয়া এখন আর শঙ্কা করিবার কারণ নাই। যেহেতু এ দেশের লোকেরা বিলাতী শিল্পজাতের আমদানিতে নিষ্কর্ম্মা এবং নিরন্ন হইয়া একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর গিয়া পড়িতেছে। অতএব এদেশে কল চলিলে কতক পরিমাণে কৃষিবৃত্তির উপর চাপ কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং এদেশে কলকারখানা হইয়া যন্ত্রপ্রসূত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় কোন দোষই হইতে পারে না। কিন্তু কল-কারখানা কয়টি বসিয়াছে ?

দেশে বৈজ্ঞানিকতার সত্য সত্যই প্রবেশ হইলে, এতদিনে কল-কারখানার সংখ্যা এত ন্যূন এবং যে কয়েকটি আছে তন্মধ্যে দেশীয়ের সংখ্যা এত কম থাকিত না।

জাপানীয়েরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং শিল্প শিখিতেছে। বর্ষে বর্ষে তাহাদের শতাধিক সংখ্যক লোক ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকায় গিয়া ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং স্বদেশে আসিয়া স্বাধীনভাবে কলকারখানা চালায়। ইহারই মধ্যে উহারা দুই তিনটি ইউরোপীয় কলের সংস্কার এবং উৎকর্ষ সাধন করিয়া তুলিয়াছে। ইউরোপীয় শিল্পীর প্রতিযোগিতা করিয়া উহারা ভারতবর্ষে আপনাদিগের দিয়াশলাই বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। আমরা যখন জাপানীয়দিগের ন্যায় ইউরোপে গিয়া শিল্প বিজ্ঞান শিখিয়া আসিতে পারিব, তখনই আমাদিগের মধ্যে দেশহিতকর বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার আরম্ভ হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, জাপানের কৃষিকার্য্য ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্য হইতে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে নাই। জাপানীয়েরা কেহই কৃষিবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত ইউরোপে যায় না—শিল্প শিখিতেই যায়।

ইংরাজ-সংসর্গে আমাদিগের যদি কোন বিজ্ঞান যথারীতি শিক্ষা হইতেছে এমন হয়, তবে সেটি চিকিৎসাবিজ্ঞান। উহার অবস্থা কিরূপ তাহা দেখিলেই আমাদিগের মধ্যে যে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার দোষে অথবা অন্য কারণে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার হইতে পারে নাই, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হইবে। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদীয়, হাকিমি এবং ডাক্তারি এই তিন প্রকার চিকিৎসা চলিতেছে। তন্মধ্যে

প্রথম দুই প্রকার চিকিৎসার কথা এস্থলে বিচার্য্য নহে। তৃতীয় প্রকারের চিকিৎসাকেই বিজ্ঞানমূলক বলা হইয়া থাকে। এবং উহাতেই উন্নতির সম্ভাবনা শংসিত হয়। কিন্তু আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তারেরা এ পর্য্যন্ত উহার কিছুমাত্র উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিয়াছেন কি? দেশে অপর দুই প্রকার চিকিৎসাপ্রণালী চলিতেছে। তদ্দ্বারা শত শত স্থলে তাঁহাদিগের অসাধ্য রোগেও প্রতীকার হইতেছে। দেশমধ্যে অসংখ্য ভৈষজ্য আছে, যাহাদিগের গুণ ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয় নাই। তথাপি কোন একটি স্থলেও কি তাঁহারা ঐ গুলির গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করেন? ডাক্তার টোয়াইনিং, ওসাগনেসী, ওয়াইজ এবং তাদৃশ দুই চারিজন কিছু করিয়াছিলেন, দেশীয় কেহই ভৈষজ্যদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু মার্কিনদেশীয় ডাক্তারেরা স্বদেশের আদিমনিবাসী বর্ব্বর ইণ্ডিয়ানদিগেরও ব্যবহৃত ঔষধাদি হইতে বহুসংখ্যক ঔষধের আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানেরও যেমন সুশিক্ষা হয় না, চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও সেই দশা হইয়া আছে।—অর্থাৎ উহা দ্বারাও এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তির বৈজ্ঞানিক ভাব প্রাপ্তি হয় না। যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্র প্রথমে মুখস্থমাত্র হইয়া পরে তাহার স্মৃতি অল্পমাত্রাতেই পরিণত হইয়া থাকে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানও তেমনি ক্রমশঃ যৎসামান্য ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী হইয়া থাকে। উহাও বৈজ্ঞানিক ভাবের জনক হইতে পারে নাই।

কয়েকটি প্রকৃত ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহাতে কি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, কি অপরাপর বিজ্ঞানে, ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতটা অনভিজ্ঞতা আছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

(১) কোন গৃহস্থের একটি বালিকা আপনার নাকের নোলক মাকৃড়ি শুদ্ধ গিলিয়াছিল। বাটীর ডাক্তারকে ডাকা হইল এবং কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করা হইল। ডাক্তারটি কালেজের পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং চিকিৎসাকার্য্যে সুপ্রতিপন্ন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিলেন যে, বালিকাটিকে কিছু নাইট্রোমুরিয়াটিক্ দ্রাবক পান করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বাটীর কর্ত্তা বলিলেন, উহার পেটটি কি কাঁচের বোতল যে, ঐ দ্রাবকে তাহা নষ্ট হইবে না? বালিকাটির পরমায়ু ছিল।

(২) একজন শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে বস্তুমাত্রের সচ্ছিদ্রতা বুঝাইবার সময় বলিলেন,—"তোমরা দেখ নাই, ঘরের শার্শির বাহির পিঠে বৃষ্টির জল লাগিলে

ভিতর পিঠেও কিছু কিছু জল জমা হয়? শার্শির গ্লাস সচ্ছিদ্র না হইলে কি তাহা হইত?"

(৩) এতদ্দেশীয় কতকগুলি বড়লোক ইল্‌বার্ট বিলের গোলযোগের সময় কেস্‌উইক্ প্রমুখ ইংরাজদিগের সহিত মিলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বক্তৃতা করিলেন, "যেমন নৌকা হইতে আকষী দিয়া টানিলে জাহাজটা সরিয়া আইসে, আমরা তেমনি ইংরাজদলকে স্বদলে টানিয়া লইতেছি।" উপমাটি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেই প্রকৃত কথা হইত।

(৪) "শীতকালের দিন ছোট হয় কেন?" "শীতকালে পৃথিবীর গতি দ্রুত হইয়া উঠে, তাই দিন ছোট হইয়া পড়ে।" "গতি দ্রুত হয় কেন?" "কেপ্‌লরের তৃতীয় নিয়মানুসারে।"

(৫) কোন খ্যাতনামা ব্রাহ্ম বলিয়াছেন "পৃথিবী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত—ঠিক পেঁয়াজের খোসার মত। যেখানে মাটি খুঁড়িবে সেই স্থানেই সকল স্তর পাওয়া যাইবে। পৃথিবী যে কাহার গঠিত ভূতত্ত্বেই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।"

(৬) পিতা সংস্কৃতজ্ঞ, পুত্র ইংরাজীনবীস। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার হয় সত্য—জোয়ার দিন রাত্রির মধ্যে দুইবার হয় কেন?" পুত্র উত্তর করিলেন "পৃথিবী ঘোরে কি না, তাই ঐরূপ হয়, জোয়ারটাও ঘুরিয়া আইসে; পৃথিবী যে ঘুরে জোয়ার ভাটাই তাহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।" পুত্রটি তাহারই পূর্ব্ববর্ষে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় খুব নম্বর পাইয়া পাস হইয়াছিলেন!

(৭) একটি সুকুমারী বালিকার বুকে সর্দ্দি বসিয়াছিল; ডাক্তার আসিয়া তাহাকে খানিকটা তুঁতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বলিল, "তুঁতে যে বিষ।" ডাক্তার বলিলেন "বমি করাইবার জন্য তুঁতে দিলাম, উহা পেটে থাকিলে ত বিষ হইবে।"

(৮) আর একদিন পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ বলে সমুদ্রের জল ফাঁপিয়া উঠিয়া জোয়ার হয়, বায়ুমণ্ডলেও কি ঐরূপ হয় না?" পুত্র বলিলেন "না, তাহা হয় না।" "কেন?" পুত্র বলিলেন—"কোন পুস্তকে ঐ কথা লেখা নাই!"

সত্য কথা, আমাদিগের যে বিজ্ঞানবিদ্যা তাহা পুস্তকেই আছে, উহা দ্বারা বুদ্ধির এবং চিত্তের কোন সংস্কার হয় নাই। দেশের উপভোগ্য শিল্পজাতও সম্বর্দ্ধিত এবং স্বল্পমূল্য হইয়া উঠে নাই। আমরা তৎসমুদায় অন্য দেশ হইতে পাইতেছি,

এবং সকল লোকই ক্রমশঃ একমাত্র চাকুরি এবং কৃষি ব্যবসায়ের উপর নির্ভরপ্রবণ হইতেছি।

পাশ্চাত্য ভাব—রাজার সমাজ-প্রতিভূত্ব

ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় সমাজগুলির উপাদান ভিন্নরূপ। ইউরোপে যদিও কোন অতি বহুপূর্ব্বকালে এস্কুইমোদিগের সদৃশ নিকৃষ্ট জাতীয় মনুষ্যের আবাস ছিল এরূপ প্রমাণ হয়, তথাপি ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে তথায় ককেসীয় ভিন্ন অপর কোন জাতীয় মনুষ্যের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। রোমীয়েরা যে সকল বর্ব্বর জাতীয়দিগকে পরাজিত করিয়া ইউরোপে আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করে তাহারা সকলেই ককেসীয় বর্ণের মধ্যে, কেহ বা কেল্‌টীয়, কেহ বা টিউটোনীয় লোক ছিল। রোমীয়েরা নিজে কেল্‌টীয় আর তাহাদের সাম্রাজ্য-বিধ্বংসকারী বর্ব্বরেরা অধিক পরিমাণেই টিউটোনীয় ছিল। অতএব ইউরোপের রাজ্যগুলি অধিকাংশই মূলতঃ এক জাতীয় লোকের অবাসভূমি।

সকল দেশেরই সমাজ-সংঘটনে বিভিন্ন স্তরের বিনিবেশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের সংঘটনে ইউরোপের ন্যায় সমুদয় স্তরের একজাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। এখানে দ্রাবিড়ীয়, কোলেরীয়, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি মূলতঃ ভিন্নজাতীয় লোকেরা ককেসীয় বর্ণসম্ভুক্ত আর্য্যজাতির নিম্নভাগে অবস্থিত। সেই আর্য্য জনগণের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে ঐ মূলতঃ বিভিন্ন বর্ণের লোকসকল ক্রমশঃ সম্মিলনের এবং একতার দিকে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে; এবং অনেক পরিমাণে ধর্ম্ম-সামঞ্জস্য, ভাষা-সামঞ্জস্য এবং ব্যবহার-সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইউরোপের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় সমাজের উপাদান যেমন ভিন্ন-প্রকৃতিক, ঐ উপাদানগুলির উপর্য্যুপরি বিনিবেশও তেমনি ভিন্নরূপ। নব্য ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যগুলি এক রোমসাম্রাজ্যের সুপ্রশস্ত ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদের কর্তৃক বিজিত রোমীয়দিগের স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করে, এবং রোমের ধর্ম্ম-শাস্ত্র রোমের ব্যবস্থা-শাস্ত্র এবং রোমের সাহিত্য-শিল্পাদি প্রাপ্ত হইয়া সভ্য হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে ওরূপ কোন সুসভ্য সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিজয় করিয়া আর্য্য পুরুষেরা এখানে বাস করেন নাই। তাঁহারা নানা ভাষাভাষী, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দস্যুদৈত্যাদির দলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের শাসন, পালন এবং শিক্ষা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অতএব ইউরোপীয় রাজ্যগুলির তলভাগের স্তরে একতা এবং সভ্যতার নিবেশ, উপরের স্তরে অনৈক্য এবং বর্ব্বরতার স্থান ; ভারতবর্ষের তলভাগে অনৈক্য এবং বর্ব্বরতা, উপরি স্তরে জ্ঞান এবং সভ্যতার আশ্রয়। এই মৌলিক পার্থক্য হইতে অনেক বিষয়ের অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে এবং সেইগুলির বিশেষ বিচার না করিয়া যাঁহারা ইউরোপীয় ইতিহাস হইতে সূত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সমাজ-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা সুবহু স্থলেই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

নব্য ইউরোপীয় জাতিগুলি রোমসাম্রাজ্যের নানা খণ্ড জয় করিয়া সাম্রাজ্য-প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক খ্রীষ্টান হয়। অতএব তাহারা বিজিত লোকদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেয় নাই, তাহাদিগেরই স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য ইউরোপে ধর্ম্মশাসনের গৌরব ন্যূন। শুদ্ধ ধর্ম্মশাসনের গৌরব ন্যূন এমত নহে, ইউরোপে ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণকে রাজ্যপালের অধীন হইয়াই চলিতে হইয়াছে। ইউরোপীয় ইতিহাসে ধর্ম্মশাস্তৃগণের সহিত রাজ্যপালদিগের বিবাদ-বিসম্বাদের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ থাকিলেও রাজ্যপালেরাই যে অধিক স্থলে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্থলেই লব্ধ-বিজয় হইয়াছেন তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়া আছে। কাথলিক ধর্ম্মশাস্তা পোপের উৎকট প্রাবল্যের সময়েই ইউরোপীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে রাজ্যপালেরা স্ব স্ব দেশীয় ধর্ম্মশাস্তৃগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় সম্যক্ বিরত হয়েন নাই, এবং বহুস্থলে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। রোমান কাথলিকেরা যাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদিগের বার আনা বিজিত জাতীয়, সিকি মাত্র বিজেতৃজাতীয় পুরুষ ছিলেন।

ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারে নাই। এখানে রাজ্যসাশন এবং ধর্ম্মশাসন উভয় শক্তিই আর্য্যপুরুষদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। এখানে ধর্ম্মশাসন, রাজ্যশাসন অপেক্ষা অল্প গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই। প্রত্যুত ধর্ম্মশাসন কার্য্যে অধিকতর বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানের এবং পবিত্রতার প্রয়োজন বলিয়া উহাই সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এখানে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনের অধীন হইয়া পড়া দূরে থাকুক, উহাই প্রবলতর এবং রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল।

ইউরোপে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনের অধীন হওয়াতে রাজশক্তি অযথা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মযাজকপ্রমুখ গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সকলেই একবাক্য হইয়া বলিতে লাগিলেন যে রাজার শক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত, উহার প্রতি কোন বাধা প্রদানে মনুষ্যের অধিকার নাই।

ভারতবর্ষে ঠিক ওরূপ মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। এখানকার শাস্ত্রে রাজশরীর

যদিও দেবশরীর বলিয়া বর্ণিত, তথাপি রাজা কর্তৃক পরিচালিত যে শাস্ত্রীয় দণ্ড তাহাই প্রকৃত রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥

সেই দণ্ডই রাজা, পুরুষ, নেতা, এবং শাসিতা, তিনিই চতুরাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিভূ।

ইউরোপীয় সমাজে রাজশাসন ধর্ম-শাসনকে আত্মসাৎ করিয়া নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সমাজের মধ্যে কোন একটি শক্তি একান্ত প্রবল হইলে তাহার দমনের এবং খর্ব্বতাসাধনের প্রয়োজন হয়। এইজন্য ইউরোপীয় সমাজের অন্তর্ভূত অপরাপর দলের, যথা, ভূম্যধিকারী এবং প্রজাসাধারণের বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তির উদ্রেক হওয়াতে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান হইতে থাকিল, রাজাদিগের পদচ্যুতি ঘটিল এবং তাহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের সহিত বিশেষ বিশেষ নিয়মাবধারণ হইল। কিন্তু সামান্য নিয়মে অত্যাচার বন্ধ হইয়া থাকে না। আবার অত্যাচার, আবার অভ্যুত্থান, আবার নিয়মবন্ধ হইল। কোথাও কোথাও প্রজাগণ প্রকাশ্য সভাস্থলে রাজার দোষের বিচার করিয়া তাঁহাব প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিল। ঐ সময়ে একটি মতবাদ বাহির হয়, তাহাকে সামাজিক চুক্তিবাদ বলিযা অভিহিত করা যায়। উহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজা-প্রজার মধ্যে কোন কালে যেন এইরূপ একটা চুক্তি হইয়া আছে যে, রাজা যথানিয়মে প্রজাপালন করিলেই প্রজাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইবেন, তাহার অন্যথাচরণ করিলে তিনি পদচ্যুত হইবেন।

ভারতবর্ষে ওরূপ কোন চুক্তির কল্পনা হয় নাই। না হইবার কারণ, এখানে রাজশক্তিকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রবলতর ধর্ম্মশাসন বিদ্যমান ছিল। সেই ধর্ম্মশাসন বলিয়াছিল—

"দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্॥"

দণ্ড সুমহৎ তেজবিশিষ্ট, অকৃতাত্মা-কর্ত্তৃক তাহা চালিত হইতে পারে না; ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে বন্ধুবর্গ সহিত রাজাও দণ্ডদ্বারা হত হয়েন।

"তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥"

রাজা তাহার সমুচিত প্রণয়ন করিলে ত্রিবর্গ ফল লাভ করেন, কিন্তু কামাত্মা, কোপনস্বভাব এবং ক্ষুদ্রাত্মা হইলে দণ্ডদ্বারাই স্বয়ং হত হয়েন। রাজার প্রতি দণ্ড

প্রণয়ন যে কথার কথা মাত্র ছিল তাহা নহে। মনুসংহিতাতেই ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—

বেণোবিনষ্টোইবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাঃ পৈজবনশ্চৈব সুমুখোনিমিরেব চ॥

নীতিভঙ্গ দোষে বেণ রাজা, নহুষ রাজা, পিজবন-পুত্র সুদা রাজা, সুমুখ রাজা এবং নিমি রাজা বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং নাটকাদি হইতেও ঐরূপ অনেকানেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই স্থলে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষীয় জনগণ হইতে ইউরোপীয়দিগের মনের গতি কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হইয়া আছে। ইউরোপীয়দিগের মনে চুক্তির ভাবটা কিছু শীঘ্র এবং সহজে সমুদিত হইয়া থাকে। উঁহারা স্বভাবজাত সম্বন্ধগুলিরও মূলে একটা চুক্তির ক্রিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইহার প্রকৃত কারণ, উঁহাদিগের প্রকৃতিগত স্বৈরভাবের প্রাবল্যও হইতে পারে, আর কার্য্যকলাপে বণিক্‌বৃত্তির বাহুল্যও হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক, ভারতবর্ষীয়েরা বিধি-প্রতিপালনকেই যেমন ধর্ম্ম-ব্যবহারের নিদানভূত জ্ঞান করেন, ইউরোপীয়েরা চুক্তির অনুসরণ করাকেও প্রায় সেই চক্ষে দেখেন। এই জন্যই রাজা এবং প্রজার মধ্যে চুক্তির কল্পনা ইউরোপীয়দিগের মনে উদিত হইয়াছিল। ঐ কাল্পনিক মতবাদ স্থায়ী হয় নাই বটে, কিন্তু ইউরোপীয় রাজ্যগুলিতে যে ক্রমে ক্রমে রাজ্যের শারীরিক বিধির সুস্পষ্ট ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং রাজগণ সেই ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐ চুক্তি সম্বন্ধীয় মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল। ফলতঃ পূর্ব্বের কল্পনাটিই প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং রাজা সমাজের প্রতিভূমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—তাঁহার সর্ব্বময় অধিকারের ভাব তিরোহিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও ধর্ম্মশাসনের স্বতন্ত্রতা থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল; তবে ইউরোপের ন্যায় এখানে সামাজিক চুক্তির কল্পনার অথবা পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবান্তে নূতন করিয়া শারীরিক-ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হয় নাই। এখানকার প্রাচীন সংহিতাতেই লিখিত হইয়াছে যে, শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা যে রাজা জীবন ধারণ করেন তাঁহার যশ অতি বিস্তৃত হয়। রাজা শিলোঞ্ছবৃত্তির * দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, ইহা মনে করিতে গেলেই বুঝা যায় যে, রাজা আপনাকে নিজ ধনাগারাদির অধিকারী বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না। আপনাকে

* মনু ৭অ ৩৩ শ্লোক।

সমাজ কর্তৃক ন্যস্ত ধনেরই রক্ষিতা বলিয়া মনে করিতেন। *

"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা ॥"

আপনাপন ধর্ম্মে নিবিষ্ট সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের অভিরক্ষিতারূপেই রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন।

"শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥"

শরীরের প্রতি পীড়া প্রদানে যেমন প্রাণ ক্ষীণ হয়, সেইরূপ রাজ্যের পীড়নে রাজার প্রাণ ক্ষীণ হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি মনুবচনে একস্থানে দণ্ড বা রাজার প্রতি প্রতিভূ শব্দেরও স্পষ্ট প্রয়োগ আছে—

"চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য ইউরোপে নানা বিবাদ-বিসম্বাদ এবং রক্তারক্তি কাণ্ডের পর কালক্রমে চুক্তির কাল্পনিক মূলে রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব স্থাপিত হইয়াছে; আর ভারতবর্ষে ধর্ম্মশাসনের স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন বিধিপ্রতিপালনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা-রূপ ভিত্তির উপর রাজার প্রতিভূত্ব সংঘটিত হইয়াছে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, চুক্তিরক্ষা এবং বিধিপালন এই দুইটির মধ্যে কোন্ ভিত্তিটি দৃঢ়তর, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, বিধিপ্রতিপালন ভিত্তিটিই অধিকতর দৃঢ় এবং প্রশস্ত—কারণ চুক্তিরক্ষা বা প্রতিশ্রুতিপ্রতিপালন ধর্ম্মটিও বিধি-প্রতিপালনের উপরেই সংস্থাপিত। অগস্ট কোমটি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, সমাজ মধ্যে ধর্ম্ম-শাসনের প্রাধান্য সংস্থাপিত হওয়া বিধেয়; ভারতবর্ষে তাহাই হইয়াছিল। এখানে রাজশাসন ধর্ম্মশাসনের বশীভূত ছিল। অতএব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে, ভারতবর্ষে রাজার সমাজ-প্রতিভূত্বের ভাবটি নূতন সঞ্চারিত হইয়াছে, এ কথা প্রকৃত নহে। তবে রাজাকে কোথাও লুপ্তশক্তি কোথাও বা হ্রস্বশক্তি করিয়া বিস্পষ্টরূপে প্রজাসাধারণের অভিমতি গ্রহণপূর্ব্বক সংগঠিত প্রতিভূসমিতি দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা ইউরোপীয় রীতি। উহার সর্ব্বাবয়ব এদেশে কখনই পরিস্ফুট হয় নাই। ইউরোপীয় প্রণালী কাল্পনিক

* মুসলমানদিগের অভ্যুদয়কালে এইরূপ নীতির অনুসরণেই কোন কোন ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট্ স্বহস্তে কোরাণ লিখিয়া তাহার বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, কেহ কেহ বা ভিক্ষোপজীবী হইতেন।

চুক্তিমূলক বলিয়া উহার অভ্যন্তরে এই অতথ্যটির সঞ্চার হইয়াছে যে, কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত লোক মাত্রেই অতি গরিষ্ঠ রাজকার্য্য পরিচালনেও মতামত প্রদান করিতে সক্ষম এবং অধিকারী। এই অতথ্য ইউরোপের সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতে এই মৌলিক দোষ থাকায় উহা অতিশয় বিপ্লব-প্রবণ হইয়াছে। সেই জন্যই ইউরোপে সোশিয়ালিস্ট, আনারকিস্ট, নিহিলিস্ট প্রভৃতি সমাজ-বিপ্লবকারীদের উৎপাত এবং আমেরিকায় বিচারকার্য্যেও হঠকারী প্রাকৃত লোকের হস্তক্ষেপে লিঞ্চ-ল এর উৎপত্তি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সুদূরদর্শী কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রতিভূ নির্ব্বাচন প্রণালীর সঙ্কোচ ও সমিতিগঠন রীতির পরিবর্ত্ত করিতে চাহিতেছেন।

অপর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইংরাজী হইতে যে সকল ইতিহাসাদি গ্রন্থ সাধারণতঃ অধ্যয়ন করা হয়, সেগুলি প্রায়ই প্রটেস্টাণ্ট মতাবলম্বীদিগের প্রণীত। প্রটেস্টাণ্টরা ধর্ম্ম-শাসনের পরম বিদ্বেষ্টা। তাঁহারা ধর্ম্মশাসনের প্রাধান্যকে যাজকতন্ত্রতা বলেন, এবং ঐ শাসনকে রাজার শাসন অপেক্ষা কঠিনতর এবং সর্ব্বপ্রকারে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন।

কিন্তু তাঁহাদের কথা প্রকৃত কথা নহে। বিশেষতঃ প্রটেস্টাণ্টদিগের পুস্তকাদিতে যাজকতন্ত্রতার যে সকল দোষের উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহার কিছুই ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্বন্ধে খাটে না। এখানকার ধর্ম্মশাসনের যে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট হইবে।

(১) অন্যান্য সমাজে, যথা রোমান কাথলিক এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যে, যাজকেরা গৃহস্থ লোক নহেন। তাঁহারা বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন না। সুতরাং প্রজাসাধারণের সহিত তাঁহাদিগের সহানুভূতি অল্প হয়। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থ লোক।

(২) অন্যান্য সমাজে যাজকেরা এক একটি দলপতির অধীন। রোমানকাথলিকেরা পোপের অধীন, বৌদ্ধযতিরা দেশভেদে ধর্ম্মরাজের অথবা লামার কিম্বা প্রধান ফুঙ্গীর অধীন। ব্রাহ্মণেরা ওরূপ কোন দলপতির অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহারা সাধারণ সমাজ হইতে কোন ভিন্ন সূত্রে সম্বদ্ধ না হওয়াতে সেই সাধারণ সমাজেরই প্রতি সম্পূর্ণ মমতাসম্পন্ন।

(৩) অন্যান্য সমাজে, যথা প্রটেস্টাণ্ট এবং গ্রীক সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে, যাজকদল রাজার ভৃতিভুক্; সুতরাং পরাধীন। ব্রাহ্মণেরা সেরূপ নহেন। ইঁহারা যে নিষ্কর ভূমি অধিকার করিতেন, তাহা পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে

ভোগ করিতেন—রাজা তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণদিগের অপরাপর জীবনোপায়ও গৃহস্থের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানাদি হইতে হইত। স্থতরাং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন এবং সত্ত্ব-গুণ-প্রধান থাকিয়াই ধর্ম্মাধিকরণে এবং শাস্ত্রশিক্ষা প্রদানে সমীচীনরূপে যোগ্য হইতে পারিতেন।

(৪) অন্যান্য সমাজে, যথা খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের মধ্যে, ধর্ম্মশাস্তৃগণকে যতটা সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজসাহায্য লইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, ভারতবর্ষের সমাজপ্রণালীতে অন্তঃশাসনের আধিক্য নিবন্ধন তত করিতে হয় নাই। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচারব্যবহার দেখিয়া সেই দৃষ্টান্তানুসরণ করিবার উপদেশই বহুলপরিমাণে আছে। প্রায়শ্চিত্তের বিধি রাজদণ্ডের বিধি নয় এবং অন্যান্য সকল সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই অধিকতর পরিমাণে ধর্ম্মশাসন নির্ব্বাহিত হইবার ব্যবস্থা আছে।

অতএব ভারতবর্ষের এবং অপরাপর সমাজের ধর্ম্মশাসনে আকাশ-পাতাল ভেদ। অন্যান্য সমাজের ন্যায় এখানকার ধর্ম্মশাসনকে যাজকতন্ত্রতা মনে করা এবং তাহার প্রতিকূল মতবাদ গ্রহণ করা অতি প্রকাণ্ড ভ্রম।

পাশ্চাত্য ভাব—তাহার উপসংহার

ভারতবর্ষে ইংরাজ-সমাগমে যে পাশ্চাত্য ভাবগুলির প্রবেশ হইয়াছে, বলা হয়, সেগুলির বিচার করিয়া দেখা হইল যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি আদবেই ভাল বস্তু নয়—আর কোন কোনটি নূতন বস্তু নয়—অপর যাহা ভাল এবং কতক নূতন তাহার যথাযথ প্রবেশ হয় নাই। পূর্ব্বগত কয়েক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে (১) একান্ত স্বার্থপরতা ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং (২) উন্নতিশীলতার প্রকৃতপথ যে চিত্তাদর্শের উৎকর্ষসাধন তাহা ইংরাজসংশ্রবে সাধিত হইতে পারে না। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৩) ইউরোপীয় সাম্যবাদটা নিতান্ত মৌখিকও বটে এবং মিথ্যাও বটে, আর ভারতবর্ষে উহার পর্য্যাপ্ত স্থানও নাই। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৪) ঐহিকতা যে পরিমাণে এবং যে ভাবে এ দেশে দমিত হইয়া আছে, তাহা থাকাই ভাল। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৫) স্বাতন্ত্রিকতার যে পথ খুলিয়াছে তাহা প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার পথ নহে, অতি মারাত্মক উচ্ছৃঙ্খলতারই পথ। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৬) এদেশে বৈজ্ঞানিকতার প্রকৃত প্রস্তাবে সঞ্চার হয় নাই। পরিশেষে দেখা গিয়াছে যে (৭) রাজার সমাজ-প্রতিভূত্ব সংস্থাপনের যে উপায় ভারতবর্ষে ছিল, তাহা বর্ত্তমান

রাজশাসন দেশীয় ধর্ম্মশাসনের নিরপেক্ষ হওয়ায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, আমি যেরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সেই রূপেই হউক বা অন্য কোন প্রকৃত রূপেই হউক যিনিই উল্লিখিত পাশ্চাত্য ভাবগুলির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে, উহাদিগের কতকগুলি আসলেই ভূয়া এবং মেকি আর অপর কতকগুলি ভাঙ্গা এবং বেকেজো হইয়াই এখানে আসিতেছে। কিন্তু উহারা যতই ভূয়া বা বেকেজো হউক, উহাদিগের চলন ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

যে ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তারা উহাদিগের প্রচলনে বিশেষ তৎপর, তাঁহারা হয়ত ওগুলিকে মেকি বলিয়াই জানেন না, এবং হয়ত মনে করেন যে, ঐ সকল ভাবের প্রাবল্যেই তাঁহাদিগের নিজ জাতির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস তাহা বলে না। ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হয় যে, যে সময়ে ইংরাজদিগের মধ্যে ঐহিকতার, ক্রমোন্নতির এবং স্বাতন্ত্রিকতার ভাব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছিল, সেই পিউরিটানদিগের প্রাবল্যের সময়েই ইংলণ্ডের চরম উন্নতির সূত্রপাত হয়। সেই সময়ের সঞ্চিত বল হইতেই বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার, উপনিবেশের প্রসার এবং অধিকারের আধিক্য হইয়াছে। দেশে ধনাগমের পথ অতি প্রশস্ত হইয়া উঠিলে ইংরাজের হৃদয়ে ক্রমশঃ সুখলালসার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যেমন তাহা হইতেছে সেই পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মনে ধর্ম্মসূত্রলব্ধ পূর্ব্ব বল ন্যূন হইয়া স্বার্থবাদ, হিতবাদ, ঐহিকতা, সাম্যবাদ প্রভৃতির উদয় হইতেছে। *

এক শত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডের মধ্যে যে কোন বিষয় লইয়া রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ হইত, ইংলণ্ড তাহার মধ্যে একজন হইতেন, এখন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছে। ইটালীর স্বাধীনতা-সাধন ফ্রান্স সম্রাট্ করিলেন, ইংলণ্ড বসিয়া দেখিলেন। প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়া মিলিয়া ডেনমার্ককে ভাঙ্গিয়া ফেলিল—ইংলণ্ড আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করিতেও ভুলিয়া গেলেন। প্রুসিয়া অস্ট্রিয়ার প্রতি লগুড় প্রহার করিলেন, পরে ফ্রান্সের মস্তক চূর্ণ করিলেন—ইংলণ্ডের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। এই ইংলণ্ড কি সেই ইংলণ্ড, যে প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সমুদায় ইউরোপখণ্ডকে

* যাঁহারা জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি গোঁড়ামি ছাড়িতে পারেন নাই তাঁহারা ধনলিপ্সার একান্ত বশীভূত হইয়া মুখে যাহাই বলুন কার্য্যে ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া স্বার্থসাধন করিতেছেন।

জাগ্রত করিয়াছিল এবং ইউরোপে অর্দ্ধপরিমিত সেনার খরচ যোগাইয়াছিল? কিন্তু ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃগণ উন্নতিশীলতার ভাবে একান্ত মুগ্ধ বলিয়া এরূপ হওয়াকে উন্নতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং এখনকার কালে তাঁহাদিগের মনে যে সকল ভাবের আবির্ভাব হইয়া উঠিতেছে, তাহাই ভাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও ঐহিকতাদি নব্য ভাব সকলের সম্যক্ প্রবেশ হয় নাই এবং তাহা হয় নাই বলিয়াই এখনও ইংলণ্ডের প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া পড়ে নাই।

আমি এমন কথা বলি না যে, ইংলণ্ড পূর্ব্বকালে যেমন ছিলেন, তাহাই ভাল ছিল। ডিস্‌রেলি বলিয়া গিয়াছেন যে, এখনকার দিনে ইংলণ্ড যতটা আসিয়িক সাম্রাজ্য, ততটা ইউরোপীয় রাজ্য মধ্যে গণ্য নয়—যদি এটা প্রকৃত কথা হইত অর্থাৎ যদি ইংলণ্ড আসিয়িক সাম্রাজ্যগুলির ন্যায় শান্তিপ্রবণ এবং পর-রাজ্যের প্রতি সম্যক্ লোভশূন্য হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ভালই হইত। কিন্তু ইংলণ্ড তাহা পারেন নাই; আজি আসান্টি, কালি সাইপ্রস্, পরদিন মিসর, তাহার পর ব্রহ্ম, এইরূপে দুর্ব্বল পররাজ্যগুলি কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ইউরোপের আভ্যন্তরিক প্রবল যুদ্ধাদিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন। ইহা লোভ দমনের লক্ষণ নয়, শক্তি-সঙ্কীর্ণতারই লক্ষণ।

ফলতঃ ঐহিকতাদির প্রাবল্যে দেশের বল বৃদ্ধি হয় না। স্বার্থপরতার দৃষ্টি সহজেই সঙ্কীর্ণ। উহার সহিত বিবেকাদির মিশ্রণ থাকিলে কিছুদিন কতকটা দূরদর্শন থাকিতে পারে, এবং দূরদৃষ্টির গুণে একেবারে অধঃপাত হয় না। কিন্তু পরিণামদর্শিতা সকল সময়ে সকল দিক বজায় করিতে পারে না, স্বার্থপরতাদি দোষে বুদ্ধিও বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং স্বার্থপরতাদূষিত বুদ্ধিমত্তাতেও অধিক দিন চলিতে পারে না। ইংলণ্ডের মন্ত্রীদল সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন পাছে তাঁহারা প্রজার উপর করভার বৃদ্ধি করিলে প্রজাব অসন্তোষ জন্মে এবং তাঁহারা পদচ্যুত হয়েন। এই ভয়ে তাঁহারা কর বৃদ্ধি করিয়া সৈনিক বল কিম্বা পোতবল বিশিষ্টরূপে বর্দ্ধিত করিতে পারেন না। কিন্তু ইউরোপের অপরাপর দেশীয়েরা আপনাপন পোতবলের নিরন্তর বৃদ্ধি করিতেছে এবং কেহ কেহ পোতবলেও ইংলণ্ডের সমকক্ষ প্রায় হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের বণিজদ্রব্যে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভেজাল চলিতেছে। ইংলণ্ডের কন্‌ট্রাক্টরেরা স্বজাতীয় সেনার ব্যবহারার্থ অস্ত্রশস্ত্রাদিতেও ভেল করিয়া দিতেছে। ঐহিকতাদিভাবের বৃদ্ধিতে এইরূপ অশুভময় ফল ফলিত হয়।

ইউরোপীয় সমাজগুলির মধ্যে যেটি আপনাকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গর্ব্ব করিত, সেই ফ্রান্সেই ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, উন্নতিশীলতা এবং সাম্যাদি ভাবের জন্ম না হউক, ঐ দেশেই উহাদিগের আত্যন্তিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টি হইয়াছে। সেই বৃদ্ধির এবং পুষ্টির ফলে, প্রুস-ফরাসীর যুদ্ধের সময় ফরাসীদিগের বারুদের পিপায় বালি এবং কয়লা, ময়দার সিন্দুকে খড়ি এবং করাতের গুঁড়া, এবং জুতার চামড়ার তলে পেস্টবোর্ড বাহির হইয়াছিল।

অতএব ইউরোপীয় ইতিহাসও বলে না যে, স্বার্থপরতা, স্বাতন্ত্রিকতা, ঐহিকতাদি গুণে কাহারও কখনও ভাল হইয়াছে। আমাদিগের পক্ষে ঐ সকল ভাবের গ্রহণ রোগীব্যক্তির কুপথ্য সেবনের ন্যায় অতি সাংঘাতিক।

ভারতবর্ষে ঐ সকল ভাবের প্রবেশ রুদ্ধ হওয়াই আবশ্যক। সমাজ যেন তাহা বুঝিয়াই ঐগুলির প্রবেশ রোধ করিবার নিমিত্ত কাকুক্তি করিতেছে। দেশময় আর্য্যসভা, হরিসভা, ধর্ম্মসভা প্রভৃতির উত্থান হইতেছে—সংস্কৃত শাস্ত্রের সমাদর বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে—এবং ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে প্রথম দল যতটা আত্মসমাজবিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন এখনকার ইংরাজীশিক্ষিতেরা আপন সমাজের ততটা প্রতিকূলতা করিতেছেন না।

কিন্তু প্রতিকূলতা না করুন, তাঁহাদিগের ইংরাজী ভক্তিটি অদ্যাপি অতি বিসদৃশ হইয়াই আছে। যাহা ইংরাজীতে নাই তাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা হয় না। আর ইংরাজকৃত নিন্দা এবং ইংরাজকৃত প্রশংসা তাঁহাদিগকে বড়ই অধিক লাগে! এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। মানুষের স্বভাবই এই, যাহা কিছুর নিমিত্ত অধিক আয়াস স্বীকার কবিতে হয়, সেটিকে অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজী শিখিতে আমাদের অতিশয় পরিশ্রম হয়। সেই ইংরাজী হইতে আর কিছুই পাই নাই, কেবল সামান্য জীবিকা উপার্জ্জনের অতি সামান্য উপায় মাত্র পাইয়াছি, এরূপ মনে করিতে বড়ই ক্লেশ জন্মে। অতএব ইংরাজী হইতে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইতেছে, আপনাদের উন্নতি-পথ মুক্ত হইতেছে এবং আরও কত কি হইতেছে, এরূপ মনে করিতে না পারিলে হৃদয়ের সন্তাপ ঘুচে না। সেইজন্য আমরা ইংরাজী হইতে অনেক প্রকারের অনেক লাভ করিতেছি, এরূপ মনে করিতে চাই এবং মনে করিতে চাই বলিয়া তাহাই মনে করিয়া থাকি। সুতরাং ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের প্রদত্ত বস্তুসকল পরীক্ষা করিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহাদের মেকিগুলিও চালাইতে দেয়।

আলস্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ইংরাজী হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা

প্রকৃত কি অপ্রকৃত, তাহার কতটা মিথ্যা, কোন্ ভাগ আমাদের উপযোগী, কোন্ ভাগ অনুপযোগী, এসকল কথা নিপুণ হইয়া বুঝিতে গেলে অনেকটা পরিশ্রম, অনেকটা অধ্যয়ন এবং অনেকটা চিন্তার প্রয়োজন হয়। স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতে পারিলে বড় উপাদেয় ভোজন হয় বটে, কিন্তু স্বপাকে খাইবার অবসর, সুবিধা এবং প্রবৃত্তি সকলের হয় না। এই আলস্যের সহিত নৈসর্গিক আশার সংযোগে মনে হয় যে, আমাদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল ইংরাজী হইতে যে সকল ভাব পাইতেছি মনে মনে সেইগুলির সঞ্চয় করিয়া রাখিলেই আমরা ফাঁপিয়া উঠিব এবং কালস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া উন্নতির ক্রোড়ে উঠিব। এই মনোভাবটি অনুকৃতির এবং নিশ্চেষ্টতার পোষক। আমরা সেই জন্যই অনুকৃতি-পরায়ণ এবং প্রকৃতপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছি।

কিন্তু নিশ্চেষ্টতা ভাল নয়। উহা মৃত্যুর পূর্ব্বরূপ। অতএব উহা ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক এবং সেইজন্য শুদ্ধ ইংরাজী পুস্তক এবং বাগ্মীদের মুখ হইতে মেকি এবং ভাঙ্গা পাশ্চাত্যভাব না লইয়া ইংরাজসংস্রবে আমাদের কি হইতেছে, তাহা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া বুঝা আবশ্যক। কারণ তাহা না করিলে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, আসল মেকি চিনিতে পারা যায় না এবং চিনিতে না পারিলেও ভাল পাইবার জন্য এবং মন্দ ত্যাগের জন্য চেষ্টা হইতে পারে না।

কিন্তু উল্লিখিতরূপেও ইংরাজ-সংস্রবের ফল বুঝিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের ফল কিরূপ (১) হইয়াছে এবং (২) হইবার সম্ভাবনা তাহাও নিবিষ্ট মনে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বণিক্‌ভাব

ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য একটি অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার। ভারতবর্ষের পরিমাণফল ১৭ লক্ষ বর্গমাইল, গ্রেট ব্রিটেনের পরিমাণফল ৮৮ হাজার বর্গমাইল মাত্র; ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ২৮৬০ কোটি, গ্রেট ব্রিটেনের লোকসংখ্যা

৩া০ কোটির অনধিক ; আর ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে উত্তমাশার পথে ১৫ হাজার মাইল ও সুয়েজের পথে ৭ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। এমন ক্ষুদ্র দেশের এত অল্পসংখ্যক লোক এত দূরে এমন অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য আর কখনও অধিকার করিতে পারে নাই।

এইরূপে অতি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইংরাজের ভারতসাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্ময়কর বোধ হয়। কিন্তু যদি মনে করা যায় যে, এই সাম্রাজ্য সংস্থাপনে ইংলণ্ডকে আপনার সমুদয় বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই—সমুদয় বলের কথা কি, ইংলণ্ডের রাজশক্তিও এই সাম্রাজ্য গ্রহণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই—এক সম্প্রদায় ইংরাজ বণিক্ কর্ত্তৃকই একশত বর্ষের মধ্যে এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কোন ফরাসী রাজনৈতিক বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষ অধিকার না করিতেন, তবে এখন ইউরোপীয় রাজ্য সকলের মধ্যে উহার যে উচ্চ আসন তাহা পাইতেন না—ইংলণ্ড প্রথম শ্রেণীর রাজ্য না হইয়া পোর্ত্তুগালের ন্যায় একটি সামান্য রাজ্য বলিয়াই গণ্য হইতেন। ফরাসী রাজনৈতিকের উক্তিটি সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইংলণ্ডেব ভারতবর্ষ অধিকার তাহার মহিমাব অন্যতম প্রমাণ মাত্র। ইহাতেই ইংলণ্ডের মহিমার পর্য্যবসান হয় নাই। ইংলণ্ডের অপরাপর অধিকারও অতি প্রশস্ত। ইংলণ্ডেব অধিকার কি আমেরিকা খণ্ডে, কি আফ্রিকা খণ্ডে, কি সামুদ্রিকাখণ্ডে, কোন খণ্ডেই কম নয়। ঐ সকল খণ্ডে ইংলণ্ড যে সকল উপনিদেশ সংস্থাপন করিয়াছেন সেগুলি প্রত্যেকে এক একটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্য হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বকালে রোম সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ হইয়াছিল। উহা ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থলভাগের বিংশতিতম অংশ ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। নব্য রুশীয় রাজ্য পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের সপ্তমাংশ ব্যাপক, কিন্তু ইংরাজ-রাজ্য (ভারত লইয়া) সমুদায় স্থলভাগের প্রায় ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া আছে। তদ্ভিন্ন, রোম এবং রুশীয় সাম্রাজ্য উভয়েই মূলতঃ কৃষিসূত্রক এবং একচক্র, অর্থাৎ উহারা কৃষি বিস্তারের প্রয়োজনে সঞ্জাত এবং একটি রাজধানীর চতুর্দ্দিকব্যাপী, বিভিন্নাংশে বিচ্ছিন্ন নয়। ইংরাজ-সাম্রাজ্য বাণিজ্য-সূত্রক এবং বহুচক্র, অর্থাৎ পরস্পর অসংলগ্ন রূপেই অবস্থিত। এক-চক্র রাজ্যের সংস্থাপন, পরিবর্দ্ধন, সংরক্ষণ এবং সুপালন বহু-চক্র রাজ্যের পালনাদি অপেক্ষা সহজ এবং স্বল্প ক্ষমতার ব্যঞ্জক। ইংরাজ শুদ্ধ বৃহত্তর সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াই আপনার ক্ষমতার পরিচয়

দিয়াছেন এমত নহে, সেই রাজ্য বহু-চক্র হওয়াতে ঐ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্টরূপেই প্রকট করিয়াছেন। *

অতএব ভারতরাজ্যের অধিকারই ইংরাজের ক্ষমতার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ নয়। প্রত্যুত ভারতরাজ্য অধিকারের জন্য ইংরাজকে স্বীয় প্রভূত বলের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ভারতরাজ্য যেন স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজকে আপনার সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। বিচক্ষণ ইংরাজেরা ইহা বুঝেন এবং হয় (অধ্যাপক শিলি প্রভৃতির ন্যায়) ইহা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করেন, অথবা (লর্ড লরেন্স প্রভৃতির ন্যায়) ভারতরাজ্য ইংরাজকে জগদীশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলেন; আপনাদের বাহুবলে উপার্জ্জন করিয়াছেন এ কথা (নিতান্ত গোঁয়ার ভিন্ন আর কোন ইংরাজ) বলেন না। বস্তুতঃ নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হয় যে, ভারতবর্ষ আপনাতে পূর্ব্বনিহিত শক্তিসকলের প্রভাবে যে দিকে অভিমুখ হইয়াছিল, ইংরাজ ইহাকে সেই দিকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার কার্য্যটি এত সত্বরে এবং সহজে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রথমতঃ। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসও বলে যে ভারতবর্ষ যদিও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত তথাপি বহুপূর্ব্বকাল হইতে ইহার মধ্যে একটি সম্মিলনপ্রবণতাও জন্মিয়া আছে। সেই সম্মিলনপ্রবণতা হইতেই হিন্দু রাজাদিগের প্রতি দিগ্বিজয় দ্বারা রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিবার বিধি, সেই সম্মিলনপ্রবণতা হইতেই শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, যযাতি এবং অশোকাদির সময়ে কতকটা একচ্ছত্রতা সাধন, এবং সেই জন্যই আফগান এবং মোগল সম্রাট্‌দিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ আক্রমণ হইয়াছিল। ইংরাজ কর্ত্তৃক দেশের ঐ সম্মিলনপ্রবণতা সম্যক্ প্রকারেই সিদ্ধ হইয়াছে। দেশটি যেমন এক হইতে চাহিতেছিল, তাহাই হইতে পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ। ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তির পূর্ণতা জন্মিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রকারেরা ভারত সমাজকে শান্তিপ্রকৃতিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু স্থায়ীরূপে একচ্ছত্রতা সংস্থাপিত না হওয়ায় তাঁহাদের মনস্কামনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইংরাজ হইতেই তাঁহাদিগের চেষ্টা সফলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন স্থলেই আর দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজগণ ইংরাজের একান্ত বশীভূত হইয়া পরস্পর বিবাদ

* প্রথম নেপোলিয়ন বলিতেন কৃষিসূত্রক সাম্রাজ্য বাণিজ্যসূত্রক সাম্রাজ্য অপেক্ষা সহজে সংস্থাপিত এবং স্বতঃই দৃঢ়তর হয়।

পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং ক্রমে ক্রমে পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন।

তৃতীয়তঃ। ইংরাজের অধিকারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত এবং বর্ত্মাদির বাহুল্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় এবং সম্মিলন জন্মিতেছে। আর্য্যশাস্ত্রকারেরা যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য নানা স্থানে তীর্থের এবং মেলাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরাজ কর্ত্তৃক শান্তিস্থাপনে তাহা শতগুণে এবং অতি উৎকৃষ্টরূপেই নির্ব্বাহিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ। ইংরাজ-মাহাত্ম্যে ভারতবর্ষের প্রতি অপরাপর বিজিগীষু জাতির আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে। এই মহাদেশের উত্তরপশ্চিম প্রান্তসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া হূনেরা এবং যবনেরা, উত্তরপূর্ব্ব দিক হইতে খসেরা, কোলেরীয়েরা এবং আহমেরা, পূর্ব্বোপকূলভাগে দ্রাবিড়ীয় নানা জাতি এবং পশ্চিম উপকূলে শক পারসিকাদি জাতি বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার অভ্যন্তরে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। ঐ সকল জাতীয়ের সংস্রব আর্য্যশাস্ত্রকৃদ্বর্গের বড়ই উদ্বেগের কারণ ছিল, এবং উহাদিগের দমনার্থ তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজকুলকে সময়ে সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। এখন ইংরাজ সেনা কি উত্তরপশ্চিম প্রান্তে, কি উত্তরপূর্ব্বভাগে, যেখানে কিছুমাত্র দৌরাত্ম্যের সূত্রপাত হয়, সেইখানেই গিয়া দৌরাত্ম্যকারীদিগকে দমন করিয়া আইসে, এবং ভারতবর্ষের সমস্ত উপকূলভাগে ইংরাজ-রণতরী সর্ব্বদাই প্রহরী স্বরূপে ভ্রমণ করিতেছে। কোন দিক হইতে কিছুমাত্র শঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে পাবে না।

অতএব ভারতবর্ষ যে দিকে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাবাপন্ন হইতে চাহিতেছিল, ইংরাজ সেই দিকেই ভারতকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই ভাবাপন্ন করিয়াছেন। সেই জন্যই ভারত আপনাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া আছে।

তদ্ভিন্ন ইংরাজ বণিক্‌বেশেই আসিয়াছিলেন এবং বণিক্‌বেশেই ভারত লাভ করিয়াছেন। বণিক্ অতি সাবধান পুরুষ। তিনি আপনার লাভের দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্ক হইয়া চলিয়া থাকেন। ইংরাজ বড় সাবধানেই চলিয়াছেন। বাস্তবিক, উপনিবেশ সংস্থাপন অথবা দূরদেশে অধিকার গ্রহণ সম্বন্ধে একটি নিয়ম এই যে, ঐ সকল কার্য্যে রাজশক্তির সাক্ষাৎ প্রয়োগে অধিকতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে স্পেনীয় এবং পোর্ত্তুগীজেরা স্ব স্ব দেশের রাজগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমেরিকা খণ্ডে এবং অনেকানেক দ্বীপাবলীতে উপনিবেশাদি স্থাপন করিতে যায়। উহারাও বিলক্ষণ সাহসিক, ক্লেশসহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল, বীরপ্রকৃতিক লোক ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মনোমধ্যে কেমন একটা গর্ব্বের ভাব

থাকিত, উহারা তাহা গোপন বা দমন করিয়া চলিতে পারিত না। এই জন্ত যে যে দেশে যাইত, সেই সেই দেশীয় লোকদিগের সহিত উহাদের বিবাদ হইত। ইংরাজবণিক্ সেই সকল লোক অপেক্ষা বিশেষ ধীরতাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি যেন আর্য্য পণ্ডিতবর্গের প্রদর্শিত ন্যায্য পথের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিলেন। আর্য্যশাস্ত্র পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে বিধান করেন—

সর্ব্বেষাং তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েত্তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্॥

প্রজাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোক সকলের অভিমতি সংক্ষেপে বুঝিয়া বিজিত রাজার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে সেই রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত (করাদি গ্রহণ বিষয়ে) নিয়ম করিবে।

ইংরাজ সমুদায় ভারতে এই নিয়মে চলিয়াছেন। যে রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন, তাঁহারই বংশীয় বা সম্পর্কীয় কাহাকেও প্রথমে তৎসিংহাসনে বসাইয়াছেন। তবে এইরূপে দুইবার চারিবার করিয়া ক্রমে রাজ্যটিকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্য্যশাস্ত্রের আরও একটি বিধান এই—

প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্মান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ॥

বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগের প্রচলিত ধর্ম্মাদি প্রমাণ করিবে এবং প্রধান পুরুষদিগের সহিত রত্নাদি প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাজার পূজা করিবে।

ইংরাজ ভারতবর্ষের যে প্রদেশ যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রজাদিগের ধর্ম্মের প্রতি বা আচারব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরাজের প্রথম প্রতিযোগী পর্ত্তুগীজেরা ওরূপ কথা মুখে আনে নাই, দ্বিতীয় প্রতিযোগী ফরাসীরা যদি কখন কখন মুখে ঐ কথা আনিয়াছিল, তথাপি মধ্যে মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দুষ্ট হইত।

কোম্পানির আমলের প্রথমভাগে ইংরাজেরা এতদ্দেশীয় জনগণের ধর্ম্মাচারের প্রতি অনেকটা ভক্তিশ্রদ্ধাও খ্যাপন করিয়া চলিতেন। খ্রীষ্টান মিশনরীরা এতদ্দেশীয় জনগণের ধর্ম্মাচারে নিন্দা করিবেন ভাবিয়া তাহাদিগকে স্থান দেন নাই। অসম্পৃক্ত আগন্তুক ইংরাজদিগকেও রাজ্য মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেন নাই, এবং স্বজাতীয় কাহাকেও এখানকার ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে দেন নাই। প্রথম জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কালীঘাটের ৺কালীদেবীর পূজা দিতেন বলিয়া যে

কিম্বদন্তী আছে, তাহা অমূলক নয়। দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রসিদ্ধ দেবালয়ে গভর্ণর হইতে কালেক্টর সাহেব পর্য্যন্ত ইংরাজের প্রদত্ত বহুমূল্য রত্নাভরণ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোম্পানির আমলের শেষ পর্য্যন্ত দেশীয়দিগের আচারের প্রতিও ইংরাজের কোন অযথাচরণ হয় নাই। রাজপুতনার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে একটি গোরা পল্টনের ছাউনি ছিল। আবু পর্ব্বত জৈনদিগের একটি তীর্থস্থান এবং জৈনেরা পশুহিংসা-পরাঙ্মুখ। কিন্তু গোরা সৈনিকদিগের গোমাংস ভক্ষণে অত্যন্ত অভ্যাস। তাহারা উহা না পাইলে বড়ই কাতর হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আবু পর্ব্বত হইতে গোরা ফৌজের ছাউনি উঠাইয়া তথায় হিন্দু সিপাহির পল্টন রাখিয়াছিলেন, আপনার জিদ বজায়ের প্রয়াস পান নাই। কাশীধামেও ঐরূপ করা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট আপনার জিদ ছাড়িয়াছিলেন।

ইংরাজ ভারতবাসীর আচারের প্রতিও যেমন ব্যাঘাত করেন নাই, তেমনি এখানকার ব্যবহার শাস্ত্রেরব গৌরব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। হিন্দুর সম্বন্ধে হিন্দুর এবং মুসলমানেব সম্বন্ধে মুসলমানেব ব্যবহার শাস্ত্র চলিবে বলিয়া প্রথমে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইংরাজ আপনাকে সেই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বদ্ধ বলিয়াই মনে করেন।

এ পর্য্যন্ত ইংরাজকৃত যে সকল কার্য্যের উল্লেখ হইল, তাহার কতকগুলির দ্বারা ভাবতবর্ষের চিরাভিলষিত বস্তু সাধিত হইয়াছে, এবং তাহার সাধনপ্রণালীও যেন আর্য্যশাস্ত্রেব অনুমোদিত পথেই চলিয়াছে। অতএব মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, ইংরাজ ভারতকে তাহার গন্তব্য পথে লইয়া আসিয়াছেন—ইংরাজ অতি বিচক্ষণতা এবং ধীরতা সহকারে প্রজাবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন—ইংরাজ ভারতে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই, এবং পারিতেন না—এই জন্য ইংরাজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভক্তিব ভাজন হইয়াছেন।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের রাজভাব

বণিক্ বীর ইংরাজ শতার্দ্ধবর্ষমধ্যে ভারতবর্ষ দেশে যে সুবিস্তৃত রাজ্যাধিকার স্থাপন করিলেন, তাহা তাঁহার জন্মভূমি ইংলণ্ডের অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহত্তর এবং প্রজাসংখ্যায় তাহার আট গুণ অধিকতর হইল। তাঁহার কর্ম্মচারীরাও বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকামাত্র বেতনে নিযুক্ত হইয়া আট দশ বৎসরের মধ্যে এত প্রভূত

অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাইতে লাগিল যে, তাহাদের বিভব লোকের বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন ইংলণ্ডে কল-কারখানা এখনকার ন্যায় অত্যধিক হয় নাই—তখন শিল্পের অথবা বাণিজ্যের কিম্বা কন্‌ট্রাক্টের দ্বারা এখনকার ন্যায় অতি প্রভূত সম্পত্তির সৃষ্টি হয় নাই—এবং তখন ভূসম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের সমূহ বিভবশালিতা জন্মে নাই। সুতরাং তখন কোম্পানির স্বদেশপ্রতিগত কর্ম্মকরেরাই ইংলণ্ডের মধ্যে অতি বিভবশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এরূপ হওয়াতে ইংলণ্ডীয় জনগণের মনে কোম্পানির প্রতি অত্যধিক মৎসরতা জন্মিয়া গেল এবং রাজমন্ত্রীদিগের ইচ্ছা হইল যে, ভারতরাজ্যটি কোম্পানির অধিকৃত না থাকিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার অধীন হয়। সেই অবধি ক্রমশঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিক্‌ভাব ন্যূন হইতে লাগিল, তাহাকে স্বজাতীয়ের অনুমোদিত রাজভাব ধারণ করিতে হইল, অনন্তর সিপাহী-বিদ্রোহের পরিসমাপ্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস দখলে আসিল।

ইংরাজের অনুমোদিত রাজভাব ভারতবর্ষের চিরপ্রতিষ্ঠিত রাজভাব হইতে কয়েকটি বিষয়ে মূলতঃই ভিন্ন। ইংরাজ জানেন যে, রাজ-শক্তি ত্রিধা বিভাজিত। তাহার একটি শক্তি ব্যবস্থা প্রণয়নে নিযুক্ত, দ্বিতীয়টি ধর্ম্মাধিকরণে ন্যস্ত, এবং তৃতীয়টি বিশেষ বিশেষ রক্ষণকার্য্যে নিবদ্ধ। প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপ্রণয়নের অধিকার রাজার হস্তে ছিল না। তৎকালজীবী ব্রাহ্মণেরাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। ব্যবস্থা প্রণয়ন যাহা হইবার তাহা প্রাচীন সংহিতা সকলেই হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল সংহিতানিবদ্ধ বচনের মীমাংসাপূর্ব্বক ধর্ম্মাধিকরণে আপনাদিগের অভিমতি খ্যাপন করিতেন মাত্র। রাজা সেই অভিমতির অনুরূপ কার্য্য করিলে যশোভাগী হইতেন, নচেৎ তাঁহার প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের বিরাগ জন্মিত। ফলতঃ প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের রাজশক্তি ব্যবস্থার প্রণয়নে প্রসারিত ছিল না, ধর্ম্মাধিকরণেও ঐ শক্তি অতি খর্ব্ব হইয়া ছিল। তাঁহাদিগের রাজ-নিয়ম একমাত্র রক্ষণ-কার্য্যেই একান্ত পর্য্যবসিত ছিল। ইহাকেই ভারতবর্ষীয় শাসন-প্রণালীর শারীরিক ব্যবস্থা বলিয়া ধরা যায়। এইরূপেই এই মহাদেশে সামাজিক শক্তি সামঞ্জস্যের বিধান চিরস্থায়ী রূপে অবধারিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত বিধান হইতেই ইউরোপীয় রাজনীতিশাস্ত্রে এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশাস্ত্রে একটি প্রকাণ্ড ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় রাজনীতিশাস্ত্র সামাজিক শক্তি-সামঞ্জস্যের বিচার লইয়াই নিরন্তর বিব্রত। রাজার হস্তে কতটা শক্তি থাকিবে, এবং প্রকৃতি বা প্রধান পুরুষদিগের হস্তে কতটা শক্তি থাকিবে,

আর প্রজাসাধারণের হস্তেই বা কতটা থাকিবে, ইহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই সকল ইউরোপীয় রাজনৈতিক শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য যে সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, অর্থাৎ সকল সময়ে সামাজিক শক্তি-সামঞ্জস্যের নিয়মগুলি অক্ষুন্ন থাকে, তাহা রাজনৈতিকদিগের পরস্পর মতভেদ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয় না—প্রত্যুত তাহার বিপরীত ভাবই অভিব্যক্ত হয়।

ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশাস্ত্রে শক্তি-সামঞ্জস্যের কোন কথাই নাই—ইহাতে কেবল প্রজাপালনার্থ রাজার করণীয় ব্যাপারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়া আছে। সেই সকল বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে ভারতবর্ষীয় রাজগণের রাজ্যপালন ব্যাপার ধর্ম্মনীতি হইতে অভিন্নপ্রায় থাকিয়া অতি সুশৃঙ্খলতা সহকারেই নির্ব্বাহিত হইত। ইংরাজরাজের রাজনীতিটি ধর্ম্মনীতির সহিত ততটা অবিরুদ্ধভাবে চলিতে পারে নাই। ইংরাজের রাজনীতিতে দূরদর্শিতার অবলম্বনে কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে বৈধশাসনের প্রভাবে ধর্ম্মের অধিষ্ঠান ছিল।

ইংরাজরাজের উল্লিখিত ভাব তাঁহার বৈদেশিকতামূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শুদ্ধ বৈদেশিকতাহেতুক নহে। উহা তাঁহার রাজনীতির প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত। বৈদেশিকতা উহার মূল হইলে, ইংরাজের নিজের দেশেও ঐ দোষ দেখা যাইত না। কিন্তু ইংরাজের নিজের দেশেও বিভিন্ন সম্প্রদায় সর্ব্বদাই অন্যোন্যের বলহানির জন্য চেষ্টা করে—বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী হইয়া কোন সম্প্রদায়ই রাজনীতির পরিচালনা করিতে পারে না। অতএব একপক্ষে রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া রাখিবার জন্য যে চেষ্টা করিতে হয়, এই ইউরোপীয় নীতি ভারতবাসী জানে না; আর পক্ষান্তরে ইংরাজরাজ জানেন যে, প্রজাকর্তৃক নিবারিত না হইলে যথেচ্ছ শক্তি প্রসারণে তাঁহার সম্যক্ অধিকার আছে। এইরূপে ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষ মধ্যে রাজা-প্রজায় একটি গূঢ় মতান্তরতা জন্মিয়া রহিয়াছে।

ইংরাজ জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ হইতে সম্ভূত তাঁহার রাজস্বনীতিও ভারতবর্ষে রাজার প্রতি প্রজাকুলের সন্দিগ্ধচিত্ততা জন্মাইয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড দেশ যে শাক্‌সন-জাতীয় জনগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হয়, তাহারা দেশের ভূমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু নর্ম্মান জাতীয়েরা ইংলণ্ড দেশটিকে জয়লব্ধ করিয়া দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তিতে বিজেতা রাজার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং রাজার স্থানে প্রাপ্ত

হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের সেই নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্বে অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিয়াছিল। ইংলণ্ডে সেই ভাব অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে। ইংরাজরাজ ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়াছে ভাবিয়া আপনাকেই সমুদায় ভারতভূমিতে স্বত্ববান জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু রাজার ওরূপ নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্বের কথা ভারতবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

"স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগং।"

যে ব্যক্তি বন কাটিয়া আবাদ করে, ভূমি তাহারই হয়; যেমন যে শিকারীর অস্ত্রবেধ যে পশুতে থাকে, সে পশু সেই শিকারীরই হয়।

ইংরাজ তাহা বুঝিলেন না; তিনি বলিলেন, ভারতের ভূমিতে আমারই স্বত্ব। তাঁহার স্বদেশীয় জমিদারী-নীতিতে যেরূপ প্রজার খোরাকীমাত্র বাদে সমস্ত উৎপন্নকেই ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধরা হয়, যেন কতকটা সেইরূপ মনে তিনি ভারতভূমির অধিকাংশ ভাগেই প্রজার সহিত খাজনার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার ভাগধেয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রদেশ ভিন্ন, কোথাও কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ রহিল না। প্রজারা ইংরাজের অনুগ্রহ ভোগ করিতে পায় কিন্তু আপনাদের স্বত্ব দেখিতে পায় না। ইংরাজরাজ কোথাও দশ বৎসরান্তে, কোথাও বা বর্ষে বর্ষে প্রজাদিগের সহিত রাজস্বের নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক উদ্বেগ জন্মাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ॥
যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ॥
অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণং।
তমাহুঃ সর্ব্বলোকস্য সমগ্রমলহারকং॥

যে রাজা প্রজার রক্ষা করেন, তিনি প্রজাকৃত ধর্ম্মকার্য্যের ষড়্ভাগ পুণ্যভাগী হয়েন; যে রাজা না করেন, তিনি পাপকার্য্যের ষষ্ঠাংশ ফলভাগী হয়েন। যে রাজা রক্ষা না করিয়া কর গ্রহণ করে, সে সকল লোকের মল গ্রহণ করে।

অতএব ভারতবাসীর শাস্ত্রানুসারে প্রজারক্ষণের ভৃতিস্বরূপই রাজকর। কিন্তু বিজেতা ইংরাজ সে পথে গেলেন না। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত ভূমিতে আমি স্বত্ববান্ হইয়াছি—আমি সেই জন্য করাদান করিব। ইংরাজরাজ এতদ্দেশের ভূমিকরটিকে তাঁহার ভূ-স্বামিত্ব সম্বন্ধে প্রাপ্য মনে করায় তাঁহাকে প্রজার জন্য যাহা

কিছু করিতে হয়, তজ্জন্য নূতন নূতন করের দাওয়া হইয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারেও তিনি স্ট্যাম্পের আইন প্রসারিত করিয়া রাজার অবশ্যকরণীয় নির্ব্বাহের জন্যও একটি স্বতন্ত্র কর লইয়া থাকেন। ইংরাজরাজের ধর্ম্মাধিকরণও অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ফলতঃ এই সকল এবং অন্যান্য কারণে তিনি প্রজাদিগের চক্ষে শোষক বলিয়াই অবধারিত হইয়াছেন। অতএব ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্য্যে প্রজার অভিমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতা বিস্তারের সীমা একমাত্র প্রজার প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন অপর কিছুই না মানিয়া এবং প্রজাব্যূহের জন্মভূমিতে আপনার স্বত্ব আরোপ করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে করাদানের মুখ বিস্তৃত করিয়া ইংরাজরাজ ভারতবাসীর হৃদয়ে এমন একটি ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, যে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্ঠগুণে বিভূষিত এবং প্রজারক্ষণে কৃতকার্য্য হইলেও তাহার ভাবান্তর হইতে পারে নাই। তিনি গৌরবের আস্পদ হইয়া আছেন কিন্তু প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই। ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

"পরাক্রমো বলং বুদ্ধিঃ শৌর্য্যমেতে বরা গুণাঃ।
এভির্হীনোঽন্যগুণযুক্ মহীভুক্ সধনোপি ন॥"

পরাক্রম, বল, বুদ্ধি এবং শৌর্য্য এইগুলি অতি শ্রেষ্ঠগুণ। এই সকল গুণশূন্য ব্যক্তি অন্যান্য গুণযুক্ত হইয়া সধন হইলেও ভূমিপতি হইতে পারেন না।

অতএব শূরসিংহ ইংরাজ রাজা হওয়ায় যোগ্যব্যক্তিরই রাজ্যাধিকার হইল মনে করিয়া ভারতবাসী তাঁহার গৌরব করিতেছে। তিনি যে বিদেশী সেজন্য ভারতবাসী তাঁহার প্রতি দ্বেষভাবসম্পন্ন হয় নাই। কেবল শোষক এবং স্বৈরস্বভাব এবং ভূস্বত্বাপহারক মনে করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া আছে।

ইংরাজ-রাজের প্রজাপালন ভাব কেমন, তাহা সকলেই দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড, তাঁহার শাসনরীতি দৃঢ়-শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে হঠকারিতা, অন্যায়কারিতা, পক্ষপাতিতাদি দোষ নাই বলিতেও চলে; অথবা যাহা কিছু আছে, তাহা বিশেষ যত্ন সহকারেই সমাচ্ছাদিত। ইংরাজের রাজত্বে ভারতবর্ষের প্রতি বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ নাই, ইহার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহাদি নাই, চৌর্য্য দস্যুতাদির প্রাদুর্ভাব নাই, সমস্তদেশ সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত। ইংরাজের রাজত্বে বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি হইতেছে, অন্তর্বাণিজ্যের সৌকর্য্য বাড়িতেছে, বিচারকার্য্যে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনভাবে চলিতেছে, বিষয়জ্ঞতা বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত লেখাপড়ার প্রসার হওয়ায় দেশীয়দিগের কোন

কোন বিষয়ে চক্ষু ফুটিতেছে—ফলকথা, ইংরাজের রাজত্ব একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার; অপরাপর জাতির বৈদেশিক শাসনের সহিত তুলনা করিয়া না বুঝিলে ইহার উৎকর্ষ যথোচিতরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

রোমীয়েরা পূর্ব্বকালে অতি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন এবং পালন করিয়াছিল। ইংরাজের ভারতশাসন-রীতি কতকটা তাহাদিগের প্রদেশ-শাসনরীতির সদৃশ, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুরূপ নয়। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশের শাসনকার্য্যে তত্তদ্দেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করিত না। ইংরাজেরাও তাহা করেন না বলা যায়। কিন্তু রোমীয়েরা এক প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রদেশান্তরে প্রেরণ করিত, ইংরাজেরা তাহা না করিয়া ভারতবর্ষে সংগৃহীত সৈন্যদ্বারাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিতেছেন। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশগুলি হইতে কর সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিত। ইংরাজেরাও ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেই টাকা কর বলিয়া প্রেরিত হয় না। রোমীয়েরা প্রদেশশাসনের ভার স্বজাতীয় এক এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিত, ইংরাজেরাও ভারতরাজ্য শাসনের ভার স্বজাতীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তে রাখেন। রোমীয়েরা প্রদেশ-শাস্তৃগণকে আপনাদিগের সেনেট সভার নিকট দায়ী করিয়া রাখিয়াছিল, ইংরাজেরাও ভারতবর্ষীয় গভর্ণর জেনারেল এবং গবর্ণরদিগকে আপনাদের পার্লিয়ামেণ্টের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। রোমীয়েরা আপনাদের লাটিন ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদেশগুলিতে বিদ্যালয় খুলিত, ইংরাজেরাও ভারতবর্ষে ইংরাজী শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু রোমীয়েরা বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত ভাষা শিখাইবার দিকে মন দিত না, ইংরাজেরা তাহাও দেন। রোমীয়েরা যে প্রদেশ জয় করিত, সে প্রদেশের পূজিত দেবতাদিগকে আপনাদিগের দেবতাশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইত। একেশ্বরবাদী ইংরাজেরা তাহা করেন না বটে, কিন্তু ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মপ্রণালী বিনষ্ট করিবার জন্যও কোন সাক্ষাৎ চেষ্টা করেন না। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশসকলে আপনাদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রচালিত করিত, ইংরাজেরা ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা-সকলের প্রণয়ন করেন; তবে সেই ব্যবস্থাগুলি তাঁহাদের স্বদেশপ্রচলিত ব্যবস্থারই অনুরূপ হইয়া থাকে।

ফলকথা, ইংরাজের ভারতশাসন-প্রণালী রোমীয়দিগের প্রদেশশাসন-প্রণালীর সহিত যত মিলে, অপর কোন জাতির বৈদেশিক অধিকার শাসনের সহিত তত মিলে না। মুসলমান এবং স্পেনীয় এবং পোর্ত্তুগীজদিগের বিদেশ শাসনের ত কথাই

নাই—তাহারা অধিকৃত দেশবাসীদিগের ধর্ম্ম-প্রণালীর উচ্ছেদ চেষ্টা করিত। ওলন্দাজদিগের যবদ্বীপ শাসন এবং রুশীয়দিগের মধ্য-এসিয়া শাসন আর ফরাসীয়দিগের আলজিরিয়া এবং টুনিস শাসনও ইংরাজের ভারতবর্ষ শাসন হইতে অনেকাংশে ভিন্নরূপ।

ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অধিবাসিগণকে আপনাদিগের সাধারণ সৈন্য-শ্রেণীসম্ভুক্ত করেন, তাঁহারা কালা ফৌজে এবং গোরা ফৌজে মিলাইয়া পণ্টন বাঁধেন—উহাদিগের মধ্যে অধিক ইতরবিশেষ করেন না। ওলন্দাজেরা আদিম অধিবাসীদিগকে কতকটা উন্নত পদও দিয়া থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্য গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক অহিফেন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি, দারুচিনি প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্যদ্রব্যে সেই ব্যবস্থা এবং তাহার অপেক্ষা কঠিনতর বেগার খাটাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আছে।

রুশীয়েরা মধ্য-এসিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া দিয়া সমস্ত দেশটিকে সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত করিয়াছে। কিন্তু রুশীয়েরা দেশটিকে বিবিধ প্রকার করভারে আক্রান্ত করিয়াছে, স্বজাতীয় রাজকর্ম্মচারী এবং বণিকৃগণকে পালে পালে উহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়াছে, এবং স্বজাতীয় জনগণের সুবিধার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছে। রুশীয়েরা যেমন তুর্কিস্থানের পশ্চিম ভাগটি বহুশত বর্ষ অধিকার করিয়াও তথাকার লোকসকলকে আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমান করিতে পারে নাই, নবাধিকৃত পূর্ব্বাঞ্চলেও যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করিতে পারিবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আলজিরিয়া প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশে তত্তৎপ্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের স্ব স্ব জাতীয় ভাব একেবারেই বিলুপ্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে, প্রদেশীয় কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্বতোভাবে ফরাসী ব্যবস্থা-শাস্ত্র গ্রহণ করেন তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রকৃত ফরাসী হইতে অভিন্ন জ্ঞান করা যাইবে—নচেৎ প্রকৃত ফরাসীর সমস্ত অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইবে না।

ইংরাজদিগের ঔপনিবেশিক নিয়মে শাসিত কয়েকটি স্থানে ইংরাজী ব্যবস্থার প্রসারণ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিকে ইংরাজের প্রকৃত অধিকার প্রদত্ত হইবার কথা উঠে নাই। সিংহলদ্বীপে, স্ট্রেট্স্ সেটেলমেণ্টে,

মরিসসে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিসে, ইংরাজ সমধিক পরিমাণেই আপনার ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রচালিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সে প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। ভারতবাসীর জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেই ইংরাজরাজের অভিমতি আছে বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু তাহা হইলেও লর্ড ডফরিন সাহেব সেদিন লণ্ডনের ভোজে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে—ভারতবাসীর ইংরাজরাজের প্রতি অনুরাগটি যতটা বিচার-মূলক, ততটা ভক্তিমূলক নহে। ভারতবাসী সাধারণতঃ অতি মৃদুস্বভাব, ভক্তিপরায়ণ এবং রাজানুরক্ত। ভারতবাসীর রাজ-বংশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ রাজ্ঞীপুত্রদিগের সমাগম সময়ে এবং মহারাজ্ঞীর জুবিলি মহোৎসবে সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব কি জন্য যে, ইংরাজ-রাজপুরুষগণের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হয় না, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন। লর্ড ডফরিন তাঁহার উল্লিখিত বক্তৃতায় কতকগুলি অতি সামান্য বাহ্য কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন—যথা, ভারতবাসীরা আপনাদিগের স্ত্রী পরিজনকে ইংরাজদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দেয় না ; ভারতবাসীরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং ভিন্ন ভাষা-ভাষী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কথা অতি অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল কারণে এতটা অনুরাগশূন্যতা জন্মিতে পারে না। মুসলমান অধিকারের সময়েও ঐ সকল কারণ বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ একত্র পান ভোজন এবং স্ত্রী পরিজন প্রদর্শন ছিল না —আর ভিন্নভাষিতা এবং ভিন্নদেশিকতাও প্রায় এখনকার ন্যায় ছিল। কিন্তু মুসলমানেব সহিত হিন্দুব যতটা মিল হইয়াছিল, ইংরাজের সহিত কি ততটা মিল হইয়াছে ? আজি কালি কোন কোন বাঙ্গালী আপনাদিগের স্ত্রী পরিজনের সহিত ইংবাজদিগের দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া থাকেন—তাঁহাদিগের সহিত কি ইংরাজের সহানুভূতি জন্মিয়াছে ?

ঐ সকল অকিঞ্চিৎকর কারণের আরোপ করায় প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান হয় না, এবং সেই জন্য ইংরাজ-রাজত্বের অভ্যন্তরে যে মৌলিক দোষ থাকায় প্রজারঞ্জনের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহার যথাযথ সংশোধন চেষ্টাও হয় না। ইংরাজ স্বদেশে সামাজিক শক্তির সামঞ্জস্য বিধানে যেরূপ অভ্যস্ত সেই অভ্যাসানুযায়ী হইয়া, এদেশেও রাজশক্তি প্রসারণের সীমা প্রজার প্রতিরোধ সাপেক্ষ, এইরূপ মনে করিয়া চলেন। কিন্তু ভারতবাসীর অভ্যাস সেরূপ নয়। এখানকার প্রজা কোনরূপে রাজার প্রতিরোধ করিতে আছে মনে করে না। তাঁহার অসংযত শক্তি প্রসারণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হয় মাত্র। ইংরাজ প্রায় শতবর্ষাবধি পৃথিবীতে অতুল্য বিক্রমশালী

হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আত্মনির্ভর এবং আত্মগৌরব অপরিসীম হইয়াছে। তিনি আর আপনার দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত অথবা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তিনি অন্যের অজ্ঞতা, অবিশুদ্ধতা, অক্ষমতা প্রভৃতি দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবাসী আমাকে তেমন ভালবাসে না, অতএব আমাতে কোন দোষ আছে, এরূপ ভাব ইংরাজের মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ভারতবাসী যে আমাকে তত ভালবাসে না, তাহা ভারতবাসীরই দোষ—এই ভাবই ইংরাজের মনে বদ্ধমূল। যদি কোন কারণে এই ভাবের অন্যথা না হয়, তাহা হইলে ইংরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজারঞ্জন চেষ্টা করিতে পারিবেন না, তিনি কেবল আপনার ক্ষমতা এবং বল বৃদ্ধি করিবার জন্যই একান্তমনা হইয়া থাকিবেন।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বৈদেশিকভাব

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ওয়েলেসলী সাহেব কোন সময়ে লিখিয়াছিলেন—"আমি ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের ফাঁসি-কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হওয়া শ্রেয়োজ্ঞান করি।" কথাটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে অতিরঞ্জিত হইলেও উহা স্থূলতঃ ইংরাজের স্বদেশানুরাগ এবং বিদেশবিরাগের ব্যঞ্জক। বস্তুতঃ ইংরাজ ইংলণ্ডকেই মনের সহিত ভালবাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল্ দেশকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করেন।

পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, অপর সকল জাতি অপেক্ষায় ইংরাজ উপনিবেশ সংস্থাপনে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর কোন জাতি তাঁহার ন্যায় বিদেশ অধিকার করিয়া তথায় বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই। ফ্রান্স বল, স্পেন বল, পোর্ত্তুগাল বল, হলণ্ড বল, আর রুশীয়াই বল, কাহারই বৈদেশিক অধিকার ইংলণ্ডের ন্যায় অতি বিস্তৃত, সুদৃঢ় এবং সুসম্বদ্ধ নহে।

অতএব নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিলে ইংরাজের প্রকৃতিতে দুইটি বিভিন্নভাব দেখিতে পাওয়া যায়—এক, তিনি বিদেশ ভালবাসেন না—অপর, তিনি বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইতে পারেন। এই বিরুদ্ধ ভাব দুইটির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে প্রতীত হয় যে, ইংরাজ বিদেশ-বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি বৈদেশিক-বিদ্বেষ্টা। যদি কোন বিদেশে তাঁহার সম্যক্ অধিকারের পথ থাকে, অর্থাৎ যদি সেই বিদেশে স্বজাতীয় লোক

ভিন্ন অপর কাহারও আধিপত্য বা আধিক্য না থাকে, যদি সেখানে তিনি আপনার আইন এবং ভাষা এবং ধর্ম্মপ্রণালী চালাইতে পারেন, যদি সেই স্থানটিকে সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের অনুরূপ করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই ইংরাজ সেই বিদেশে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, নচেৎ বিদেশ-প্রবাসে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্টানুভব হয়—তিনি বিদেশের রাজাসন অপেক্ষা স্বদেশের ফাঁসি-কাষ্ঠও ভাল মনে করিতে পারেন।

এই জন্য ইংরাজ কর্ত্তৃক যে যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই আদিম অধিবাসীদিগের ধ্বংসসাধন হইয়াছে, সর্ব্বত্রই ইংরাজী ভাষার এবং ইংরাজী ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের অনুষ্ঠান সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অপরাপর লোকেও সেই দেশে বাস করিতে গিয়া ইংরাজের সংস্রবে বিলুপ্ত-জাতীয়ভাব হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ কখনও কাহারও সহিত মিশেন না—অন্যান্য লোককেই তাঁহাব সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। অন্যের সহিত ইংরাজের মিশ্রণও অধিক পরিমাণে হয় না। অপবাপর ইউরোপীয় লোকের সহিত অল্প মাত্রায় হয়, ইউরোপীয়েতব লোকের সহিত প্রায়ই হয় না।

আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড প্রদেশগুলিই ইংরাজ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে অধ্যুষিত হয়। ঐ স্থানে অপবাপর ইউরোপীয় লোকও গিয়া বাস করিয়াছে। কিন্তু ওখানকার ভাষা, ব্যবস্থা, রীতি, নীতি সমুদায়ই ইংরাজী হইয়া গিযাছে। ওখানকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ান জাতিও নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে। স্পেনীয়েরা, পোর্ত্তুগিজেরা, ইটালীয়েরা এবং কিয়ৎপরিমাণে ফরাসীরাও অপব জাতীয়দিগের সহিত যতটা মিলিতে পারে, ইংরাজেরা, বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ন্যায় টিউটন্ বর্ণ-সম্ভূক্ত কোন জাতিই, অন্যেব সংস্রব সহিতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে স্পেনীয়েরা এবং পোর্ত্তুগিজেরা তত্তৎপ্রদেশীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত এতদূর মিলিয়া গিয়াছে যে, * মেক্সিকো, পেরু, বলিভিয়া এবং ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে গড়ে একতৃতীয়াংশ

* মেক্সিকোতে	মিশ্রজাতীয় শতকরা	৪৩,	আদিম	৩৮
পেরু	„	২৩,	„	৫৭
বলিভিয়া	„	২৫,	„	৫০
ব্রেজিল	„	৩৫,	„	ও নিগ্রো ৩০
		৩১.৫		৪৪

লোক মিশ্রজাতীয় হইয়াছে। এবং কোথাও কোথাও প্রায় অর্দ্ধাংশ লোক অবিমিশ্র আদিম অধিবাসীদিগের বংশোদ্ভব। ঐ মিশ্রজাতীয়দিগের মধ্যে অনেক লোক বিশেষ গুণ-শালী ক্ষমতা-শালী এবং সমাজ মধ্যে মান্য গণ্যও হইয়াছে—এমন কি, মেক্সিকো সাম্রাজ্য সভার সভাপতি 'জুয়ারেজ' ঐ মিশ্রজাতীয় পুরুষ। উত্তর কানেডা প্রদেশ ফরাসীদিগের অধ্যুষিত। ওখানকার আদিম অধিবাসী অনেক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—তথাপি ওখানকার উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মিশ্রজাতীয়েরা লোকসমষ্টির দশমাংশের ন্যূন নহে—এবং 'লুয়ি' নামক যে ব্যক্তি কানেডা প্রদেশে রাজনীতির বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ করায় কতকটা রক্তারক্তি কাণ্ডের পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অত্যুদার ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, সেই 'লুয়ি' মিশ্রজাতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইংরাজের উপনিবেশক্ষেত্র সকল দেখ, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে আদিম অধিবাসীদিগের সমূলোৎসাদন হইয়া গিয়াছে। ইউনাইটেড রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা কোথায়? ঐ মহাদেশনিবাসী বিবিধ ইণ্ডিয়ান জাতীয় লোকের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদিগের অধিকারভুক্ত ভূমিতে এক্ষণে ৫৮ হাজার মাত্র অবশিষ্ট আছে! যে সকল ভাগে শ্বেত-পুরুষদিগের বসবাস হয় নাই, তথায় আনুমানিক ২৷৷০ লক্ষ ইণ্ডিয়ান এখনও মৃগয়াদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে। তাহাদিগের জন্য স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—উহারা সেই ভূমিখণ্ডের বাহিরে যাইতে পারে না, এবং প্রতি আদমসুমারীতেই তাহাদিগের সংখ্যা কমিতেছে, দেখা যায়। ফলতঃ ইউনাইটেড প্রদেশের আদিম অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা '৪ মাত্র দাঁড়াইয়াছে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে কেপকলনি প্রদেশে ওলন্দাজেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ স্থান ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইলেও উহার দশা এখনও ইউনাইটেড দেশের ন্যায় হয় নাই। ওখানে কাফ্রি জাতীয় লোকের সংখ্যা আজিও ইউরোপীয়দিগের তিন গুণ। কিন্তু তাহাদের কোন উন্নতি নাই, প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্যে ও মজুরিতে নিযুক্ত, সংখ্যাবৃদ্ধিও কম। নিউজিলাণ্ড দ্বীপে মেয়োরি নামে একটি জাতি আছে। ইহারা আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের ন্যায় নিতান্ত বন্যদশাপন্ন নহে; আফ্রিকার হটেণ্টটদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অক্ষম নহে। মেয়োরিদিগের ভাষায় সাহিত্য গণিতাদির গ্রন্থ আছে, মেয়োরিদিগের হৃদয়ে যথেষ্ট সাহস এবং আত্ম-গৌরব আছে। কিন্তু ইংরাজ তাহাদিগের দেশে বাস করিতে গেলেন, আর তাহারা নিঃশেষিত প্রায় হইল। ১৮৮১ অব্দের আদমসুমারীতে ৪৪ হাজার মেয়োরি পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারীতে উহাদের সংখ্যা ৪১ হাজার

মাত্র। এখন নিউজিলাণ্ডে মেয়োরির সংখ্যা শতকরা ৬টি মাত্র। ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ২০০ জন মাত্র তদ্দেশবাসী মেয়োরি জাতীয় কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল পত্নীদিগের গর্ভজাত সন্তানদিগকে আপনাদিগের সমাজে গ্রহণ করেন নাই, তাহারাও মেয়োরি হইয়া আছে। অস্ট্রেলিয়া খণ্ডের উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। ওখানকার আদিম অধিবাসীরা বেড়া আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিক হইতে যেমন ইংরাজের উপনিবেশ দেশের অন্তর্ভাগে প্রসারিত হইতেছে, অমনি আদিম অধিবাসীরা ফুরাইয়া যাইতেছে। একজন ইংরাজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয়ের ঘ্রাণমাত্র পাইলেই অপরাপর ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যেরা একেবারে শুকাইতে আরম্ভ করে।" অন্যান্য সকল ইউরোপীয়েরা অপেক্ষা ইংরাজের ঘ্রাণ অধিকতর তীব্র তাহার সন্দেহ নাই।

আর দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ইংরাজ অপর জাতীয় লোকের সহিত মিশেন না—এটি একটি সিদ্ধান্ত কথা। কোম্‌টি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে তাঁহার স্বদেশীয় ফরাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মতানুগামী হইয়া "নরদেব" পূজায় প্রবৃত্ত হইবে; এবং সমস্ত নরজাতির প্রতি ভক্তি ও প্রীতি সমন্বিত হইবে। ইটালীয়েরা উহাদিগেব পরে এবং স্পেনীয় ও পোর্ত্তুগিজেরা তাহার পরে তৎপথাবলম্বী হইবে, ইংরাজেরা তাহাদিগেরও পরে নরজাতিসাধারণের প্রতি প্রেমিক হইয়া উঠিবে। কোম্‌টি যেরূপেই বুঝিয়া ঐ কথা বলুন, (তিনি প্রথম পুস্তক প্রচারে জর্ম্মনদিগকেও ইংরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছিলেন) ইংরাজের নরজাতিপ্রেম যে অনেক দূরবর্ত্তী ব্যাপার, অতি স্থূল স্থূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

কিন্তু ইংরাজাধিকৃত দেশসকলে তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের নিঃশেষতা এবং অপর জাতির সহিত মিশ্রণের অল্পতা দেখিয়া ইংরাজকে অধিক পরিমাণে নৃশংস মনে করায় ভ্রম হয়। বস্তুতঃ অপরাপর ইউরোপীয় জাতিদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজকেই স্বল্প নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্পেনীয়েরা মেক্সিকো এবং পেরুতে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিস দ্বীপাবলীতে যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, পোর্ত্তুগিজেরা ব্রেজিলে এবং কিয়ৎকাল ভারতবর্ষে যেরূপ পিশাচবৎ আচরণ করিয়াছে, এবং ফরাসীরাও কানেডা এবং আলজিয়রে এবং আনামে যেরূপ খামখেয়ালি খেলিয়াছে ইংরাজ তাঁহার অধ্যুষিত কোন দেশেই সে পরিমাণ নৈষ্ঠুর্য্য, অত্যাচার এবং অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রদর্শন করেন নাই—অথচ তাঁহার অধিকারেই আদিম নিবাসীর সমধিক পরিমাণে বিলোপ হয়। ইংরাজের আওতাই বড় আওতা।

এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলেই ইংরাজের বৈদেশিক-বিদ্বেষের বিশিষ্টতা অতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে পারে। অপরাপর ইউরোপীয় জাতির যে বৈদেশিক-বিদ্বেষ তাহারও অভ্যন্তরে যেন ঘৃণার কতকটা ন্যূনতা আছে—যেন অপর জাতির প্রতি কতকটা মনুষ্যবুদ্ধি আছে। স্পেনীয় কিম্বা ফরাসী অথবা অন্য লাটিন জাতীয় খ্রীষ্টান যেন অপর জাতীয় লোককে বলেন—"তোরা কেম আমাদের মত হইবি না, আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর, আমাদের পরিচ্ছদ পর, আমাদের ন্যায় খাওয়া দাওয়া কর—আমাদের মত হইবি।" ইংরাজের ভাব ওরূপ নহে। তাঁহার ভাব—"তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার ধর্ম্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"

আমরা হিন্দুজাতীয়। আমরাও ঐ ভাব বুঝিতে পারি, আমরাও জানি যে, এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না—ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকিয়া জাত্যন্তর হইতে পারে না। আমরা জানি যে, মনুষ্যের দোষগুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত। সুতরাং আমরা যে বংশজাত অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই ঠিক তেমন হইতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুর এই ভাবে এবং ইংবাজের উল্লিখিত ভাবে পার্থক্য আছে। হিন্দুর আত্মগৌরব দৈবায়ত্ত বিষয় লইয়া। ইংরাজের আত্মগৌরব প্রধানতঃ নিজায়ত্ত বিষয় লইয়া। হিন্দুর আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে না। ইংরাজের আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া দেয়। ভিন্ন জাতির প্রতি ইংরাজের বিদ্বেষ কিরূপ প্রখর তাহা ইংরাজ সন্তান মার্কিনদিগেব মধ্যে প্রচলিত একটি চলিত কথার ভাব বুঝিলেই সুস্পষ্ট হয়। মার্কিনেরা বলে যে, তাহাদের দেশে যত আইরিশ আছে, তাহারা প্রত্যেকে যদি এক একটি নিগ্রোকে খুন করিয়া ফাঁসী যায়, তাহা হইলেই মার্কিন দেশের আপদ বালাই মিটে। আমাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে লোকে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক দেশবাসী এবং এক ভাষাভাষী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া, পানভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি অন্যোন্যের শরীর স্পর্শে অনুরাগী না হইয়া, এক সমাজ সম্বদ্ধ, এক মতানুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে। সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে ভিন্নজাতীয় লোকের প্রতি তেমন তীব্র বিদ্বেষভাব জন্মিতে পারে না। অপর সকলের অপেক্ষা বৈদেশিক-বিদ্বেষ্টা হইয়াও ইংরাজ বর্ণভেদ মানে না—সুতরাং তাঁহাকে সামাজিক পার্থক্যগুলি অতি

যত্নপূর্ব্বকই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এই নিমিত্ত তিনি আপনার জাতীয় গৌরব বজায় রাখিবার জন্য অধিকতর ব্যস্ত থাকেন। এই জন্য তাঁহার পার্থক্য বুদ্ধিটি নিরন্তর ঘর্ষণে অধিকতর তীক্ষ্ণধার হইয়া থাকে।

উপনিবেশ স্থাপনের কথায় হিন্দুজাতির উল্লেখ করিবার একমাত্র প্রয়োজন ইংরাজের প্রকৃতিতে এবং হিন্দুর প্রকৃতিতে বৈদেশিক-বিদ্বেষ সম্বন্ধে যে প্রকার বিভেদ আছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা। নচেৎ আমরা কোথাও উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে যাই না—এবং কোন বিদেশীয়ের উপর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি কোমলই হউক বা কঠোরই হউক, কোন প্রকার ব্যবহারে নিযুক্ত হই না। তবে আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি যে ভিন্নজাতীয়ের সহিত মিশ্রণ নিরোধ করে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে বিদেশপ্রেরিত 'কুলি'দিগের ব্যবহারের উল্লেখ করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেকানেক শ্রমজীবি-লোক ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির অধিকৃত দেশে নীত হয়। কিন্তু তাহারা শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চায়—বিদেশে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না।

অতএব দেখা গেল যে, হিন্দুও বৈদেশিকের সহিত মিশ্রণে অনিচ্ছু এবং ইংরাজও বৈদেশিক-বিদ্বেষ্টা। ভারতবর্ষে এমন দুইটি জাতির একত্র সমাবেশ হওয়ার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হয়।

ভারতবর্ষে ভারতসন্তানের আধিপত্য নাই—কিন্তু আধিক্য আছে। এখানকার লোকসংখ্যা ইংরাজাধিকৃত অংশে প্রতি বর্গমাইলে ২২৯। সুতরাং এ দেশে লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছে। এখানে ইংরাজ আপনার উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, ভাষা এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে এবং ভারত-সন্তান সেই ধর্ম্ম, ভাষা এবং ব্যবস্থার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান—সেই সকলের প্রভাবেই তাহার মন এবং হৃদয় গঠিত। সুতরাং এখানে ইংরাজের ধর্ম্মাদিও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ভারত-সন্তানদিগের আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতিরও অনেক ভাগ ইংরাজদিগের আচারব্যবহারাদি হইতে ভিন্নরূপ। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের মনে যাহাই হউক, সাধারণতঃ ইংরাজের মনে ভারতবর্ষের প্রতি প্রকৃত মমতা এবং ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি একান্ত অসাধ্য। ইংরাজ ভারতবর্ষের সিংহাসন অপেক্ষাও স্বদেশের ফাঁসিকাঠ ভালবাসিবেন।

কিন্তু তেমন মমতা এবং সহানুভূতি না থাকিলেও ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছেন। ভারতবর্ষ তাঁহার অধিকৃত হওয়ায় ইংরাজের ধনগৌরব এবং

প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাঁহার স্বদেশ হইয়া যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহার অধিকৃত দেশ থাকিয়া তাঁহার লাভবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতবর্ষের জন্য তিনি কোন ক্ষতি স্বীকার করিতেই পারেন না —প্রত্যুত ভারতবর্ষের ধনে লাভভাগী হইতে তাঁহার পূর্ণ দাওয়া আছে। কিন্তু ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানেন যে, ন্যায়পথে এবং ধর্ম্মপথে না চলিলে কখন কোন রাজার অধিকার চিরস্থায়ী হয় না—প্রজা বিরূপ হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যে ভারতবর্ষে ন্যায়পথে এবং ধর্ম্মপথেই চলিতেছেন, সকলকে এইরূপ বুঝাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আছেন। তিনি স্পষ্ট কথাতেই বার বার বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীর উন্নতিসাধন করাই আমার রাজ্যপালনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ প্রকার অত্যুচ্চ উদার ভাব ব্যক্ত করিয়া বলা যে ধর্ম্মরক্ষার অনুকূল তাহা নিঃসন্দেহ। ইংরাজ যতদিন ঐ কথা মুখেও বলিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার প্রজাপালন নিন্দনীয় হইতে পারিবে না, ভারতবাসীর সহিত তাঁহার সহানুভূতি-শূন্যতার সমস্ত অশুভ ফল ফলিবে না, এবং অন্তর্বাহ্য উভয়তঃ না হউক, বাহ্যতঃ ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতে থাকিবে।

অল্পদিন গত হইল একজন জর্ম্মনদেশীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া এখানকার ইংরাজ শাসনের সমূহ গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরাজের ভারত-শাসনে বৈদেশিক ভাব নাই। সেই গুণকীর্ত্তনের একটি গূঢ় হেতু আছে। আজি কালি জর্ম্মনেরা ইউরোপখণ্ডের বহির্ভাগে আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি এবং উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা উদ্ধত এবং গর্ব্বিত আচরণের দোষে কোথাও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজের ব্যবহার তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অনুকরণীয় ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ জর্ম্মন পণ্ডিত এখানকার শাসনকার্য্যে ইংরাজ স্বদেশের এবং স্বজাতীয়ের লাভের প্রতি দৃষ্টি করেন না, এই কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জর্ম্মন গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছেন তাহার সহিত তুলনায় ইংরাজের ব্যবহারে ঔদ্ধত্য অল্প এবং ন্যায়ানুগামিতা অধিক।

ইংরাজ বণিক্‌বেশে রাজ্যগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বণিক্-প্রকৃতিসুলভ নম্রতা এবং সতর্কগুণে সকল বিষয়েই একান্ত ন্যায়পর হইয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং অনেক স্থলেই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়াছেন। বৈদেশিকবিদ্বেষ যদিও ইংরাজের স্বভাবগত, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা এবং আত্মসংযম এত অধিক যে, ঐ স্বভাবের সমগ্র অশুভফল কোথাও ফলিতে পায় নাই। নানা কারণে

ভারতবর্ষেই ঐ বৈদেশিকতার অশুভময় ফল স্বল্প পরিমাণে ফলিয়াছে। মানুষ জ্ঞানের দ্বারা সংস্কার এবং স্বভাবের দোষও অনেক কমাইতে পারেন। ইংরাজ ভারতবর্ষে তাহা কমাইয়া চলিয়াছেন। তথাপি তাঁহার রাজকার্য্যে যে বৈদেশিক ভাবের দোষ স্পর্শ হয় নাই, একথা বলা যায় না। কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ভারতবর্ষের শাসন ভারতবাসীর উন্নতি সাধনার্থ হইবে—এই মূলসূত্রের এক্ষণে একটু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শাসনসূত্র হইয়াছে—ইংলণ্ডের শুভোৎপাদনের কোন ব্যাঘাত না করিয়া যতদূর ভারতবাসীর শুভ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা যাইবে। অবশ্য এই কথার সহিত বলা হয় যে যাহাতে ইংরাজের ভাল, ভারতেরও তাহাতেই ভাল। কিন্তু যদি সত্য সত্য সকল বিষয়েই তাহা হইত, তবে শাসনসূত্রটির পরিবর্ত্তের প্রয়োজন হইত না।

(২) আইনেব চক্ষে সকল প্রজাই সমান। এই কথাটিও অক্ষুণ্ণ নাই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও শ্বেতকায়দিগের পক্ষে যে আইন ও আদালত কিয়ৎ-পরিমাণে ভিন্ন রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) প্রজাদিগেব ব্যবহারশাস্ত্র বজায় থাকিবে। অধিকাংশই বজায় আছে, সত্য। কিন্তু ঐ শাস্ত্রের যেখানে যেখানে ফাঁক পাওয়া যাইতেছে সর্ব্বস্থলেই অসঙ্কুচিতভাবে ইংরাজী ব্যবস্থাসূত্রের প্রবেশ হইতেছে।

(৪) বিচাবকার্য্য—আইন অনুসারে হইবে। কিন্তু বিচারের প্রণালী ইংলণ্ডের অনুরূপ অতি জটিল হইতেছে। আর এদেশে অতি কঠিন দণ্ডদানেই ইংরাজ বিচারকদিগের প্রবৃত্তি বাড়িতেছে।

(৫) প্রজার স্থানে করাদান সম্পূর্ণরূপে নিয়মনিবদ্ধ। আদানপ্রণালীতে যথেচ্ছাচার নাই, কিন্তু কর নিয়োগে যাহাতে স্বজাতীয়ের উপর উহার ভার অধিক না পড়ে, তজ্জন্য ইংরাজ-রাজকে যেন সতর্ক হইতে হইতেছে।

(৬) শুল্ক বা বাণিজ্যকর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে, যাহাতে ইংরাজী-শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয় তদনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়াতে দেশীয় শিল্পের বিলোপসাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৭) স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাসনের ক্ষমতা প্রায় সমুদায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তগত।

(৮) সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সকলই ইংরাজী ধরণের, কিছুই দেশীয় ধরণের হয় না।

(৯) ভারতবর্ষের ধর্ম্মকীর্ত্তিতে হস্তার্পণ হয় নাই। কিন্তু রক্ষণ অভাবে সমুদয় বিধ্বংসে সমর্পিত হইয়াছে।

(১০) সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজ-রাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্থ রাখিতেছেন।

এইরূপে যে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইবে সর্ব্বত্রই কতকটা ন্যায়ানুগামিতা সত্বেও প্রজার প্রতি সহানুভূতি না থাকিবার অশুভ লক্ষণ একটি না একটি দেখা যাইবে। যাহা কিছু সংস্কার, প্রতিকার বা সৎকার করিতে হইবে, ইংরাজ তাহার একমাত্র উপায় দেখিতে পান, তাঁহার স্বজাতীয় লোকের নিয়োগ অথবা তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি। বস্তুতঃ ইংরাজের বৈদেশিক ভাব হইতেই এইরূপ হইতেছে—এবং সে ভাব তিনি অধিকতর সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা স্বয়ং সঙ্কুচিত করিতে না পারিলে তাঁহার বল বুদ্ধির সহিত নিয়ত বর্দ্ধনশীল হইয়া চলিবারই সম্ভাবনা।

পঞ্চম অধ্যায়

ভবিষ্যবিচার—সাধারণ কথা

মানসদৃষ্টি কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি নিয়ত এবং স্থিরতররূপে সম্বদ্ধ রাখিলে অনুরাগ, বিরাগ, আসক্তি, বিদ্বেষ, প্রসাদ এবং গ্লানি প্রভৃতি ভাবের ন্যূনতা হইয়া প্রকৃত তথ্যোপলব্ধির পথ পরিষ্কৃত থাকে। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর বিচারে মনের ঐ প্রকার ঔদাসীন্য রক্ষা করিয়া চলা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। ঐ সকল ঘটনার সহিত আপনাদের সুখদুঃখের এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব, উহারা বাল্য-সংস্কার রূপে মনের এমন সারভূত হইয়া থাকে, এবং উহাদিগের সহিত ঔচিত্যানৌচিত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং যোগ্যাযোগ্য প্রভৃতি বোধসকল এমন সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত হইয়া যায় যে, বোধ হয়, কোন ব্যক্তিই একান্ত পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া সমাজতত্ত্বের বিচারে, কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

আমি ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার কোন কথাই আমার অনুরাগ অথবা বিরাগমূলক না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজের বণিক্‌ভাবে রাজ্যলাভ, তাঁহার জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী রাজভাব এবং তাঁহার জ্ঞান ও পরিণামদর্শনমূলক

ন্যায়পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিকভাব প্রদর্শন করিয়াছি, এবং তৎসহ এ কথাও বলিয়াছি যে, এদেশে ইংরাজের বদ্ধমূলতার সহিত তাঁহার বলবৃদ্ধির অভিলাষ বর্দ্ধিত হইবার এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত সহানুভূতির ন্যূনতা ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঐ কথা বলাতে ভবিষ্যবিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের সূচনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক, ভবিষ্যবিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া মানুষ আপনার গন্তব্যপথে পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। লোকে ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান বলে, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্য বলে না। অর্থাৎ কালের পৌর্ব্বাপরত্বের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অতীতের পর ভাবী, এবং সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান কালের উল্লেখ করে। এরূপ করিবার অপর কারণ যাহাই হউক, একটি কারণ এই হইতে পারে যে ভূত বিষয়গুলির বিচার করিয়াই ভাবী ব্যাপারের অনুভব হয়, এবং সেই অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়।

যিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই অল্প বা অধিক পরিমাণে নবজাতির ভাবী অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সকল অনুমানে কতক বিজ্ঞানের কতক ধর্ম্মশাস্ত্রের, আর কতক ইতিবৃত্তের এবং মনের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যেরূপেই ও বিষয়ের নির্ণয় চেষ্টা হউক, বিষয়টি কল্পনার লীলাভূমি। এখানে আশা, প্রীতি, ইচ্ছা, ঘৃণা প্রভৃতি সহচরদিগের সহিত তিনি যেন নিয়তই নৃত্যশীলা। এখানে মনের একান্ত ঔদাসীন্য রক্ষা করিয়া বিচার করা অতীতের মধ্যে কার্য্যকারণ সূত্র ধরিয়া চলা অপেক্ষাও বহুপরিমাণে কঠিনতর। যাহা হউক মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল মতের প্রচলন হইয়া আছে, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা মনুষ্যের বাসভূমি পৃথিবীর ভবিষ্যদশা কিরূপ হইবে, তাহার অবধারণ চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, পৃথিবী ক্রমশঃ তাপশূন্য হইয়া শীতল হইতে থাকিলে কিছুকাল ইহার সর্ব্বত্র শীতপ্রধান হইবে, কাজেই ইহার সকল ভাগই শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের উপযোগী হইয়া উঠিবে—কোন ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের বাসোপযুক্ত থাকিবে না। অনন্তর পৃথিবীর শৈত্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জল এবং বায়ুও তারল্য ভাব পরিহার করিবে, সুতরাং জল এবং বায়ুর বিনাভাবে যে সকল প্রাণী বাঁচে না, তেমন প্রাণী একটিও বাঁচিবে না। অতএব সকল মানুষই মরিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, চন্দ্রমণ্ডলের এক্ষণে যে অবস্থা হইয়াছে, পৃথিবীরও ভাবী দশা তাহাই হইবে।

অত দূরতম কালে দৃষ্টি প্রসারিত না করিয়াও বিজ্ঞানের নিয়ত উন্নতি দর্শনে কদাচিৎ এরূপও মনে করা হয় যে, দেশভেদে যে উষ্ণানুকূলতার প্রভেদ আছে নরজাতি তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। এবং তাহা হইলেই পৃথিবীর সকল ভাগে বাস করিতে পারিবে। শুদ্ধ তাহাই পারিবে এমত নহে। বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ এখন যেরূপ মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ, আকৃতিভেদ, এবং প্রকৃতিভেদ আছে, সেই সকল বিভেদও আর থাকিবে না। সকল মনুষ্যই এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে—এবং অবশ্যই একভাষা-ভাষী এবং একশাসনপ্রণালীর বশীভূত হইবে।

উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মনুষ্যের অমরত্ব লাভ এবং জীবের স্বতঃ উৎপত্তি সাধনও অসম্ভবপর ব্যাপার নহে। স্থূল কথায়, ইঁহারা মনে করেন যে, কালে পৃথিবীই স্বর্গ হইয়া উঠিবে। তাঁহারা বলেন পৃথিবীর ভাবী অবস্থাই স্বর্গের প্রতিরূপ স্বরূপ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর প্রদান করিয়া যাঁহারা নরজাতির ভাবী অবস্থার অবধারণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একেশ্বরবাদী তাঁহারা বলেন যে, সকল জাতীয় মনুষ্যই কোন সময়ে তাঁহাদেরই ধর্ম্মাবলম্বী হইবে। খ্রীষ্টানদিগের মতে সকলেই খ্রীষ্টান হইবে, মুসলমানদিগের মতে সকলেই মুসলমান হইবে, যাহারা না হইবে তাহারা মারা পড়িবে। তাহা হইলেই পৃথিবীর সমস্ত পাপতাপ দূর হইয়া যাইবে—এবং পৃথিবী স্বর্গ না হউক, স্বর্গতুল্য হইয়া উঠিবে। বৌদ্ধ এবং হিন্দু মত ওরূপ নয়। নিরীশ্বরবাদী এবং সর্ব্বেশ্বরবাদী উভয়েরই মতে পরিবর্ত্ত মাত্রই অস্থায়ী। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, তাহাও চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে না। সুতরাং কালের অনন্ত ভাব ধরিয়া বিচার করিলে সকল ব্যাপারেই পূর্ব্বাবস্থা চক্রনেমিক্রমে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ইঁহাদিগের শাস্ত্রে যদিও ব্যক্তিগত ক্রমোৎকর্ষের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস খ্যাপিত হয় তথাপি সমাজোন্নতির অশেষতা উপলব্ধ হয় না। ইঁহাদের মতে স্বর্গও অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া স্বীকৃত নহে।

বৈজ্ঞানিক মত এবং ধর্ম্মমত উভয়কেই দৃষ্টিপথে রাখিয়া এবং ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া অশেষবিৎ অগস্ট কোম্‌টি নরজাতির ভবিষ্যদশার বিচার পূর্ব্বক একটি নব্য মতের কল্পনা করিয়াছেন। কোম্‌টির গ্রন্থসমূহে সমাজতত্ত্বের নিগূঢ় বিচার এবং ভবিষ্যঘটনার বহুল কথা দৃঢ়রূপে ব্যক্ত আছে। তাঁহাকে ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ব-শাস্ত্রের সংস্থাপয়িতা বলিয়াই ধরা হয়। তাঁহার মতের সহিত প্রচলিত হিন্দু এবং বৌদ্ধপ্রণালীর কতকটা মিল আছে, এবং ইংরাজী-

শিক্ষিত সুবোধ এবং সুশীল কতিপয় দেশীয় লোক এক্ষণে কোম্‌টির মতবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক উহার প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সকল কারণে কোম্‌টির স্থূল স্থূল কথাগুলির সবিশেষ উল্লেখ করা আবশ্যক। কোম্‌টি বলেন, (১) পৃথিবীতে ধর্ম্মভেদ রহিত হইবে (২) বর্ণভেদ রহিত হইবে (৩) যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যাইবে (৪) বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে (৫) শাসন এবং শিক্ষাকার্য্য পবিত্রাত্মা পুরোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে (৬) জনগণ সর্ব্বত্র যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে এবং (৭) অভ্যাসগুণে পরার্থপরতা মানবহৃদয়ে স্বার্থপরতার আসন পরিগ্রহ করিবে। কথাগুলি বিচার করিয়া বুঝিতে হয়।

(১) ধর্ম্মভেদ রহিত হইবার সম্বন্ধে কোম্‌টির তাৎপর্য্য এই যে, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই বিচার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। প্রত্যুত উহা বিচারের বিষয়ই নহে। আর মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধির মূল এবং চরম উভয়ই মনুষ্য-সমাজের হিতসাধন। অতএব যখন বিজ্ঞানালোচনার বলে, উপধর্ম্মের প্রয়োজন এবং তাহাতে বিশ্বাস তিরোহিত হইবে, তখন সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মমতের পরিহার পূর্ব্বক মনুষ্য নিজ সমাজেরই পূজা করিবে—সেই আবহমান কাল ব্যাপক মানবসমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ শিশুক্রোড়স্থা একটি নারীমূর্ত্তি—যথা গণেশ জননী—অথবা যিশু-মেরী অথবা হোসেন-ফতেমা। এই নবদেবপূজাই পৃথিবীর ভাবী ধর্ম্ম।

কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের দ্বারাই সুসিদ্ধ, যখন দেখা যাইতেছে যে কারণের অনুসন্ধানে মনুষ্যমন চির জাগরূক, যখন দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যসমাজের প্রতি সহানুভূতিমূলক যে ধর্ম্ম তাহারও অতিব্যাপক পদার্থ, যথা বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্বসৌন্দর্য্য প্রভৃতি অত্যুদার ভাব সকল, মনুষ্যহৃদয়ে অধিষ্ঠিত, এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা, অপাপবিদ্ধত্ব প্রভৃতি গুণ-লক্ষণে লক্ষিত মনুষ্যের উপাস্য বস্তু সর্ব্বময় রূপেই বিদ্যমান, তখন পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ-বিদূষিতাঙ্গ, আংশিক এবং কাল্পনিক একটি নরদেব পূজায় মানববুদ্ধি এবং মানবহৃদয়ের তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথা? আমার বোধ হয় যে, সর্ব্বেশ্বরবাদই পৃথিবীতে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইবে। কোম্‌টির গুরুপর্য্যায়ী এবং শিষ্যপর্য্যায়ী কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরও ঐ ভাব।

(২) বর্ণভেদ রহিত হইবার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিবেচ্য। তাহার প্রথম

কথা এই যে, বর্ত্তমান বর্ণভেদের হেতু কি শুদ্ধ বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর ভেদ, না মৌলিক উৎপত্তিরই ভেদ। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল-বায়ুর বিভেদই বর্ণভেদের একমাত্র কারণ। কোম্‌টির মতও তাহাই। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তথাপি বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর প্রকৃতির ভেদ রহিত করাই কি বিজ্ঞানের সাধ্যায়ত্ত? ইউরোপীয়দিগের বংশজাত মার্কিনেরা আপনাপন পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা দীর্ঘচ্ছন্দ এবং রক্তবর্ণ হইয়াছে—অর্থাৎ আকারে এবং বর্ণে আমেরিকার পূর্ব্ব অধিবাসীদিগের সমধিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। অতএব এ পর্য্যন্ত যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় না যে, জলবায়ুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিবার শক্তি বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন। তবে এ কথা বলা যায় যে, বিভিন্ন বর্ণের লোকসকল পুরুষানুক্রমে একদেশবাসী হইয়া থাকিতে থাকিতে উহাদের মধ্যে মিশ্রণ হইয়া যাইবে এবং সেই মিশ্রণের ফলে কোন কালে আকার এবং বর্ণসাম্য জন্মিতে পারিবে। পক্ষান্তরে ইহাও দেখিতে হয় যে, যদিও "মিশ্র নরনারীর সংযোগে বহু পুরুষ ব্যাপিয়া বংশের রক্ষা হয় না," এ কথা সত্য না হয় তথাপি অনেক জাতীয় লোকেরই দৃঢ় সংস্কাব মিশ্রণের বিরুদ্ধ। সেই সংস্কারের বল কোথায় যাইবে? উহা অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ নিবারণ কবিবে, স্থতরাং পৃথিবীতে বর্ণভেদ রহিত হইয়া যাইবে, এ কথা যতই দূরবর্ত্তী কালকে লক্ষ্য করিয়া বলা হউক, উহা কোন নির্দ্দিষ্ট কালকেই লক্ষ্য করিতে পারে না। আর মিশ্রণপ্রবণতা যতই বলবতী হউক, যে যে কাবণে পূর্ব্বে বর্ণভেদ জন্মিয়াছে, সে সকল কারণের মধ্যে অতি প্রবল যে পরিবৃতির ভেদে আকারভেদ এবং যোগ্যতার অনুসারে বংশের রক্ষা, তাহা ত কখনই সম্পূর্ণরূপে যাইবে না।

(৩) যুদ্ধবিগ্রহাদি উঠিয়া যাইবার সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে, পৃথিবী এবং তজ্জাত ভোগ্যবস্তুর সসীমতাই মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ, মোকদ্দমা, মামলা যুদ্ধবিগ্রহাদির মূলকারণ। যদি ভোগ্য বস্তুর পরিমাণ এবং সংখ্যা অপরিসীম হইত, তবে মানুষে মানুষে বিবাদের কোন চিরস্থায়ী হেতু থাকিত না। তুমিও যাহা চাও আমিও তাহাই চাই, আর সে সব বস্তু অনেক নাই—এই জন্যই তোমাতে আমাতে বিবাদ হয়। বিভিন্ন জাতির বা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সংগ্রাম হয় তাহাবও মূল কাবণ ঐরূপ। তোমায় আমায় বিবাদ না হয় এরূপ কবিতে হইলে, হয় তুমি যাহা চাও তাহা আমি না চাই অথবা উভয়ে যাহা চাই সেই বস্তুব পবিমাণ বৃদ্ধি হইযা উঠে। মনে হইতে পাবে যে, প্রথমটি পরার্থপরতা-

বুদ্ধির প্রাবল্যে সাধিত হইবে, দ্বিতীয়টিও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রভাবে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু পরার্থপরতাও অসীম হইতে পারে না, আর বিজ্ঞান যতই বিকলন শক্তির আস্ফালন করুন, এ পর্য্যন্ত একটিও প্রকৃত নূতন দ্রব্যের সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। সুতরাং যেমন ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা রাজব্যবস্থার বলে সাধিত হইয়াছে, জাতিগত বিবাদের মীমাংসাও যদি কখন বিনা যুদ্ধে সিদ্ধ হয়, তাহা সেইরূপেই হইতে পারিবে। বিভিন্নজাতীয় লোকের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত অনেক দিন হইতে হইয়া আছে। গ্রীকদিগের মধ্যে আমফিক্‌টিয়োনিক্ সভা ছিল, ইউরোপখণ্ডেও শক্তি-সামঞ্জস্যের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পরস্পর মিলন হইয়া থাকে, আর পোপের কর্ত্তৃত্বেও কখন কখন বিগ্রহাদি মিটিয়া যায়। যদিও ঐ সকল উপায়ে একাল পর্য্যন্ত যুদ্ধকাণ্ডের বিশেষ হ্রাস বা নিবৃত্তি হয় নাই, তথাপি যখন বীজ আছে, তখন কালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্নজাতীয় লোকদিগের মধ্যে সকলের মাননীয় এমন একটি সভার সংস্থাপন হইতে পারে, যে সভা বিভিন্ন জাতীয় বিবাদের হেতু জানিয়া বিনা যুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণ কিছুতেই যাইবার নহে। সুতরাং তাহা একেবারে মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

(৪) বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা রহিত হইবার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ পর্য্যন্ত ওরূপ চেষ্টার কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষিত হইতেছে না। তবে এখন সাম্রাজ্য স্থাপনের ভাব একটি বিশেষ পথকেই লক্ষ্য করিতেছে। যে সকল লোক মূলতঃ একজাতীয় তাহাদিগকেই মিলাইয়া এক একটি সাম্রাজ্য ঘটাইবার জন্য যত্ন হইতেছে। প্রুসিয়া বলেন জর্ম্মন জাতীয় সকলেই আমার সহিত মিলুক, রুশিয়া বলেন শ্লাবোনিক জাতীয় যাবতীয় লোক আমার অধীন হউক, ফ্রান্স লাটিন জাতীয় সকলকে আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করাইতে সমুৎসুক, আর ইংরাজ-রাজনৈতিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত আংগ্লোসাক্সন জাতিকে ইংলণ্ডের সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য যত্নবান। এরূপ সাম্রাজ্য সংঘটিত হইবার অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় শক্তিই বিদ্যমান আছে। এক এক জাতি এক একটি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলে সাম্রাজ্যগুলি অধিকতর দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়, অতএব তাদৃশ সাম্রাজ্য সংঘটনে লোকের প্রবণতা থাকিতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তার এবং গমন-সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া একজাতীয় মনুষ্যকে বিভিন্নদেশবাসী করিয়া তুলিতেছে। মনুষ্যের পরস্পর সংস্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আরও বৃদ্ধি পাইবে। তদ্ভিন্ন,

একজাতিত্বে যেমন সহানুভূতির বৃদ্ধি, তেমনি দেশভেদে স্বার্থের কতকটা ভেদনিবন্ধন সহানুভূতির হ্রাস হয়। তজ্জন্য জাতিত্বকে মূল করিয়া সাম্রাজ্য সংঘটনের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ইটালী লাটিন জাতির আবাসভূমি। উহা ফ্রান্সের কৃপায় অষ্ট্রিয়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইটালী এখন ফ্রান্সের চিরশত্রু জর্ম্মনির সহিত একমত হইয়া চলিতেছে। বাল্‌কান দেশগুলিতে শ্লাভজাতীয় লোকেরাই অধিক পরিমাণে বাস করে। ঐ প্রদেশগুলিতে তুরস্কের যে আধিপত্য ছিল তাহা রুশিয়ার প্রতাপেই খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাল্‌কান প্রদেশীয় অধিকাংশ লোক রুশিয়ার প্রতি নিতান্ত সন্দিহানমনা হইয়াই চলে। ইংলণ্ড আপনার উপনিবেশ-গুলির জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা ইংলণ্ডের এমনি আদুরে ছেলে হইয়াছে যে, মাতৃভূমির নিমিত্ত তাহারা কোন ক্ষতি স্বীকারে সম্মত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব একজাতিত্বমূলক সাম্রাজ্য বন্ধনও যে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুভবসিদ্ধ নহে। যদিই বা হয়, সেই সকল সাম্রাজ্য সত্বরেই প্রাদেশিক সম্মিলিত শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্য কালে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সম্মিলিত শাসনপ্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক প্রদেশপ্রমাণ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতাভেদ চিরকালই থাকিবে। সুতরাং ক্ষমতাশীল লোকে আবার বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তুলিবে। পরার্থপরতার সহস্র বৃদ্ধিতেও ঐ কার্য্যের নিবারণ হইবে না।

(৫) শিক্ষা এবং শাসনের ভার পুরোহিতবর্গের হস্তে থাকিবার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, এখনও শিক্ষার ভার প্রায় সকল দেশেই যাজকবর্গের হস্তে ন্যস্ত আছে। পূর্ব্বেও ছিল। ইউরোপ খণ্ডের যে যে দেশে প্রটেস্টাণ্ট মতের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, সে সকল দেশে যাজকবর্গ কিছু হীনপ্রভ হইয়াছেন এবং যাজক ভিন্ন অন্যান্য লোকেও শিক্ষকের পদে ব্রতী হইতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও একমাত্র ফ্রান্স দেশ ভিন্ন অপর সকল দেশে এখনও যাজকদলই স্বদেশের শিক্ষায় নিযুক্ত। ফ্রান্সেও যাজকেতর লোককে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ফল অতি শুভ বলিয়া গণ্য হয় নাই। যাঁহারা ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, তাঁহারাই সকল শিখাইবেন ইহাই স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ঐ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল—ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান করিতেন। মুসলমানদিগের মধ্যেও মুল্লা বা যাজকের দলই প্রধানতঃ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া

থাকেন। বৌদ্ধজাতীয়দিগেরও ঐ রীতি। অতএব যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে, তাহা পরেও থাকিবার সম্ভাবনা।

কিন্তু শাসনকার্য্যের ভার যাহা কতক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কতক পরম্পরা সম্বন্ধে যাজকবর্গের হস্তগত ছিল, তাহা উঁহাদিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ডে পোপের প্রাধান্য কাথলিক রাজ্যগুলিতেও পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছে। এমন কি এই সেদিন আয়র্লণ্ডের লোকেরাও ল্যাণ্ডলীগ সম্বন্ধে পোপের নিবারণ শুনিল না। প্রটেস্টাণ্টদিগের দেশে ত যাজকদিগের প্রাধান্য কিছুই নাই। তুরস্কের সুলতান আপন যাজকমণ্ডলীর (উলেমাব) মত গ্রহণ করিয়া চলেন বটে, কিন্তু ইউরোপীয় রাজাদিগের প্রবলতর অনুরোধের নৈরন্তর্য্যে তাঁহাকে ক্রমশঃ উলেমার মুখাপেক্ষা ন্যূন করিতে হইতেছে। বৌদ্ধদিগের রাজ্য সকলেও পূর্ব্বে এক একটি ধর্ম্ম রাজ্যের অধিষ্ঠান ছিল, তাহা হয় একেবারে উঠিয়া যাইতেছে, নতুবা খর্ব্বশক্তি হইতেছে। এই সকল লক্ষণে আপাততঃ মনে করা যাইতে পারে না যে, শাসনকার্য্যে যাজকবর্গের মহিমা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু যখন ইতিবৃত্তশাস্ত্রের বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যাজকদিগের হস্ত হইতে শাসনভার অপসৃত হইবার মুখ্যকারণ রাজ্যে যুদ্ধের আধিক্য এবং জনগণের বৈষয়িক ব্যাপারে অনুরাগের বৃদ্ধি, তখন মনে করা যায় যে, যুদ্ধের ন্যূনতা হইলে এবং বিষয়ানুরাগ ধর্ম্মানুরাগ হইতে অভিন্নরূপে উপলব্ধ হইলে আবার শাসনকার্য্যে যাজকবর্গের আধিপত্য জন্মিতে পারে। এইস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সর্ব্বেশ্বরবাদ স্বীকৃত হইলে বিষয়চিন্তা এবং বিষয়ার্থ পরিশ্রম, ধর্ম্মচিন্তা এবং তপশ্চরণ হইতে অপৃথগ্‌ভূত হইয়া উঠে। অপর কোন মতবাদে তাহা সর্ব্বাঙ্গীণ হয় না।

(৬) রাজ্যের লোক যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভাজিত হইবার সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, স্থূলতঃ ঐ প্রকার বিভাগই পৃথিবীর সকল দেশে পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব পরেও ঐ বিভাগ বলবৎ থাকিবারই সম্ভাবনা। ঐ বিভাগ ভারতবর্ষে পুরুষানুক্রমিক হওয়াতেই অতি বিস্পষ্ট ভাব ধারণ করিয়া আছে এবং যদি উহা অতিপল্লবিত না হইত, তাহা হইলে কোন অশুভ ফলই প্রসব করিত না। যাতায়াত-সৌকর্য্যের বৃদ্ধির সহিত কূপমণ্ডুকতার হ্রাস হইয়া এ দেশেও এক্ষণকার স্থানভেদমূলক জাতীয় অবান্তরভেদগুলি কিয়ৎপরিমাণে তিরোহিত হইতে পারে, এবং মহাদেশটি আপনার প্রকৃত পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে।

(৭) মানবহৃদয়ে পরার্থপরতা সম্যক্ প্রকারে স্বার্থপরতার অধিকার গ্রহণ করিতে পারে কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই অবধারিত হয় যে, অভ্যাসগুণে যদিও স্বার্থপরতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করা যায়, তথাপি উহা একেবারে নিঃশেষিত হইতে পারে না। যে সহানুভূতি হইতে পরার্থপরতা জন্মিবে, অহং অভিমানটি তাহারও মূলে আছে। সুতরাং স্বার্থবোধ এবং পরার্থবোধ উভয়ে পরস্পর অনুস্যূত। বস্তুতঃ যদি মানবমন একেবারেই স্বার্থবোধশূন্য হয়, তাহা হইলে উহা পরার্থবোধেও অক্ষম হইয়া পড়ে—তখন মানুষ পরের উপকার করিবে কি, উপকার কিসে এবং অনুপকার কিসে, তাহা জানিতেই পারে না। কোম্‌টিও ঐরূপ স্বার্থশূন্যতার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উদ্দেশ্য এইমাত্র ছিল যে, লোকে, বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা, যেরূপ পরার্থ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া স্বার্থের অনুসরণ করে, এবং তাহা করিয়া একান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং অব্যবস্থিত হয়, ক্রমশঃ সেই ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে অভ্যস্ত হয়।

অতএব উপসংহারে বলা যায় যে, মনুষ্যসমাজের প্রতি আন্তরিক হিতৈষা প্রণোদিত হইয়া পণ্ডিতপ্রবর সুতীক্ষ্ণধী অগস্ট কোম্‌টি যেরূপে ভবিষ্য গণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কিয়ৎপরিমাণে তথ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য। তিনি ইতিবৃত্তশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা মনুষ্যসমাজের প্রতি যে সকল শক্তির কার্য্যকারিতা উপলব্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এবং অনেকটা সংযতচিত্ত হইয়াও বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। যদি নিতান্ত তাড়াতাড়ি করিয়া একটা নূতন ধর্ম্মপ্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না যাইতেন, অথবা যদি তাহার পূর্ব্বে কখন এই ভারতবর্ষে কিম্বা কোন বৌদ্ধ দেশে আসিতেন এবং তাঁহার আনুমানিক অনেকানেক ব্যাপারের কতকটা ফল প্রত্যক্ষীভূত করিতেন, কিম্বা অভ্যাস এবং শিক্ষার দ্বারা কতদূর হইতে পারে, আর কি হইতে পারে না, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে মানুষের পরিবর্ত্তনশীলতার সীমা এবং মানব সমাজে চক্রনেমির ক্রম নির্ণয় করিতে না পারিলেও সমাজ যে বক্র রেখাক্রমে চলে তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাইতেন, তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্র আরও বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইত, এবং সমাজতত্ত্বশাস্ত্র সংস্থাপনের মুখ্য ফলই ফলিত—গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় মনুষ্যসমাজও যে কোন বিশেষ কক্ষায় গমন করে তাহা অনুমিত হইতে পারিত।

ভবিষ্যবিচার—ইউরোপের কথা

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এখনও অধিকাংশ লোকেই স্বধর্ম্মপর এবং পরকালে বিশ্বাসবান্ আছেন। তথাপি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই উদরচিন্তায় অর্থচিন্তায়, এবং সুখলালসায় উদ্বেজিত হইয়া বিষয়ভোগার্থ ই আয়াসবান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল লোক কেবল ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যই চায়। উহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদত্ত পারলৌকিক সুখের উৎকোচে ভুলিতে চাহে না। তাহাদের মধ্যে গিয়া যদি বল যে, তোমাদেব শাসনপ্রণালীর এই এই দোষেই তোমাদের যত দুঃখ, তাহারা সে কথায় কান দিবে এবং হয়ত শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। যদি বল, তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহা অমুক বা অমুক কর্ত্তৃক অপহৃত হইতেছে, তাহাবা সে কথায় বিশ্বাস করিবে এবং সেই অমুক বা অমুকের ঘরবাড়ী লুঠ করিতে যাইবে। কিন্তু ধর্ম্মের কোন কাহিনীতে উহাদের মন যায় না। পবকালকে মাথায় রাখিয়া উহারা ইহকালকেই ভোগ করিতে চায়।

যেখানে অনেক লোকের মন এরূপ ঐহিকতাপ্রবণ হইতেছে, সেখানকার কবি এবং সংস্কারকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ যে ঐহিকতার উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া সমাজসংস্কারের এবং সমাজের ভাবী অবস্থার কল্পনা করিবেন, তাহা সম্ভবপর। ইউরোপে তাহাই হইতেছে। যেমন সর্ব্বদাই রাজ্যশাসননীতির এবং অর্থনীতির পরিবর্ত্ত চেষ্টা হইতেছে, তেমনি সমাজগঠনের নূতন নূতন শৃঙ্খলার আন্দোলনও চলিতেছে। ঐ সকল সমাজ-কল্পনার কিছু উল্লেখ না করিলে সমাজ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যবিচার সর্ব্বাঙ্গীণ হইতে পারে না। এই জন্য সংক্ষেপতঃ তাহাদিগের কিছু উল্লেখ করিব।

ইউরোপখণ্ডের ইতিবৃত্ত তিনটি স্থূল ভাগে বিভক্ত। তাহার প্রথম ভাগের আরম্ভ যে কোন পূর্ব্বকাল হইতে হউক, উহার পরিসমাপ্তি রোমসাম্রাজের পতনে; দ্বিতীয় ভাগ, ঐ সময় হইতে আবদ্ধ হইয়া ফরাসীদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবে পর্য্যবসিত; আর তৃতীয় ভাগ, ঐ বিপ্লবকাণ্ডের পরবর্ত্তী আজি পর্য্যন্ত সমস্ত সময়কে লইয়া সংঘটিত। ভবিষ্য সমাজ সংঘটনের যাবতীয় কথা এই শেষভাগেরই অন্তর্নিবিষ্ট। পূর্ব্ব দুইভাগে সমাজ-কল্পনার যে সকল কথা পাওয়া যায়, সেগুলি কবিকল্পনার ন্যায়; সে সকল কথাকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই বলিলেও চলে। অতএব ফরাসী দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার হইতেই প্রকৃত-

প্রস্তাবে সামাজিক বন্দোবস্তের নূতন মতবাদগুলি বাহির হইয়াছে বলা যায়।

ফরাসীদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে কয়েকটি কথার ধুয়া উঠিয়া ক্রমে ইউরোপের মধ্যে সিদ্ধান্তবাক্য বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে। কথাগুলি এই (১) মনুষ্য স্বাধীন জীব। (২) মনুষ্যেরা পরস্পর তুল্য। (৩) মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। এই সকল কথা যে কারণে উঠে তাহার প্রভাবে ফরাসীদেশে সমূহ পরিবর্ত্ত ঘটে। তাহার মধ্যে কোনগুলি অল্প কালের জন্য থাকে, অপর কতকগুলি স্থায়ী হইয়াছ, এবং অপরাপর দেশেও পরিগৃহীত হইতেছে। ফরাসী-বিপ্লবে (১) যাজকদিকের তিরস্কার এবং ধর্ম্ম-শাসনের উচ্ছেদ হয়। (২) রাজার শাসন উঠিয়া গিয়া প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিভূদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। (৩) ভূম্যধিকারীদিগের নির্ব্বাসন হইয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। (৪) পৈতৃক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠাধিকার রহিত হইয়া সকল সন্তানের সমান স্বত্ব সংস্থাপিত হয়। (৫) রাজমধ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থার তিরোধন হইয়া সর্ব্বভৌমিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। (৬) ব্যক্তিভেদে ধর্ম্মাধিকরণের বিভিন্ন নিয়ম রহিত হইয়া আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান হইয়া দাঁড়ায় (৭) অপরাধীর নির্য্যাতন এবং বিচারকার্য্যের ব্যয়াধিক্য নিবারিত হয়। (৮) আদত্ত কর, শাস্তার ভোগে ব্যয়িত না হইয়া প্রজার হিতার্থই ব্যযিত হইবার বিধি হয়। (৯) শিক্ষা সম্পাদন, সুনীতি প্রবর্ত্তন, বিদ্যা এবং শিল্পের সম্বর্দ্ধন, রথ্যা নির্ম্মাণ, বাণিজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি প্রজার হিতকর ব্যাপার, রাজা বা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাসম্ভূত বা দয়ার কার্য্য না থাকিয়া শাসনকার্য্যের অঙ্গীভূত হয়। এই সকল পরিবর্ত্তের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, ইউরোপে প্রজাসাধারণের হিতোদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সমাজের পরিচালনা করাই ফরাসীবিপ্লব কাণ্ডের প্রদত্ত অতি মহতী শিক্ষা। *

ইউরোপে ঐ তথ্যশিক্ষার সহিত একটি অতথ্যশিক্ষাও হইয়া গিয়াছে। তথায় ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে সুশাসনের শিক্ষা হয় নাই—বিপ্লবের বলে হইয়াছে। সেখানে ন্যায়ানুগামিতার শিক্ষা না হইয়া বিদূষিত সাম্যবাদ ধরিয়া বিপ্লব করিতে হইয়াছে। কিন্তু ওরূপ সাম্যের কথাটি প্রকৃত কথা নয়। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী প্রভৃতিই সধন

* ভারতবর্ষে ঐ শিক্ষা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছিল, যথা—

ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানামনুপালনম্।

নির্দ্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥

সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শাস্ত্রোক্ত করাদি ভোক্তা রাজা সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতিপালনে বাধ্য।

ছিলেন। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যাদির প্রভাবে মধ্যবিধ লোকের মধ্যেও ধনবত্তার এবং বিদ্যাচর্চ্চার বিস্তার হয়। এমন কি, ঐ সকল লোকের মধ্যে অনেকেই ভূম্যধিকারী প্রভৃতি শাস্তৃবর্গের অপেক্ষা ধনে এবং ক্ষমতায় বড় হইয়া উঠে। ঐ সকল লোক আত্ম-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া শাস্তৃদলের সহিত আপনাদের সমতা খ্যাপন করে এবং সেই সাম্যবাদের বলে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। কিন্তু জন্মবৈষম্যের স্থলে ধনবৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছিল মাত্র। বৈষম্য যায় নাই—উহার একটু গতি ফিরিয়াছিল।

যে সময়ে ফরাসীবিপ্লব হইতে অলীক সাম্যবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, সেই সময়েই ইউরোপখণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রাদির আবিষ্কার, উৎকর্ষ সাধন, এবং প্রয়োগ-বাহুল্যে শিল্পজাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং মূলধনীদিগের ধনের ঐকান্তিক আধিক্য হইতে থাকিল। তজ্জন্য শ্রমজীবীদিগের কার্য্যহানি, ভক্ষ্য-সামগ্রীর মূল্য-বৃদ্ধি এবং অস্থি-পেষক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হইল। কলের ব্যবহার বাড়িলেই মজুরের কাজ কমে, কাজ কমিলেই মজুরের দর কমিয়া যায়। মজুরির দর কম হওয়া, আর ভক্ষ্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া, একই কথা। বৈদেশিক শিল্পকরদিগের প্রতিযোগিতা এবং দেশীয় শিল্পকরদিগের পরিশ্রমের আতিশয্য এ দুইটিও এক পদার্থ। কলে জিনিস হয় বেশী, স্বদেশে সমুদায় কাটে না, বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়, এবং বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়ে। শ্রমজীবী এবং শিল্পকরদিগকে খাটিতে হয় অধিক, এবং যে সমাজে ঐহিকতার প্রাবল্য তথায় শ্রমজীবীরা লাভভাগী হয় না, ধনোপার্জ্জন হয় মূলধনীদিগের।

অতএব একপক্ষে ফরাসীবিপ্লব হইতে লোকের মনে সাম্যভাবের বৃদ্ধি হইল, এবং পক্ষান্তরে কলের প্রভাব হইতে লোকের অবস্থার সমূহ বৈষম্য জন্মিল। এই বাহ্য বৈষম্য নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই সুবুদ্ধিগণ কর্ত্তৃক সমাজের বিবিধ রূপ-কল্পনা হইয়াছে।

ঐ কল্পনা অনেক প্রকার হইয়াছে। তাহার এক একটি করিয়া বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। উহাদিগের মূলসূত্র কয়েকটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সকল কল্পনারই প্রধান সূত্র এক—"সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিনিষ্ঠ না হইয়া সমাজনিষ্ঠ হউক।" অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের কিছুমাত্র সম্পত্তি থাকিয়া কাজ নাই, সকল সম্পত্তির অধিকারী একমাত্র সমাজ হইয়া থাকুন। তুমি আমি যে যাহা রোজগার করিব সকলেই সমাজের হাতে দিব; সমাজ আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। আমরা কাজ করিব ক্ষমতানুসারে, ভোগ করিব প্রয়োজনানুসারে।

ইউরোপীয়েরা ভারতবাসী অপেক্ষা সহস্রগুণে ব্যক্তিনিষ্ঠত্বের পক্ষপাতী।

আমাদের মধ্যে সম্মিলিত-পারিবারিক-প্রণালী প্রচলিত। উঁহাদের মধ্যে তাহা নাই। আমাদের মধ্যে পাঁচ ভাই রোজগার করিয়া বাপের হাতে দেয়, বাপ যাহাকে যাহা দিতে হয়, তাহা দিয়া থাকেন। ইউরোপীয়েরা এরূপ বন্দোবস্ত আদবেই ভাল বাসেন না। উঁহাদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হইয়া যাইবারই বিধি।

এরূপ পারিবারিক অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে একেবারে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের বিলোপ হইয়া সমাজ-নিষ্ঠ স্বত্বের সংস্থাপন হইবার কথা অতি বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা ততটা বিস্ময়ের বিষয় থাকে না। কোন বস্তুকে নিতান্ত নিজস্ব বোধ করা একটি প্রকাণ্ড ভ্রম। একতঃ এই নশ্বর মর্ত্ত্যলোকে কিছুই কাহারও নিজস্ব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তির উৎপত্তি বল, তাহার রক্ষা বল, তাহার ভোগ বল, কিছুই কাহারও একেলার যত্নে বা সুখসাধনে সম্পাদিত বা পর্য্যবসিত নহে। সুতরাং শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যে মনুষ্যের যে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব, তাহার অভ্যন্তরে একটি গূঢ় সম্মিলিত স্বত্ব স্বীকার করিবার সম্যক্ হেতু আছে। ইউরোপীয়েরা রোমীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বত্বের ঐ গূঢ় প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এখন যে একেবারে সামাজিক সম্মিলিত স্বত্বের পক্ষপাতী হইতে যাইতেছেন, তাহা সেই পূর্ব্ব ভ্রমেরই ফলমাত্র। একদিকে অধিক ঝুঁকিলেই আবার তাহার বিপরীত দিকে ঝুঁকিতে হয়।

যদি বাণিজ্যিকী সুবিধার প্রতি তন্মনস্কতা বশতঃ সম্মিলিত স্বত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত না হইত, যদি ঐ বোধটিকে আপনাদের সহিত মিলে না বলিয়া অসভ্যতার বা অনুন্নতির চিহ্ন বলিয়া গণনা না করিতেন, তবে আজি ইউরোপের মধ্যে সামাজিক স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য এমন আগ্রহাতিশয্য হইত না।

এখন যে ইউরোপে পরার্থপরতা শিখাইবার জন্য এতটা আগ্রহ বাড়িয়াছে, তাহারও কারণ ঐরূপ। ইউরোপীয়দিগের রাজনীতি, সমাজনীতি, গৃহনীতি সকলই একমাত্র স্বার্থপরতার উপর সংঘটিত হইয়া আছে। ঐ সকলের দোষ ক্রমে ক্রমে আতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে পদে পদে দৃষ্ট হইতেছে। অতএব একেবারে পরার্থপরতার দিকে বেগ বাড়িয়াছে—এখনও কাজে বড় কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু ক্রমে কাজেও কতকটা হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও এইরূপ ঝোঁকগুলিকে সমাজের উন্নতির পথানুসরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত উন্নতির পথে ওরূপ ঝোঁক ধরে না, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত তথ্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াই ব্যাপকতর সত্যের আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে

কোন পূর্ব্বনির্ণীত সত্যের অপলাপও হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ-কল্পয়িতৃগণ অনেকানেক সত্যের অপলাপ করিয়াই আপনাপন মত প্রচারিত করিয়া থাকেন। প্রথম, তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধন মানেন না; দ্বিতীয়, তাঁহারা বৈবাহিক সংস্কার স্বীকার করেন না; তৃতীয়, তাঁহারা প্রজাসংখ্যার বৃদ্ধি সংকোচ করা আবশ্যক বলেন না; চতুর্থ, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন দল বলেন যে, মানুষেব সাহজিক রিপুসকলকে দমন করিবার চেষ্টা করা অবৈধ; পঞ্চম, অপর কোন কোন দলের মতে শারীরিক সুখ ভোগই পরম পুরুষার্থ।

আমাদিগের শাস্ত্রেও অর্থ সাধনের উপায় কথিত হইয়াছে, যথা—

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থান্…

ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়া মনকে সংযত করিয়া সমুদায় অর্থেব সাধন করিবে।

ভারতবর্ষের কথা যাহাই হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রসকল ধরিয়া ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মনিতে এবং আমেরিকায় অনেকানেক সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেগুলির বন্দোবস্ত এবং কার্য্যনির্ব্বাহের সহায়তার জন্য কয়েকজন মানবকুলহিতৈষী মহাত্মা ধনব্যয় এবং শরীরব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায়ের অনেকগুলিই টিকে নাই। অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিযাছে। যেগুলি আছে, তাহাদিগেব কর্তৃপক্ষীয়েরা অতি কঠিন দণ্ডনীতির প্রবেশ করাইযাই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়গুলিতে যেরূপ হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোন প্রচলিত সমাজেই সমাজপতিদিগের হস্তে ততটা প্রভূত ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন হয নাই। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি স্পষ্টানুভূত হইবে। পবিণয় ব্যাপাবে স্বেচ্ছাচারপ্রবণ ইউবোপীয়দিগের সংঘটিত ঐ সকল সম্প্রদায়ে বিবি হইয়াছে যে, সেই সেই সম্প্রদায়সম্ভুক্ত কোন নরনারী স্বেচ্ছাতঃ এবং কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারিবে না। এটা সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিধিও সংস্থাপিত হইযাছে যে, কোন স্ত্রীপুরুষের সন্তানসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণেব অতিরিক্ত হইবে না। আবার কোন সম্প্রদায় বিধান করিয়াছেন যে, প্রত্যহ কে কখন কোথায় কি করিবে, তাহার এক একটি তালিকা কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরির নিমিত্ত প্রত্যহ প্রদত্ত হইবে। অতএব ঐ সকল সাম্প্রদায়িকেরা স্বাধীনতা বর্দ্ধনের প্রয়াসে ইউবোপ-প্রচলিত শিথিল সমাজ-বন্ধনগুলি ছিন্ন করিতে গিয়া তদপেক্ষা বিবিধ কঠিনতর বন্ধনজালেই জড়িত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমাজ পদার্থটি কুম্ভকারেব প্রতিমাদির ন্যায় হাতে করিয়া গড়িবার

বস্তু নহে ; উহা প্রাণী বা উদ্ভিজ্জশরীরের ন্যায় জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হয়। উহার উপর অতিরিক্ত কাটাছেঁড়াও চলে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং সম্প্রদায় গঠনের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া আর একটি দল নূতন উঠিয়াছে। ইঁহারা বলেন যে, স্বাধীনতা এবং সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের জল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, যে একমাত্র পরিণামবাদে সকল বিষয়ের তথ্য নিহিত আছে, সেই পরিণামবাদ মানবসমাজের সম্বন্ধে কি বলেন বা বলিতে পারেন, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

অতএব পরিণামবাদ বলিলে ইউরোপীয়েরা যাহা বুঝেন, তাহার এ স্থলে কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে পরিণামবাদের মোটামুটি অর্থ জগৎকার্য্যে উন্নতিশীলতার স্বীকার। পরিণামবাদের ভিতরে উন্নতির ভাবটিকে বিভিন্ন প্রকারে প্রবেশিত করা হয়। তাহার এক প্রকার এই—একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হওয়ার নাম পরিবর্ত্তন বা পরিণাম। কিন্তু একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হয় কেন? অবশ্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত হয়; সে উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস ভিন্ন আর কি উদ্দেশ্য আছে? তবেই জগতে যাহা কিছু হয়, তাহাব দ্বারা সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস হয়। তাহারই নাম উন্নতি। অপর পরিণামবাদীবা এরূপ উদ্দেশ্য-বাদী নহেন। তাঁহারা বলেন জগৎকার্য্যের মধ্যে উদ্দেশ্যেব কল্পনা মনুষ্যের আত্মত্বারোপসম্ভূত। উহা কোন প্রকৃত বস্তু নহে। অতএব জগৎকার্য্য কিরূপে চলিয়া আসিতেছে তাহাই দেখ এবং তাহা দেখিয়া উহার পথ বুঝিয়া লও। দেখিবে, সেই পথটি সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাসের দিকে যাইতেছে। সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাসের নামই উন্নতি। অপর পরিণামবাদীরা বলেন যে, এই বিচারে যদিও জগৎকার্য্যের প্রতি কোন উদ্দেশ্যের আরোপ নাই বটে, তথাপি সর্ব্বত্রই যে সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস কল্পিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ অনুভব-বিরুদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎকার্য্যের মধ্যে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার কোথাও একটা কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে অপরাপর ব্যাপারেও তদুপযোগী রূপান্তরতা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার রূপান্তরতার সংঘটন অথবা সাধারণতঃ উপযোগিতার সম্বর্দ্ধন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু উপযোগিতার বৃদ্ধিতেই সংরক্ষণ হয় এবং যাহাতে রক্ষা হয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। অতএব পরিণতি ব্যাপার ধর্ম্মের অভিমুখে হয় এবং ধর্ম্ম কোথাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আর কোথাও বা পরম্পরা সম্বন্ধে সুখের হেতুভূত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পরিণামবাদের শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি সর্ব্বাপেক্ষায় বিচারসহ হইলেও

উহা পূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ নহে। রক্ষণ বলিলেই বিনাশের একটি প্রতিযোগী শক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ঐ ব্যাখ্যায় তাহার উল্লেখ নাই। ফলতঃ পরিণামবাদ যেমন জগৎকার্য্যের প্রথম প্রবৃত্তির কোন কথাই বলিতে পারেন না, তেমনি রক্ষণোপযোগী প্রতিযোগিতারও হেতু দেখাইতে পারেন না। এই জন্য অস্তিত্ব এবং পরিবর্ত্ত অর্থাৎ (১) অস্তিত্ব (২) উৎপত্তি ও (৩) বিনাশ বিশ্বব্যাপারে এই ত্রিগুণাত্মিকতা স্বীকৃত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

পরিণামবাদী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতগুলি অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল। নূতন দলস্থদিগের মধ্যে ব্যক্তিভেদে ইহার অন্যতম ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা মনুষ্যসমাজের প্রতি পরিণামবাদের প্রয়োগ করিয়া বলেন, মানুষ প্রথমতঃ একান্ত পশুভাবাপন্ন ছিল, অনন্তর দণ্ড-নীতির বশীভূত হইয়া পশুভাব ত্যাগ করিয়াছে, পরে নীতিমান হইয়া অনেকেই দণ্ডের প্রয়োজন অতিক্রম করিতেছে, সুতরাং পরিশেষে সকলেই নীতিসংস্কারপূত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। তখন আর কোন প্রকার শাসনকাণ্ডের প্রয়োজন থাকিবে না। শাসন মানুষের শিক্ষার জন্য, যখন শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন শাসনেরও কাজ ফুরাইল। এই বলিয়া তাঁহারা সমস্ত শাসনপ্রণালীর বিধ্বংস করিতে চাহেন। সেই জন্য ইঁহাদিগকে 'নিহিলিস্ট' বা বিধ্বস্তা বলা যায়।

বিধ্বস্তৃগণ বলেন যে, প্রকৃত সাধারণতন্ত্রতাই শাসনপ্রণালীর পরিণাম, কিন্তু নির্ব্বাচনপ্রণালী অবলম্বপূর্ব্বক প্রজাপ্রতিভূদিগের দ্বারা শাসনপ্রণালী সংঘটিত হইলে, তাহা বাস্তবিক সাধারণতন্ত্রতা হয় না। কারণ সে শাসনপ্রণালীও প্রজাসাধারণের সম্পূর্ণ অভিমতানুসারে চলে না। উহাতেও ধনশালী ব্যক্তিব্যূহের প্রাধান্য থাকে। সম্পত্তিশালী লোকেরাই নির্ব্বাচন করেন, এবং সম্পত্তিশালীরাই নির্ব্বাচিত হয়েন। অতএব নির্ব্বাচিত পার্লিয়ামেণ্ট অথবা তাদৃশ সভার দ্বারা যে শাসনকার্য্য চলে, তাহাও ধনীদিগের শাসন এবং ধনহীনদিগের পীড়ন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত সাধারণ-তন্ত্রতাই শাসনপ্রণালীর পরিণাম, অর্থাৎ কোন শাসন না থাকাই শাসনপ্রণালীর চরমাবস্থা। অতএব শাসনকার্য্য একেবারেই উঠিয়া যাউক। ইঁহারা আরও বলেন যে, কোন মনুষ্য প্রভূত ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া সুখভোগ করিবে, আর কেহ বা উদরান্নের নিমিত্ত হা হা করিবে, ইহাও মনুষ্যসমাজের যথোচিত পরিণাম নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজগুলিতে লোকের আর্থিক বৈষম্য অপরিসীম হইয়াছে। সে বৈষম্যের হেতু ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব। যদি ভূমিতে, যন্ত্রাদিতে এবং মূলধনে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের লোপ হইয়া সামাজিক স্বত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা

হইলে জনগণের মধ্যে যে আর্থিক বৈষম্য জন্মিয়াছে তাহা অবশ্যই তিরোহিত হইবে। অতএব ইঁহাদের মতে সামাজিক পরিণামের ফলে শাসনপ্রণালী একেবারে উঠিয়া যাইবে এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের সম্যক্ লোপ হইবে।

বিধ্বস্তৃদিগের মতবাদ লইয়া অধিক বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা শাসন-কার্য্য একেবারে উঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তদ্বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, শাসনের প্রয়োজন থাকিলেই শাসন থাকে। যদি শিক্ষাগুণে এবং অভ্যাসগুণে মানুষমাত্রেই কখন এমন ধর্ম্মশীল হইয়া উঠে যে, আপনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে শাসন করিতে পারে, তবে বাহির হইতে অপর কোন শাসনের প্রয়োজন হয় না। মানুষ তেমন ধর্ম্মশীল হইতে পারে কি? মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষায় এখন ধর্ম্মশীল হইয়াছে কি? এ প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের কোন কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যে ইউরোপে এই সকল কথা উঠিয়াছে সেখানে ধর্ম্মের যে কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া মনে করিব? অপর কোন কথার উল্লেখ না করিয়াও বলা যায় যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পররাজ্যগ্রহণচেষ্টা যেরূপ বলবতী এবং বৃদ্ধিশীলা হইতেছে, এবং ভোগসুখতৃষ্ণার যেরূপ তীক্ষ্ণ ধার জন্মিতেছে, তাহাতে ত ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইতে পারিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ইউরোপীয়েরা যতদিন পররাজ্যগ্রহণের ছল, বল, কৌশল না ছাড়িতেছেন, ততদিন তাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি করিতেছেন বলিয়া মনে হওয়া অসাধ্য। প্রত্যুত তাঁহাদের সন্তানেরাও ঐ দস্যুপ্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিবে, ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। শাস্ত্রে, শাসনের প্রয়োজন দেখাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে—

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥

যদি রাজা সতর্ক থাকিয়া দণ্ডযোগ্যের প্রতি দণ্ডের প্রয়োগ না করেন, তবে বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে শিকপোড়া মাছের মত করিয়া পাক করে।

ইউরোপীয়েরাই কি সেই বলবত্তর নহেন? তাঁহারাই কি পৃথিবীর সকল লোককে শূলে বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় ভাজা ভাজা করিতেছেন না? এমন ইউরোপে যদি শাসনের প্রয়োজন নাই, তবে কোথায় আছে?

আর্থিক বৈষম্য ইউরোপে যতদূর হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সমাজ-সংঘটনের দোষে এবং পুরুষানুক্রমে পরার্থপরতা শিক্ষার অভাবে ঘটিয়াছে। অতএব সেই সকল দোষ নিবারণের চেষ্টা করিলে এবং পরার্থপরতা-শিক্ষার সাফল্য হইলে ঐ বৈষম্য কতকটা নিবারিত হইবে। কিন্তু বিধ্বস্তৃগণ আর্থিক বৈষম্যের যে সকল

হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বিচার করেন, তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণের উল্লেখ করেন না। সে কারণটি মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্য এবং পরিশ্রমশক্তির এবং পরিশ্রম-প্রবৃত্তির তারতম্য। ঐ নৈসর্গিক বৈষম্যের তিরোধান হইতে পারে না। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের অপর সকল উপাদান সমান করিয়া দিলেও ঐ দুইটি উপাদানের বৈর্ষম্য নিবন্ধন আবার সমাজ মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে। অতএব সমাজমাত্রেই কতকটা বৈষম্য থাকিবার স্বাভাবিক হেতুই বিদ্যমান আছে।

বস্তুতঃ বিধ্বস্তপ্রভৃতি লোকের যে সকল মতবাদ উঠিয়াছে, তাহার অধিক কথাই অভিলাষমূলক, বিচারমূলক নহে। প্রত্যুত তাঁহারা বিতণ্ডা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের কথাগুলি যদিও অভিলাষ হইতেই উঠিয়াছে বটে, তথাপি অভিলাষ হইতে উঠিয়াছে বলিয়াই কথাগুলি অলীক বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাহাতে প্রয়োজন তাহাতেই মনুষ্যসাধারণের নিয়ত অভিলাষ থাকে, এবং তাহা কালক্রমে সিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, অভিলাষ বশতঃ চেষ্টা জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি স্থায়িভাবে কার্য্য করিলেই ফলবতী হয়। এ কথাতেও বলা যায় যে, চেষ্টার ফলবত্তা কার্য্যের সাধনে পর্য্যবসিত হয়। প্রয়োজনসাধনের প্রণালী আবিষ্কারে অভিলাষের অধিকার নাই, অভিজ্ঞতার অধিকার।

স্থূল কথা এবং সূক্ষ্ম কথাও এই যে, শাসনের প্রয়োজন কখনই যাইতে পারে না, তবে শাসন কঠোর না হইয়া অর্থাৎ কেবল দণ্ডমূলক না হইয়া অধিক পরিমাণেই শিক্ষা এবং উপদেশমূলক হইতে পারে। আর সমাজ হইতে বৈষম্য যাইতে পারে না, কিন্তু উহার অনেকটা ন্যূনতা হইতে পারে। সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ-বিপ্লাবকবর্গের ধ্বনিত "স্বাধীনতার" পরিবর্ত্তে "শাস্ত্রাধীনতার" এবং "সাম্যের" পরিবর্ত্তে "ন্যায়ানুগামিতার" এবং "ভ্রাতৃত্বের" পরিবর্ত্তে "ভক্তি, প্রেম, এবং দয়ার" ধ্বনি উত্থিত হইলেই ভাল হয়। কতকটা এইরূপ ধ্বনি, অন্ততঃ "শাস্ত্রাধীনতার" ধ্বনি, ইংলণ্ডের বিপ্লবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—তাহার ফলও ইউরোপীয় অপরাপর বিপ্লবকাণ্ডের ন্যায় তেমন অপকৃষ্ট হয় নাই।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা

(উপনিবেশ-যোগ্যতা)

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইউরোপেরই অবস্থামাত্র ভালরূপে জানিয়া সমস্ত মানব-সমাজ সম্বন্ধে যে প্রকার ভবিষ্যদর্শন করেন, সম্প্রতি তাহার সহিত ভারতবর্ষের

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতি অল্প। ভারতসমাজ অনেকটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াই আপনার উন্নত সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি শান্তিপ্রবণ, ইহার নেতৃত্ব ধর্ম্মাশাস্ত্রবর্গের হস্তগত, ইহাতে সামাজিক স্বত্বও কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত, ইহাতে সম্মিলিত গার্হস্থ্যের ব্যবস্থা প্রচলিত, ইহাতে ত্যাগের মাহাত্ম্য এবং পরার্থপরতায় পবিত্রতা জাজ্বল্যমান, এবং ইহাতে সমব্যবসায়ীদিগের সুদৃঢ় দলবন্ধন সূত্রও বহুকাল হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এ সমাজে এবং ইউরোপীয় সমাজে অনেক অন্তর। সুতরাং ইউরোপীয় সমাজের পরপরকালিক পরিবর্ত্তসকল দেখিয়া তাহাতে যেরূপ পরিণতি অনুমিত হইয়াছে ভারত-সমাজের পরিণতিও অবিকল সেই সেই প্রকারের হইবে এরূপ মনে করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ভারত-সমাজ সর্ব্বতোভাবে মুক্তাবস্থ থাকিলে উহা এতদিন যে পথে চলিয়া আসিয়াছে এখনও সেই পথেই চলিতে থাকিত। কিন্তু ভারতসমাজ সেরূপ মুক্তি পাইতেছে না। ইউরোপের মধ্যে যে জাতি সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে, ভারত এখন সেই জাতির একান্ত বশতাপন্ন। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন গিয়াছে, সামাজিক স্বাধীনতাও সেইরূপ যাইবে কি না, ইহা বিচারের স্থল হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব অগ্রেই দেখিতে হইবে যে, ভারত-সমাজের স্বাধীন ভাব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। ভারতসমাজের স্বতন্ত্রভাব যাইতে পাবে এই প্রকারে। এক, ভারতবর্ষীয়দিগেব মধ্যে ইউরোপীয়দিগের অনুরূপ পরিবর্ত্ত সাধিত হইয়া গেলে হয়। অপর, এখনকার ভারতবাসী নিঃশেষিত হইয়া এই দেশ ইউবোপীয় জাতির আবাসভূমি হইয়া উঠিলেও হয়। এই দুইটি বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টির বিচারই অগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ যদি ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশিত হইয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়, তবে আর ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কি কি পরিবর্ত্ত ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয় থাকে না। অতএব ভারতবর্ষ ইউরোপীয় কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইতে পারে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে দুইটি স্থূল কথা আছে। (১) উপনিবেশ-স্থাপন বিরল-প্রজ দেশেই হয়। (২) উপনিবেশ-স্থাপন সমপ্রকৃতিক দেশেই ভাল হয়; অর্থাৎ যাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিবে তাহারা যেমন দেশ হইতে আইসে সেই দেশের সমানশীতোষ্ণ এবং তাহার সমান জল-বায়ু-শস্যাদি বিশিষ্ট দেশেই উহারা সহজে বসবাস করিতে এবং বর্দ্ধিতবংশ হইতে পারে।

উল্লিখিত দুইটি সূত্রের প্রয়োগ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের

উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রতি উহার কোনটিই খাটে না। ভারতবর্ষের প্রজা বিরলপ্রচার নহে। ইহার মধ্যে অনেক বনভূমি এবং পার্ব্বতীয় ভূমি আছে। সে সকল স্থান অধিক লোকের বাসযোগ্য নয়। কিন্তু সে সকল ধরিয়া হিসাব করিলেও এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ১৮৪র অন্যূন এবং ইউরোপে ৯১র অনধিক। * ইহাতেই ভারতবর্ষের কেমন প্রজাধিক্য তাহা বুঝা যায়। এই কথা অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছি যে, ফ্রান্সের জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ১৮৭, ডেনমার্কের ১৪৩, বেলজিয়মের ৫৪৮, হলণ্ডের ৩৬৯, ইটালীর ২৭৬, অস্ট্রিয়া হঙ্গেরির ১৭১, জর্ম্মনির ২৫৬, গ্রেটব্রিটন আয়র্লণ্ডের ৩১৬, চীনের ২৯০ এবং জাপানের ২৭৫। ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি প্রতিবর্ষে প্রায় ৩০ লক্ষ অধিক। অতএব ভারতবর্ষ অতি নিবিড়-প্রজ দেশের মধ্যেই গণ্য। এখানে অপর জাতীয় লোকের উপনিবেশ সংস্থাপনের সুবিধা নাই।

ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের পক্ষে দ্বিতীয় সূত্রটিও খাটে না। কারণ এক পক্ষে ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান এবং অধিক পরিমাণেই সমতল দেশ। উহার সুবিস্তৃত সমতল ভূভাগের মধ্যে উচ্চ এবং অপেক্ষাকৃত শীতল অধিত্যকা অত্যল্পই আছে। পক্ষান্তরে ইউরোপ শীতপ্রধান। অতএব ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে সমপ্রকৃতিকতা নাই। এই জন্য ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার বিশেষ সুবিধা নাই।

কিন্তু একটি কথা আছে। ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। ইহার কোন কোন অংশ এমন আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত বিরলপ্রজ এবং পর্ব্বত-বহুল বলিয়া শীতপ্রধান। ভারতবর্ষের সেই সকল ভাগেও কি ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে না? ভারতবর্ষের মধ্যে ওরূপ স্থানের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গড়ে ঐ স্থানগুলিতে বর্ত্তমান প্রজার সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ২১র অনধিক। ঐ সকল প্রদেশে ইউরোপীয় শ্রমজীবী লোকেরাও আসিয়া বাস করিতে পারে।

অপর একটি কথাও বিবেচ্য আছে। অবিরল-প্রজ দেশেও উপনিবেশ স্থাপনের সুবিধা দুই কারণ হইতে হয়। (১) যদি উপনিবেশিতব্য দেশে আপনাদের রাজ্যাধিকার থাকে, আর (২) তৎসহ উপনিবেশ স্থাপয়িতার বল

* বাঙ্গালায় প্রতি বর্গমাইলে ৪৭১, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় ৪৩৬, মান্দ্রাজে ২৫২, পঞ্জাবে ১৮১, বোম্বাইয়ে ১৫১, মধ্যপ্রদেশে ১২৫, রাজপুতানায় ৯২, ব্রহ্মে ৪৫, কাশ্মীরে ৩১।

যদি নিয়ত বৃদ্ধিশীল থাকে, তাহা হইলেও হয়।

উল্লিখিত দুই সূত্রের মধ্যে প্রথমটি ভারতবর্ষের প্রতি খাটিয়াছে। ভারতবর্ষের যে সকল ভাগ পার্ব্বতীয় এবং শীতপ্রধান তাহার সকলগুলিই ইংরাজরাজের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, অথবা করিলেই হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতবর্ষের ঐ সকল ভাগে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ ঐ সকল ভাগ একেবারে নিষ্প্রজ অথবা অস্বামিক নহে। দ্বিতীয়তঃ গ্রেটব্রিটন এবং আয়র্লণ্ড হইতে প্রতিবৎসর যে প্রায় ২ লক্ষ লোক দেশের বাহির হইয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ইউনাইটেড দেশে এবং অল্প লোকমাত্র ইংরাজের নিজের অধিকারে গমন করে। ভারতবর্ষে যে দুই হাজার লোক বর্ষে বর্ষে আইসে তাহারা প্রায় সকলেই স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সুতরাং যত কাল ইউনাইটেড দেশের এবং তাহার পরে কানেডা, অস্ট্রেলিয়া, কেপকলনি, মধ্য-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে উপনিবেশের অধিকতর সুবিধা থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে স্বেচ্ছাতঃ আসিবার জন্য ইংরাজ ঔপনিবেশিক অধিক যুটিবে না। পৃথিবীর যতস্থানে ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহার শতকরা অশীতি ভাগ ইংরাজেরা ঐ কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই উপনিবেশযোগ্য স্থান সমস্তে যাইবার সুবিধা থাকিতে ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে ইংরাজের উপনিবেশের চেষ্টা হইবার সম্ভাবনা অল্প।

আর এক প্রকারে ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে ইংরাজ-উপনিবেশের সূত্রপাত হইতে পারে। ইংরাজরাজ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার স্বজাতীয় কতকগুলি লোক ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করিয়া থাকিলে ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার এবং তাহার আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ দমন করিবার সুবিধা হইবে; এবং তাহা মনে করিয়া রোমীয়েরা যেরূপ আপনাদের অধিকৃত প্রদেশসকলে সৈনিক-নিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল ইংরাজেরাও সেইরূপ চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে দুই চারিটি উপনিবেশের বীজ বপন করিয়া দিতে উৎসুক হইতে পারেন। গ্রিফিন সাহেব যে কাশ্মীরে উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেটি ঐরূপ একটি কথা। তিনি একেবারে ইংলণ্ড হইতে ৩০ লক্ষ উপনিবেশিক আনিয়া কাশ্মীরে বসাইতে বলেন নাই। এখন হইতে উপনিবেশের সূত্রপাত করিয়া রাখিলে প্রয়োজনের সময়ে অর্থাৎ রুশিয়ার সহিত ভারতবর্ষ লইয়া যুদ্ধের সময়ে কাশ্মীর প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ ফৌজ পাওয়া যাইবে এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজরাজ যদি এই কাজে হাত দেন তবে তাঁহার শাসন

আরও কঠোর হইয়া পড়িবে, তাঁহার শোষকতা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তিনি এক্ষণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রজার বিরাগভাজন হইবেন। কিন্তু হয়ত এ সকল কথা ভাবিয়া ইংরাজ পশ্চাৎপদ হইবেন না। তিনি আপনার বলবত্তা দৃঢ়তর করিবার লোভে কাশ্মীর এবং তাদৃশ দুই একটি প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

কিন্তু ইংরাজের প্রতাপ কি চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে?—এই বিচার দ্বিতীয় সূত্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট। সাম্রাজ্যশক্তির লোপ বা খর্ব্বতা হইলে উপনিবেশাদির সর্জ্জন, পালন এবং রক্ষণ হয় না। তবে ইংরাজের সাম্রাজ্যশক্তি যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলেই ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত এবং প্রচারিত হইতে পারে।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, কোন জাতি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই। আসিরীয় সাম্রাজ্য ১৬০৯ বর্ষ ছিল, মীড-পারস্য ৪০০ বর্ষ, গ্রীক ১৪০০ বর্ষ, রোম-রুম ২২০০ বর্ষ, মুসলমানের ভারতসাম্রাজ্য ৫৫০ বর্ষ, আরব-সাম্রাজ্য ৩০০ বর্ষ, স্পেনীয় ১১০০ বর্ষ, পোর্টুগীজ ৭০০ বর্ষ। ইহাদিগের প্রথম ছয়টি একেবারেই গিয়াছে। শেষের দুইটিরও সাম্রাজ্যশক্তি খর্ব্ব হইয়াছে, তবে রাজ্যের স্বাধীনতা এবং কতক অধিকারেরও লোপ হয় নাই।

কিন্তু পূর্ব্বকার সাম্রাজ্যগুলি গিয়াছে বলিয়াই কি মনে করিতে হইবে যে, কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হইতে পারে না? সাংদৃষ্টিক-ন্যায়ের বল কি এত অধিক যে, তাহারই উপর অনুমানের একান্ত নির্ভর হইতে পারে? প্রাণিশরীরের পক্ষে বলা গিয়া থাকে, জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে। এ কথাটি সম্পূর্ণ সাংদৃষ্টিক-ন্যায়-মূলক হইলেও ইহা সিদ্ধান্তবাক্য বলিয়া সম্যক্ পরিগৃহীত হয় নাই। কারণ অনেকানেক লোক ঐ চিরপ্রচলিত বাক্য সত্ত্বেও চিরজীবী হইবার উপায় আবিষ্করণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকানেক সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাটি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচারের উপর কোন প্রকারে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বিচারাবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, প্রাণিশরীরের বৃদ্ধির সহিত সেই শরীরের ভার তাহার ঘনফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, বিস্তার এবং বেধের গুণফলের) অনুসারে বর্দ্ধিত হয় এবং উহার স্থিতিস্থাপকশক্তিবিশিষ্ট পেশী-নিচয় বর্গফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং বিস্তারের গুণ-ফলের) অনুসারে বাড়ে। অতএব দেহের ভার যত বাড়ে বল তেমন বাড়ে না। এইজন্য দেহের পাত হয়।

অতএব সাম্রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সাংদৃষ্টিক-মূলক এই কথাটির

প্রতিপোষক কোন স্বতন্ত্র যুক্তি আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। সেরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবিনাশের কারণ তিনরূপ হইতে পারে। এক এই—সামাজ্যবৃদ্ধিতে ধনের বৃদ্ধি; ধনের বৃদ্ধিতে সুখের অভিলাষ; সুখাভিলাষে আলস্যপ্রবণতা এবং আলস্য হইতে দৌর্ব্বল্য; এবং দৌর্ব্বল্য হইতে বিনাশ। আসিরীয়া, পারস্য, গ্রীক প্রভৃতি সাম্রাজ্য মুখ্যতঃ এই কারণেই গিয়াছে।

সাম্রাজ্যলোপের দ্বিতীয় সূত্র এই—সাম্রাজ্য অতি বিস্তৃত হইলে তাহার বিভিন্নভাগনিবাসী জনগণের স্বার্থ বিভিন্ন হইয়া উঠে। স্বার্থভেদে ঐকমত্য থাকে না—বিভিন্ন ভাগের পরস্পর বিবাদ হয়। সেই বিবাদ শুদ্ধ বলপ্রয়োগে মিটে না। সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমেরিকার বিচ্ছেদে ইংলণ্ডের একটা প্রভূত অধিকার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড সে আঘাত সামলাইয়াছেন—ঐরূপ অপর উপনিবেশের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও আবার সামলাইতে পারিবেন। কিন্তু স্পেন তাহা পারেন নাই।

সাম্রাজ্যপতনের তৃতীয় সূত্র এই—সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া যে জাতি বাড়িয়া উঠে সে অপর কোন প্রবলতর জাতি কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হয়; সুতরাং তাহার সাম্রাজ্যাধিকার থাকে না। ভেনিস এবং জেনোয়া এইরূপে স্পেন এবং পোর্টুগাল কর্ত্তৃক, স্পেন এবং পোর্টুগাল হলন্দ কর্ত্তৃক এবং হলন্দ ইংরাজ কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া বিলুপ্ত-প্রভ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রতি উল্লিখিত তিনটি সূত্রের প্রয়োগ করিয়া দেখা যায় যে (১) ইংলণ্ডের ধন অতি বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ধনের প্রতি ইংরাজের মায়াও বাড়িয়াছে। কিন্তু ইংরাজ খুব বাবু হয়েন নাই। আয়াস স্বীকারেই তাঁহার আনন্দানুভব হয়। অক্‌সফোর্ড কেম্ব্রিজের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ না করেন, তাঁহারাও দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, নৌকাবাহন প্রভৃতি পরিশ্রমের কার্য্যে বিলক্ষণ পটু হইয়া থাকেন। এখানেও দেখা যায়, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরা আপনাপন কাজ ভাল করিয়া করুন বা না করুন, কিন্তু টেনিস, ক্রিকেট, ক্রোকে, বাড্‌মিণ্টন এবং শিকার খেলায় খুব মন দেন। (২) ইংলণ্ড আপনার ঔপনিবেশিকদিগকে চিরকালই স্ববশে রাখিতে পারিবেন এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। উহারা যে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে, মার্কিনেরাই তাহার লক্ষণ দেখাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মার্কিনেরা ছাড়িয়া যাওয়ায় ইংলণ্ডের কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? মার্কিনেরা হাত ছাড়া হইবার পরই ত প্রথম বোনাপার্টি ইংলণ্ডের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন।

(৩) জর্ম্মনি এবং রুশিয়া যথেষ্ট বাড়িতেছে বটে, কিন্তু জর্ম্মনি যতদিন হলন্দ এবং ডেনমার্ককে আত্মসাৎ না করিবে, ততদিন ইংলণ্ডের সমকক্ষতাও প্রাপ্ত হইবে না। রুশিয়ারও তুর্কি এবং আফগানকে স্ববশ করা চাই, তবে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী হইতে পারিবে। সে সকলের অনেক বিলম্ব। ফ্রান্স, জর্ম্মনির বৃদ্ধি নিবারণ করিবে এবং জর্ম্মনি ও অস্ট্রিয়া মিলিত হইয়া রুশিয়াকে বাড়িতে দিবে না। তবেই অপর কেহ বড় হইয়া ইংলণ্ডকে খাট করিতে পারিবে না। সম্প্রতি ইংলণ্ডের শিল্পজাত ইউরোপীয় অপরাপর দেশে পূর্ব্বের ন্যায় অধিক যাইতেছে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অনেকানেক দেশে ইংলণ্ডের শিল্পজাতের আমদানিই অধিক হইয়া উঠিতেছে। অতএব ইংলণ্ডের ধন এবং সাম্রাজ্যশক্তি যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও যে তেমনি থাকিবে না, ইহা বলিবার কোন হেতুই এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না।

যদি ইংলণ্ডের বল চিরকাল অটুট থাকে এবং তাঁহার ভারতবর্ষ অধিকার কখনও হস্তচ্যুত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ দেশ অতি নিবিড়প্রজ বলিয়া সামান্যতঃ ইংরাজের উপনিবেশিত না হইয়াও একটি বিশেষ প্রকারে ইংরাজের উপনিবেশিত-প্রায় হইতে পারে ; অর্থাৎ এ দেশে ইংরাজ শ্রমজীবীদিগের প্রবেশ না হইয়া, এখানকার প্রধান প্রধান রাজপদ সমস্ত যেমন ইংরাজের করকবলিত হইয়াছে, তেমনি ক্রমে ক্রমে জমিদারী স্বত্ব, শিল্পালয়ের মূলধনিতা, এবং অপর সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তৃত্ব ইংরাজের আয়ত্ত হইয়া যাইতে পারে। দেশীয়েরা ইংরাজ ভূস্বামীর প্রজা, ইংরাজ মনিবের কর্ম্মকর এবং ইংরাজ নেতার অধীন লোক মাত্র হইয়া থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ এখন হইতেই তাহার কতকটা সূত্রপাত হইয়া যাইতেছে। চা-কর, নীলকর এবং অনেক স্থলে ইজারদার আর কোথাও কোথাও জমিদার রূপেও ইংরাজ ভারতবর্ষে ভূস্বামিত্ব লাভ করিয়াছেন। জমিদারী, বাটী, বাগান প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও ইংরাজেরা টাকা ধার দিতেছেন। এই সেদিন বেতিয়ার মহারাজা ইংলণ্ড হইতে ৫ লক্ষ পৌণ্ড ধার পাইয়াছেন। তুলার কল, পাটের কল, গালার কারখানা, রেসমের কুঠি বহু পরিমাণেই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। দেশের অন্তর্বাণিজ্যও ক্রমশঃ ইংরাজের হাতে যাইতেছে। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় সুনাব্য নদনদীতে যে সকল বাষ্পীয় পোত নিরন্তর গতিবিধি করিতেছে, সকলগুলিই ইংরাজ বণিকের সম্পত্তি। দেশীয়দিগের হস্ত হইতে সকল অধিকার ক্ষমতা এবং ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে খসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডীয় শিল্পজাতের আমদানিতে দেশীয় শিল্পের লোপ হইয়া কৃষিজীবীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকারাদির লোপে তাহা আরও বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। সাম্রাজ্য বল ত্রিবিধ। (১) রাজনৈতিক বল, (২) সৈনিক বল, (৩) ধন বল। ভারতবর্ষ প্রথম দুইটি দ্বারা সন্দষ্ট হইয়া ক্ষতশির হইয়াছে, তৃতীয় বলটি ক্রমে ক্রমে ইহাকে দৃঢ়তররূপে বাঁধিবার নিমিত্ত প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবাসীদিগের মধ্যে ধনশালী লোকের সংখ্যা একান্ত ন্যূন হইয়া গেলেও উহাদিগের ধর্ম্মলোপ না হইলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে না।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা

(ধর্ম্মপ্রণালী-বিষয়ক)

পণ্ডিতেরা কোন মানবিক ব্যাপার সম্বন্ধেই উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, উন্নতি এবং অবনতি, এই শব্দগুলি যথাশ্রুত মুখ্যার্থে প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, যাহা আপনার সময়ের উপযোগী তাহাই উৎকৃষ্ট বা উন্নত, এবং যাহা সময়ের অনুপযোগী তাহাই অপকৃষ্ট বা অবনত। এই গৌণার্থের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখায় সাধারণ লোকের মধ্যে দুই প্রকারের ভ্রম জন্মে। এক, যাহা পূর্ব্বগত তাহাই অপকৃষ্ট বলিয়া নিন্দিত, অথবা যাহা পরবর্ত্তী তাহাই হেয় বলিয়া ঘৃণিত হয়। প্রথমটির ফল অযথানুকরণ এবং দ্বিতীয়ের ফল গোঁড়ামি। প্রথমটি হইতে পুরাতনের প্রতি বিরাগ এবং দ্বিতীয়টি হইতে নূতনের প্রতি অযত্ন সম্ভূত হয়। প্রথমটি বলে যাহা নূতন তাহাই আসুক, পুরাতনের থাকিয়া কাজ নাই, দ্বিতীয়টি বলে যাহা যেমন আছে, তাহা ঠিক সেইরূপই থাকুক।

এ দুইটি ভাব দুইটি উপধর্ম্মস্বরূপ। প্রকৃত ধর্ম্ম ইহাদের কোনটিতেই নাই। যাহা উপযোগী, অর্থাৎ আত্মরক্ষার অনুকূল পরিবর্ত্ত, তাহাই হউক—এই ভাবই ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাবের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া 'উন্নতি' 'উৎকর্ষ' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃতার্থ যে 'উপযোগিতা' মাত্র, ইহাই স্মরণ রাখিয়া, ইংরাজ আধিপত্যে ভারতসমাজে কিরূপ পরিবর্ত্তের উন্মুখতা জন্মিতেছে, তাহা বিচার পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রধান সামাজিক বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রণালী লইয়া সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

ধর্ম্ম তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। যেমন দেহের শিরোভাগ, মধ্যভাগ, এবং হস্তপদাদি অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্ম্মের শিরোভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া ; মধ্যভাগ, নীতিব্যবহার লইয়া ; এবং হস্তপদাদি, আচারপ্রণালী লইয়া

সংঘটিত মনে করা যাইতে পারে। উহারা পরস্পর পৃথক্ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ নয়। যেমন শিরোদেশ হইতেই অপর দুই ভাগের বল, তেমনি অপর দুই ভাগে বিশেষ বিশেষ কার্য্য না হইলেও শিরোদেশে বলসঞ্চার হয় না। ধর্ম্মের শিরোভাগ বা মতবাদ, দর্শনাত্মক জ্ঞান-কাণ্ড। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মনুষ্যের মন যাহা কিছু জানিতে এবং বুঝিতে চায়, এই ভাগ তাহা জানাইয়া এবং বুঝাইয়া দেয়। মনুষ্য আপনাকে কিরূপে রাখিবে এবং অপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা নৈতিক উপদেশের পালনে শিক্ষিত হয় এবং যদ্দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইতে পারিবে আচারকাণ্ডে তাহার অভ্যাসের উপায় বিবৃত হয়। এইরূপে ত্রিধা বিভাজিত আর্য্যধর্ম্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হইতে পারে কি না, তাহাই ক্রমশঃ দেখা যাইবে।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের কয়েকটি সূত্র নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে—

(১) ব্যাপকতর ধর্ম্মের আবির্ভাবে ব্যাপ্য-ধর্ম্ম তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। মনে কর, কোন বালক বা যুবা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান মাত্রেই ধর্ম্মের চরম, তাহাকে যদি অপর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, ঐ সকল অনুষ্ঠানমাত্রেই ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম জাগতিক সমুদায় গূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর দেয় এবং তাহার আদেশ সকল কার্য্যেই যাবজ্জীবন পালনীয়, তাহা হইলে সে যাহাকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, তাহা অপেক্ষা উদারতর ভাবে মগ্ন হইয়া পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যদি কোন কারণে কোন ব্যক্তির বা জাতির মন উচ্চতর এবং পবিত্রতর ধর্ম্ম গ্রহণের উপযোগী হইয়া থাকে তবেই তাদৃশ ধর্ম্মপ্রণালীর সাক্ষাৎ লাভে ঐ ব্যক্তি বা জাতির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রহণযোগ্যতা না জন্মিলে উচ্চতর ধর্ম্ম আপনা হইতে গৃহীত হয় না।

(২) বিজেতৃদিগের নিয়ত পীড়নেও ধর্ম্মপরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যদি একজাতি অপর জাতীয় লোক কর্ত্তৃক বিজিত হয় এবং বিজয়ীরা আপনাদের ধর্ম্মটিকে বিজিতদিগের মধ্যে প্রচালিত করিবার জন্য নিয়ত যত্ন করেন, তাহা হইলে বিজিত জাতির ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হয় অথবা বিজিতেরা নিঃশেষিত হইয়া যায়। মিসর পারস্য প্রভৃতি দেশে এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের এবং দক্ষিণ আমেরিকায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

(৩) ধর্ম্মের আদান-প্রদান হয়। অর্থাৎ যদি দুইটি জাতির ঘনিষ্ঠ মিশ্রণ ঘটে, তবে উভয়ের ধর্ম্মও সম্মিলিত হইয়া একরূপ হইয়া যায়। রোমীয় এবং গ্রীকদিগের

এবং অপরাপর দেবপূজাপরায়ণ জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ হইয়াছে।

(৪) কোথাও কোথাও দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্রবে একটি নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যদি দুইটি জাতি বুদ্ধিবিদ্যায় কতকটা সমকক্ষ হয় এবং উভয়ের মধ্যেই জ্ঞানচর্চ্চা সমভাবে প্রচলৎ থাকে তাহা হইলে দুইটি হইতেই কিছু কিছু মতবাদ এবং আচাব পবিগৃহীত হইয়া নূতন পন্থাটি জন্মে। ভারতবর্ষের নানক পন্থী, কবীর পন্থী, গোবক্ষ পন্থী, দাদূ পন্থী, প্রভৃতি পন্থ সকল মুসলমান এবং হিন্দু উভয় ধর্ম্মের সম্মিলনসম্ভূত।

(৫) অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংখ্যায় বৃহত্তর জাতির সহিত সংস্রব ঘটিলে তাহার ধর্ম্ম, অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র জাতি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত দেশাদিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, এবং সুইডেন নরওয়ে প্রভৃতিতে খ্রীষ্টধর্ম্মেব আবির্ভাব, এই সূত্রে হইয়াছিল বলা যায়।

(৬) দেশের ভিন্নতা হইলেও ধর্ম্মভাবে ঈষৎ ভিন্নতা জন্মিবার সম্ভাবনা। যদি কোন জাতি অপনাদের পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন-প্রকৃতিক দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে জগতের মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষে পূর্ব্ব হইতে ভিন্নরূপ দেখায় এবং তাহারা পুরুষপরম্পরাক্রমে যে দেশে আসিয়াছে তাহাব উপযোগী সুতরাং তদ্দেশপ্রচলিত ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিতে উন্মুখ হয়। বোমধ্বংসকাবী বর্ব্বর জাতীয়েরা যে, অতি সহজেই খ্রীষ্টান হইয়াছিল, আবাস পবিবর্ত্ত তাহার অন্যতম কারণ।

এই ছয়টি স্থূল স্থূল সূত্রের মধ্যে কোনটিব প্রয়োগে ভাবতবর্ষের ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় কি? প্রথমতঃ ধর্ম্ম্য মতবাদ সম্বন্ধে বলা যায়—

(১) আর্য্যধর্ম্মেব অপেক্ষা উদাবতর ধর্ম্ম মনুষ্যের মনে উদিত হয় নাই—হইতেও পারে না। এ ধর্ম্ম কোন একটি বাক্যে অথবা কোন ঘটনা বিশেষের প্রতি প্রতীতি খ্যাপনে অথবা কোন বিশেষ মতবাদে সম্বদ্ধ নহে। ইহার প্রদত্ত শিক্ষা, অধিকারভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে পারে। ইহা অপব কোন ধর্ম্মেরই ব্যাপ্য বস্তু নয়। ইহাতে ভীতিপ্রণোদিত বর্ব্বরজাতীয়দিগের অর্চ্চন-বন্দনাদি, বশ্যতাপ্রবণ এবং সম্মিলনপটু যুদ্ধ-কুশল লোকদিগের দাস্য-সখ্যাদি, ভক্তিপরিষিক্ত ভাবুক জনগণের প্রেমবাৎসল্যাদি, এবং অধ্যাত্ম-দর্শনোন্মুখ মানবদিগের আত্মনিবেদন এবং অভেদভাবাদি অতি প্রোজ্জ্বল রূপেই বিদ্যমান। আর্য্যধর্ম্মে যাহা নাই, তাহা অপর কোথাও নাই।

(২) ভারতবর্ষের অধিপতি ইংরাজ। ইংরাজ পরধর্ম্মের পীড়ন করেন না।

তিনি বরং স্বদেশ মধ্যে কখন কখন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকের প্রতি অযথাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশে আসিয়া তাহা কখনই করেন নাই। আর ভারতবর্ষে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া আছেন, সেই প্রতিজ্ঞা সম্যক্‌রূপেই পালন করিয়া চলিতেছেন বলা যায়।

(৩) ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ পাদ্রি সাহেবদিগের নিরন্তর আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া ভারতবর্ষীয়গণ আর্য্যধর্ম্মের সারভূত কথাসকলের সমধিক চর্চ্চা করিতেছেন। আর্যধর্ম্মের যে ভাগটি খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুরূপ সেই ভাগই সম্প্রতি বিশেষরূপে প্রকটিত হইতেছে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদের অনুরূপ ভারতবর্ষের যে বৈষ্ণবতন্ত্রতা তাহাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে জর্ম্মন জাতীয় পণ্ডিতেরা কেহ স্পষ্টতঃ কেহ বা অস্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষীয় মতবাদ হইতে ভিন্ন নয়। ইংরাজেরাও ক্রমশঃ ঐ জর্ম্মন মতবাদে দীক্ষিত হইতেছেন এবং পূর্ব্বে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের যেরূপ সঙ্কীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা ছাড়িয়া দিয়া উহাতে আর্য্যধর্ম্মসম্মত উদারতর ব্যাখ্যা প্রবিষ্ট করিতেছেন। কালে যখন জর্ম্মনদিগের মতবাদ অধিকতর প্রচলিত হইয়া উহা পাদ্রি সাহেবদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে নূতন জিনিস বলিয়া প্রদত্ত হইবে, তখন আবার অদ্বৈতবাদ প্রোজ্জ্বলতররূপে পরিদৃষ্ট হইবে। হেগেল এবং সোপেনহৌর এই দুইজন জর্ম্মনির অতি প্রধান দার্শনিক। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম্য মতবাদ সম্বন্ধে হেগেল বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা প্রকৃত জ্ঞানই লাভ করিযাছিল, কিন্তু তাহা বিচারপূর্ব্বক করিতে পারে নাই—আন্দাজিতে করিয়াছিল মাত্র। সোপেনহৌর বলিয়াছেন যে, আমি যাহা বলিলাম তাহাব সহিত বৈদিক উপনিষদ সমস্তের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন আছে; কিন্তু কেহ মনে না করেন যে, আমি উপনিষদ গ্রন্থ হইতে নিজ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, ইউরোপে সংস্কৃতের চর্চ্চা এখানকার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত এবং গভীরতর হইলে, গ্রীকদিগের দর্শন শাস্ত্রাদি পাঠে ইউরোপ যেমন একবার জাগ্রৎ হইয়াছিল, আবার সেইরূপ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর জাগ্রৎ ভাব ধারণ করিবে। ফলতঃ অতীন্দ্রিয় ভাবের একান্ত বিরোধী যে সঙ্কীর্ণ জড়বাদ এক্ষণে ইউরোপে দেখা দিয়াছে তাহা ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিকেরা স্থায়ী বলিয়া মনে করেন না এবং ঐ ইউরোপীয় জড়বাদ এদেশে আসিলেও ভারতবর্ষের প্রশস্ত অদ্বৈতবাদ দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াই যাইবে। অতএব ইউরোপীয় সংস্রবে এবং ইংরাজ-আধিপত্যে আমাদের ধর্ম্ম্য

মতবাদের কোন মৌলিক পরিবর্ত্ত সংঘটন হইতে পারে না।

(৪) যদি ভারতবর্ষে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা বলবৎ থাকে এবং এখানকার অধিবাসিগণ একেবারে বিদ্যাবিহীন না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মুসলমানদিগের অধিকারকালেও যেমন লোকে ফারসি আরবি পড়িয়া মুসলমান হয় নাই, তেমনি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী পড়িয়াও সাধারণে ধর্ম্মচ্যুত হইবে না। নূতন ব্রাহ্মদিগের ন্যায় দুই একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে দেখা দিবে মাত্র। ফলতঃ যেমন মুসলমানেরাই আর্য্যমতবাদের স্বাদগ্রাহী হইতেছিল, ইংরাজও ক্রমে তাহাই হইবেন।

(৫) ভারতবাসী সংখ্যায় অল্প নয়। প্রত্যুত পৃথিবীর সর্ব্বত্র লইয়া যত ইংরাজ আছেন, ভারতবাসীর সংখ্যা তাহার তিনগুণ অধিক। সম্প্রতি বিদ্যাবত্তাতে ভারতবাসী ন্যূন হইয়া আছে। কিন্তু যখন প্রাচীন সংস্কৃতের প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে এবং ইহারা আপনাদের চলিত ভাষাগুলিতে যত্নপূর্ব্বক সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছে, তখন যে ইংরাজদিগের অপেক্ষা নিতান্তই স্বল্পবিদ্য হইয়া থাকিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অপর, ইউরোপীয় ধর্ম্ম্য মতবাদ যে অভিমুখে আসিতেছে যখন আমরা সেই দিকেই পূর্ব্ব হইতে আসিয়া আছি, তখন আপনাদের রক্ষার উপযোগী কোন মৌলিক পরিবর্ত্তই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। অর্থাৎ আর্য্যধর্ম্মের পরিবর্ত্ত সাধনে উন্নতি বা উপযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

(৬) ভারতবর্ষবাসীরা স্বদেশেই আছেন এবং স্বদেশেই থাকিবেন। আর যদিই স্বদেশ হইতে গিয়া অপর কোথাও বাস করেন, তাহা হইলেও তথাকার বাহ্য প্রকৃতি, সমস্ত পৃথিবীর প্রতিরূপ স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে সমুৎপন্ন ব্যাপক ধর্ম্ম-ভাবের বিসদৃশ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, নীতিবাদ। পূর্ব্বকালে অপরাপর জাতীয় লোক ভারতবাসীকে কেমন সুনীতিসম্পন্ন এবং একান্ত সত্যপরায়ণ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। অনধিক কাল গত হইল, মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মন্‌রো সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশের নীতিবিষয়ক বাণিজ্য চলে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের নীতি সেই দেশে যায় এবং সে দেশের নীতি ভারতবর্ষে আইসে, তবে ইউরোপীয় দেশটি আদানী দ্রব্যগুলি পাইয়া যৎপরোনাস্তি লাভবান হয়। কিন্তু আজি কালি আর সে ভাবের কথা নাই। এখন ভারতবাসীকে দুর্ব্বিনীত বলাই একটি অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে, এবং অভ্যস্ত-অন্তর্দৃষ্টি, শান্ত-স্বভাব, এবং পূর্ণতাভিলাষী ভারত-

সন্তান সহজেই আপনার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধ করিয়া আপনার প্রতি আরোপিত সকল ক্রটিই স্বীকার করিয়া লইতেছেন ; অন্যের সহিত তুলনায় তাঁহার নিজের যে উৎকর্ষ প্রমাণিত হইতে পারে, অমানিত্বাদি গুণ বশতঃ তিনি সে তুলনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

অনেক জাতির শাস্ত্রেই ধর্ম্ম দশ-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, আর্য্যশাস্ত্রেও ঐরূপ অনেকানেক উক্তি আছে। মনু বলেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্‌॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মলক্ষণ।

অপর কোন জাতিরই মধ্যে শান্তি, দৃঢ়তা এবং পবিত্রতা সাধনের এমত উচ্চ এবং কার্য্যকারী উপায় সকল কথিত হয় নাই। প্রত্যুত অপর কাহারও বর্ণিত ধর্ম্মলক্ষণ ইহাব সহিত তুলিত হইতেই পারে না।

লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে "অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং" এই কয়েকটি শব্দেই সমস্ত সার কথা রহিয়াছে।

লোকের প্রতি মনের ভাব কেমন হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেও সারাৎসার বলা হইয়াছে, যথা—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥"

অন্যের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, মিত্রের প্রতি, দ্বেষ্টার প্রতি, সর্ব্বদা আত্মবদ্‌ ব্যবহার করিবে, ইহাই দয়াধর্ম্ম। আর্য্যনীতির আরও একটি উচ্চতম সোপান আছে। তাহা এই—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্‌ আত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥"

বস্তুতঃ আর্য্যনীতিশাস্ত্র প্রকৃত বস্তু প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত অভেদ হইয়া আত্মপর বোধটিকেই থাকিতে দেয় না—এই জন্য ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। এই কারণে স্বল্পাধিকারীর চক্ষে ইহাতে একটি প্রকাণ্ড ক্রটি লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যুত সেই একমাত্র ছিদ্র দ্বারেই ভারতবর্ষে যাবতীয় ধর্ম্মবিপ্লবের স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। প্রথমে বৌদ্ধই ঐ পথ দেখাইয়া দেন। তিনি "সংঘ" বা আত্মসম্প্রদায়কে নিরতিশয় ভক্তি এবং প্রীতি করিতে শিক্ষা দেন।

তাহার পর, যতগুলি "পন্থ" মুসলমানদিগের সময়ে আর্য্যধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূতরূপে উত্থিত হইয়া ক্রমে উহাতেই লীন হইয়া গিয়াছে, তাহারাও মুসলমান ধর্ম্ম হইতে শিখিয়া আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমিক হইতে উপদেশ দিয়াছিল। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও উহাদিগেরই অন্যতম।

যাহা হউক, বৌদ্ধবাদ, 'পন্থ'বাদ এবং বৈষ্ণবতা ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হওয়াতেই এখানকার লোকের মনে উহাদিগের উপদিষ্ট সাম্প্রদায়িক সহানুভূতি এবং প্রেম প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সমস্ত ভারতসমাজে দৃঢ়তর একতার প্রবর্ত্তন ও সম্বর্দ্ধন অর্থাৎ ভারতবাসী মাত্রের ঘনিষ্ঠতর সম্মিলন ইংরাজের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রভাবে হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়—আচার। আমাদিগের আচারপ্রণালীর কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলে আচারের সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি কিরূপ তাহা স্মরণ করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুবাচারাদীপ্সিতা প্রজা।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥"

আচার হইতে আয়ুষ্মত্তা, অভীষ্টরূপ সন্তান, ধন এবং অক্ষয়ভাব লাভ হয়। আচারে দুর্লক্ষণের নাশ হয়।

অতএব আচারের সাক্ষাৎ ফল ঐহিক। সুতরাং উহা মনুষ্যের ভূয়োদর্শন বা বিজ্ঞানের সহিত অসম্পৃক্ত নয়, অর্থাৎ প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান যাহা বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহা হইতে ভিন্ন হইবে না। মনুসংহিতায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার প্রকরণের প্রারম্ভেই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে—

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাং।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো॥

হে প্রভো! আপনি যেরূপ বলিলেন সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের (অকাল) মৃত্যু ঘটনা হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বাক্যে বলা হইতেছে—

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাৎ অন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

বেদের অনভ্যাস বশতঃ, আচারের বর্জ্জন নিমিত্ত, আলস্যদোষ হেতু এবং ভোজনদোষ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের (অকাল) মৃত্যু ঘটনা হয়।

অতএব ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের প্রকৃত কারণ শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্যসংরক্ষণ

—তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও এই ভাবটি সুব্যক্ত হইয়াছে।—

আয়ুঃ-সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

আয়ু, উৎসাহ, বল, স্বাস্থ্য, সুখ এবং রুচি-বৃদ্ধিকর সরস, সস্নেহ, স্থায়ী এবং তৃপ্তি-জনক ভক্ষ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক-স্বভাব লোকের প্রিয় হয়।

অতএব কোন্ দ্রব্য খাইতে আছে আর কোন্ দ্রব্য খাইতে নাই, তাহা নির্ণয় করিবার শাস্ত্রসম্মত মূলসূত্র শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্যরক্ষারই সূত্র—দীর্ঘায়ু লাভের সূত্র। ঐ মূলসূত্রের যত শাখাপল্লব আছে, সেগুলির অধিকাংশ এতদ্দেশে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণের উপযোগী নিয়ম বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সে নিয়মগুলি সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারদিগের অভিজ্ঞতাসম্ভূত ; সুতরাং তাচ্ছল্যের বস্তু নহে। আজি কালি ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই স্বাস্থ্য হারাইতেছেন এবং স্বল্পায়ুঃ হইতেছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার আহার শাস্ত্রকারদিগের প্রশংসিত, সেই প্রকার আহারই প্রচলিত থাকিবে, কারণ তাহাতেই রক্ষাব উপায়, তাহাই আমাদের উপযোগী। কিন্তু বিদেশগত হিন্দু সন্তানের আহার কিছু ভিন্নরূপ হইলে ততটা দোষ না হইতেও পারে। ধাতুভেদে এবং বয়োভেদে এবং ঋতুভেদে আহারের অবান্তর ভেদ হওয়া অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক নহে।

আচারের অপরাপর অঙ্গের এই কয়েকটি প্রধান (১) দশবিধ সংস্কার (২) ব্রতানুষ্ঠান (৩) আশ্রমভেদ রক্ষা (৪) শ্রাদ্ধপূজাদি ক্রিয়া।

এগুলি অনেক লুপ্ত হইয়াছে। সাগ্নিকতা পূর্ব্বেই গিয়াছিল। বৌদ্ধের প্রাবল্য হইতে আচার লোপ আরম্ভ হইয়াছে, মুসলমানের অধিকারে আরও বাড়িয়াছে, এখনও বাড়িতেছে। কিন্তু আচার লোপ হইবার কারণ, সকল আচারের অনুপযোগিতা নহে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচার ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া যাওয়াতেই লোকের মধ্যে আচার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অনেক ন্যূনতা হইয়াছে। সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে এই বঙ্গদেশেই স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত আচারকাণ্ড এখনও সজীব আছে এবং এই প্রদেশেই স্মার্ত্তাচারও অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও আচাররক্ষা নিবন্ধন এ প্রদেশের লোকেরা অনেক বিষয়েই অন্য কোন প্রদেশবাসী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই।

বাস্তবিক আচারটি পরমধর্ম্ম না হউক, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষার প্রধানতম উপায়। আচার যাওয়া ভাল নয়। যে দেশের এবং যে জাতির যে আচার, তাহার ত্যাগে তদ্দেশীয় এবং তজ্জাতীয় লোকসকল ক্ষীণ এবং অল্পায়ু হয়। রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারের অনেকানেক নিয়ম প্রচলৎ আছে। উঁহারা তৎসমুদায় রক্ষা কবিয়া ইউরোপ-প্রচলিত ধনোপার্জ্জন-প্রথার সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারেন। ইহুদীয়েরাও খুব ধনবান্ এবং নীরোগ এবং আয়ুষ্মান্ হয় এবং কখনও কোন দেশে আপনাদিগের জাতীয় আচার পরিত্যাগ করে না। অতএব ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়া এক্ষণে কেহ কেহ যেমন আচার ছাড়িতেছেন তাহা অপ্রকৃতদর্শীর কাজ।

শাস্ত্রে যে আচারেব উল্লেখ আছে তাহা বহু পরিমাণে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপাল্য। এখনও ব্রাহ্মণেরাই সেগুলি অধিক পরিমাণে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এবং অপর সকল ভারতবাসী অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা যে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়া আছেন ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

বস্তুতঃ আচার ধর্ম্মের শরীর। দশসংস্কার পবিত্রতার ব্যঞ্জক। ব্রতানুষ্ঠান ইন্দ্রিয়দমনের বিকাশ। আশ্রম-ভেদ অধিকারী-ভেদ স্বীকৃতির পরিচায়ক, এবং শ্রাদ্ধপূজাদি পূর্ব্বাগতদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। অতএব সমগ্র আচার লোপে নীতিলোপও অবশ্যম্ভাবী।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা

(ভাষা-বিষয়ক)

পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের ত্রুটি হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যূন হইয়া থাকে। মনুষ্যশিশুর পক্ষে পিতামাতাও যাহা, মনুষ্যসমাজের পক্ষে ধর্ম্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম্ম সমাজের পিতা, ধর্ম্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। ধন বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম্ম এবং ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।

দক্ষিণ-আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের আদিম নিবাসী ইণ্ডিয়ান লোকেরা বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম খ্রীষ্টান এবং ভাষা স্পেনীয় অথবা পোর্টুগীজ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মও নাই, পূর্ব্ব ভাষাও নাই। ঐ সকল লোকের আত্মসমাজ সর্ব্বতোভাবেই বিলুপ্ত।

মার্কিণেরা স্বদেশ হইতে নিগ্রোজাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া গিয়া আফ্রিকা খণ্ডের লাইবিরিয়া নামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাইবিরিয়াতে আপনাদের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিণদিগের বড়ই আশা ছিল যে, ঐ সকল লোক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং ঐ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রোজাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিবে। কিন্তু সে আশা বিফলা হইয়াছে। নিগ্রোজাতীয় ঐ লোকগুলি লাইবিরিয়ায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের ধর্ম্ম এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা আর অপর নিগ্রোদিগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রোজাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা সমুদায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম আছে, কোট কোর্ত্তা আছে, গির্জাঘর আছে, বৈদেশিক রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজিকী সন্ধিপত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে; নাই লাইবিরিয়ায় জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষা; বলও নাই, বুদ্ধিও নাই, সচ্ছলতাও নাই, মৌলিকতাও নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আনুকূল্য না থাকিত, তবে এতদিন সমীপবর্ত্তী বাস্তব নিগ্রোজাতিদিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিণ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ফলতঃ অন্য জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভাষাদি পাইলে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত গ্রীস ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই তৎপ্রদেশীয় ভাষার শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় আদালতগুলিতেও রোমীয়দিগের নিজ লাটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পূর্ব্ব সাম্রাজ্যই বর্ব্বর বিপ্লব হইতে সমধিক কাল

সংরক্ষিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরের অধিককাল মুসলমানদিগের একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্ম্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারতবাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দুদিগেরই পুনরুজ্জীবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রকৃত কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাম্রাজ্য-শক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে ভারত-সাম্রাজ্য পাইয়াছেন, বস্তুতঃ হিন্দুর স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের আমলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিম্বা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোমসাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদিও সেইরূপ বিলুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে? আমাদের ভাষাগুলির ভবিষ্যদশা কিরূপ হইবে অনুমিত হইতে পারে, তাহাই এই প্রবন্ধে বিচার করিব।

বিচার্য্য বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে (১) ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি থাকে, তবে কেমন ভাবে থাকিবে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে পূর্ব্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন একটি জাতি বাস করিয়া আছে, অথবা চিরকালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে—ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল, তাহারও পূর্ব্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয়ত তাহারও পূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনুমান এই পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে দেশটি একেবারে মনুষ্যশূন্য ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। হয়ত কোলেরীয়দিগেরও পূর্ব্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্য অবশেষ মাত্র এখনও মোরভঞ্জের গভীরতম বনপ্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে—উহারা কোনপ্রকার অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র পরিধানও করে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথাও কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়া বাহির করিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন্ ভাষা বা কেমন ভাষা ছিল, তাহা নির্ণীত হয় না।

এই সকল উদাহরণের দ্বারা জানা যায় যে, জাতির বিধ্বংসে জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছে, যথায় জাতির বিধ্বংস না হইয়াও জাতীয় ভাষার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এখনও শত বর্ষেব বড় অধিক হয় নাই, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কর্ণওয়াল প্রদেশে কর্ণিশ নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা আর স্বতন্ত্র ভাষারূপে বিদ্যমান নাই—ইংরাজীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচলং ছিল। ব্রহ্মদেশীয়েরা পেগু বিজয় করিয়া ঐ ভাষাটিকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল—পেগুবী ভাষাটি ব্রহ্ম ভাষার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। রুশিয়াধিকৃত পোলণ্ডের মধ্যেও রুশীয়দিগের যত্নে পোলদিগের ভাষা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, এবং রুশীয় ভাষার চলন হইতেছে।

উল্লিখিত কয়েকটি স্থলে এবং ঐ প্রকার অপরাপর স্থলেও বিজিত ক্ষুদ্রসংখ্যক লোকের ভাষা বিজয়ী বৃহত্তর জাতির ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিজিগীষু ক্ষুদ্র জাতির ভাষাও বিজিত বৃহত্তর জাতিদিগের ভাষার শিরোবর্ত্তী হইয়াছে, এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। রোমীযদিগের ভাষা, গ্রীকদিগের ভাষা এবং আরবদিগের ভাষা এইরূপে তত্তজ্জাতীয়দিগের বিজিত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশগুলিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এ সকল স্থলে দেখা যায় যে, বিজিত প্রদেশগুলির ভাষাতে শিক্ষাদান, বিচারালয়ের ব্যবহার এবং রাজকীয় কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ একেবারেই বন্ধ করা হইয়াছিল।

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষপ্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি উল্লিখিত লক্ষণগুলি বা তাহাদিগের কোনটি সংলগ্ন হয় কি না।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে ভারতবাসী একেবারে নির্ব্বংশ এবং বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ব্বর, স্বল্পসংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল—জাতিপদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং সুপরিস্ফুট হয় নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তদ্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতির অনুক্রমেই জন্মে। বর্ব্বরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ এবং অসম্বদ্ধ থাকে। তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপদশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০টি ভাষার নাম পাওয়া

যায়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই অধিকসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, * এবং পূর্ণাবয়বও নয়, এবং দৃঢ়সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটি ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, তাহা প্রধানতঃ পাঁচটি, ** আর্য্যাবর্ত্তে, (১) হিন্দুস্থানী এবং (২) বাঙ্গালা উড়িয়া ; দাক্ষিণাত্যে, (৩) মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটি, কানারী, (৪) তেলেগু, (৫) তামিল, মালয়ালম। এই পাঁচটির মধ্যে একটি অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ১০ কোটি লোকের ভাষা—স্থতরাং পৃথিবীর যত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ লোকে হিন্দুস্থানী কহে। বাঙ্গালা উড়িয়া ৫ কোটি লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্ম্মনভাষী লোকের তুল্য। মহারাষ্ট্রীয়ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি, সমস্ত ফরাসীভাষীর সমান। তেলেগু ভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি, এবং তামিল মালয়ালম ভাষীর সংখ্যাও প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ইউরোপের স্পেনীয়ভাষী সমস্ত লোক অপেক্ষাও অধিক। এই পাঁচটি ভাষার মধ্যে একটিও অসম্পূর্ণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকলগুলিতেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্য গ্রন্থ আছে। এরূপ পূর্ণাবয়ব ভাষাসকল মারা পড়িতে পারে না।

---

* ১৮৯১ অব্দের আদমস্থমারীতে মোট ১১৮টি এবং তন্মধ্যে ২৬টি ইউরোপীয় এবং ১২টি এসিয়া ও আফ্রিকার বৈদেশিক ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। বক্রী ৮০টি ভাষার মধ্যে আকা (আসাম) ১২৫০ এবং পালৌং (বর্ম্মা) ২৮০০ লোকের ভাষা। এরূপ "ভাষা" ৮০টির মধ্যে অনেকগুলি আছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও ফরাসিস এবং স্পেনীয় ভিন্ন বাস্‌ক ভাষা, ইটালীয় ভিন্ন মালটীয় ভাষা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের সামান্য বিভিন্নতা ধরা হয় না।

** (১) খাস হিন্দী ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ, পঞ্জাবী ১ কোটি ৭২ লক্ষ, দক্ষিণী মুসলমানী ৩৬ লক্ষ, সিন্ধী ২৬ লক্ষ, পশ্চিম পাহাড়ী ১৫ লক্ষ, মধ্য পাহাড়ী ১২ লক্ষ, মাড়বারী ১১ লক্ষ—মোট হিন্দুস্থানী ১১ কোটি ২৮ লক্ষ লোকের ভাষা।

(২) খাস বাঙ্গালা ৪ কোটি ১৩ লক্ষ, আসামী ১৪ লক্ষ, উড়িয়া ৯০ লক্ষ। মোট বাঙ্গালা উড়িয়া ৫ কোটি ১৭ লক্ষ লোকের ভাষা।

(৩) মহারাষ্ট্রীয় ১ কোটি ৯০ লক্ষ, গুজরাটী ১ কোটি, কানারী ৯৭ লক্ষ, কচ্ছী ৪ লক্ষ। মোট মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, কানারী ৩ কোটি ৯১ লক্ষ লোকের ভাষা।

(৪) তেলেগু ১ কোটি ৯৮ লক্ষ লোকের ভাষা।

(৫) তামিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ, মালয়ালম ৫৪ লক্ষ। মোট তামিল, মালয়ালম ২ কোটি ৬ লক্ষ লোকের ভাষা।

নেতাদিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিতজাতির ভাষা লুপ্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র ভাষা বৃহত্তরের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনটিই ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি খাটে না। ইংরাজ-রাজত্বে ভারতবর্ষীয় বহুপ্রচলিত ভাষার লোপ সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন না এবং প্রজারা ভাষা বিনষ্ট করিবার জন্য কোন ইচ্ছাই করেন না। প্রত্যুত অনেকে ইংরাজের ভাষাসম্বন্ধীয় রাজনীতির প্রতি অন্যরূপ সন্দেহই করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখেন যে, ইংরাজ প্রতি প্রদেশে এবং কখন কখন প্রতি বিভাগেও ভাষাগত অবান্তর ভেদগুলি রক্ষা করিয়াই চলিতে সমুৎসুক, * এবং তাহা দেখিয়া মনে করেন যে, ভারতবর্ষীয় ভাষাভেদ মিটিলে পাছে সমুদায় অন্তর্ভেদ মিটিয়া যায় এবং ভারতবাসী সবল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে ইংরাজ আমাদের ভাষাভেদ রক্ষা করিতেই চাহেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত অনুমান নয়। দেশের মধ্যে গমনাগমনের সৌকর্য্য যত বৃদ্ধি হইবে, এবং শিক্ষার যত বিস্তৃতি হইবে, এবং ভারতবর্ষীয় ভাষা-সকলে পুস্তক রচনা এবং সংবাদপত্র প্রচারাদি যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই এক একটি ভাষার অন্তর্গত অবান্তর ভেদ লুপ্ত হইবে এবং বিভিন্নভাষীদিগেরও মৌলিক ভেদ ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া আসিবে। ইংরাজ হইতেই ঐ ত্রিবিধ কার্য্যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সহায়তা হইতেছে। অতএব তাঁহার কর্তৃক আমাদের ভাষাগুলির অন্তর্ভেদ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায্য। কিন্তু কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর মনে যে ঐরূপ রাজনৈতিক ভাব সমুত্থিত হইতে পারে না এমত নহে।

যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা রোমসাম্রাজ্যে চলিয়াছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষে সেইরূপ প্রভুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচার্য্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন হইয়া উঠে তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, ইংরাজী-শিক্ষিত দেশীয়দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন। ইংরাজ বিধি করিলেন যে, সকল আদালতেই স্থানীয় ভাষা অথবা ইংরাজী

* সিন্ধু দেশে সাধারণ লোকে ভাষা দেবনাগরীতে লেখে, তথায় আরবী অক্ষরের প্রচলন, উড়িয়া ও আসামীকে বাঙ্গালা হইতে সযত্নে পৃথক্ রাখা, অনেকে এইগুলিকে ঐরূপ রাজনৈতিক কুটিলতার উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করেন।

ভাষা এই দুয়ের এক ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু সেরূপ বিধি থাকিলেও দেশীয় ভাষায় উকীল-মোক্তার প্রভৃতির উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং আমলাবর্গের লেখা পড়া, বর্ষে বর্ষে ন্যূন হইয়া পড়িতেছে এবং ইংরাজীতেই আদালতের সমুদায় কাজ চলিতেছে। দেশীয় ভাষার সেরেস্তা উঠিয়া যাওয়াতে, ইংরাজ হাকিমের কোন অসুবিধা নাই। এই জন্য তিনি বুঝিতে পারেন না যে, ইহা হওয়ায় আদালতের কার্য্য ইংরাজী-শিক্ষিতদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহাতে প্রজার অসুবিধা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। বাঙ্গালা দেশের আদালতসকল হইতে যে সকল কারণে ফারসী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বিহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে কায়েথি-হিন্দি প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজীর অতিপ্রসারতা রোধ করিবার জন্য সেই সকল কারণই বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিতেরা তাহা বুঝেন না। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় সাধারণ লোক হইতে তাঁহাদের যে বিশিষ্টতা জন্মে, তাঁহারা সেই অভিমানসুখেই একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিতদিগের অভিমান বশতঃই হউক, আর ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষের অভিমানমিশ্রিত আলস্য বশতঃই হউক, যদিও ইংরাজ-অধিকারে আদালত এবং রাজকার্য্যালয়সকলে দেশীয় ভাষাগুলির অনাদর হইয়া উঠিতেছে, তথাপি উহা মুসলমানদিগের সময়ে যতটা হইয়াছিল তাহার অধিক হয় নাই, এবং হইতে পারিবেও না—মুসলমানদিগের সময়ে রাজকার্য্যে দেশীয় ভাষার প্রচলন একেবারেই বন্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানের আমলেও দেশীয় ভাষাগুলি সর্ব্বতোভাবে সজীব ছিল। পঞ্জাবী ভাষায় "আদি" গ্রন্থ, হিন্দী ভাষায় দাদূপন্থীদিগের দ্বিলক্ষাধিক দোঁহা, কবীরপন্থীদিগের সুরসাগর, ভক্তমালা, সতসইয়া এবং ছত্রপ্রকাশাদি গ্রন্থ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী, অভঙ্গ এবং বাকৃহারাদি গ্রন্থ; বাঙ্গলায় চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যনিচয়—এগুলি মুসলমানদিগের রাজত্বকালেই প্রণীত এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল। অপরাপর দেশে বিদ্যাচর্চ্চার সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত রাজার সাহায্যের যতটা প্রয়োজন ভারতবর্ষে চলিত ভাষা সম্বন্ধে কখনই রাজানুকূল্যের ততটা প্রয়োজন হয় নাই। এই মহাদেশের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মভাবের আধিক্য এবং সেই ভাবের বিকাশই এখানকার সাহিত্যের মূল। অপরাপর ভাবের বিকাশ সেই মূল হইতেই সমুদ্ভূত। এদেশে যতদিন ধর্ম্মভাব আছে, ততদিন এখানকার লোক আপনাপন পিতৃমাতৃভাষায় সেই ভাব প্রকাশ করিতে রত হইবে—এবং তাহা হইলে সমস্ত সাহিত্য-শাস্ত্র সজীব থাকিবে। অতএব ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের ভাষার লোপ বা হীনবীর্য্যতা

ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ভাষাসকল সজীব এবং উন্নতাবস্থ থাকিলেও রাজভাষা ইংরাজীর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকিবে। মুসলমানদিগের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, ইংরাজের আমলেও সেই সকল ব্যাপারের অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে—এবং তাহা স্বল্পতর কালে এবং সমধিক পরিমাণেই ঘটিবে। কারণ, এখন মুদ্রাযন্ত্র জন্মিয়াছে, শিক্ষার বিস্তৃতিও হইতেছে, এবং গতায়াত দ্বারা লোকের পরস্পর মিশ্রণ পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। মুসলমানদিগের সময়ে কত শত শত আরবী এবং ফারসী শব্দ আমাদিগের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী শব্দ অনেক আসিয়াছে, আরও অনেক আসিবে। ইউরোপের আমদানি নূতন নূতন দ্রব্যাদির নাম, আর আইন এবং ব্যবহার ঘটিত এবং বিজ্ঞান ঘটিত অনেকানেক পারিভাষিক শব্দ, আর জাতিবাচক এবং গুণবাচক কতক শব্দ অবশ্যই আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া স্বর-সামঞ্জস্যের নিয়মানুসারে অপভ্রষ্ট হইয়া চলিত হইবে। বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহু পরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পব সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষাসমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলিব মধ্যে হিন্দি-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পাবে যে, উহাকে অবলম্বন কবিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা

(সামাজিক-রীতি বিষয়ক)

আমাদিগের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা—জাতিভেদ। ইহা পৃথিবীর অপর সকল লোকের পক্ষে অতি আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার হইয়া আছে। যে বৈদেশিক পর্য্যাটক যখন ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন, তিনিই এখানকার জাতিভেদ প্রণালী সম্বন্ধে কথা তুলিয়াছেন। পূর্ব্বকালের লোকেরা ইহার প্রায়ই নিন্দা করিতেন। কিন্তু প্রশংসাই করুন, আর নিন্দাই করুন, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই বলিলেই হয়। জাতিভেদ প্রণালীটা কোন সমাজের পক্ষেই নিতান্ত নূতন বস্তু নয়। পুরুষানুক্রমে ব্যবসায় বিশেষের

অবলম্বন করা, বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের বিভিন্নদলে সম্বদ্ধ হওয়া, এবং সকল ব্যবসায়িবর্গের একমাত্র যাজক সম্প্রদায়ের বশ্য হওয়া, এ সকল ব্যাপার সর্ব্বদেশ-সাধারণ এবং কোন কালে পৃথিবীর সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায় বিভাগের ভেদটি অপর সকল দেশের অপেক্ষা বিশেষরূপেই পরিস্ফুট হইয়া আছে।

এইরূপ হইবার কারণ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধেয়। ভারতবর্ষে মৌলিক বর্ণভেদের নিরতিশয় আধিক্য। ভারতভূমির মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আকার এবং প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে একত্রিত হইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। এখানে ককেসীয়, মোঙ্গলীয়, কোলেরীয়, দ্রাবিড়ীয়, নিগ্রীয়, পলিনেসীয় প্রভৃতির বিবিধ পরিমাণে মিশ্রণ-জাত নানা প্রকারের লোক সুবহু পরিমাণেই বাস করিতেছে। ব্যবসায়ভেদের সহিত ঐ সকল মৌলিক ভেদও মিলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যবসায়ভেদ জন্মভেদ অনুসারে ঘটিয়াছে। মনুসংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, অমুক বা অমুক হইতে উৎপন্ন বংশীয়দিগের অমুক ব্যবসায়। উক্ত সংহিতায় ককেসীয়াদি মৌলিকবর্ণের কথা নাই বটে, কিন্তু তাহা না থাকিলেও যখন জন্মের গুণাগুণ ধরিয়া ব্যবসায়ের নিরূপণ হইয়াছিল, তখন মৌলিক বর্ণের ভেদ এবং তাহাদের উচ্চাবচ সাঙ্কর্য্য ঐ গুণাগুণ অবধারণের যে শ্রেষ্ঠ উপাদান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। ব্যবসায়ভেদ সাহজিক বর্ণভেদের সহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত হওয়াতে এখানকার জাতিভেদ সুদৃঢ় এবং অত্যধিক পরিস্ফুর্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য অপরাপর দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিবাহবন্ধনের স্বল্পতা মাত্র দৃষ্ট হয়, এখানে ওরূপ বিবাহের একেবারেই নিষেধ হইয়া গিয়াছে এবং সেই বিবাহনিষেধের অঙ্গীভূত হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভোজনের একপংক্তিকতা এবং শারীর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়াছে। সঙ্কর, বিশেষতঃ বিলোমসঙ্কর, উৎপাদনে আর্য্যশাস্ত্রের নিতান্ত অনভিরুচি। "সঙ্করো নরকায়ৈব"।

আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থূল এবং মূল কথা এই। ইংরাজ এতদিনের পর জাতিভেদের এই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার উপক্রম করিয়াছেন। সম্প্রতি রিস্‌লী সাহেব বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে জাতিভেদ বিষয়ে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীর জাতিভেদের অন্তস্তলে যে মৌলিক বর্ণভেদের অস্তিত্ব আছে তাহার সুপরিস্ফুট বোধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে যখন একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় এই কথার প্রথম উত্থাপন করেন তখন তাঁহার

শ্রোতৃবর্গ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। আজি কালি এরূপ কথাও উঠিতেছে যে, বিভিন্নজাতীয় লোকের শরীর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারিলে, জাতিভেদের মৌলিক হেতু স্থির হইতে পারে। যাহা হউক, ইংরাজ বিদেশী—তিনি যে এতদিন আমাদের সামাজিক প্রণালীর প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বিচিত্র নহে। এ দেশের বড় বড় সংস্কারকেরাও এই রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারেন নাই এবং তাহা না পারাতেই আপনাদের প্রবর্ত্তিত সংস্কারকার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। "যেমন গঙ্গাতে আসিয়া পড়িলে সকল নদ-নদীর জল গঙ্গার জল হইয়া যায়, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠে"—বুদ্ধদেবের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মতাবলম্বীরা ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না, সকল জাতির লোককে তুল্যমূল্য করিলেন; সেই জন্য দেশের অনুপযোগী ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া আপনারা হীনবল এবং দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল দেশে একবর্ণাত্মক লোকের বাস, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইল, আশ্রয় পাইল এবং বদ্ধমূলতা লাভ করিল।

বৌদ্ধের স্থানে সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির নীতিবাদ গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একটি উক্তি যে, যবন, খস, হূন প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয়েরাও হরিনাম গ্রহণ বলে দ্বিজোত্তম হয—ইহার পারমার্থিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারিক বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ লইয়া, নব্য বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রবর্ত্তকগণ দলপোষণ চেষ্টায় জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু দুই এক পুরুষের মধ্যেই ঐ উপদেশ নিষ্ফল হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবেরা বৈবাহিক বিষয়ে আপনাপন জাতি খুঁজিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ফল কথা, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রণালীর মূল অতি গভীর এবং দৃঢ়, এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। বৈষ্ণবই হউক, আর মুসলমানই হউক, আর নানকপন্থীই হউক, আর খ্রীষ্টানই হউক, আর যেই হউক, ভারতবাসী জাতিভেদ প্রথা অবলম্বন না করিয়া পুরুষানুক্রমে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারে না। এখানকার জাতিভেদ প্রণালীর হেতু যদি কেবল মাত্র ব্যবসায়ভেদ হইতে সমুৎপন্ন হইত, তাহা হইলে যেমন পৃথিবীর অপরাপর দেশ হইতেও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতেও সেইরূপে ইহা অনেক কাল উঠিয়া যাইত। মনুসংহিতা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোক সকলকে পুরুষানুক্রমিক বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়কার্য্যে সম্বদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা সেই সংহিতার সময় হইতেই বিলক্ষণ শিথিল ছিল। মনু বলেন—

অজীবংস্তু তথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং॥

পূর্ব্বোক্তরূপ জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ আপনার জীবিকার অর্জ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে দ্বিতীয় যে ক্ষত্রিয় জাতি তাহার ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। যদি দুয়েতেই না হয়, তবে কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যব্যবসায় অবলম্বন করিবেন।

অতএব জীবনোপায়ের নিমিত্ত একজাতীয় লোকে জাত্যন্তরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। ব্রাহ্মণেরা পাখিমারা, কুকুরপোষা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন, মনুসংহিতাতেই ইহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্চজাতীয়দিগের বৃত্তি স্বল্পোৎপাদিকা। নীচজাতীয় লোকে যে উচ্চজাতীয়ের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত না, বোধ হয়, ইহাও তাহার একটি কারণ।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রণালী শুদ্ধ ব্যবসায়ভেদমূলক নয়, এই প্রকৃত কথাটি না বুঝাতেই এই প্রণালীর প্রতি অনেকটা অযথা নিন্দাবাদ হইয়া থাকে। ইউরোপীয় অর্থ নৈতিকেরা বলেন যে, লোকে যাহার যে ব্যবসায়ে ইচ্ছা সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে না পাইলে, সমাজের ধনবত্তার কথা দূরে থাকুক, তাহার জীবনরক্ষাই দুরূহ হইয়া পড়ে। অর্থ নৈতিক পণ্ডিতদিগের এই সিদ্ধান্তটি কিরূপ যুক্তির উপর সংস্থাপিত তাহা একটু অনুধাবনপূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় অর্থ নৈতিকদিগের বিচার এইরূপ—"কোন দেশে তদ্দেশনিবাসী জনগণের প্রয়োজনীয় শস্য, বস্ত্র, লবণ, তৈলাদি ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত হইতেছে। মনে কর, অপর কোন দেশ হইতে তথায় ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন একটি, যথা তৈলের, আমদানি হইল, এবং সেই তৈল দেশে যে তৈল জন্মিতেছিল তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং স্বল্পমূল্য হইল। তাহা হইলে ঐ আমদানি তৈলেরই ব্যবহার হইবে এবং দেশীয় তৈলিকদিগের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। যদি তাহাদিগকে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা অতিশয় বিপদাপন্ন, একান্ত দরিদ্র এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইবে। তৈলিকদিগের সম্বন্ধে যেরূপ, অপর ব্যবসায়ী সকলের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এই জন্য ব্যবসায়-পরিবর্ত্তের পথ সর্ব্বতোভাবেই মুক্ত থাকা আবশ্যক।"

অর্থ নৈতিকদিগের যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম, সেগুলি বিচারসঙ্গত কথা।

কিন্তু ভারতবাসীর জাতিভেদ প্রথা যে ব্যবসায়-পরিবর্ত্তের তেমন কঠিনতর কোন প্রতিবন্ধকতা করে না, তাহা মনুসংহিতা হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানাপন্ন এমন দুইটি ইংরাজের উক্তিও উদ্ধৃত করিব। এল্‌ফিন্‌স্টোন সাহেব বলেন,—"আমি এতদিন ভারতবর্ষে আছি, এবং ইহার অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কোন নূতন ব্যবসায় গ্রহণ করাতে জাতি গিয়াছে ইহা দেখি নাই।" কোলব্রুক্ সাহেব বলিয়াছেন, "পৈতৃক বৃত্তির দ্বারা জীবিকার্জ্জন না হইলে অপর বৃত্তির অবলম্বন করায় শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি আছে, সুতরাং জাতিভেদ আছে বলিয়া ভারতবর্ষে ব্যবসায়-পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় না।" অতএব প্রকৃত অর্থনৈতিক বিচারে যাহা সিদ্ধ হয়, ভারতবাসীর জাতিভেদপ্রথাটি সে বিধানের বিরোধী হইয়া চলে না। সকল লোকেই 'বৃত্তিকর্ষিত' হইলে স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ এবং জাত্যন্তরের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে।

কিন্তু ইংরাজের অর্থনৈতিক বিচার যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। উহার পরিণামে একটি হঠোক্তি আছে। তাহা এই—'সমাজান্তর্গত অধিক লোকের যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই ন্যায্য, কোন একটি সম্প্রদায়ের দুঃখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে তৈলিকদিগের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়া তাহাদের কষ্ট হইতেছে বলিয়া কি উৎকৃষ্টতর এবং স্বল্পতর-মূল্য বৈদেশিক তৈলের আমদানি বন্ধ করা হইবে? কদাপি নহে। তৈলিকেরা ব্যবসায়ান্তরে প্রবিষ্ট হউক।' আমার বিবেচনায় ইংরাজ-অর্থনীতিশাস্ত্রের এই কথাটি ভাল কথা নয়। তৈলিকেরা কি সমাজেরই একটি অঙ্গস্বরূপ নয়? সমাজের অন্তর্গত কোন একটি সম্প্রদায় অথবা একটি পুরুষও যদি জীবিকার জন্য কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্য সমাজের চেষ্টা করা কি বিধেয় নয়? দীনদুঃখীদিগকেও সমাজ পালন করেন কেন? ইংলণ্ডাদি দেশে দীনপালনবিধির সৃষ্টি কেন হইয়াছে? ভারতবর্ষাদি দেশে আতিথ্যপ্রথা এবং ভিক্ষাদানের নিয়ম কেন এত বলবৎ রহিয়াছে? সমাজ আপনার অঙ্গস্থানীয় কোন সম্প্রদায়কেই তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারেন না। এই জন্য কোন চিন্তাশীল স্বতন্ত্রপ্রজ দেশেই ঐ হৃদয়শূন্য অর্থনীতি গ্রহণ হইতে পারে নাই। মার্কিণেরা আমদানি বাণিজ্য সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, স্বদেশীয় কোন ব্যবসায় উঠিয়া যাইতে পারে এমন কোন বৈদেশিক আমদানির আরম্ভ হইলে, সেই দ্রব্যের উপর গুরুতর শুল্ক বসাইয়া স্বদেশীয় ব্যবসাদারদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে, এত বর্ষের জন্য ঐ শুল্কটি বসান হইল, সেই সময়ের মধ্যে

তোমরা আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যটিকে উৎকৃষ্ট এবং অল্পমূল্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। ঐ নিয়মের ফলে বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া উঠে, তাহার বিক্রয় অধিক হয় না, দেশীয় ব্যবসায়ীরা অবসর পায়, এবং সেই অবকাশের মধ্যে হয় আপনাদের দ্রব্যটিকে বৈদেশিক দ্রব্যের সমান বা তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে, অথবা আপনারা ব্যবসায়ান্তর শিখিয়া লইয়া সেই নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথাও কিয়ৎপরিমাণে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ এখানেও সমাজের অঙ্গীভূত ব্যবসাদারদিগের প্রতি মমতা থাকে এবং সেই জন্য আমদানি দ্রব্যের একেবারে ভূরি প্রবেশ কতকটা বন্ধ করিয়া রাখে, এবং বৈদেশিক আমদানিতে যে ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে কিছু অবসর দেয়। বস্তুতঃ অর্থনীতি যদি ধর্ম্মনীতির সহিত মিলিয়া চলে, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথার সহিত তাহার কোন অনৈক্যই হইতে পারে না।

জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে একটি শিক্ষাসূত্রকেও সাক্ষ্য স্বরূপে দণ্ডায়মান করা হয়। সে সূত্রটি এই—ব্যক্তি-ভেদে প্রবৃত্তির ভেদ থাকে, যে যাহার আপনাপন প্রবৃত্তিব অনুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। এই জন্য পুরুষানুক্রমে কোন এক ব্যবসায়ে লোকের নিবদ্ধ হওয়া ভাল নয়। এ স্থলে দেখা যায় যে, শিক্ষাসূত্রের সাক্ষ্যটি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিভেদ প্রথার অনুকূল বই প্রতিকূল নহে। প্রবৃত্তির মূল প্রথমতঃ পিতৃমাতৃ-শরীর-সঞ্জাত এবং দ্বিতীয়তঃ শৈশবের দৃষ্ট ব্যাপার সম্ভূত। উভয় কারণ হইতে পিতৃব্যবসায়ে প্রবৃত্তির আধিক্যই সম্ভবপর, এইজন্য সাধারণতঃ পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করাতেই কি প্রবৃত্তিগত, কি শিক্ষাসৌকর্য্যগত, সকল প্রকার সুবিধা অধিক। আর বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির প্রতিবন্ধক কিছুই নাই।

জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে আর একটি কথা বলা হয়। ঐ কথাটি ঐতিহাসিক পরিণামবাদ হইতে সমুদ্ভূত। কথাটি এই—কোন সময়ে ইউরোপীয় সকল সমাজেই একপ্রকার জতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখনও সকল দেশেরই প্রত্যন্ত গ্রামাদিতে ঐ প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামবাসীদিগের পুত্রেরা স্ব স্ব পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করে, এবং সমব্যবসায়ীদিগের সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদানকরিয়া থাকে। কিন্তু এখন ঐ প্রথা কোন বৃহন্নগর বা দেশ-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব সমাজ যে পরিণতিনিয়মের অধীন, সে নিয়ম জাতিভেদ প্রথার অনুকূল নহে—এই জন্য উহা এখন পৃথিবীতে অসাময়িক

হইয়াছে এবং উৎসাদিত হওয়া উচিত। ঐ কথার উত্তরে এই বলা যায় যে, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা যদি অন্যান্য দেশের জাতিভেদ প্রথার ন্যায় কেবলমাত্র শ্রম-বিভাগের প্রয়োজনে সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে সেই সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও ঐ প্রথার পরিণতি তদনুরূপ হইত, অর্থাৎ উহা ঐ সকল দেশে যেরূপে গিয়াছে সেই প্রণালীতেই উঠিয়া যাইত।

পরন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিণামবাদীর বিচার তদনুরূপ স্থূল কথায় পর্য্যবসিত নহে। প্রকৃত পরিণাম-বাদী বলিবেন যে, জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন তিনটি; এক শ্রমের বিভাগ, দ্বিতীয় শিক্ষার সৌকর্য্য, তৃতীয় ব্যবসায়ানুসারিক দলবন্ধন। ভারতবর্ষে জাতিভেদ নিবন্ধন এই তিন প্রয়োজনই সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ভারতবাসীর প্রয়োজন লোকসাধারণের সম্মিলন এবং একতা। আমি একথাটির অসম্মান করি না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এক প্রকারে দলবন্ধন অন্য প্রকারের বৃহত্তর সম্মিলনের ব্যাঘাতক নহে, প্রত্যুত তাহার অনুকূল। কারণ জাতিভেদ বশতঃ ব্যবসায়গুলি অতি বিস্পষ্টরূপে পরস্পর পৃথক্‌ভূত হওয়াতে সমাজান্তর্গত সকলেই অতি দিব্যচক্ষে দেখিতে পায় যে, তাহারা অন্যোন্যের আশ্রয়াপেক্ষী হইয়াই সকলে সচ্ছন্দে থাকিতেছে, পরস্পরের আশ্রয় না পাইলে কেহই সুখে থাকিতে পারিত না। অতএব ব্যবসায়-পার্থক্য স্পষ্টীকৃত হওয়ায়, সাধারণ সম্মিলনের ব্যাঘাত না হইয়া তাহার বিশিষ্ট সহায়তাই হইতে পারে; এই যে এক্ষণে ইউরোপখণ্ডের নানা দেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের মধ্যে, সম-ব্যবসায়িব্যক্তিদিগের দলবন্ধন হইতেছে, তাহাই কি ইউরোপীয় সমাজের পরিণাম ফল বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতেছে না? ঐ সকল দলবন্ধন কি জাতীয় বন্ধনের অঙ্গীভূত নয়? ঐ দলবন্ধনের প্রভাবেই কি মূল-ধনিগণ শ্রমজীবীদিগের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি করিতে শিখিতেছেন না? অতএব ঐতিহাসিক পরিণতির প্রকৃত বিচারে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সদোষ বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে অর্থনীতি, শিক্ষাসূত্র, এবং সমাজ-নীতি যাহা যাহা বলেন, তাহার বিচার করিয়া এক্ষণে অপর তিনটি সামান্য কথার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, কথাগুলি আজি কালি বহুলোকের মুখেই শুনা যায়। (১) খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিলে, সমাজের মধ্যে দৃঢ় সম্মিলন জন্মে না। কিন্তু আমার বিবেচনায় যখন সম্মিলনের প্রকৃত মূল বন্ধুভাব, তখন খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের অবারিত ব্যবস্থা সম্মিলনের অনুকূল হইতে পারে না। বস্তুতঃ কোন দেশেই ঐ সকল সম্বন্ধ অবারিত ভাবে

চলে নাই, এখনও চলিতেছে না। (২) জাতিভেদ স্বীকারে সাম্যের অপলাপ হয়। উহার উত্তর এই—যাহা নাই তাহার অস্বীকারে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে না। পৃথিবীতে সাম্য নাই। তদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ সাম্যভাবের প্রভাবে বশ্যতার লোপ হয় এবং বশ্যতার লোপে সম্মিলন একেবারে অসম্ভবপর হয়। (৩) জাতিভেদের কথা বেদে তেমন স্পষ্টতঃ উক্ত হয় নাই। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে অথবা তাহারও পশ্চিম অঞ্চলে হইয়াছিল। সেই সকল দেশ আর্য্যবহুল। তথায় বিভিন্ন বর্ণের লোক সমধিক পরিমাণে একত্রিত হয় নাই। সুতরাং অপরাপর লোকের সহিত মিশ্রণে আর্য্য-শোণিত দূষিত হইবে এরূপ শঙ্কার কারণ ব্রহ্মাবর্ত্তে উপস্থিত হয় নাই। এই জন্যই প্রাথমিক বৈদিক গ্রন্থে জাতিভেদের কথা তেমন অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না। আর্য্যগণ ক্রমে ব্রহ্মর্ষি দেশে, অনন্তর সমুদায় আর্যাবর্ত্তে, এবং তাহার পর দাক্ষিণাত্যে যেমন প্রসারিত হইতে থাকিলেন, অমনি ব্যবস্থাপকেরা অপরাপর লোকদিগের সহিত তাঁহাদিগের মিশ্রণ নিবারণার্থে সচেষ্ট হইলেন। মৌলিক বর্ণভেদজনিত আকারগত পার্থক্য হইতে যে ভিন্নতা স্বতঃই উপস্থিত ছিল, ব্যবস্থাশাস্ত্র সেই ভিন্নতাকে ন্যূনকল্প করিয়া এবং তজ্জাত বিদ্বেষভাবকে মন্দীভূত করিয়া তাহাকে সামান্য ব্যবসায়ভেদরূপে পরিণত করিয়া দিলেন।

এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ইংরাজের অধিকারে আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক-ও সাহজিক এবং সাধারণতঃ অর্থ, শিক্ষা ও সমাজনীতির অবিরোধী এই জাতিভেদ প্রণালীর অবস্থা কিরূপ হইতে পারে।

ইংরাজ ভারতবাসীকে আপনার অধীন মনে করেন। অধীনের প্রভুশক্তি থাকে না। প্রভুতা দুই প্রকারে জন্মে, (১) ধনাধিকার হইতে (২) আভিজাত্য হইতে। সুতরাং সাধারণ ইংরাজের চক্ষে ভারতবাসীর ধনাধিকার এবং আভিজাত্য দুইটি বস্তুই ভারতবাসীর অবস্থার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের আভিজাত্য সহজেই ইংরাজের চক্ষুঃশূল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের প্রতি অনুকূল না হইলেই জাতিভেদ প্রথার প্রতিও অনুকূল হওয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজ ঐ আন্তরিক প্রতিকূল ভাবটিকে বিলক্ষণ দমন করিয়াই চলেন এবং জাতিভেদ প্রথার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন না করিয়া উহার প্রতি সম্যক্ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াই অপক্ষপাতিতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন।

যে যে স্থলে অত্যল্প পরিমাণে ইংরাজ আমাদের সমাজরীতির প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন তাহাও দেশীয় সম্প্রদায় বিশেষের প্ররোচনাতেই

করিয়াছেন। ইংরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সমাজ-প্রণালীর গাত্র স্পর্শ করেন নাই। যাহা হউক, দুই একটি স্থলে তাঁহার কৃত কার্য্যের দ্বারা আমাদের সামাজিক প্রথার প্রতি কিছু কিছু আঘাত হইয়াছে বলিতে হয়। প্রথম আঘাত ১৮৫০ অব্দে ২১ আইনের দ্বারা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থার অনুসারে কেহ স্বধর্ম্মচ্যুত হইলে পিতৃধনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে না। ঐরূপ ব্যবস্থা বা ব্যবহার মুসলমানদিগের সময়েও প্রবল ছিল, এবং তাহা থাকায় যেমন সমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই ইংরাজকৃত ঐ আইন হইতেও তাহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই, এবং হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। ১৮৫৬ অব্দের ১৫ আইন অর্থাৎ বিধবা-বিবাহের আইনটিও আমাদিগের সামাজিক রীতির প্রতি একটু আঘাতের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ঐ আইন হইতে বিশেষ কোন ফলই ফলে নাই। প্রত্যুত আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়াতে এই হইয়াছে যে, হিন্দু বিধবা দুশ্চরিত্রা হইলেও মৃত স্বামীর ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে। যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তাহা হইলেই সেই অধিকার বিচ্যুত হইয়া যায়!! কিন্তু উল্লিখিত দুইটি আইন জাতিভেদ প্রথার প্রতি সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করে না; ১৮৭২ অব্দের ৩ আইন অর্থাৎ ব্রাহ্ম-বিবাহের আইনও জাতিভেদ প্রথার প্রতি অধিকতর বিরূপতা করিতে পারিবে না। বিবাহ ব্যাপারটিকে 'সংস্কার' কার্য্য হইতে আনিয়া 'চুক্তির' ভিতরে ফেলায় ভাল হয় নাই, ইতিমধ্যেই দুই একজন ব্রাহ্মকে এই কথা বলিয়া অনুতাপ করিতে শুনিয়াছি। হিন্দুর বিবাহ যে সংস্কার কার্য্য তাহা যদিও ১৮৯১ সালের কনসেণ্ট আইনের দ্বারা অস্বীকৃত হয় নাই, তথাপি ঐ আইন প্রচলিত সামাজিক রীতির প্রতি কিঞ্চিৎ আঘাত করিয়াছে। কিন্তু সুবোধ এবং সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই দিয়া ঐ পথে অধিকদূর অগ্রসর হইবেন তাহা মনে করা যায় না—প্রমাদ কখনই স্থায়ী ভাব হইতে পারে না।

বস্তুতঃ এই সকল উপায়ের দ্বারা ভারতবর্ষের সমাজপ্রণালীর মূলস্বরূপ জাতিভেদপ্রথার কিছু কিছু অনিষ্টের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যতই চেষ্টা হউক ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার নৈসর্গিক মূল আছে, এবং যতদিন সেই মূল থাকিবে, ততদিন সকল ঘরেই সকল লোকে বিবাহ করিতে পারিবে না। জাতিভেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বিবাহভেদ, অন্য কোন ভেদ নয়; বিবাহ-ভেদটিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই অন্যান্য ভেদের ব্যবস্থা। বিবাহ-ভেদের মূল কথাও যাহা শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, বিজ্ঞান এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাও তাহাই সমর্থিত করে।

বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিরেব কুত্রচিৎ।
উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে ॥

কোথাও পুরুষ উৎকৃষ্ট কোথাও বা স্ত্রী উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়ে সমান হইলেই সন্তান ভাল হয়। ক্ষেত্রে বীজের বৈষম্য হইতে পূর্ব্বপুরুষের দোষাদি সন্তানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সম্ভাবনা—এইটি মৌলিক তথ্য।

জাতিভেদ এই মৌলিক নিয়মের উপরেই সংস্থাপিত। যদি কখন ভারতবাসিগণ ইউরোপীয় বা আসিয়িক কোন একটি দেশের অধিবাসিবর্গের ন্যায় সমবর্ণ এবং সমাকার হয়, তখনই জাতিভেদ উঠিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যতদিন ইহাদের আকার, বর্ণ, এবং প্রকৃতির সাদৃশ্য না জন্মিতেছে, ততদিন ইহাদের মধ্যে একজাতিত্বও হইবে না। তবে একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থানভেদজনিত বিবাহপ্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক্ প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ-নির্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত-সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়। উপসংহারে বলি, জাতিভেদপ্রথা অসময়ে উঠাইবার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অন্তঃশাসনশক্তি আরও ন্যূন হইয়া পড়িবে, এবং (৩) লোকের স্বভাব হইতে শান্তি-প্রবণতা তিরোহিত হইয়া রাজ্যের সুশাসন কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

ভবিষ্যবিচার---ভারতবর্ষের কথা

(আর্থিক অবস্থা বিষয়ক)

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে বিভিন্নদেশীয় বণিক্‌গণ ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক উপাদেয় দ্রব্য স্ব স্ব দেশে লইয়া যাইতেন, এখন ভারতবর্ষেই অপর দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যজাত সমানীত হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজকার্য্য দেশীয় লোকের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত, এক্ষণে সমস্ত উচ্চ রাজকার্য্যে বিদেশীয়দিগেরই সম্যক্ অধিকার হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের রক্ষা, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দেশীয় লোকের দ্বারাই

সম্পাদিত হইত, এক্ষণে বিদেশ হইতে সমাগত সৈন্যই দেশরক্ষার অস্থিকল্প হইয়াছে।

দেশীয় জনগণের উল্লিখিতরূপ অকর্ম্মণ্যতার লক্ষণগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইটি, অর্থাৎ রাজকার্য্যে এবং সৈনিককার্য্যে বিদেশীয়ের নিয়োগ, মুসলমানদিগের সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল। তখনও অনেকানেক উচ্চতম রাজকার্য্য বৈদেশিক মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল, এবং অনেকানেক মুসলমান সৈনিকপুরুষও ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু কি মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারী, কি মুসলমান সৈনিক প্রায় সকলেই স্ব স্ব জন্মভূমির সহিত সম্পর্ক-শূন্য এবং ভারতবর্ষ-নিবাসী হইয়া যাইত।

এখন ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী এবং ইংরাজ সৈনিক প্রায় কেহ এ দেশে স্থায়ী হইয়া থাকেন না—এবং ইংরাজের অধিকারেই ভারতবর্ষের বাণিজিকী অবস্থার পূর্ব্বোল্লিখিত বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরাজের অধিকারকালকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকারের কাল বলা যায়।

পক্ষান্তরে, এই বৈদেশিক অধিকারের সময়েই ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত হইয়াছে, ইহার সমস্ত অন্তর্বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে, বহিঃশত্রুর আগমন-সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে, বাণিজ্যকার্য্যের সম্যক্ বিঘ্নশূন্যতা জন্মিয়াছে, এবং ধনোপার্জ্জনের পথ লোকসাধারণের পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্ষমতা অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতার সমক্ষে এক প্রকার উন্মুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই সকল কারণে ধনের বৃদ্ধি বই কদাপি হ্রাস হইবার সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু ঐ সকল শুভ লক্ষণের যুগপৎ উদয়েও ভারতবর্ষ দরিদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন যে, ৫ কোটি ভারতবর্ষবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত অন্ন দুই সন্ধ্যা যুটে না! কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অনাহার, অল্পাহার এবং কদাহার দোষে ভারতবাসী ক্ষীণবীর্য্য এবং স্বল্পায়ুঃ হইতেছে। এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াই গিয়াছে যে, প্রতি দশ এগার বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে একটি করিয়া বৃহৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং তাহার পরেই একটি করিয়া মহামারী আসিয়া উপস্থিত হয়; তদ্ভিন্ন, স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট এবং মারীভয় প্রায় প্রতিবর্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রভূত ধনশালী ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিলেও পৃথিবীর অপর কোন দেশের অবস্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

ভারতবর্ষে সর্ব্ববিজয়ী ইংরাজের অধিকার। ঐ অধিকারের গুণে দেশে শান্তি থাকায় যে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও তৎসহ আবাদের বৃদ্ধি হইয়া মোট কৃষ্যুৎপন্ন

ধনের উৎপত্তি বাড়িয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গড়পড়তায় প্রজার আয় বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ঐ অধিকার কালেই বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পোৎপন্ন ধনের হ্রাস হইতেছে এবং যত ধন উৎপাদিত হইতেছে, তাহাও সমস্ত দেশে থাকিতেছে না।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকারে কত ধন প্রতিবর্ষে উৎপন্ন হয়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচিব বেয়ারিং সাহেব একপ্রকার নিশ্চয় করিয়াছেন যে, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৭ টাকা মাত্র। কেহ কেহ, যথা গ্রাণ্টডফ সাহেব বলেন, ঐ আয় ২০ টাকার অনধিক। যদি ২৭ টাকাই ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রতি ব্যক্তির ভাগে মাসে ২৷০ অথবা ৴২॥ সাড়ে চার পয়সা পড়ে। ঐ আয় হইতেই ভারতবাসীর খাওয়া, মাখা, পরা, বাস, ক্রীড়া, আমোদ প্রমোদ সমুদায় নির্ব্বাহিত হয়। এবং ইহার ভিতর হইতেই বৈদেশিক শিল্পজাতের মূল্য দিতে হয় এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে গভর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।

কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশে গড়ে প্রতিব্যক্তির বার্ষিক আয় ও রাজস্ব দান কত টাকা তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে। ২২ কোটি ব্রিটিশ ভারতবাসী ৮৯ কোটি টাকা রাজস্ব দেয়।

দেশ	আয়	রাজস্ব দান
ইংলণ্ড	৩৪০ *	৩০
ফ্রান্স	২৯০	৩৪
জর্ম্মনি	১৮০	২৫
ইটালী	৭৭	২৩
অস্ট্রিয়া-হঙ্গেরী	১১০	২২
রুশিয়া	৫৪	১৪
স্পেন	৬২	২০
পর্ত্তুগাল	৮০	১১
তুরস্ক	৪০	৫
মার্কিণ	৩০০	১৪
পারস্য	অজ্ঞাত	২
জাপান	৬২	৪

* বিদেশীয় রাজ্যের হিসাব পৌণ্ডে জানা আছে। এই প্রবন্ধের সকল তালিকায় সাবেক মত ১০ টাকায় পৌণ্ড ধরা গেল।

দেশ	আয়	রাজস্ব দান
চীন	অজ্ঞাত	৷৷০
ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ	২৭	৪

অতএব পৃথিবীর অপর সকল প্রধান প্রধান দেশের লোকের অপেক্ষা ভারতবাসীর আয় এত কম যে, তাহার উপর অধিকতর করভার পড়িয়াছে স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ইংরাজাধীন ভারতভূমিতেই এরূপ গুরুভার করের আদায় হয়, এমত নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজের অনধীন ভারতবর্ষের যে সকল ভাগ আছে, সেই সকলেও করভার অল্প নহে। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রতি ব্যক্তির রাজস্ব দান ৪৵০ টাকা, হোলকার রাজ্যে ৭ টাকা, বরোদা রাজ্যে ৫ টাকা, সিন্ধিয়া রাজ্যে ৪ টাকা, কাশ্মীর রাজ্যে ৫।৵০ টাকা, মহীশূর রাজ্যে ৪৷৷০ টাকা। অতএব দেশীয় রাজাদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজ অধিকারে করাদানের আধিক্য বোধ হয় না।

কিন্তু দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে যে কর গৃহীত হয়, তাহা অনেকটা দেশের ভিতরেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধন দেশের কার্য্যে লাগে। কিন্তু ইংরাজাধিকৃত ভাগের যে রাজস্ব তাহার প্রায় চতুর্থাংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। ভারতবর্ষের নিমিত্ত কখন আবশ্যক হইতেও পারে এইরূপ অনুমানে ইংলণ্ডে যে সকল সৈনিক প্রস্তুত থাকে তাহার জন্য, ভারতবর্ষের রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় বিলাতী অফিসের খরচের জন্য, ভারতবর্ষ কর্তৃক পরিগৃহীত ঋণের বৃদ্ধির জন্য, এবং বাটাবিভ্রাট প্রভৃতি অন্যান্য বাবদে সমুদায় রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিতে হয়। ইংলণ্ডে ঐরূপ খরচ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ১৮৭৯ অব্দে কিঞ্চিন্ন্যূন ১৭ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ডে খরচ হয়। ১৮৯২ অব্দে ঐ খরচ প্রায় ২৩ কোটি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন, এখানে যে প্রায় ৭০ হাজার গোরা ফৌজ থাকে এবং প্রায় ১০ হাজার নানা ব্যবসায়ী ইংরাজ আছেন, তাঁহাদিগের বেতনাদির টাকাও অনেক পরিমাণে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। উহার পরিমাণ কত তাহা ভারতবর্ষের বাণিজিকী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছু অনুভূত হইতে পারে।

১৮৯২-৯৩ অব্দে কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশে আমদানি রপ্তানি যেরূপ হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে দেখান যাইতেছে।

দেশ	আমদানি	রপ্তানি
	কোটি টাকা	কোটি টাকা
ইংলণ্ড	৪২৩	২৯১

দেশ	আমদানি কোটি টাকা	রপ্তানি কোটি টাকা
ইউনাইটেড দেশ	১৭৩	১৬৬
ইটালি	১৬০	১৪৮
ফ্রান্স	৩৬৮	৩১৬
জর্ম্মন	৪৫০	৩৫০
হলণ্ড	১০৬	৯৪
পোর্টুগাল	১১	৭
চীন	৩০	২৩
তুরস্ক সাম্রাজ্য	২৩	১৫
ভারতবর্ষ	৮৩	১১৩
মিসর	১২	১৫

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ এবং বৈদেশিক ঋণে বিক্রীতপ্রায় মিসর ব্যতীত উল্লিখিত সকল দেশেই রপ্তানির অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ অধিক।

১৮৯২-৯৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে যত মাল রপ্তানি হয় তাহার মূল্য ১১৩ কোটি টাকা। ইংরাজ সওদাগরেরা শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে লাভের গণনা করেন; অতএব ১১৩ কোটির উপর লাভ ১৭ কোটি পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের বাণিজিকী ব্যাপারটি সুস্থাবস্থ হইত, অর্থাৎ যদি বহির্ব্বাণিজ্যের লাভের টাকাও দেশে আসিয়া পৌছিত, তাহা হইলে আমদানির পরিমাণ (১১৩+১৭=১৩০) এক শত ত্রিশ কোটি হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ৮৩ কোটি মাত্র হয়! অতএব সুস্থাবস্থার সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি (১৩০—৮৩=৪৭) সাতচল্লিশ কোটি টাকা বলিয়া ধরিতে হয়। আমাদের বাণিজ্যচেষ্টা না থাকায় আমরা পূর্ব্বোক্ত ১৭ কোটি টাকার লাভভাগী হইতে অধিকারী নহি। কিন্তু যত যায় ততও ত আইসে না!

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যত টাকার জিনিস বাহির হইয়া যায় তাহার অপেক্ষা ৩০ কোটি টাকার জিনিস কম অইসে। ঐ ৩০ কোটি টাকা, কতক পরম্পরাসম্বন্ধে ইংলণ্ডেই যায়। ইংলণ্ড হইতে কতক মূলধন রেলওয়ে এবং জলপ্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য এবং নীল, চা, কাফি প্রভৃতির চাষের জন্য, এবং চটের কল, তূলার কল, চিনির কল প্রভৃতি কারখানার জন্য, ইংরাজ কর্ত্তৃক এই

দেশে আনীত হয়। ঐ মূলধনও ভারতবর্ষের মোট আমদানির অর্থাৎ ৮৩ কোটি টাকার মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি ৩০ কোটি মাত্র নহে, তাহা অপেক্ষা অধিক।

বৎসর বৎসর যে বৈদেশিক মূলধন আসিতেছে তাহার পরিমাণ ঠিক জানিবার উপায় নাই। রেলওয়ে কোম্পানিদের অংশে ও গবর্ণমেণ্টের ঋণে মোটামুটি আন্দাজ ৩০০ কোটি টাকা এক্ষণে ভারতের বাহিরের ঋণ দাঁড়াইয়াছে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যেই এই ঋণের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ৬ কোটি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজা জমিদার প্রভৃতির ঋণ, কলকারখানা চা-বাগান, স্টীমার প্রভৃতির জন্য টাকা আসিতেছে; সুতরাং গড়ে বার্ষিক আরও ২ কি ৩ কোটি মূলধন ঐ হিসাবে আসিতেছে মনে করা অসঙ্গত নহে। এইরূপ বাণিজ্যের গতি এবং অন্যান্য বিষয় অনুশীলন করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, এখনই ভারতবর্ষের বৎসরে বৎসরে ৩৭।৩৮ কোটি টাকা সাক্ষাৎ লোকসান হইতেছে।

আরও একটি কথা বিবেচ্য আছে। গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের এবং এদেশে ইংরাজ বণিকাদির প্রেরিত মূল-ধনের সুদ পরে আমাদের রপ্তানিকে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করিবে। এদেশে ইংলণ্ডের ন্যস্ত মূলধন গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়াই হউক আর সাক্ষাৎ বিলাতী কোম্পানীদিগের দ্বারাই হউক রেলওয়ে নির্ম্মাণেই সমধিক ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৯২ অব্দ পর্য্যন্ত মোট ২৩৪ কোটি টাকা রেলওয়ে নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে প্রজার স্থানে গৃহীত রাজস্ব হইতে অন্যূন ২৬ কোটি টাকা প্রদান করিয়া ইংলণ্ডীয় মূলধনীদিগের সুদ পোষাইয়া দিতে হইয়াছে। তবে আজি কালি আর তেমন ক্ষতি হইতেছে না। কোন কোন রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেণ্টের কিছু কিছু লাভ হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের অপর কতকটা মূলধন ভারতবর্ষের জলপ্রণালী নির্ম্মাণে বিনিযুক্ত হইয়াছে। সেই সকলের মধ্যে যেগুলি পূর্ব্বকালের অর্থাৎ, হিন্দু এবং মুসলমানদিগের সময়ের জলপ্রণালীর পুনরুদ্ধার মাত্র, সেগুলি হইতেই কিছু কিছু লাভ থাকে, নূতন প্রণালীর মধ্যে কয়েকটি ভিন্ন প্রায় কোনটিতেই লাভ থাকে না, কিছু কিছু লোকসান হয়। তবে রেলওয়ে এবং খালে দেশীয় মজুরদারেরা কতকটা কাজ পায়।

রেলওয়ে এবং পূর্ত্তকার্য্যে তাদৃশ লাভ না হইবার কয়েকটি কারণ প্রধান বলিয়া উক্ত হয়। এক কারণ এই যে, উহাদিগের নির্ম্মাণে অযথারূপ মূলধন ব্যয় হইয়া

যায়। দ্বিতীয় কারণ, উহাদিগের কার্য্য পরিচালনেও অপরিমিত খরচ হয়। তৃতীয় কারণ, সকল কাজ বুঝিয়া করা হয় না। চতুর্থ কারণ, কখন কখন ইংলণ্ডীয় বণিক্‌দল ভারতবর্ষে কাজ করিতে আসিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিলে, যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাহাদিগের কারবার ক্রয় করিয়া লওয়া হয়।

রেলওয়ে এবং জলপ্রণালী নির্ম্মাণ এই দুইটি প্রধান কার্য্য ভিন্ন, নীল, চা, কাফির চাষে এবং পাট, তুলা, পশম, কাগজ এবং চিনির কারখানায় ইংলণ্ডের কতক মূলধন ভারতবর্ষে খাটে। ঐগুলির উপর গবর্ণমেণ্টের টাকার, অর্থাৎ প্রজার প্রদত্ত রাজস্বের কোন অংশ ব্যয়িত হয় না। সুতরাং ঐগুলিতে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন লোকসান নাই। প্রত্যুত ঐ সকলের অবলম্বনে মজুরদার লোকেরা খাটিয়া খাইতে পায়।

ঐ সকল চাষের এবং কল-কারখানার কাজে কত মজুর খাটে তাহার একটা স্থূল হিসাব করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৯১০টি ঐ প্রকার কারবার চলিতেছে। তাহার কোন কোনটি বৃহৎ এবং কোন কোনটি অতি সামান্য। যদি প্রত্যেক কারবারে গড়ে ৫০০ মজুর খাটে বলিয়া ধরা যায়, তবে ইংরাজদিগের চাষ এবং কলকারখানাদিতে (৯১০ × ৫০০ = ৪,৫৫,০০০) মোটামুটি ৫ লক্ষ মজুরের অন্নসংস্থান হইতেছে বলিযা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যতই হউক, বিলাতী দ্রব্যের আমদানিতে আমাদের যে সকল ব্যবসায় মারা পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, সেই সকল ব্যবসায়ের অবলম্বনে কত লক্ষ লোক অন্ন পাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। লবণ প্রস্তুতকারী মলুঙ্গিদিগের সংখ্যাই বোধ হয় ৫ লক্ষের অধিক ছিল।

ফলতঃ ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষীয় শিল্পজাতের বড়ই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা তন্তুবায়ের কিম্বা কর্ম্মকারের অথবা কাংস্যকারের ব্যবসায়দ্বারা অতি সচ্ছল অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তাহারা সকলে আর স্ব স্ব ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। কলের কাপড় এবং সুতার আমদানি হওয়াতে, এবং বিলাতী ছুরি, কাটারি, কুদ্দাল প্রভৃতির আগমনে, আর লোহা, পিত্তল এবং তাম্রের চাদর বিলাত হইতে আসাতে, এখানকার অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে।

১৮৯২-৯৩ অব্দে ২৫৷৷০ কোটি টাকার সুতার বস্ত্র আসিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ৪৷৷০ কোটি টাকার অন্যান্য বস্ত্র ও সুতা, ৪৪ লক্ষ টাকার ছাতা, ৬৷৷৵ কোটি টাকার ধাতু ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ৫৭ লক্ষ টাকার লবণ, ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মদ্য ও ২

কোটি ৯১ লক্ষ টাকার তৈল আসিয়াছিল।

এক মাত্র কার্পাসশিল্প নাশে ভারতবর্ষের আয় কত ন্যূন হইয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দেখা যায় যে, তুলার মন ২০ টাকা ও বিলাতী বস্ত্রের মন ৬৩ টাকা। প্রতি ২০ টাকার তুলায় প্রায় ৪০ টাকা বৈদেশিক শিল্পীর মজুরী ও মহাজনদিগের লাভ। সুতরাং বাৎসরিক ২৫ কোটি টাকার কাপড় আমদানিতে এদেশে প্রায় ১৭ কোটি টাকার ধনোৎপত্তি কমিতেছে। যদি এমনও মনে করা যায় যে, অন্যান্য শিল্পনাশে ভারতের যত লোকসান হয় তাহা ইংরাজ মূলধনীদিগের আয়ে পোষাইয়া যাইতেছে, তথাপি বিলাতের খরচ যোগানয়, বৈদেশিক ঋণে ও দেশীয় শিল্পনাশে বৎসরে ৫৪।৫৫ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত হিসাবে এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান দেশে কৃষিজীবীর পরিমাণ কিরূপ হইয়া থাকে তাহা দেখিলে ভারতবর্ষের শিল্পনাশের ফল আরও সুস্পষ্ট হইবে। শিল্পপ্রধান ও সুসমৃদ্ধ দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যধিক হয় না। ইংলণ্ডের কর্ম্মণ্য লোকদিগের মধ্যে শতকরা ১৩ জন কৃষিজীবী ; স্কটলণ্ডের ১৭ জন, আয়র্লণ্ডের ৪৩ জন, ইটালিতে ৪৪ জন, ফ্রান্সে ৪৬ জন, গ্রীসে ৪৯ জন, মার্কিণদেশে ৪৪ জন। সমস্ত ভারতবর্ষ-ব্যাপক আদমসুমারী তিনবার গৃহীত হইয়াছে, প্রথমবার ১৮৭১ অব্দে, দ্বিতীয়বার ১৮৮১ অব্দে ও তৃতীয়বার ১৮৯১ অব্দে। প্রথমবারের গণনার উপর নির্ভর করিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশন ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের জনগণের ব্যবসায়ানুযায়ী সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ অবধারণ করেন।

কৃষি ও পাশুপাল্যজীবী	শতকরা	৫৬ জন
বণিক্, মজুর ও শিল্পী	"	৩৪ জন
চাকরী ও উচ্চব্যবসায়ী	"	১০ জন

১৮৮১ অব্দের গণনা হইতে দেখা যায়—

কৃষি ও পশুপাল্যজীবী	শতকরা	৬০ জন
বণিক্, মজুর ও শিল্পী	"	৩১.৫ জন
চাকরী ও উচ্চব্যবসায়ী	"	৮.৫ জন

১৮৯১ * অব্দের গণনা হইতে দেখা যায়—

* (১) কৃষিতে ৫৯.৮ এবং পাশুপাল্যে ১.২।

(২) বাণিজ্যে শতকরা ২.৯, ইহার মধ্যে মাল ও সংবাদাদি বহন কার্য্যে অর্থাৎ রেল, নৌকা প্রভৃতিতে ১.৪, শিল্পে শতকরা ১৫.৪, ইহার মধ্যে আহার্য্য দ্রব্যের

কৃষি ও গাশুপাল্যজীবী	শতকরা	৬১ জন
বণিক্, মজুর ও শিল্পী	„	৩৩ জন
চাকরী ও উচ্চব্যবসায়ী	„	৬ জন

পর পর আদমসুমারীতে মজুরদারদিগের সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান হইলে কৃষিজীবীর পরিমাণ যে আরও অধিক তাহা সহজেই দেখা যাইবে। যাহা হউক উপরি লিখিত বিবরণগুলি হইতেই বোধ হয় যে (১) ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর পরিমাণ অন্যান্য সুস্থাবস্থ দেশের অপেক্ষা অধিক, (২) বৈদেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় এখানকার অনেকানেক লোক স্ব স্ব ব্যবসায়চ্যুত হইয়া কৃষিকার্য্যের উপর যাইয়া পড়িতেছে এবং কৃষিকার্য্যই ভারতবাসীর একমাত্র অবলম্বন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা। ইহাই বৈদেশিক অধিকারের ফল। এই মহানিষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই সুদূরদর্শী এবং উদারমতি ইংরাজ শাস্তৃগণ কেহ বা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, কেহ বা স্বদেশীয় বিদ্যাদানের, কেহ বা স্বায়ত্তশাসন-শক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। সে সকল উপায় একান্ত নিষ্ফল হয় নাই—কিন্তু পর্য্যাপ্তও হয় নাই। এখনও সমাজের উপরিভাগ নামিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের যে এতদূর দারিদ্র্য হইয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরাজরাজের তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত ছিল না। ভারতবর্ষকে সোণার গাছ বলিয়াই সকলের বোধ ছিল। এখনও যে ইংরাজ মাত্রেই এই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু যখন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যের অবগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, * তখন কালে দেশের পরিচালন এরূপে

প্রস্তুত করণে অর্থাৎ মাছধরা, ধান ভানা, মুড়ি ভাজা ইত্যাদিতে ৫, সাধারণ মজুরীতে [মাটিকাটা প্রভৃতি] শতকরা ৮.৯, গৃহস্থের চাকরীতে [ধোপা নাপিত চাকর চাকরাণী ইত্যাদি] শতকরা ৩.৯, অজ্ঞাত বা কুব্যবসায়ে ২.৯।

(৩) সরকারী চাকরীতে শতকরা ২.৪, উচ্চ ব্যবসায়ে শতকরা ২, যাহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না শতকরা ১.৬—ইহাদের মধ্যে .৬ পেন্সন ভোগী, অবশিষ্টের কতক সম্পত্তিশালী এবং কতক ভিক্ষোপজীবী বা দানগ্রহণে প্রতিপালিত।

* ইংরাজরাজের মনে যে দেশের প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি হইতেছে তাহা দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রদত্ত সদুপদেশ হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

কমিশনের প্রধান কথা এই—

পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা, যাহাতে ইহার দারিদ্র্যদশা আরও বর্দ্ধিত না হয়; প্রত্যুত ভারতবাসীর এমন সচ্ছল অবস্থা হয় যে, এদেশে জন্মিতে পারে না এমন শিল্পজাত দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়া এখনকার অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে ভারতবাসীর দ্বারা ক্রীত হইতে পারে।

স্বদেশীয় কাহারও কাহারও মনে এমন একটা ভ্রম আছে যে, এই দেশে ধনবিভাগের বৈষম্য নিবন্ধন ক্লেশ হয়। বস্তুগত্যা তাহা নহে। ইউরোপ এবং আমেরিকাতে লোকের যে প্রকার ভয়ানক ধনবৈষম্য জন্মিয়াছে, এখানে তাহার লক্ষাংশের একাংশও হয় নাই, হইতে পারেই না। এখানে উপরের স্তর সকল ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িতেছে এবং ভারতবাসী সকল লোক ক্রমে এক-সা হইয়া যাইতেছে।

পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, লক্ষ টাকার অধিক আয়-বিশিষ্ট বড়মানুষ বাঙ্গালার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার ও বোম্বাইয়ের সওদাগর ও জাইগীরদারদিগের মধ্যেই যাহা কিছু আছে, অন্যান্য প্রদেশে নাই বলিলেই চলে। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বড় বড় হৌসওয়ালা বৈদেশিক সওদাগরেরাও ঐ মোট ৮৩৬ এর মধ্যেই আছেন।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের তৎকালীন ১৯ কোটি প্রজা-সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, শতকরা '৩ জনের ৫০০ বা তদধিক টাকা বার্ষিক আয় এবং শতকরা '৫৩৬ জনের আয় ২০৯ টাকার অনূ্যন। *

---

(১) ভারতবাসীর শিল্পবিদ্যায় সম্বর্দ্ধন করা উচিত।

(২) গবর্ণমেণ্ট এই দেশ হইতে যে যে বস্তু ক্রয় করিতে পারেন ইংলণ্ড হইতে তাহার আনয়ন না করাই কর্ত্তব্য।

(৩) দেশীয়েরা কোন শিল্পালয় স্থাপিত করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রার্থনানুসারে সুশিক্ষিত শিল্পী প্রভৃতি আনয়নের এবং সাক্ষাৎ অর্থসাহায্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল প্রকারের আনুকূল্য করিবেন।

এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য কথাসকলের আন্দোলনে দেশের দারিদ্র্যদোষ-বৃদ্ধি ক্রমশঃ স্থগিত হইতেও পারে।

* এখনকার আয়করের বিজ্ঞাপনী হইতে সর্ব্বপ্রকার আয়ের ঠিকানা হয় না। পথকরের খাসমহলের ও আয়করের কাগজ হইতে যদি অন্ততঃ ২০ বৎসর অন্তর

১৮৭২ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতের আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় যে বিজ্ঞাপনী দাখিল হইয়াছিল তাহা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কত আয়ের কত লোক আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রদেশ	৫০০৲ হইতে ১০০০এর ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা	১০০০ হইতে ২০০০এর ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা	২০০০ হইতে ১০০০০এর ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা	১০০০০ হইতে ১ লক্ষের ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা	১ লক্ষের অধিক আয়ের লোকসংখ্যা	৫০০ টাকা ও তদধিক আয়বানের সমষ্টি	২০০ টাকার অন্যূন আয়বান সঃ কঃ সমেত
বাঙ্গালা	১৪২৯৪৭	২৬২০০	১৬৬৯১	২১০৮	১৮০	১৮৮৫২৬	২৭৮৪৮২
মান্দ্রাজ	৪৬০৩৯	৯৩৯৮	৪৮২০	৪১৫	২২	৬০৬৯৪	১৩৯৫২৯
বোম্বাই	৭৯৩৭১	৩৭১২৭	১৪৭৪৯	১৪৫৬	২০৮	১৩২৯১১	২১৮৯৬৮
উঃ পঃ প্রদেশ	৫৪১৪৩	১২৩৫৯	৭১০৭	৮৩৮	২১	৭৪৪৬৮	২০০৪৯৩
অযোধ্যা	৭১৫৯	১৪৭৫	৯৯৮	৪৩৪	৩৮৬	১০৪৫২	৪৪২৩৮
পঞ্জাব	২৫২২৯	৫২৮০	২০৩১	১৫৮	২	৩২৭০০	৭৬০৩৪
ব্রহ্মদেশ	৭৫০৫	১১৯১	- ৫৬৯	২৭৯	১০	৯৫৫৪	৩৩১০২
মধ্য প্রদেশ	৮০৩৫	২৫৭৮	১৪,৫	১৫৪	৭	১২১৮৯	২৬১৯২
৫০০ টাকার অন্যূন আয়ের সঃ কঃ (= সরকার কর্ম্মচারী)	———	———	———	———	——	৫৯৫৬৮	————
	৩৭০৪২৮	৯৫৬০৮	৪৮৩০০	৬২৪২	৮৩৬	৫৮০০৬২	১০১৭০৩৮

ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌ এবং স্কটলণ্ডের মোট প্রজাসংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ। উহাদিগের মধ্যে ১৪ লক্ষের বার্ষিক আয় ১৫০ পৌণ্ড বা তদধিক। অর্থাৎ শতকরা ৫ জনের বার্ষিক আয় ১৫০০ (এখনকার হিসাবে ২৩০০) টাকার অন্যূন। এই সকলের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক এরূপ অতুল আয়বান যে গড়পড়তায় দেশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ই ৫৪০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, ইংলণ্ডের মধ্যে যাহারা সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে আছে তাহারা, ইউরোপে দান ও আত্মীয়প্রতিপালন-ধর্ম্মের প্রভাব না থাকায় এবং শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু, এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা গরীবদিগের অপেক্ষাও অধিক দুঃখভাগী। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে প্রতি ৩১ জনের মধ্যে এক জনকে দরিদ্রাবাসে খাটিয়া খাইতে হয়। এবং ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক আছে তাহার মধ্যে শতকরা ৩৮ জনকে শেষ দশায় ঐ স্থলে গিয়া পড়িতে হয়।

ফলতঃ ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জন্মিয়াছে এখানে তাহার নামগন্ধও নাই। অতএব জমিদার বা উকিল অথবা মহাজন ইহারাই দেশের সকল টাকা উদরসাৎ করিতেছে, কৃষক এবং শিল্পীরা সেই জন্যই নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে নাই। ওরূপ কথা বলিলে কেবল ইউরোপ সম্বন্ধে একটি সত্য কথার নিতান্ত মিথ্যা জল্পনা করা হইবে, গৃহের ছিদ্র আরও বিস্তৃত হইবে, সম্মিলন হইবার উপায় আরও ন্যূন হইয়া যাইবে এবং শত্রু হাসিবে মাত্র।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা

(জৈবনিক অবস্থা বিষয়ক)

কোন দেশের লোক সমধিক নির্ধন হইলে সেই দেশে অনেকানেক দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তদ্দেশবাসীদিগের জৈবনিক অবস্থা সম্পৃক্ত কোন দুর্লক্ষণ যদি জন্মিয়া থাকে, সেগুলি বিশেষ সাবধানতা পূর্ব্বক লক্ষ্য করা আবশ্যক। দেশের দরিদ্রতা অতিবর্দ্ধিত হইলে (১) দেশবাসীদিগের খাদ্যপরিমাণ ন্যূন হয়, এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রকৃতি অপকৃষ্ট হয় (২) সন্তানোৎপত্তি অল্প বা দুর্ব্বল সন্তান উৎপন্ন হয় এবং লোকের আয়ুষ্কাল স্বল্প হইয়া পড়ে।

মহাসভায় দাখিল করিবার জন্য সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হয় এবং ইউরোপীয় ও এদেশীয়দিগের বিবরণ পৃথক তালিকায় দেখান হয় তবেই দেশীয়দিগের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সকলে সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারেন।

এই সকল বিষয়ে ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে হইলে ভারতবাসীর বিভিন্ন সময়ের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ 'ন্যূনতা,' 'অপকর্ষ,' 'স্বল্পতা' প্রভৃতি শব্দগুলি সাপেক্ষ শব্দ। কোন কিছু 'ন্যূন' বা 'অপকৃষ্ট' বা 'স্বল্প' বলিলে, কাহার অপেক্ষা ন্যূন বা অপকৃষ্ট বা স্বল্প এই প্রশ্ন সহজেই উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা তুলনা করিয়া বুঝিবার কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। মনে কর, প্রশ্ন হইল, এখন ভারতবাসী দীর্ঘায়ু হইতেছে অথবা স্বল্পায়ু হইতেছে। ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, ঐ অব্দে সমস্ত ভারতবর্ষে ষাইট বৎসর এবং তাহার অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৪৮ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ জন। ভারতবর্ষের পক্ষে বৃদ্ধ লোকের এই পরিমাণ অল্প বা অধিক হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে, ভূতপূর্ব্ব কোন সময়ে ৬০ বৎসর এবং তদধিক বয়স্ক শতকরা কত লোক ছিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। আকবর বাদশাহের সময়ে, কি বিক্রমাদিত্যের সময়ে, কি সম্রাট অশোকের সময়ে, ভারতবর্ষে কত লোক ছিল এবং তন্মধ্যে কত বৃদ্ধ লোক বাঁচিয়া ছিল, তাহা কেহই বলিতে বা অনুমান করিতেও পারেন না। উহা অপেক্ষা স্থূল আর একটা কথা লইয়াই দেখ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দুর্ভিক্ষ পীড়া এখন অধিক হইতেছে, না পূর্ব্বকালের সমানই আছে, না কমিয়াছে, তাহা হইলে কোন কথাই দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানের অধিকার কালেও দুর্ভিক্ষ হইত, এখনও হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে কতকাল অন্তর হইত, কত সময় ব্যাপিয়া থাকিত এবং কতদূর প্রসারিত হইত, তাহার কোন নির্ণয় নাই। এই মাত্র অনুমান করিতে পারা যায় যে, এখনকার দুর্ভিক্ষ যেমন প্রায় লাগিয়াই রহিয়াছে, অথবা এক বৎসর বা দুই বৎসর অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলেই ঘটিতেছে, পূর্ব্বে তেমন শীঘ্র শীঘ্র হইত না। কিন্তু ঐ কথাটিও অনুমান মাত্র। যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে সকল দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইত না, তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায়, এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নাই।

উল্লিখিত দুইটি উদাহরণ দ্বারা অবশ্যই বোধ হইবে যে, পূর্ব্বগত কোন কালের সহিত তুলনা করিয়া ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থাকে ভাল অথবা মন্দ বলিতে পারিবার প্রকৃত পথ নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও এখন ভারতবাসীর জৈবনিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা জানিবার অনেকটা উপায় হইতেছে এবং তাহা জানাতেই বিশেষ ফল।

ভারতবাসীর খাদ্যপরিমাণ ন্যূন হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে লোকে যত খাইতে পারিত এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইরূপ বিশ্বাস। এখনকার দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, যাঁহারা তাহার দুই একটির হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে লোক খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক খাওয়াতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না। প্রসিদ্ধ দেবসেবাগুলির পূর্ব্বকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল তাহা দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বসনীয় অপর এক প্রমাণ আছে। এখনকার জেলের কয়েদীদিগের নিমিত্ত ইংরাজ ডাক্তারেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, তণ্ডুল এবং দাইল-এবং মৎস্যাদি উপকরণ সমস্তে প্রতি ব্যক্তির অন্ততঃ এক সের এক পুয়া দুই ছটাক দুই তোলা খাদ্য পাওয়া আবশ্যক। যাহারা তণ্ডুল খায় না, আটা খায়, তাহাদেরও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে এক সের দুই ছটাক দুই তোলা খাদ্য পাওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত পরিমাণের ন্যূন হইলে কয়েদীর শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া হিসাব করিলে প্রতি ব্যক্তির খোরাকী খরচ মাসিক ৪৲ টাকার ন্যূন হয় না। কিন্তু ইহা বাজারদর। কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে অনেক জিনিস বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয় না এবং বিক্রেতাকে লাভ দিতে হয় না। এজন্য সাধারণের পক্ষে খোরাকী খরচ গড়ে ৩৲ ধরা যায়। কিন্তু এই খোরাকী পূর্ণবয়া লোকের জন্যই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা অল্পবয়স্ক অথবা বৃদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে ঐ পরিমাণ খোরাকীর প্রয়োজন হয় না। ২২ কোটি ব্রিটিশ ভারতবাসীর মধ্যে পূর্ণ-বয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসর হইতে ৫৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১২ কোটি; তাহার মধ্যে ৬ কোটি পুরুষ, ৬ কোটি স্ত্রীলোক। পুরুষ ৬ কোটির খোরাকী খরচ ডাক্তারদিগের উপদিষ্ট হিসাবে ধরিলে ৬×৩৬= ২১৬ কোটি টাকা হয়। এবং ৬ কোটি স্ত্রীলোকের খোরাকী উহার চতুর্থাংশ ন্যূন ধরিলে ৬×২৭=১৬২ কোটি টাকা হয়। অতএব উভয়ের খোরাকীতে (২১৬+১৬২=) ৩৭৮ কোটি টাকা পড়ে। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের খোরাকী যদি গড়পড়তায় পূর্ণবয়স্কদিগের একতৃতীয়াংশ হয় বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ খোরাকীতেও বার্ষিক ১০×১২=১২০ কোটি টাকা পড়ে। অতএব সমুদায় ভারতবাসীর বার্ষিক খোরাকী খরচ ডাক্তারদের মতানুসারে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী হইতে হইলে ৪৯৮ কোটি টাকা হয়। কিন্তু সমস্ত ব্রিটিশভারতবাসীর রোজগার

২৭×২২=৫৯৪ কোটি টাকার অধিক বলিয়া কেহই মনে করেন না। উহারই ভিতর হইতে রাজস্ব দান করিতে হয়। অতএব ভারতবাসীর খাদ্য যে, এত ন্যূন হইয়া আছে যে, তদ্দ্বারা শরীর সবল বা সুস্থ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে জেলের খোরাকী ডাক্তার সাহেবদিগের উপদেশানুযায়ী হয় না। কিন্তু যাহা হয় তাহাও জেলের বহিঃস্থিত প্রজাসাধারণের অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কেহ কেহ স্পষ্টাভিধানেই বলিয়াছেন যে, অন্যূন পাঁচ কোটি ভারতবাসী অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করে।

ভারতবাসীর খাদ্য অবশ্যই অপকৃষ্ট হইয়াছে। খরচের অনটন হওয়াতে লোকে আহারে ন্যূনতা করিতে বাধ্য হইলে, তাহার পূর্ব্ব হইতেই আহারের অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্যসামগ্রী শস্যজাতের মধ্যে গোধূম, যব এবং চাউল ছিল। শাস্ত্রে ঐ তিনটি শস্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এখনকার কয়েকটি নূতন এবং প্রধান ভক্ষ্যশস্যের নাম বাজরা, মকাই, চিনে, জোয়ারি। ঐ গুলির নাম কোন সুপ্রচলিত সংস্কৃত পুস্তকে নাই। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে উহাদের এরূপ প্রাধান্য ছিল না। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশে গোধূমের ব্যবহারই সমধিক ছিল, এখন সেই সকল স্থানে তণ্ডুল বাড়িয়াছে এবং বাজরাদি শস্যের বৃদ্ধি অপরিসীম হইয়াছে। এইটি সাধারণ সংস্কার। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত (১৮৯১-৯২ অব্দের) বিবিধ বিজ্ঞাপনী হইতেও জানা যায় যে, বঙ্গবিভাগ ছাড়িয়া ধরিলে এখন বাজরা প্রভৃতি খাদ্যশস্য ২৩ কোটি বিঘায়, গোধূম ৫॥০ কোটি বিঘায় এবং ধান্যের চাষ ৮ কোটি বিঘায় হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে চাউলের রপ্তানি ১২ কোটি টাকার হইতেছে, গোধূম ৭॥০ কোটি টাকার, বাজরাদিগরের রপ্তানি নাই, দাইল ৩০ লক্ষ টাকার যায়। অতএব ভারতবাসী অপরাপরদেশবাসীদিগের নিমিত্ত যথেষ্ট গোধূম এবং তণ্ডুল পাঠাইয়া দিয়া আপনারা অধিকাংশই বাজরাদিগর খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রতিবর্ষে যত গোধূমের রপ্তানি হয় প্রায় তত পরিমাণেই বাজরা মকাই প্রভৃতি তথায় আমদানি হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড সালিসবরী সাহেবও বলিয়াছেন যে, ভারতবাসী বাজরাদিগর খাইয়াই থাকিতে পারে, অতএব ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গোধূমের আমদানি প্রসারিত হউক।

লোকের আহার যথোচিত না হইলে তাহাদের উৎপন্ন সন্তানের জীবনরক্ষা ভাল হয় না। কোন বিচক্ষণ ইংরাজ এই তথ্যের স্মরণ করিয়া এদেশে দুর্ভিক্ষের

নিরূপণ করতঃ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে সন্তানোৎপত্তির হ্রাস বা অধিক শিশুর মৃত্যু হইতেছে দেখিলেই অনুভব করিতে হয় যে, তথায় খাদ্যসামগ্রী দুর্মূল্য হইয়াছে, এবং সত্বরেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। বাস্তবিক আহার গ্রহণ এবং সন্তানোৎপাদন এই দুইটি ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই আছে। উদ্ভিজ্জদিগের চাষে দেখা যায়, যদি মৃত্তিকায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সার না পড়ে, তবে গাছ সতেজ হইয়া উঠে না। এই কথা উদ্ভিজ্জের পক্ষেও যেমন খাটে, অপরাপর সকল জীব এবং মনুষ্যের পক্ষেও তেমনি খাটে।

এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে সন্তানের উৎপত্তি এবং রক্ষা কি পরিমাণে হইতেছে। ইংরাজদিগের দেশে প্রতিবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি শতকরা ১'০০। যদি আয়র্লণ্ডে প্রজার স্বদেশত্যাগাদি জন্য বৎসর বৎসর সংখ্যা হ্রাস না হইত তবে প্রায় ২ হইত। ফ্রান্সের প্রজাবৃদ্ধি '৩, জর্ম্মনির ১'১, অস্ট্রিয়ার '৭, বেলজিয়মের ১'১ (বেলজিয়মই ইউরোপের মধ্যে অতি নিবিড়-প্রজ), ডেনমার্কের ১, ইটালীর '৬, স্পেনের '৩, পোর্টুগালের ১'১। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাইয়ে '৮, বঙ্গবিভাগে '৭, মান্দ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ ও পঞ্জাবে '৬ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে '৩। সমুদায় ভারতবর্ষের পক্ষে '৬ ধরা যাইতে পারে।

যে সকল প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে ১৮৮১ অব্দের এবং ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারি গ্রহণে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে প্রজাবৃদ্ধির স্বল্পতার কোন হেতুই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু প্রায় সকলেই এদেশের বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন। ভারতবাসীর যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটে, তাহা ভারতবাসীর দোষেই ঘটে, এরূপ ভাবিয়া লইতে ইচ্ছা হওয়া অসঙ্গত নয়। এরূপ ইচ্ছার বশীভূত না হইলে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও কেন এমন অপ্রকৃত স্থলে দোষারোপ করিতে যাইবেন?

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বৈবাহিক প্রণালীর তেমন কোন গুরুতর দোষই নাই। (১) এখানে বৈবাহিক সম্বন্ধের অল্পতা নাই, এখানে গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেই বিবাহ করে। ইউরোপের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী নরওয়ে সুইডেন দেশে স্ত্রীজাতীয়দিগের মধ্যে প্রতি শতে ৬০'৮ অবিবাহিতা, ৩১'৮ বিবাহিতা এবং ৭'৪ বিধবা থাকে। ইংলণ্ডে ৫৯'২ অবিবাহিতা, ৩৩'৩ বিবাহিতা এবং ৭'৫ বিধবা। ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী গ্রীসদেশে স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৫৪'৩ অবিবাহিতা, ৩৪'৭ বিবাহিতা এবং ১১ বিধবা থাকে। হাঙ্গেরীতে অবিবাহিতা ৪৯'৫, বিবাহিতা ৪০'৫, বিধবা ১০। ভারতবর্ষে অবিবাহিতা ৩৩'৪, বিবাহিতা ৪৮'৮ এবং বিধবা

১৭'৮। অতএব স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বিবাহিতার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, রোগিণী ভিন্ন দেশের সকল স্ত্রীলোকেরই উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ হওয়া উচিত। অতএব ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে ঐ বৈজ্ঞানিক নীতিরই অধিক সুপালন হয়, তাহা অক্ষতপাতী ইউরোপীয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী লেখক একটি ইংরাজও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে সধবার সংখ্যা শতকরা ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক। অতএব ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষের বৈবাহিক প্রথা উৎকৃষ্টতর এবং প্রজাবৃদ্ধির অনুকূল।

(২) আদমসুমারির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এদেশের প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রথার প্রতিকূলে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। যুক্তির মধ্যে এইমাত্র বুঝা যায় যে, এখানকার বিবাহরীতি ইংলণ্ডের রীতির সহিত মিলে না! কিন্তু এ বিষয়েও বিজ্ঞানের মত লওয়া যাইতে পারে। উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ প্রতি দম্পতীর ন্যূনকল্পে চারিটি করিয়া সন্তান হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে বংশ থাকে না, কারণ যত সন্তান জন্মে গড়ে তাহার অর্দ্ধেক অপূর্ণাবস্থাতেই মারা গিয়া থাকে। চারিটি সন্তানের জন্মলাভে এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় মাতার পালনে দশ বার বৎসর কাল লাগে। সুতরাং যদি দেশভেদে আয়ুষ্মত্তার ভেদ হয়, অর্থাৎ কোন দেশের লোক অধিক কাল বাঁচে আর কাহারাও বা অল্প কাল বাঁচে এমত হয়, তবে যে দেশের লোকের আয়ুষ্মত্তার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের সহিত বৈবাহিক বয়সেরও একটি নিত্যসম্বদ্ধ হইয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনাপন সাহজিক সংস্কারের প্রভাবেই ঐ বৈবাহিক কালের অবধারণ করিয়া লইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নরওয়ে সুইডেনে লোকের আয়ুষ্মত্তা গড়ে ৪২ বৎসর, ঐ দেশের বৈবাহিক বয়স ৩০ বৎসর। ইংলণ্ডে আয়ুষ্মত্তা ৩৫ বৎসর, ওখানে বৈবাহিক বয়স ২১ বৎসর। ফ্রান্সে আয়ুষ্মত্তা ৩০ বৎসর, বৈবাহিক বয়স ১৯ বৎসর। ইটালী এবং গ্রীসে আয়ুষ্মত্তা ২৮ বৎসর, বৈবাহিক বয়স ১৬ বৎসর। ভারতবর্ষে আয়ুষ্মত্তা ২৫ বৎসর, এখানকার প্রকৃত বৈবাহিক (দ্বিরাগমনের) বয়স ১৩ বৎসর। অতএব ভারতবাসীর বৈবাহিক বয়সের নিয়ম, অন্যান্য জাতীয়দিগের নিয়মের ন্যায় সাহজিক সংস্কার হইতে সমুত্থিত এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত।

(৩) আদমসুমারির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আর একটি কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ

করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে বৈবাহিক বয়োবৈষম্য অধিক, অর্থাৎ এখানে পুরুষের বয়স খুব বেশী এবং স্ত্রীর বয়স খুব কম হয়। কিন্তু তাঁহারা এই ব্যবস্থার কোন বিশেষ দোষের উল্লেখ করেন নাই। এই মাত্র আন্দাজ করিয়াছেন যে, ঐ কারণে এ দেশে পুত্রসন্তান অধিক এবং কন্যাসন্তান অল্প হয়। কিন্তু ইংলণ্ডেও পুত্রসন্তান অধিক জন্মে; তথায় জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টরী সঠিক হয় এবং জানা গিয়াছে যে শতকরা ৩·৭ টি পুত্রসন্তান অধিক জন্মে অথচ পুত্রসন্তানের শৈশবে অধিক পরিমাণে মৃত্যু, পুরুষদিগের বিদেশযাত্রা প্রভৃতি কারণে ইংলণ্ডে পুরুষের সংখ্যা হাজারকরা ৫১টি কম। ভারতবাসীর মধ্যে যে পুরুষের সংখ্যা তেমন অধিক এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা তেমন অল্প, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে। আদমসুমারিতে সকল স্ত্রীলোকের সংখ্যা না হওয়াই ঐ সংখ্যাবৈষম্যের প্রধান কারণ। ১৮৭১ সালের আদমসুমারিতে যত বৈষম্য দেখা গিয়াছিল ১৮৮১ সালে তত দেখা যায় নাই, ১৮৯১ অব্দে তদপেক্ষাও কম। ইউরোপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান গ্রীস এবং ইটালীর আদমসুমারিতেও ওরূপ অল্পপরিমাণ ইতরবিশেষ দেখা যায়; এখানেও সেইরূপ, তাহার অধিক নহে। মোট অধিবাসীর সংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা জর্ম্মনিতে শতকরা ৪৮·৭, স্পেনে ৪৯·৩, ইটালীতে ৫০·, গ্রীসে ৫১·৭, ভারতবর্ষে ৫০·৮ দেখা যায়;

(৪) যাঁহারা ভারতবাসীর বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি দোষারোপ পূর্ব্বক তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত দুরবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা যে এখানকার বিধবা বিবাহ প্রতিষেধের উল্লেখ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিন্দাবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রদেশভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে বিধবা-বিবাহ প্রচলৎ আছে। দ্বিতীয়তঃ, আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী হইতেই দেখা যায় যে, বিধবার সংখ্যা হিন্দু স্ত্রীজাতীয়ার মধ্যে শতকরা ১৭, মুসলমানের ১৫, জৈনের ২১·৪, খ্রীষ্টানের ১২·৪ এবং আদিমদিগের ১০·৭; অতএব দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহের কোন শাস্ত্রীয় প্রতিষেধ না থাকিলেও ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এদেশে বিধবার বিবাহ অধিক দেন না। আদমসুমারির বিজ্ঞাপকেরা এই তথ্যের সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, এখানে হিন্দুই অধিকসংখ্যক এবং প্রবল; এইজন্য এ দেশে আর সকলে হিন্দুরই অনুকরণ করে, এবং তাহা করিবার ইচ্ছাতে স্বধর্ম্মাবলম্বী বিধবাদিগের বিবাহ দেয় না। এ কথা নিতান্ত অমূলক নয়। অমূলক কি, ইহাই

সমস্ত ভারতবাসীর এক-সামাজিকতার মূলসূত্র। ভারতবর্ষে হিন্দুরই সম্যক্ প্রাধান্য এবং স্থূলতঃ ভারতবর্ষে বিধবার বিবাহ স্বল্পসংখ্যক হইবার সাহজিক কারণই আছে। গ্রীস এবং ইটালী প্রভৃতি দেশ ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী, সুতরাং অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম-প্রধান। ঐ দেশগুলিতে বিধবার সংখ্যা ইউরোপের শীত-প্রধান ভাগগুলির অপেক্ষা অনেক অধিক। ও সকল দেশে ত হিন্দু প্রবল এবং অনুকরণীয় হয় নাই! গ্রীস এবং ইটালীতে বিধবার সংখ্যা শতকরা ১২ এবং নরওয়ে সুইডেনে ৩ মাত্র। যদি তুরস্ক, মিসর, পারস্য প্রভৃতি দেশের তেমন আদমসুমারি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিধবা-সংখ্যার সহিত (শতকরা ১৮.৭ সহিত) মিলিয়া যাইত বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যৌব-ধর্ম্মের হ্রাস শীঘ্র হয়—এই মুখ্য কারণেই ঐ সকল দেশে বিধবার সংখ্যা অধিক থাকিয়া যায়।

(৫) আদমসুমারির বিজ্ঞাপনীতে বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ক কথার মধ্যে বহুবিবাহের অতি সামান্যরূপ উল্লেখ আছে। কারণ এখন আর ভারতবর্ষে বহুবিবাহের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। বিবাহিত পুরুষের যে সংখ্যা তাহাদের পত্নীসংখ্যা তাহা অপেক্ষা ৩ লক্ষ মাত্র অধিক অর্থাৎ শতকরা .৫৪। তন্মধ্যে হিন্দু স্ত্রীর আধিক্য শতকরা .৩; মুসলমানের ১.৯ এবং আদিমদিগের .০৩। বাস্তবিক বহুবিবাহ ব্যাপারটি কখনই কোন দেশে সমধিক পরিমাণে প্রবল হইতে পারে না। প্রাচীন রোমীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ, জর্ম্মনদিগের, ভারতবাসীদিগের এবং মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে। প্রভুতাশালী ধনী এবং বিজেতৃভাবসম্পন্ন লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে সকলদেশেই একাধিক দারপরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বহুবিবাহের রীতি একমাত্র বিশিষ্ট রূপে বিজেতৃধর্ম্মী মুসলমান ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে তেমন প্রচলিত হয় নাই।

অতএব প্রকৃত দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারিলে, ভারতবাসীর বৈবাহিক প্রণালীতে এমন কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধির অল্পতার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে। কম হইবার কারণ, সন্তানজনন-শক্তিরহ্রাস নহে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রতিবর্ষে এই বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যেই ৩০ লক্ষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ কথা হইতে অনুমান করিয়া সমুদায় ভারতবর্ষে ৮০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৪টি সন্তান জন্মে ধরা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ইহা হইতে কিছু ন্যূন পরিমাণই সন্তান জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এখানে উৎপত্তির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক

হইয়াও প্রজার বৃদ্ধি কম হয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষজাত সন্তানগুলির শৈশবে মৃত্যুর পরিমাণ অতি বিসদৃশই হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সুভিক্ষের বর্ষে ভারতবর্ষীয় বৈবাহিক প্রণালীর গুণে সন্তানোৎপত্তি এখনও কম হয় না। কিন্তু শিশু-মৃত্যু এত অধিক হইতেছে যে, তন্নিবন্ধন সমস্ত লোকের আয়ুর গড়পড়তা অর্থাৎ দেশের সাধারণ আয়ুষ্কাল পঞ্চবিংশতি বর্ষের অনধিক।*

ভারতবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইবার কারণ বৈবাহিক সম্বন্ধের অল্পতা নয়, লোকসকলের অবৈধ আচরণের আধিক্য নয়, জননশক্তির হ্রাস নয়, ইহার কারণ একমাত্র দরিদ্রতা ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। যদি এখানকার বৈবাহিক রীতি ইউরোপীয় দেশগুলির রীতির ন্যায় হইত, অর্থাৎ ঐ রীতি অল্প মাত্রায় পালিত, তুচ্ছীকৃত এবং অসাময়িক হইত, তাহা হইলে এত দিনে ভারত নিতান্ত স্বল্পপ্রজ হইয়া ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশযোগ্য হইয়া পড়িত। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, কোন দেশে আহার্য্যোৎপত্তি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইয়া গেলে তথায় আর প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন জন্ম মৃত্যুর পরিমাণ এক হারে হইয়া প্রজার সংখ্যা স্থির থাকে। আজও ভূমণ্ডলের কোন দেশই ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভূমি এত উর্ব্বরা এবং উহাতে সর্ব্বত্রই এত অনাবাদী ভূমি পতিত আছে যে, ভারতবর্ষে প্রজাসংখ্যার পূর্ণতা নিকটবর্ত্তী হওয়াতেই প্রজাবৃদ্ধির হার ন্যূন হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখানকার আদমসুমারির সমুদায় কাগজপত্র আলোচনা করিয়া একজন সুতীক্ষ্নদৃষ্টি ইংলণ্ডবাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন, "মধ্যে মধ্যে দুর্ভাগ্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের উপর এমন প্রবল প্রতিযোগিতার ভার পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য দেশবাসিগণের পুরুষে পুরুষে আহার্য্য কমিয়া যাইতেছে এবং উৎপন্ন প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।"

ভবিষ্যবিচার—তাহার উপসংহার

ভারতসমাজের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহার অনুমান করিতে গিয়া দৃষ্ট হইয়াছে যে, (১) পণ্ডিতপ্রবর অগস্ট কোমটি মানবজাতি-সাধারণের ভাবী ধর্ম্ম এবং শাসনাদি সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই মত সর্ব্ববাদিগ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং (২) ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবতৃদলের অনুযায়ী পরিণামবাদ

* বাঙ্গালায় ২৩ বৎসর মাত্র। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও পঞ্জাবে ২৬এর কিছু অধিক।

স্বীকৃত হইয়া এখানকার সমাজের প্রকৃতি সম্যক্ ভাবান্তরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, (৩) ইউরোপীয়দিগের কর্তৃক ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপনের সম্ভাবনা অতি সুদূরবর্ত্তী কোন ভবিষ্যকালকে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেও করিতে পারে, কিন্তু কি বর্ত্তমান, কি অনতিদূরবর্ত্তী কোন কালের সহিত তাদৃশ ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। দৃষ্ট হইয়াছে যে, ভারতবাসীর (৪) ধর্ম্মজ্ঞান যে উচ্চতম অক্ষয় বস্তু, তাহার বিলোপের কোন শঙ্কাই হইতে পারে না, এবং (৫) ভারতবর্ষ-প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলির সমীকরণ-বৃদ্ধি বিলক্ষণ সম্ভবপর। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসীর (৬) বর্ত্তমান সামাজিক রীতির মূল স্বরূপ জাতিভেদপ্রথা কোন সামান্য কাল্পনিক বস্তু নহে, নৈসর্গিক কারণ হইতেই সম্ভূত ; সুতরাং উহা হঠাৎকারে এবং স্থায়ীরূপে উঠিয়া যাইতে পারে না। পরিশেষে ভারতবাসীর (৭) বর্ত্তমান ধনহীনতা এবং (৮) জীবনক্ষীণতার সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, আমাদিগের অবস্থার প্রতি দেশাধিপতির এবং তজ্জাতীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগের সযত্ন দৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং দেশীয় জনগণের প্রকৃত উদ্যোগ হইলে অধঃপাতের প্রতিবিধান চেষ্টায় সফলতা লাভ হইলেও হইতে পারে।

ইউরোপখণ্ডের ইতিবৃত্ত মাত্র পাঠ করিয়া ঐতিহাসিক পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের যে সকল স্থূল সিদ্ধান্ত হইয়া যায়, সেই সকল সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করিয়া ভারত-সমাজের সংস্কারসাধন চেষ্টা করায় বৈফল্যের এবং অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। সকল দেশের সমাজগঠন প্রণালী একরূপ নহে। ইউরোপীয় সমাজসকল যে প্রকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, আসিয়াখণ্ডের বিভিন্ন সমাজগুলি ঠিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় নাই। আসিয়াখণ্ডে ধর্ম্মশাসনের প্রাবল্য। ইউরোপে বৈষয়িক ভোগবাসনার আতিশয্য। আসিয়াখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তিতিক্ষার শিক্ষা, ইউরোপে স্বার্থ-রক্ষার শিক্ষা এবং অভ্যাস। ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন, যদি একমাত্র জাতিভেদ-প্রথাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখা যায়, তবে চীনীয় জাপানীয় প্রভৃতি আসিয়িক জাতি-দিগের সহিত অধিক মিলে। জাপান এবং চীন যে সম্প্রতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমে ইউরোপীয় জাতিদিগের তুল্যমূল্য হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহার পথ যে ইউরোপীয়দিগের অনুসৃত পথ হইতে ভিন্নরূপ, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। জাপানীয়দিগের সৈন্যবৃদ্ধি এবং যুদ্ধপোতবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। তাহাদের ভূম্যধি-কারীরা স্বেচ্ছাতঃ আপনাদিগের ভূমিসম্পত্তি সমুদায় সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিল এবং আপনারা সম্রাটের বৃত্তিভোগী হইয়া থাকিল। ইউরোপের ইতিহাসে কোথাও এমন ব্যাপারের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। ইউরোপে ভূম্যাধিকারীর বল খর্ব্ব হইয়া

রাজার বল বৃদ্ধি হইতে কত রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং কত কালবিলম্ব হইয়াছে। আবার দেখ, জাপানীয়েরা ইউরোপের শাসন-প্রণালীর প্রকৃতি অবগত হইয়া ইচ্ছা করিল যে; তাহাদের দেশেও ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এই অভিলাষে তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন করিল। তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইল, এবং জাপানে প্রজানির্ব্বাচিত পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইউরোপের কোনও দেশে কি এরূপে শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে? ওখানকার সকল দেশেই পার্লিয়ামেণ্টের উদ্ভাবন, সংস্থাপন এবং বলবর্দ্ধন করিতে অনেক গোলমাল এবং অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন দেখিলাম, একজন বিচক্ষণ ইংরাজ চীনসাম্রাজ্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাটেরা যদিও সর্ব্বতোভাবে নিরঙ্কুশ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তথাপি চীনের শাসনকার্য্য অতি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বকই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, চীনের রাজা এবং প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের শিক্ষা, সংস্কার এবং অভ্যাস এরূপ যে, তাঁহারা একমাত্র প্রজার শুভ সাধনের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া অতি পরিশ্রম সহকারে আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং তদ্বিপরীতাচরণকে অধর্ম্ম জানিয়া তাহার পরিহার করেন। অতএব প্রজার হিতের নিমিত্ত রাজার সৃষ্টি, রাজার হিতের জন্য প্রজার সৃষ্টি নয়, এই তথ্যজ্ঞানের লাভ করিতে ইউরোপখণ্ডে যত বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়াছে, চীনদেশে সেই তথ্যজ্ঞান ধর্ম্মমূলক বলিয়া একেবারে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ ধারণ করিয়া চলে না। সমাজভেদে তাহার রূপান্তরতা ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বিজাতীয়ের অনুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথাও কোন সমাজের সম্যক্ শুভসাধন হইতে পারে না। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি পারিবারিক, সকল ব্যবস্থাই দেশভেদে কিছু কিছু পৃথক হইয়া আছে এবং পৃথক থাকাই ভাল। দেখ, ইউরোপ-খণ্ডে রাজনীতি লইয়া নিরন্তর আন্দোলন চলিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ আন্দোলন চীন এবং জাপানের পক্ষে আবশ্যক হয় নাই। ঐ দুইটি দেশে সেরূপ আন্দোলন না হইয়াও তথায় প্রয়োজনানুরূপ ইউরোপীয় শিল্প ও সমরপ্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে, ভারতবর্ষেও ইউরোপীয় প্রণালীর অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রয়োজনীয় কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া বুঝা হয় নাই; গতানুগতিকতা বশতই ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয় জনগণ ঐ প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আরও দেখ, ইউরোপখণ্ডের সমাজগুলিতে সাম্যভাবের বৃদ্ধি করাই

সমাজোন্নতির বিশিষ্ট পথ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। ওখানকার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গের ক্ষমতা এবং অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছে; আরও ন্যূন করিয়া দেওয়া অনেকানেক রাজনৈতিকের অভিমত। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা, মহারাজা, নবাব, সুবা, জমিদার এবং ব্রাহ্মণাদি স্বসমাজভুক্তদিগের পদমর্য্যাদার এবং গৌরবের লোপ করিতে গেলে নিতান্ত অপথে পদার্পণ হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপে বৈবাহিক বন্ধনটিকে চুক্তির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা পারিবারিক শুভসাধন বলিয়া অনেকে গণ্য করেন। কিন্তু বিবাহকে চুক্তিতে পরিণত করা ভারতবর্ষের সংশোধনকার্য্য না হইয়া নিতান্ত অপুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। কোন্ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই প্রকার নানা সন্দেহের ভঞ্জন হইবে?

কার্য্যপ্রবৃত্তি মানুষের স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রবৃত্তির বলে লোকে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যাবধারণের পূর্ব্বেও কাজ করিতে যায়। সেইজন্য হঠকারিতাও জন্মে। ভারতবর্ষে যে কোন না কোন প্রকার সংস্কারকার্য্যের নিমিত্ত অনেকেই সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন এবং ব্যস্ত ভাবে একটা না একটা কিছু করিতে বা করাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ঐ কার্য্যপ্রবৃত্তিই তাহার অন্যতম মুখ্য কারণ। বস্তুতঃ কর্ত্তব্যবোধ-প্রণোদিত সমাজসংস্কার-কার্য্যেও হঠকারিতার উপস্থিতি হইয়া থাকে। এইজন্য সংস্কারকার্য্যেও ধৈর্য্যাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ভারতসমাজ হীনাবস্থ হইতেছে, ইহার হীনাবস্থা কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি, ইহা নিপুণ হইয়া জানিতে হয়, এবং দেখিতে হয় যে, বর্ত্তমান হীনাবস্থা আরও হীনতর হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং হীনতাবৃদ্ধির অভিমুখ কোন দিকে। এই সকল বিষয় নিঃসন্দিগ্ধ রূপে স্থির হইলেই কর্ত্তব্যনির্ণয়টি যথাযথরূপ হইতে পারে, নচেৎ কেবল উদ্বেগ, অধৈর্য্য, অস্থৈর্য্য এবং বিড়ম্বনা সার হয়। যিনি সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে কর্ত্তব্যের পথ অবধারিত করিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত সংস্কারক হইবেন।

ভবিষ্যবিচার দ্বারা ভারতবাসীর যে যে বিষয়ে হীনাবস্থাবৃদ্ধির শঙ্কা হইতে পারে, সেই সেই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্ণয় করা আবশ্যক। সমুদায় সমাজটিকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা করা অবৈধ এবং অফল। আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, যতদিন আমাদের মধ্যে তাদৃশ কোন নেতৃমহাপুরুষের আবির্ভাব না হইতেছে, তাবৎকাল আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভারত-গবর্ণমেণ্টকেই রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় স্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইব না। এতদ্দেশাগত বেসরকারী ইংরাজ রাজনৈতিকদিগের আন্দোলনপ্রণালী আমাদের অবস্থা এবং প্রকৃতির উপযোগী নহে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলিতে

আমাদের মিশ্রিত হওয়া যেমন অকর্ত্তব্য, বে-সরকারী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কোন অনুষ্ঠানের প্রতিকূলে আন্দোলন করিতে যাওয়া তেমনি মূর্খতার কার্য্য। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, বিলাতী উদারনৈতিক এবং রক্ষণশীল উভয় দলই আমাদের পক্ষে সমান। যদিও বিলাতবাসী ইংরাজের অথবা এতদ্দেশাগত ইংরাজের চাপে বা মন রাখিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট কথঞ্চিৎ এমন কাজ করিয়া ফেলেন যে তজ্জন্য আমাদের ক্ষুব্ধ হইতে হয়, তথাপি ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের আজীবনের সহিত বিলাতী ও এতদ্দেশাগত বে-সরকারী ইংরাজদিগের প্রখর স্বার্থের যতটা বিরোধ, গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের কখনই ততটা প্রভেদ হইতে পারে না। এদেশে বড় লোকের আবির্ভাব গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত, ইংরাজ কর্ম্মচারীর মুখেও এরূপ হঠবাদ অসঙ্গত এবং অশ্রদ্ধেয়।

ভারতবাসীর ক্ষমতা ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী আপনাকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিতে অশক্ত, আপনার সুশাসনে আপনি অক্ষম, নিজের দেশটিকে নিজে মিলাইয়া এক করিতে পারেন নাই। এখন ত সমস্ত দেশ একচ্ছত্রে মিলিত হইয়াছে, তথাপি উহাকে স্বশক্তিতে একত্র করিয়া রাখিতে পারেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে অপরের সাহায্য অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষ সেই অত্যাবশ্যক সহায়তা ইংলণ্ডের স্থানে পাইতেছেন। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, ইহার সুশাসন করিতেছেন; ইহাকে মিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সম্মিলিত রাখিতেছেন।

অতএব ইংলণ্ড আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার, সম্মানের এবং প্রেমের পাত্র হইয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের যতটা উপকার হইয়াছে, অপর কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক ততটা হইতে পারিত না। যদি ফ্রান্সই ইহার অধিকারী হইতেন, তিনিও ইংলণ্ডের প্রবলতর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। পোর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজদিগের ত কথাই নাই। কিন্তু ইংলণ্ড কেবল মাত্র পরাক্রমেই যে অপর সকল ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা উচ্চতর তাহা নহে। অপর সকল ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজের ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য অধিকতর, এবং তাঁহার ন্যায়ানুগামিতা স্থিরতর। অতএব যখন ভারতবাসীর অবস্থা এমন যে, তাঁহাকে অপরের অধীন হইতেই হয়, তখন আর কাহারও না হইয়া যে ইংরাজের অধীন হইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্য বলিয়াই স্বীকার্য্য।

ইংরাজীশিক্ষিত সুতরাং ইংরাজনীতি এবং চরিত্রে যাঁহারা অধিক অভিজ্ঞ হইয়া-

ছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে একটি বিশেষ ভাব সঞ্চিত হয়। তাঁহারা জানেন যে, বীর-প্রকৃতিক ইংরাজ যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না, তাহার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতেও পারেন না। এই ভাব হইতে ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে এক প্রকার স্বচেষ্টার বাহুল্য হইয়াছে—রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক সমিতির সংঘটন হইয়াছে, সংবাদপত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে, সমুদায় দেশ ব্যাপিয়া বিবিধ প্রকার আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে এবং নানা প্রকার সংস্কারের কল্পনা এবং চেষ্টা চলিতেছে।

কিন্তু ভারতবাসী ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া স্বয়ংসিদ্ধের ন্যায় এ পর্য্যন্ত কোন প্রধান রাজনৈতিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, খ্যাতনামা অনেকানেক দেশীয় রাজনৈতিক ভিতরে ভিতরে ইংরাজ-বিশেষের উপদেশ এবং পরামর্শ লাভ করিয়াই যাহা কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভায় জর্জ টমসনের আবির্ভাব হইতে কংগ্রেসের জীবাত্মা-স্বরূপ হিউম সাহেবের নাম স্মরণ করিলেই আমাদের প্রকৃত অবস্থার অব বোধ হইবে। ফলতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে বে-সরকারী ইংরাজের সাহায্য এক্ষণে আমাদের একমাত্র অবলম্ব হইয়া আছে। কিন্তু ঐ অবলম্ব গ্রহণ আমাদের পক্ষে কোনমতেই নির্দ্দোষ নহে। উহার প্রধান দোষ দুইটি। এক দোষ এই যে, ঐ সাহায্য গ্রহণে আমাদিগের অনুকরণ বৃত্তিটিই অতি প্রবলা হয়। সুতরাং ইংরাজের প্রণালী শুদ্ধ রাজনৈতিক বিচার বিষয়ে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে না, উহা আমাদের সামাজিক নীতি, ধর্ম্মনীতি এবং পারিবারিক নীতির মধ্যেও প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগের অনুপযোগী অনেকানেক পরিবর্ত্ত ঘটাইয়া দিতে চায়। দ্বিতীয় দোষটিও অনুকৃতি-প্রবণতার বৃদ্ধি সম্ভূত। ইংরাজ অধিনেতা তাঁহার স্বদেশের উপযোগী যে আন্দোলনের রীতি তাহাই জানেন। তিনি সেই রীতি এখানেও প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু তাহা এখানকার লোকের স্বভাব, শিক্ষা এবং অভ্যাসের উপযোগী হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা স্পষ্ট করিব। মনে কর, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাজার নিকটে স্বদেশ-বিষয়ক কোন প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ-রাজ স্বদেশীয় নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা দুই পাঁচ জনে যে প্রার্থনা করিতেছ তাহা তোমাদের মনগড়া বস্তু হইতে পারে—দেশের অধিক লোক ত ওরূপ কোন প্রার্থনা করে নাই! এই উত্তর ইংরাজী রীতির অনুযায়ী হইলেও উহা এদেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য নহে। সুতরাং উহার ফল এই যে, ইংরাজ নেতার প্ররোচনায় ইংরাজীশিক্ষিত লোকেরা এদেশে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং আপনাদের পক্ষ

সমর্থনের উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আমার বিবেচনায় ঐ প্রণালী এদেশের অনুপযোগী। অতএব ইংরাজ-নেতৃত্বে এখানে সমীচীন কার্য্য হইতে পারে না, অর্থাৎ ইংরাজ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দেশীয় নেতারই সমূহ প্রয়োজন হইয়া আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ত্তব্যনির্ণয়—নেতৃপ্রতীক্ষা

উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণ সহজ। কিন্তু অনুকরণ কার্য্যতঃ সহজ হইলেও উহাতে ভ্রম এবং হানি অধিক হইতে পারে। উদ্ভাবন সহজে হয় না; কিন্তু যদি হয় তবে একেবারে দেশকালপাত্রের উপযোগী হইয়াই হয়। অনুকরণে ঐরূপ উপযোগিতার রক্ষা বিশেষ চেষ্টাসাধ্য। যে অনুকরণে সম্যক্ উপযোগিতার রক্ষা হয়, তাদৃশ অনুকরণ উদ্ভাবন হইতে বড় নিকৃষ্ট বস্তু নহে। প্রত্যুত অনেকানেক উদ্ভাবনের উদাহরণই ঐরূপ অনুকরণের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও অনুকরণে এবং উদ্ভাবনে মূলতঃই ভেদ আছে। অনুকরণ বাহ্য, উদ্ভাবন আভ্যন্তরিক। অনুকরণে ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য, উদ্ভাবনে একত্ব এবং তদাত্মতা। এইজন্য যিনি অনুকরণ করিতে পারেন, তিনি প্রায়ই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়েন না। এইজন্যই বোধ হয়, ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির ন্যূনতা। আমাদের বর্ত্তমান নেতা ইংরাজও আমাদিগকে তাঁহার নিজের অনুকরণের শিক্ষা ভিন্ন আর কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না। ইংরাজের অবস্থা, স্বভাব এবং চিত্তবৃত্তি এরূপ নয় যে, তিনি আমাদিগের জন্য এবং আমাদিগের হইয়া আমাদিগের প্রকৃত গন্তব্য পথ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিতে শক্ত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত এমন একটি আইন, কার্য্যবিধি অথবা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই, যাহা ইংলণ্ডের অনুকরণসঞ্জাত নহে।

ইংরাজের স্থানে অনুকরণ করিবার অনেকানেক বিষয় ভারতবাসী আপনার সম্মুখেই পাইতেছেন। এখন ইংরাজ নানা প্রকারেই তাঁহার আদর্শস্থলীয়। অর্থসাধন করিবার নিমিত্ত যে যে গুণের প্রয়োজন, ইংরাজের শরীরে সে সমস্ত গুণ মূর্ত্তিমান হইয়া আছে। ইংরাজের উচ্চাভিলাষ আছে, স্বাবলম্বন আছে,

অধ্যবসায় আছে, ইন্দ্রিয়দমন আছে, গাম্ভীর্য্য আছে, এবং সম্মিলনশক্তি আছে। সম্মিলনশক্তিটিতে অনেকানেক উচ্চতম সদ্‌গুণেরই সত্তা বুঝায়। ইহাতে মনের সংযম বুঝায়, স্থিরতর সহানুভূতি বুঝায়, বশ্যতা বুঝায়, সত্যনিষ্ঠা বুঝায়। ভারতবাসীর সম্মিলনশক্তি ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ঐ শক্তিটিকে অধিকার করিবার জন্য বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন। যদি সম্মিলন-প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয় ভাবের পরিবর্দ্ধন অতি অল্পায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ জাতীয় ভাব সম্মিলন-প্রবণতারই নামান্তর অথবা পরিপাক।

আমরা সম্মিলন-প্রবণতা ইংরাজের উপদেশ হইতে যদিও না পাই, তাঁহার প্রকৃত অনুকরণে কতকটা শিখিলেও শিখিতে পারি। ভারতবাসীর যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলনপ্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারতবাসী রত্নপ্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়াও দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান্ হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলনে অক্ষমতা।

এই অক্ষমতার দূরীকরণ আমাদের বর্ত্তমান নেতা ইংরাজের সাক্ষাৎ চেষ্টায় কদাপি পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ হইবার নহে। কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষ কর্ত্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোন পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে, তৎসম্বন্ধে আমাদের অবশ্যকরণীয় দুইটি। একটি এই যে, যখন কোন শুভকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই—আপনার প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোন স্বজাতীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমরা স্বহস্তে মাটি তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পূজা করিতে এবং তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিতে জানি। অতএব প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড় করিয়া লইতে পারি। বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড়লোক জন্মিয়া

যাইতে পারেন। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বড়লোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়াদোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড়লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না; তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই, অতএব ন-কড়ে ছ-কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড়লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলতঃ অনুবর্ত্তী লোক থাকে বলিয়াই বড়লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে তখনই আমরা স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের গুণগরিমা দেখিতে পাইব এবং তখন আর অর্থপিশাচ, লঘুচিত্ত, অনুদারপ্রকৃতিক বৈদেশিকদিগকেই সর্ব্বগুণাধার বলিয়া মনে করিব না। তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দেশীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের অপমান, দেশীয় রীতিনীতির প্রতি ঘৃণা এবং স্বজাতীয় লোকের কুৎসা-প্রচার করিব না।

ভারতভূমি সত্যসত্যই রত্নপ্রসবা। এখানে প্রকৃত বড়লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদ্গত হয়। তাহা না হইলে এত শত শত নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে কেন? যাঁহারা ছোটখাট যেরূপ হউক এক একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু না কিছু মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে।

তবে কি যে কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে তাহারই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়? তাহাও নহে। কিন্তু বরং তাহাও ভাল, তথাপি কেহ কোন উদ্ভাবনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তাঁহার প্রতি অসূয়াবান্ হওয়া ভাল নয়। পরন্তু যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটি লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি-প্রয়াসী হইবেন। (২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার

ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। (৪) তাহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধপাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরই সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্নমাত্র পাইলেই ভগবদ্‌বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্‌যদ্‌-বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং॥"

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাসমাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রকৃত বড়লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

আমার বোধ হয় যে, ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটি আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার উৎকর্ষসাধন, মনের সংশয়চ্ছেদন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভশান্তন করিবার জন্য স্বজাতি মধ্যে একজন নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে। সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক। কারণ ভগবদ্‌বাক্য আছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের উদয় হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।

ঐ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্য্যকলাপ, ব্যবহারপ্রণালী, এবং মনের ভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে।

নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কোথায় হইবে, কখন হইবে, তাহার কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব সেই ঘটনা তাঁহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই এরূপ মনে করিতে হয় এবং তাহা

মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্ব্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইহা হইতেই আমাদের জন্মভূমি যশের মালা ধারণ করিতে পারেন, ইহা হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মধনের সম্বর্দ্ধন হইয়া মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারে। কোন একটি মনুষ্যশিশুর ভাবী অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, ব কি হইতে পারে না, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাখিয়া আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের সুশিক্ষার প্রতি নির্দ্দিষ্টরূপে নিরন্তর যত্ন করিলে সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতেও নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয় সেইরূপ হৃদয়বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। শিক্ষাকার্য্য ও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপি-কুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্দ্ধনচেষ্টার সহিত স্বজাতিবাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রে একটি দশম অবতারের কথা আছে। উঁহার নাম কল্কি। তিনি সম্ভলগ্রামে, বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ় পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোক্তির যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কথাই সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন—'সম্ভলগ্রামের' * অর্থ 'নিশ্চয়াত্মক-চিত্তসমূহ', 'বিষ্ণুযশা'র

* সম্ভলগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি—'ভল' ধাতু নিরূপণার্থ, অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, সম্ভল অর্থে সম্যক্ প্রকারে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক চিত্ত; গ্রাম

* অর্থ 'ব্যাপক-আজ্ঞা', 'সুমতি'র + অর্থ 'সাধুবুদ্ধি' এবং 'কল্কি'র × অর্থ 'কলহ-নাশক'। অর্থাৎ লোকের হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) এবং লোকসমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলে, সুবুদ্ধি হইতে কলহ-নিবারণ-দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভলগ্রাম, সমস্ত ভারতসমাজই বিষ্ণুযশা, সকল ব্যক্তিই সুমতি স্থানীয়, এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহ-বিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্য্য। কল্কিদেব যে অসিধারণ করিবেন সেটি জ্ঞানবিজ্ঞানময় অসি—অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলনসাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহাঅশ্ব।

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে য়িহুদী জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়া ঐ জাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আমাদেরও ভাবী অবতার কল্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য়িহুদীরা তাহাদিগের ভাবী অবতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কল্কিকে সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কল্কিদেব আয়সকৃপাণ-হস্ত সামান্য অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ-বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, ভারতাধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভবপর।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—অতথ্য পরিহার

ভারতবর্ষেব অবস্থা হীন হইয়াছে; আজি কালি ইংরাজেরা বিধিপূর্ব্বক,

অর্থে সমূহ, অতএব সম্ভলগ্রাম—নিশ্চয়াত্মক চিত্ত সমূহ।

* বিষ্ণুযশা—বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক, যশস্ শব্দের অর্থে আজ্ঞা বা সভা, অতএব বিষ্ণুযশা—ব্যাপক-আজ্ঞা।

+ সুমতি—সুন্দর বুদ্ধি।

× কল্কি—কলি অর্থে কলহ বা পাপ (কলহাৎ কলিরুৎপন্নো যেন ধর্ম্মং বিনশ্যতি), কলি হইতে কণ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ কল্ক শব্দ; কল্কের অর্থাৎ পাপের বা কলহের নাশ করেন এই অর্থে ই-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ কল্কি—কলহ বা পাপনাশক। কল্কিপুরাণেই কথিত আছে "কল্কিং কল্ক-বিনাশার্থম্ আবির্ভূতং বিদুর্বুধাঃ।"

অবিধিপূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকারেই ভারতবাসীর নিন্দা করিতেছেন। ভারতবাসী নিজেও জানিতেছেন যে, তিনি কলহে মগ্ন, অসূয়াপরবশ, মিলনে অশক্ত, বিদ্যাহীন, ধনহীন এবং স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দোষমাত্রই ধর্ম্মহানি হইতে জন্মে। অতএব শাস্ত্রে কলিযুগে যে ধর্ম্মহানির উল্লেখ আছে, তাহাতেই সমষ্টিভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে সকল দোষের উল্লেখ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভারতবাসীর শাস্ত্রই ভারতবাসীকে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক তিরস্কার করিয়াছেন এবং স্নেহময় পিতার ঐ তিরস্কারের সহিত তিরস্কারের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কলি হইতে দোষ হইয়াছে, কলিজয়েই দোষের পরিহার হইতে পারে।

মানুষের সকল দোষই ধর্ম্মহানিমূলক। কিন্তু ভারতবাসী পৃথিবীর অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধর্ম্মভীরুতাপ্রবণ, একথা শুদ্ধ আমরাই বলি না, সকল দেশের সকল লোকই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অতএব ভাবিয়া দেখিলে একটি বিষম সমস্যাই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হয়। এক পক্ষে, ভারতবাসীর সকল দোষের মূল ধর্ম্মহানি; পক্ষান্তরে, ভারতবাসীর মন অপর সকল জাতির অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মানুরক্ত। তবে ভারতবাসীর দোষ কোথা হইতে আইসে? কোন সময়ে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছিলাম এবং যাহা এখনও মনে লাগিয়া আছে, এ প্রবন্ধে তাহারই ব্যাখ্যা করিব। সংক্ষেপতঃ বলিয়া রাখি যে, ভারতবাসী ধর্ম্মশীল বলিয়াই এখনও পৃথিবীতে থাকিতে পারিয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীনজাতিদিগের ন্যায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া আছে, এইজন্য তাঁহার উন্নতি নাই, অধঃপতন হইতেছে।

কতিপয় বর্ষ গত হইল ৺কাশীধামে একটি মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাকে লোকে অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, আরবি ফারসিও জানিতেন এবং ভারতবর্ষের সকল তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া ছদ্মবেশে পাদচারে ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অনেকানেক দেশ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন সেবক বা শিষ্যের স্থানে আমি তাঁহার কতকগুলি মতবাদ শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিতেন—এখন ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি অর্থাৎ উহার শাস্ত্রোক্ত পূর্ণাবয়ব প্রায়ই ভারতবাসীর মানসচক্ষে সমুদিত হয় না। ভারতবাসী এখন যে-ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান, চিন্তাপর, অনুষ্ঠানশীল এবং ব্যাকুল, তাহা ধর্ম্মের সর্ব্বাবয়ব নহে—মুখ্যাবয়বও নহে। এইজন্য ভারতবাসীর দ্বারা ধর্ম্মের যথাযথ পূজা হইতেছে না। ধ্যানেই ত্রুটি হয় বলিয়া

অনুষ্ঠানও দুষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্যই ভারতবাসী নানা দোষে জড়িত হইয়া বিপন্ন হইতেছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন ভারতবাসীর যে যে দোষ তাহার উদাহরণ, যথা—

(১) পারলৌকিক স্বার্থপরতা। ভারতবাসী শাস্ত্রীয় শিক্ষার গুণে স্বার্থত্যাগে এবং পরার্থপরতায় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পৃথিবীর অপর কোন জাতি তেমন কৃতকার্য্য হয়েন নাই। গৃহস্থাশ্রমের সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা হইতে চতুর্থাশ্রমের পূর্ণ সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সকল আশ্রমধর্ম্মই ভারতবাসীর পরার্থপরতার পরিচায়ক। এমন কি, কেবল আপনার নিমিত্ত ভাত রাঁধিয়া খাওয়াও ভারতবাসীর পক্ষে কিল্বিষ ভোজন বলিয়া নিন্দিত। এমন কথা কি আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রে বলিতে পারিয়াছে? প্রত্যুত অন্যের ধর্ষণ ভারতবাসীর স্বভাবের বিপরীত। অন্যের দুঃখমোচনে ভারতবাসীর প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। ভারতবাসীর দরিদ্রতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার দানশক্তিও পৃথিবীতে অতুল্য। কিন্তু ইহলৌকিক সকল বিষয়ে এরূপ পরার্থপর হইয়াও ভারতবাসী পারলৌকিক বিষয়ে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করিবে সে নিজেই ধর্ম্মাচরণের ফলভোগ করিবে, অর্থাৎ স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইবে। ঐ সকল ধর্ম্মে মনুষ্যের আত্মা সৃষ্টবস্তু বলিয়া বর্ণিত এবং উহা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। সুতরাং ঐহিক সুখদুঃখাদি সম্বন্ধে ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে প্রকার ব্যবহার, পারলৌকিক বিষয় সম্বন্ধেও যে তদনুরূপ বোধ জন্মিয়া থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নয়। কিন্তু আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাদান অন্য প্রকার। আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রগুলির মতবাদে অবান্তর ভেদ যাহাই থাকুক, আত্মার অনাদিত্ব, অনশ্বরত্ব এবং বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব সকলেরই স্বীকৃত বলিলে চলে। সুতরাং কোন এক ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ বা অধর্ম্মাচরণ যে অপর কাহাকেও স্পর্শ করে না, এরূপ হইতেই পারে না। আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে, একজনের সুকৃত দুষ্কৃত যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে অপর সকলেই সংলগ্ন হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর্য্য দার্শনিকদিগের এই প্রকৃত এবং অত্যুদার মতবাদ কোন সময়ে ভারতবর্ষের অত্যুচ্চ জ্ঞানিপুরুষদিগের মধ্যে প্রচলৎ ছিল। তখন একজীববাদ এবং একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি, সুতরাং সকলের মুক্তির পথ না হইলে কোন একজনেরও মুক্তি হইতে পারে না, এই বিশ্বাসও দৃঢ়তর ছিল। কিন্তু ক্রমে ঐ মতবাদ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং জ্ঞানযোগী পুরুষেরাও ইদানীং যে যাহার আপনাপন আত্মার নিঃশ্রেয়স সাধনে যত্নবান হইয়া পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হইতেছেন। এখনকার ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থেরা অপরের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্টভাব গ্রহণ পূর্ব্বক হরিনাম

করিতেছেন ; এখনকার ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং পরমহংসেরা কেহ জপ, কেহ ধ্যান, কেহ বা যোগ করিয়া আপনাপন উর্দ্ধগতির চেষ্টা পাইতেছেন এবং এখনকার দাতৃগণও দানাদি দ্বারা পুণ্য ক্রয় করিয়া স্ব স্ব পরকালের সম্বল করিতেছেন।

যাহাদের মধ্যে উচ্চতব একজীব-বাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই ভারতবাসীর মন এখন এরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাতে উল্লিখিতরূপ পারলৌকিক স্বার্থপরতার প্রবেশ জন্মিয়া গিয়াছে। উত্তরায়ণী বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা পৃথক্‌রূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়াই মানে। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে ডালাই-লামার সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি বহু পূর্ব্বকালে মুক্তি প্রাপ্তির সম্পূর্ণরূপে অধিকারী হইয়াও কেবল স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের শিক্ষা, উন্নতি ও মুক্তির জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ-ক্লেশ সহ্য করিতেছেন—সকলের মুক্তিপ্রাপ্তি না হইলে তিনি আপনার মুক্তি প্রার্থনা করেন না। এই বিষয়ে সুরক্ষিত বৌদ্ধমতবাদ যে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃতাবস্থ হিন্দু ব্যবহারের অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান মলিন এবং ধর্ম্মবুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেইজন্য অপরের কৃত পুণ্যপাপে বা অপরের ভুঞ্জিত সুখদুঃখে আমাদের ঔদাসীন্য জন্মিয়া যাইতেছে। ঐ ঔদাসীন্যই পাপ। সেইজন্য আর্য্যধর্ম্ম ক্রমশঃ নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে, দেশ মধ্যে সাহানুভূতি দিন দিন স্বল্পতর হইতেছে, এবং সম্মিল-শক্তি ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া যাইতেছে।

অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিতেন যে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক মনুষ্য আপনার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন মাত্র। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করিলেই ত সমুদায় কার্য্য শেষ হইতে পারে না। এইজন্য স্বসমাজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিমিত্ত চতুর্থাশ্রমের পরবর্ত্তী একটি আশ্রমান্তরের প্রয়োজন আছে। লোকের শিক্ষা প্রদান ও সমাজের হিত সাধন সেই আশ্রমের করণীয়। এইজন্য সকলে তাঁহাকে অত্যাশ্রমী বা সর্ব্বাশ্রম-অতীত পুরুষ বলিত। তিনি বলিতেন, কোন একজনের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স সাধন স্বতন্ত্রভাবে হইতে পারে না। মুক্তি পদার্থটি সকলের যুগপৎ লভ্য বস্তু, কারণ, আত্মা এক, বহু নয়। পরিগৃহীত শরীরের ধর্ম্ম-ভেদেই আত্মার ধর্ম্মের পৃথক্‌ত্ব বোধ হয়। তিনি বলিতেন, ভারতবাসী ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে যেমন পরার্থপর হইয়া মুক্তির পথে আসিয়াছেন, পারলৌকিক বিষয়েও সেইরূপ পরার্থপর হউন, কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক, সকল ব্যাপারে

সকলের মঙ্গলেই আপনার মঙ্গল ইহা জানুন; আত্মার বিভুত্ব যেমন বিচারকালে স্বীকার করিয়াছেন, কার্য্যকালেও সেই বিভুত্ব স্মরণ করিয়া কার্য্য করুন, এবং অন্যের পাপে আপনার পাপ, অন্যের কষ্টে আপনার কষ্ট ইহা অনুভব করিতে অভ্যস্ত হউন। তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রাচীন কালের ন্যায় পূর্ণরূপে মূর্ত্তিমান হইবেন এবং প্রাচীনকালের তেজস্বিতা এবং প্রাচীন কালের উদারতাও জন্মিবে।

(২) অভেদে ভেদবুদ্ধি। দর্শনশাস্ত্রসমূহের টীকাকারদিগের মধ্যে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে, তাহার মধ্যে দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদ প্রধানরূপে পরিদৃষ্ট হয়। একপক্ষ বলেন, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার যুগপৎ অবস্থানের আবশ্যকতা আছে। ভগবান্ রামানুজ স্বামী প্রভৃতি এই মতানুগামী। ইঁহাদিগেরর সমসমুচ্চয়বাদী বলে। অপর দলের নেতা ভগবান্ শঙ্করস্বামী। ইঁহারা বলেন যে, জ্ঞানের অবির্ভাবে কর্ম্মের লোপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উভয়ের একত্রাবস্থান অথবা সমসমুচ্চয় হইতে পারে না। ইঁহাদিগকে ক্রম-সমুচ্চয়বাদী বলা যায়। যেখানে দুইটি মতবাদ স্থায়িভাবে প্রচলিত হয়, সেখানে উভয়েই কিঞ্চিৎ সত্যের বিদ্যমানতা থাকে। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। জ্ঞানের সারাংসার কথা, আত্মার বিভুত্ব। যাঁহার সেই জ্ঞান উপস্থিত হইল, তাঁহার নিজের পক্ষে আর কোন কর্ম্মই থাকিতে পারে না। তাঁহার কাম্যকর্ম্ম ফুরাইল। কিন্তু যতদিন সকলের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের স্ফুরণ না হইতেছে তাবৎকাল তাঁহার কর্ম্মের শেষ হইতে পারে না। অন্যহৃদয়ে আপনার জ্ঞানস্ফূর্ত্তি সম্পাদন করা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ একটি কাজ পরম জ্ঞানীর পক্ষেও বাকী থাকিয়া যায়। ফলেও দেখা যায়, ক্রমসমুচ্চয়বাদীরাও গ্রন্থ-প্রণয়নে, শিষ্যের শিক্ষায় এবং শাস্ত্রীয় বিচারে কখনই অবহেলা করেন নাই। অতএব সমুচ্চয়াসমুচ্চয় উভয়বাদের মীমাংসা করিয়া লওয়াই প্রকৃত পথ। কারণ আত্মার বিভুত্বজ্ঞান-মূলক সকলের যুগপৎ মুক্তিসাধন স্বীকৃত হইলে, তাহার জন্য যে কর্ম্ম তাহা উভয়বাদীর সম্মত। প্রত্যুত ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম বা নৈষ্কর্ম্য; ইহাই বুদ্ধিযোগ এবং সন্ন্যাসযোগ।

যেমন কর্ম্মে এবং জ্ঞানে বিরোধ বাধাইয়া লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রকার লোকে ভক্তির সহিতও জ্ঞানের বিবাদ বাধাইয়া একটা সমূহ অনিষ্টের হেতু জন্মাইয়াছে। জ্ঞান এবং ভক্তি, ইহারা পিতা এবং মাতার স্থানীয়। উহাদিগের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। ভক্তি না হইলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, কার্য্য না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা না হইলে জ্ঞান জন্মে না; এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। অতএব কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ ভক্তিযোগী এবং কেহ

জ্ঞানযোগী, এই যে সাময়িক পার্থক্য হইতে স্থায়ী পার্থক্য হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যধর্ম্মের সমূহ ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

(৩) ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ। আর একরূপেও ধর্ম্মের অঙ্গহানি হইয়াছে। এখন লোকে ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব করিতেছে। আমরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি পুনর্ব্বার রাত্রিকালে শয্যাশায়ী হইতে যাইবার সময় পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করি, সকল কার্য্যই ঈশ্বরস্মরণ-পূর্ব্বক আরব্ধ করিতে উপদিষ্ট। কোথাও যাইব, কিছু করিব, কিছু খাইব, একখানি সামান্য চিঠি লিখিব, কিছুই বিনা ঈশ্বর-স্মরণে করিবার কথা নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-চিন্তাই ভারতবাসীর সকল ব্যাপারে সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকিবে, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই ঈশ্বর-স্মরণের তাদৃশ প্রবর্ত্তনা। কিন্তু এখন ধর্ম্মের ঐ সর্ব্বব্যাপিত্ব লুপ্তপ্রায় হইতেছে। "বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা ত তপস্যা নয়", "চাকুরী করা ত তীর্থবাস নয়", "ধর্ম্ম করিবার বয়স ত এখনও হয় নাই"—এরূপ কথাসকল কিছুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। আজি কালি আবার "ক্লেশস্বীকার", "দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা", "তপশ্চর্য্যা"—প্রভৃতি কথাগুলি যে যে ভাবের ব্যঞ্জক তাহা উপধর্ম্মমূলক বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে; ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সাপ্তাহিক বারাদিও ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম সমস্তজীবন-ব্যাপক না হইয়া একটি কার্য্যবিশেষ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবাসীর পূর্ব্ব শিক্ষা এরূপ ছিল না। ভারতবাসী জীবিতকালের সকল কার্য্যেই ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষিত হইতেছিল।*

প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং॥

হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা যাহা করি সকলই তোমার পূজা হউক। তান্ত্রিকের প্রার্থনা এইরূপ। বৈষ্ণবের প্রতি উপদেশও ভিন্নরূপ নয়।

ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

* ভারতবর্ষের বাহিরে কেবল দুই সময়ে দুই স্থানে এইরূপ ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এক মহম্মদ ও প্রাথমিক কালিফদিগের সময়ে আরব দেশে, আর ইংলণ্ডের পিউরিটানদিগের অভ্যুদয়-কালে।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥"

"তুমি যাহাই কর আমাকে অর্পণ কর।" অতএব শাস্ত্রানুগামী হিন্দুমাত্রের প্রতি বিধি হইল, ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, শুদ্ধ নিজের জন্য কিছু করিও না, তাহা করিতে নাই।

এই অত্যুচ্চ পবিত্রভাবের বিলোপ হইয়া অমুক বারে বা অমুক সময়ে ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়, অপর সময়ে অপর কার্য্য করিতে হয়, এই অতথ্যজ্ঞান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মভাবকে জীবনের সকল কার্য্যকলাপে অনুস্যূত করাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রেত সাধন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে ভারতবাসীর জীবন আবার সতেজ, সুন্দর এবং মধুময় হইয়া উঠিবে, আপনার শিক্ষা এবং তদ্দ্বারা অপরের হিতসাধনা, ইহা ভিন্ন আর কোন চেষ্টা থাকিবে না, জীবিতকালের ঈষন্মাত্রও নিষ্কর্ম্মে বা অকর্ম্মে নিরর্থক নষ্ট হইবে না এবং আমোদ-প্রমোদও ধর্ম্মানুমোদিত, অবস্থার উপযোগী, বিশুদ্ধ এবং স্ফূর্ত্তিপ্রদ হইবে।

কর্ত্তব্যনির্ণয়---সূত্রনির্দ্ধারণ

বুদ্ধি দুই প্রকারে কার্য্যকারিণী হয়। উহার এক প্রকার কার্য্যের নাম সংকলন; অপর প্রকারের নাম বিকলন। সংকলনের দ্বারা ব্যষ্টীভূত পদার্থসকলের সমষ্টিসাধনপূর্ব্বক প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের সংঘটন হয়, আর বিকলনের দ্বারা সমষ্টীভূত বস্তুর বিচার হইয়া তাহার উপাদানসমস্তের আবিষ্কার হয়। বুদ্ধিশক্তির এই দুই প্রকার কার্য্য যদিও যুগপৎ ভাবেই চলে, তথাপি উভয়েই সকল সময়ে সমানরূপে বলবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সমাজের অবস্থাবিশেষে যখন দ্রব্য এবং ভাব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, তখন সংকলনশক্তি তেজস্বিনী দেখায়; এবং সমাজে ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, যখন সংঘটিত ভাব এবং বস্তুর সম্বন্ধে চিন্তার আধিক্য হইয়া উঠে, তখন বিকলনশক্তি তেজস্বিনীরূপে বিস্ফুরিত হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে যখন শাস্ত্রাদির প্রণয়ন, ব্যবহার নিরূপণ, দেবমূর্ত্তির কল্পন, এবং মহাকাব্য বিরচন হইয়াছিল, তখন সমাজ-নেতৃবর্গের সংকলনশক্তিমত্তা প্রকট হইয়াছিল। অনন্তর যখন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনাদির প্রাদুর্ভাব হইল, তখন বিকলনশক্তিমত্তা অতি প্রবলরূপেই দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধির উভয় শক্তিই সকল সময়ে কার্য্যকরী থাকে, তবে একটি বা অপরটি সময়ভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে প্রবলরূপ দৃষ্ট হয়। সংকলনশক্তির কার্য্য—সংঘটন, সুতরাং নির্ম্মাণকার্য্যের বাহুল্যে

ঐ শক্তির প্রাবল্য লক্ষিত হয়; বিকলনশক্তির কার্য্য—বিচার, সুতরাং উহার প্রাবল্য চিন্তার এবং পরীক্ষণের বাহুল্যে অনুভূত হইয়া থাকে।

সমাজের এই বিভিন্ন ভাব পুনঃ পুনঃ প্রকট হয়। একবার সংকলনের কার্য্য হইয়া পরে বিকলনের কার্য্য হইয়া গেলে, আবার সংকলনের কার্য্য চলে, এবং তাহার পর পুনর্ব্বার বিকলন হয়—এইরূপ পর পর হইতে থাকে। ভারতবর্ষে বৈদিক মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানাদি প্রস্তুত হইয়া সামাজিক আচারব্যবহারাদি সম্বদ্ধ হইয়া উঠিলে দর্শনশাস্ত্র সকল জন্মে। সেই সকল দর্শনের এবং বৌদ্ধের বিচার দ্বারা বিভাজন কার্য্যের পর, আবার পুরাণ-সংহিতাদির সৃষ্টি হইয়া সমাজের দৃঢ়তর বন্ধন হয়। অনন্তর মুসলমানের আগমনে আবার নূতন ভাবাদির সমাগম হইলে, সংকলনের কাল আইসে। নানক, কবির, দাদু প্রভৃতি পন্থীবাদীরা এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হিন্দু এবং মুসলমানের ভাব সম্মিলিত করিয়া আপনাপন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

পৃথিবীর সকল সমাজেই এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সংকলন এবং বিকলন শক্তির কার্য্যকারিতা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই পর্য্যায়ক্রমকে শ্রদ্ধা এবং সংশয়ের কাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং তাহা করিয়া সংশয়াত্মিকতার ভূয়সী প্রশংসা এবং শ্রদ্ধাত্মিকতার সমূহ নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের মধ্যে তেমন কোন ভেদ নাই যাহার জন্য একটির নিন্দা বা অপরটির প্রশংসা হইতে পারে।

এখন ভারত-সমাজে সংকলনশক্তিই বিশিষ্টরূপে বলবতী হওয়া আবশ্যক বোধ হয়। আর্য্য দার্শনিকদিগের সময়ে যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিক বিচার চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সকল বস্তুর, সকল ভাবের এবং সকল ব্যাপারের উপাদানভূত মৌলিক পদার্থের আবিক্রিয়া হইয়াছে; ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন জাতীয় জনগণের সমাগমেও কিছু কিছু নূতন উপাদান আসিয়াছে; এবং নানা কারণ সহকারে দেশের অনেকটা অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অতএব পূর্ব্ব হইতে যাহা আছে, এবং পরে যাহা আসিয়াছে, তৎসমুদয়কে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া বিনিবেশ করিবার জন্য সংকলনশক্তি-মূলক কার্য্য-সূত্র নির্দ্ধারণের প্রয়োজন। এখন কর্ম্মের আধিক্য হইলেই সজীবতার প্রমাণ হয়।

কর্ম্মেরই প্রয়োজন বলিয়া আমি কোন সময়ে একটি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। শ্লোকটি এই—

চরাচরমিদং সর্ব্বং যৎ সৃষ্টং কর্ম্মণা ময়া।
তস্মাৎ কর্ম্ম ভজেন্নিত্যং ভক্তিজ্ঞানসমন্বিতম্॥

আমি কর্ম্মের দ্বারাই চরাচর সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব ভক্তি এবং জ্ঞানযুক্ত হইয়া নিত্যই কর্ম্মের সেবা করিবে।

শ্লোকটিতে ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের সম্যক্ সম্মিলনের আদেশ আছে এবং কর্ম্মেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্লোকটির উপদেশ বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণরূপেই উপযোগী। কর্ম্ম করাই আমাদিগের পক্ষে বিধেয়। কিন্তু কর্ম্ম বলিলে কি বুঝিতে হইবে?

আমাদিগের শাস্ত্রসমূহের প্রধান প্রধান টীকাকার এবং ভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী বা পরমহংস ছিলেন। যখন কোন কর্ম্মের উদাহরণ দিতে হইয়াছে, উঁহারা তখনই অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধাদি যজ্ঞীয় ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মের উদাহরণ দিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ লোকের করণীয় অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যুদ্ধ, কৃষি, বাণিজ্য, সেবাদি কর্ম্মের উল্লেখও করেন নাই। এইজন্য আমাদের মধ্যে কর্ম্ম শব্দের মুখ্যার্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া উহার গৌণার্থ যে যজ্ঞাদি ব্যাপার তাহাই প্রচলিত হইয়াছে, এবং বিষয়কর্ম্মের সহিতও ধর্ম্ম ব্যবহারসম্পর্ক শূন্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় কর্ম্মের প্রকৃত অর্থই উক্ত হইয়াছে, যথা—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

যাঁহা হইতে জীবসমস্ত উৎপন্ন, যাঁহা-কর্ত্তৃক এই সমুদয় জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, মনুষ্য আপনাপন কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।

অতএব জীব আপনার প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্য্য পূজাবুদ্ধিতে নির্ব্বাহ করিলেই জগৎকর্ত্তার অর্চ্চনা করে এমন বলা যায়। কর্ম্ম শব্দের এই প্রকৃত এবং উদার অর্থ লইয়া, এবং যে কর্ম্ম করি, তাহাই ঈশ্বরের পূজা হউক, মনে মনে এই ভাব স্থিরতর রাখিয়া, আমাদিগের পক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার স্থূল স্থূল কয়েকটি সূত্র সঙ্কলন করা যাইতে পারে। যথা—

১। পারিবারিক। সমস্ত পারিবারিক বিধি একটি মূলসূত্রের অন্তর্ভূত করা যায়। সে সূত্রটি এই,—যাহাতে বাটীর সন্তানদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ হয়, কায়, মন, বাক্য, ব্যবহারে তাহাই করণীয়। তাদৃশ কার্য্যই পারিবারিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা।

২। সামাজিক। সামাজিক কার্য্যসূত্রও একটি হইতে পারে—যাহাতে অন্যের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সম্বর্দ্ধিত হয়, কায়, মন, বাক্য, এবং ব্যবহারে

এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা। কিন্তু এই সাধারণ মূলসূত্র হইতে কয়েকটি বিশেষ সূত্রেরও নির্দ্দেশ হইতে পারে।

(ক) প্রতিবাসী। প্রতিবাসীর প্রতি স্থলভেদে গৌরব, সাম্য এবং দয়া প্রকাশ করিতে হয়। প্রতিবাসীদিগের সুখে সুখানুভব এবং দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়। প্রতিবাসীর সাহায্যদানে সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিতে হয় এবং প্রতিবাসীর স্থানে সাহায্য প্রাপ্তিতেও সঙ্কুচিত হইতে নাই। প্রতিবাসীর সহিত বাক্যালাপ এবং ব্যবহারে অহঙ্কার এবং মাৎসর্য্য এই দুইটি দোষ বিশিষ্টরূপেই পরিহার করিতে হয়। প্রতিবাসীর কোন কাজ করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(খ) স্বদেশীয়। স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালী অথবা ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশবাসী বিশিষ্টরূপেই প্রেমের পাত্র। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত, এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই ভাবটি মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে কথোপকথন করাই ভাল। বাঙ্গালী বাঙ্গালীতে ত ইংরাজীতে না চলাই উচিত। পত্রাদি লিখিতেও ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারতসমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি অল্লায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) ভিন্নদেশীয়। ভিন্নদেশীয়দিগের প্রতি সাহায্য-দানে এবং দয়া-প্রদর্শনে ত্রুটি করিতে নাই।

(ঘ) রাজা। রাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন সুপালিত এবং সুব্যবস্থিত পরিবারের মধ্যে কর্ত্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে হয় না, বাটীর প্রৌঢ়, যুবক, গৃহিণী, বধূ এবং কন্যাগণ, দাস দাসী প্রভৃতি সকলে বিবেচনা এবং ধীরতা পূর্ব্বক আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়—আমাদিগেরও রাজার প্রতি সেইরূপ সম্ভ্রমশীল হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করা উচিত। রাজাকে যত অল্প দেখিতে এবং করিতে

হয়, ততই ভাল। তাহাতে শুদ্ধ সহানুভূতি নয়, প্রকৃত রাজভক্তিও প্রদর্শিত হয়। দেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা বিজাতীয় রীত্যাদির পক্ষপাতী হইয়া অথবা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সাধারণতঃ দেশীয় জনগণের প্রকৃতি, রীতি ও অবস্থার বিপরীত কার্য্যের জন্য রাজব্যবস্থার প্রার্থনা করে, তাহারা অনেক সময়েই রাজাকে নানাপ্রকার অসুবিধায় ফেলে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এদেশে রাজা আপন ইচ্ছাতেই সকল কাজে হাত দিতে যান। কিন্তু সকল কার্য্যেই রাজার হস্তক্ষেপ প্রজার অভিমত নহে, ইহা দেশীয় সকলে একবাক্যে জানাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ সকল কার্য্যে রাজার পূর্ব্বেও আগ্রহ ছিল না, এখনও নাই।

(ঙ) রাজপুরুষ। আমাদের রাজপুরুষ দুই প্রকারের—তিন প্রকারের বলিলেও হয়। এক, বিজাতীয় ইংরাজ রাজপুরুষ। অপর, স্বদেশীয় প্রাপ্তপদ রাজপুরুষ। তৃতীয়, অপ্রাপ্তপদ রাজার স্বজাতীয় লোক।

(চ) বিজাতীয় রাজপুরুষদিগের প্রতি আমাদের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নম্র এবং নির্ভীক হওয়া আবশ্যক। নির্ভীকতা রক্ষার একমাত্র উপায় অতি সাবধানতাপূর্ব্বক সত্যের সম্যক্ পালন। উঁহাদিগের তুষ্টি সাধনের জন্য বিন্দুমাত্রও মিথ্যার প্রয়োগ করিবে না এবং নির্ভীকতা প্রদর্শনার্থেও বিন্দুমাত্র নম্রতার ত্রুটি করিবে না। সমুদায় কথা এবং কার্য্য বিনম্র এবং সত্যপূত হইবে। ইংরাজ রাজ-পুরুষের সহিত কখন আলগা হইয়া কথা কহিতে নাই। উঁহারা ভিন্ন সমাজের লোক। সেই ভিন্ন সমাজের সহিতই উঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি। আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহা বুঝিয়াই কখন কখন ইংরাজীশিক্ষিত দু দশ জনকে দেশীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া পরামর্শাবধারণ করিতে যান। ওরূপে আহূত হইলে প্রত্যেক সুজাত ভারতসন্তানের উচিত যে, রাজপুরুষদিগের অভিমতি বুঝিয়া তাঁহাদের সন্তোষার্থ, অথবা তিনি স্বয়ং যে পাশ্চাত্য প্রণালীর বিশেষ পক্ষপাতী তাহা দেখাইবার জন্য, কিম্বা আপনাদের মধ্যে একজন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিপরীত যুক্তির অবলম্বন করিয়া কয়েকটি ইংরাজী গত বলিবার জন্য, যেন স্বদেশীয় জনগণের প্রকৃত শুভানুষ্ঠানের প্রতিকূল পরামর্শ না দেন।

(ছ) দেশীয় রাজ-পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা যে, লোকে তাঁহাদিগের প্রতিও ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের সদৃশ মানসম্ভ্রম প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের এই অভিলাষ-পূরণ করাই ভাল। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি বিশেষ কর্ত্তব্যও আছে—তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই এমন সাহায্য দান করিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা আপনাপন কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন।

(জ) রাজার জাতীয় লোক, যথা ইউরোপীয় বণিক্, প্লাণ্টর, কলওয়ালা, দোকানদার, পাদ্রি, সম্পাদক প্রভৃতি। কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার লোপ হওয়া অবধি, এই সকল ইংরাজের সংখ্যা এবং ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। দেশীয় লোকের অপেক্ষা ইঁহাদিগের কথার গৌরব বাড়িয়াছে। এইজন্য ইঁহাদিগের প্রতিও কিয়ৎ পরিমাণে রাজ-পুরুষবৎ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ নম্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভীক এবং সতর্ক হইয়া চলাই বিধেয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাইওনিওর কিম্বা ইংলিস্‌ম্যান কিম্বা হেষ্ট কিম্বা ব্রানসন্ অথবা কেসউইকের ন্যায় কোন সম্পাদক, পাদ্রি বা রাজজাতীয় পুরুষ, ভারতবাসীর নিন্দা করিলে, ইংরাজের জাতি বা ধর্ম্ম ধরিয়া প্রতিনিন্দা না করিয়া উঁহাদের গালি দান যে সত্য হয় নাই, মিথ্যা হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ সহকারে দেখাইয়া দিয়া আর কিছু না বলাই বিধেয়। নিন্দাতে ধর্ম্মের রক্ষা হয় না, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষা করিয়া সকল কার্য্যে ঈশ্বরের পূজা করিব, ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এইরূপে সর্ব্বদা সত্যের পালন, সর্ব্বদা সতর্ক থাকা, এবং সর্ব্বদা যথাযোগ্য স্থলে সহানুভূতি প্রদান বিষয়ে উন্মুখ থাকিলেই আমাদেব কার্য্যকলাপে সত্যের, জ্ঞানের, এবং আনন্দের অধিষ্ঠান থাকিয়া উহা সফলতা প্রাপ্ত হইবে।

৩। বহিরাশ্রমিক। সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান গৃহস্থাশ্রমের বহিঃস্থিত বলিয়া বহিরাশ্রমিক বলা যায়। তাঁহাদিগকে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সমাজেরই উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সমাজের হিতের নিমিত্ত আপনাদিগের সুশিক্ষা নির্ব্বাহ ও তদনন্তর সাধুশীলতা ও সংযমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অথবা জ্ঞানের বিস্তার চেষ্টা তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য, এবং তাহাই এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের মুখ্যধর্ম্ম বা ঈশ্বরপূজা।

কর্ত্তব্যনির্ণয়---সূত্রের ব্যাখ্যা

কাহারও কাহারও মতে সমাজই ধর্ম্মের মূল। সমাজ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। সমাজ ছাড়িয়া দেখিলে, সমস্ত প্রকৃতিকার্য্যের মধ্যে কোথাও ধর্ম্মভাব নাই। প্রকৃতিতে, কি জড়ে কি চেতনে, ধর্ম্মও নাই অধর্ম্মও নাই—প্রকৃতি, ধর্ম্মাধর্ম্মভাব-পরিশূন্য। নব্য-ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই এই মত।

আমাদের শাস্ত্রের মত ভিন্নরূপ। পশুদিগের এবং মনুষ্যদিগের সংঘ জন্মিলে, ধর্ম্মের ভাবটি প্রকটিত হয় মাত্র; কিন্তু সমজ বা সমাজ ঐ জ্ঞানের মূল হইতে

পারে না। শাস্ত্র বলেন, অভাব পদার্থ হইতে কোন ভাব পদার্থ জন্মে না। ধর্ম্ম একটি ভাব পদার্থ। যদি উহা জীব-ধর্ম্মের অন্তর্ভূত রূপে না থাকিত তাহা হইলে শুদ্ধ জীবের সঙ্ঘমাত্রে (অর্থাৎ সমজ বা সমাজের সংঘটন মাত্রে) উহা জন্মিতে পারিত না। দ্রব্যের অণুগুলি পরস্পর দূরবর্ত্তী থাকিলে, উহাদিগের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির কার্য্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া যেমন প্রতি অণুতে আকর্ষণশক্তি নাই বলিতে পারা যায় না, এস্থলেও ঠিক তদ্রূপ হয়। জীবের সঙ্ঘ না হইলে উহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু যখন সঙ্ঘ হইলেই ঐ জ্ঞানের কার্য্য দৃষ্ট হয় তখন ঐ জ্ঞান অনুদ্ভূতাবস্থায় জীবধর্ম্মের মধ্যেই আছে, ইহা বলিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মই ধর্ম্মের মূল বলিয়া উক্ত। "উর্দ্ধমূলমবাকৃশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" এই সনাতন অশ্বত্থের মূল উর্দ্ধে, শাখা নিম্নে।

বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান আধিভৌতিক ব্যাপার-সকল একই শক্তির কার্য্য। বিজ্ঞান ইহাও বলিতে উন্মুখ হইয়াছেন যে, আধি-ভৌতিক এবং আধি-জৈবনিক কার্য্যকলাপও একই অভিন্ন শক্তির কার্য্য হইতে পারে। বিজ্ঞান কালে ইহাও বলিতে পারেন যে, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সমস্তও কোন স্বতন্ত্র মূল হইতে হয় না, সেই একই মূলশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। সে পর্য্যন্ত হইলে সামাজিক নিয়মাদি বা ধর্ম্মসূত্রও যে ঐ মূলশক্তির কার্য্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমাদের শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই যে বৈজ্ঞানিক চরম সিদ্ধান্তের সহিত একীভূত হইবে, ইহাই সম্ভবপর—অর্থাৎ আকর্ষণাদি ভৌতিক বা বাহ্যশক্তির মূলেও যাহা, ধর্ম্মজ্ঞানের মূলেও তাহাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে।

"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।"

(গীতায় ভগবান বলিতেছেন) এই চরাচর ভূতসৃষ্টিতে এমন কিছুই নাই যাহা আমা হইতে নয়।

বিজ্ঞানের অতদূর উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে সমাজের উৎপত্তির হেতু যদি কেহ না বলিতে চান, তথাপি ধর্ম্মই যে সমাজের স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র কারণ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া যেমন কোন বাহ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তেমনি সামাজিক কোন কার্য্যই ধর্ম্মসূত্রকে ছাড়িয়া পরিচালিত হইতে পারে না। ধর্ম্মই সামাজিক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্মা।

ভারতসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বলবর্দ্ধনের একমাত্র উপায় ধর্ম্মের

বৃদ্ধি। অপর কোন উপায়ের দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে অথবা স্থায়িভাবে ভারত-সমাজের শুভসাধন হইতে পারে না। যে যে কার্য্য দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে, পরার্থপরতা প্রবল হইবে, সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, আত্মসংযম বর্দ্ধিত হইবে, এবং পাশবভাবের ন্যূনতা হইবে, তাহাতেই সমাজের বলবৃদ্ধি হইবে। যিনিই যাহা বলুন, নিজ সমাজ মধ্যে সহানুভূতি বিস্তারের ব্যাঘাতক, মনের সঙ্কীর্ণতা সাধক, এবং বিলাস-বাসনার উত্তেজক, কোন অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম্য কার্য্য হইতে পারে না।

আজি কালি ধর্ম্মের সহিত সুখের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই লোকের মুখে শুনা যায়। এখন বাঙ্গালা বহিগুলিতে "মনের সুখ" "আত্মপ্রসাদ" প্রভৃতি শব্দের কিছু অধিক পরিমাণেই প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উহা একটি দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিব। কারণ উহাতে ধর্ম্মেরঅপরাপর প্রধানতম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি ন্যূন হইয়া উহার অনিশ্চিত সহচর সুখের দিকেই দৃষ্টির আধিক্য প্রকাশ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভও যে অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপাব, তাহা ঐ সকল জল্পনাদ্বারা প্রকট না হইতে পাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্ম কথাটি বলিতে সহজ, কিন্তু উহা তেমন সহজ বলিবা শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

সে পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, পণ্ডিতেরা ইহাই বলিযাছেন। সুখের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। তাহাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ।
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীত।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুভবতি।
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥

শ্রেয়স্কর এবং প্রীতিকর এই দুইটি বোধের দ্বারা মনুষ্য নানা প্রয়োজনে বদ্ধ হয়; তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে সে সাধু হয়, যে প্রেয়কে বরণ করে তাহার প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না।

অতএব প্রীতিপ্রদ সুখ, মঙ্গলকর ধর্ম্মের চিরসহচর না হইয়া বস্তুতঃ তাহা হইতে দূরগত বস্তু। ধর্ম্ম করিলেই সুখ হয়, যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যবহারের প্রবর্ত্তনার জন্য অলীক প্ররোচনা প্রদান করেন মাত্র। কষ্ট এবং চিন্তা এবং সংযম এবং পরিশ্রম এবং অবধানতা ধর্ম্মকার্য্যের নিত্যসহচর রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহা ধর্ম্মকার্য্যের শুভফল, তাহা প্রায়ই দূরে ফলে, এবং কখন কখন জন্মান্তরের প্রতীক্ষাতেও থাকে। প্রকৃষ্ট সুখের লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

অভ্যাস বশতঃই যাহা রমণীয়, যাহা দুঃখের শেষ করিয়া যায়, অগ্রে বিষের ন্যায় বোধ হয় এবং পরিণামে অমৃতের তুল্য হয়, তাহাকেই আত্মপ্রসাদ-জনক সাত্ত্বিক সুখ বলে।

অতএব আত্মপ্রসাদটিও হাতে হাতে পাইবার বস্তু নয়। সুতরাং সুখপ্রাপ্তির জন্য ধর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া যে ভ্রমসঙ্কুল বিপথপ্রাপক মতটি এক্ষণে দেখা দিয়াছে, সেটির অস্তিত্ব লোপ হওয়াই ভাল। ঐ মতটি যে-বিচারমূলক তাহার ব্যাসবাক্য এইরূপ হইতে পারে, যথা—"এমন কাজ করিব, আর ওরূপ কাজ করিব না কেন?—এমন কাজে ধর্ম্ম আর ওরূপ কাজ অধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম করিব কেন, আর অধর্ম্ম না করিব কেন?"—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া হেতুবাদাশ্রয়ীরা বলেন, 'ধর্ম্মে সুখ তাই ধর্ম্ম করিবে, আর অধর্ম্মে অসুখ তাই অধর্ম্ম করিবে না।' কিন্তু ঐ উত্তর সদুত্তর নয়, কারণ উহা প্রত্যভিজ্ঞা-বিরুদ্ধ। ধর্ম্মের সহিত সুখের যে সম্পর্ক তাহা দূর-সম্পর্ক; কখন কখন বহু অনুসন্ধানেও তাহা দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মে সুখ, তাই ধর্ম্ম করিবে, আর অধর্ম্মে দুঃখ, তাই অধর্ম্ম করিবে না, একথা না বলিয়া বলিতে হইবে যে ধর্ম্ম হইতেই রক্ষা হয়, তাই ধর্ম্ম করিবে; আর অধর্ম্ম হইতে বিনাশ হয়, তাই অধর্ম্ম করিবে না। ধর্ম্ম—ধারণ করে * বা রক্ষা করে, হাতে হাতে সুখ দেয় না। গীতার সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ শ্রীভগবান এই কথাই বলিয়াছেন—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

আমার প্রতি চিত্তস্থাপন করিলে আমার প্রসাদে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইবে, যদি অহঙ্কার করিয়া আমার কথা না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে।

অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখদুঃখের কথা নয়, থাকিবার বা না থাকিবার কথা। এখন ভারতসমাজেরও বাঁচিবার মরিবার কথা দাঁড়াইয়াছে, ইহার সুখের বা দুঃখের কথা অতি দূরগত হইয়াছে। সেইজন্য যে একমাত্র শক্তি সর্ব্বশক্তির মূল, যে

*"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।"—মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব।

শক্তি রক্ষণকার্য্যে সমর্থ, যাঁহার সহায়তায় সকল বিঘ্নবিপত্তি দূর হয়, তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মে এবং সুখে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাধাইয়া দিবার অপর একটা হেতুও আছে। ইংরাজেরা খুব ভাল বাড়ীতে থাকেন, খুব ভাল গাড়ী চড়েন, খুব ভাল খান, ভাল পরেন, অথচ তাঁহারা খুব প্রতাপশালী, বিদ্বান্, বিচক্ষণ এবং দেশে রাজা। এই সকল দেখিয়া লোকের বোধ হইয়া যায় যে, ভোগ-বিলাসের সহিত ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হয়, ইংরাজেরা কি সত্য সত্যই তেমন বিলাসী। স্বদেশে উঁহারা কি ভাবে থাকেন, তাহা ত আমরা কিছুই জানি না, এখানেও উঁহাদিগের বাহ্য আড়ম্বর মাত্র দেখিতে পাই। শুনিয়াছি, অধিকাংশ ইংরাজই যথেষ্ট মিতব্যয়ী। উঁহারা মনে করেন যে, এদেশের লোকেরা জাঁক-জমকে বড়ই গৌরব করে, হয় ত সেইজন্যই দেশীয়দিগের সন্তোষের অথবা ভয় ভক্তি উদ্রেকের উদ্দেশ্যে অতটা বাহ্যাড়ম্বর করিয়া থাকেন। হয় ত, প্রভুতা এবং ধনাধিকার বশতঃ উঁহাদের বিলাসবাসনারূপ কীটের প্রবেশ হইয়া গিয়াছে, পরিণামে কি ফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ যখন ইংরাজ তাঁহার বর্ত্তমান প্রভাবশালিতায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না; তখন তিনি নাচ, তামাসা, গান, বাদ্য, নাটকাভিনয় প্রভৃতি সকল আমোদপ্রমোদের একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সেই সময়ের ধর্ম্ম বলেই এখন ইংরাজ বলীয়ান্ আছেন—বিলাসিতার জন্য তিনি বলীয়ান্ নহেন।

ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত যে সুখদুঃখের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, তাহা আরও এক প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। যদি সুখবোধই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ হইত, তবে ধর্ম্মের বৃদ্ধির সহিত সুখবোধটিরও বৃদ্ধি হইত; আর যদি দুঃখবোধই অধর্ম্মের অব্যভিচারী লক্ষণ হইত, তবে অধর্ম্মের বৃদ্ধির সহিত দুঃখবোধেরও বৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ধর্ম্মের ব্যবহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে, চরিত্রের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যের সুখানুভব ন্যূন হইয়া যায়; পাপের অভ্যাসেও চরিত্রের অপকর্ষ হয়, কিন্তু পাপকার্য্যজনিত দুঃখের বোধও কম হইয়া থাকে। প্রত্যুত, ধর্ম্মকার্য্যে সুখের বোধ অল্প হওয়া, চরিত্রের উৎকর্ষ-লক্ষণ; এবং পাপকার্য্যে দুঃখানুভব অল্প হওয়া, চরিত্রের অপকর্ষের লক্ষণ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং সুখদুঃখকে ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করা একটি মহৎ ভ্রম।

এই ভ্রমাত্মক মতবাদ হইতে ইউরোপে আর একটা মতবাদ সমুত্থিত হইয়াছে। সেটিকে বঙ্গভাষায় 'হিতবাদ' বলা হইয়াছে। এই মতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দিষ্ট না করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মকে বহুসংখ্যকলোকগত সুখদুঃখের লক্ষণাত্মক বলা হয়। যাহাতে অধিকসংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ সুখ হয়, তাহাই ধর্ম্ম; আর যাহাতে অধিকসংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ দুঃখ তাহাই অধর্ম্ম। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মতবাদ অপেক্ষা, এই হিতবাদটি অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহাকেও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এইজন্য সমীচীন নহে যে, ঐ লক্ষণের অর্থ বিভিন্নরূপে এবং প্রয়োগের পথ নানা প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। "অধিক পরিমাণ সুখ" বলিলে কি সুখের কালাধিক্য বুঝিব, না সুখের গভীরতাধিক্য বুঝিব? আর "অধিকসংখ্যক লোক" বলিতে কেমন লোক বুঝিব? বস্তুতঃ, হিতবাদ মতটি প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলিতে সাধারণ লোকদিগের রুচিকর হয় বলিয়াই ইউরোপে উহার নামডাক এত বাড়িয়াছে। উহার প্রকৃত প্রয়োগ বড়ই দুরূহ। কিসে যে লোকের প্রকৃত হিত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রয়োগকালে হিতবাদীরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আপনাপন মনঃকল্পিত জিনিসকেই লোকের হিতকর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে হিতবাদের এই অর্থ করিতে পারা যায় যে, ধার্ম্মিক এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লোকের উপকার হইবে ভাবিয়া যে কার্য্যে উপদেশ দেন, তাহাই ধর্ম্মকার্য্য।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত ॥

প্রত্যুত তাদৃশ উপদেশ প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধির সহিত অভিন্নভাবেই চলিয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বিধির যথাযথ ব্যাখ্যা হইলেই ঐ সকল বিধি যে সমাজরক্ষণ কার্য্যের উপযোগী তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। এইজন্য বিধির প্রতিপালনই ধর্ম্ম (বিধিপ্রতিপালনং হি ধর্ম্মঃ) এবং ধর্ম্মের ফল রক্ষা—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। * শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

ধর্ম্ম কাহারও নিজের মনগড়া হয় না এবং সুখবোধও ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

---

* নহি কার্য্যমকার্য্যং বা সুখং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।
শ্রুতেন জ্ঞায়তে সর্ব্বং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে ॥—(মহাভারত)

ফল কথা, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যে সময়ে যে জাতির হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময়ে যে জাতি স্বকীয় শাস্ত্র বিধি পালনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছে, সেই সময়ে সেই জাতির ভোগসুখাভিলাষ ন্যূন হইয়াছে, আত্মসংযম দৃঢ় হইয়াছে; এবং সেই সময়েই সেই জাতির বল সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে—এবং যথাকালে সেই জাতিই বিপদ্‌জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং বিদ্যাবত্তায় এবং ধনবত্তায় এবং গৌরবসৌরভে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ সকল জাতির ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এবং কীর্ত্তি, ইঁহারা তিন জনেই ভগবান্ ধর্ম্মের চিরসঙ্গিনী।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—সূত্রের প্রয়োগ

ভারতসমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ দুইটি উপস্থিত হইয়াছে। এক, বিদ্যাহীনতা; অপর, ধনহীনতা। ধর্ম্মসূত্র গ্রহণপূর্ব্বক কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা ঐ ভয়ের নিবারণ হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

বিদ্যাহীনতা। ইংরাজের অধিকারে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বলিয়াই লোকের সংস্কার। কি ঐ সংস্কারটি সম্যক্ ভ্রমশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষা দুই প্রকারের। এক, প্রাথমিক শিক্ষা; অপর, উচ্চশিক্ষা; তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এই যে, এ দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলৎ ছিল, উহা এখন তাহা হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই। পূর্ব্বে যে শ্রেণীর লোকেরা পাঠশালায় ছেলে পাঠাইত, এখনও সেই শ্রেণীর লোকেরাই পাঠায়, তন্নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা এখনও ছেলে পাঠায় না। ইংরাজদিগের স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষাটি নিতান্তই নূতন ব্যাপার। ইংরাজেরা আপনাদিগকে সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। অতএব তাঁহাদের দেশে যাহা ছিল না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই এদেশে আছে, এ কথা উঁহাদের মনে স্থান পায় না। এইজন্যই উঁহারা আপনাদিগকে এখানকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তক, অন্ততঃ তাহার বিস্তার-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেশের দারিদ্র্যবর্দ্ধনের সহিত কি প্রাথমিক, কি উচ্চ, কোন শিক্ষারই বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত সঙ্কোচই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ত বিস্তারে বাড়ে নাই, গভীরতায় কিছু ন্যূন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কি নীতি অর্থাৎ গুরুজনে ও দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি, কি মানসাঙ্ক, কি হস্তাক্ষর, কিছুতেই

এখনকার পাঠশালার ছাত্রেরা পূর্ব্বকার পাঠশালাব ছাত্রদিগের সহিত তুলনীয় নহে। এদেশের বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ওরূপ শিক্ষার হ্রাসবৃদ্ধিতে বর্ত্তমান কালে ভারত-সমাজের বিশিষ্ট হিতাহিত কিছুই হইতে পারে না। যখন ইউরোপীয়দিগের কোন প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না, তখন হইতেই উঁহারা প্রবল হইয়াছেন ; আর ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই লিখিতে এবং পড়িতে পারে, তাহাতে ব্রহ্মদেশ, কি ধনে, কি ধর্ম্মে, কি গৌরবে, কিছুতেই বড় হয় নাই।

এখনকার ইংরাজী উচ্চশিক্ষা দেশীয় উচ্চশিক্ষার অনেকটা স্থান অধিকার করিযাছে। যেমন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হইতেছে, তেমনি সংস্কৃত এবং আরবী ফারসী কম হইয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ বাড়িয়াছে, কিন্তু টোল, চতুষ্পাঠী, আখড়া, মাদ্রাসা কমিয়াছে। তবে যে সকল শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা ছিল না তাহাদের মধ্যেও কতকটা ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে। তাহা করিলেও শুনিতে পাই যে এখনও সমস্ত বাঙ্গলা প্রদেশে ইংরাজী-স্পৃষ্ট লোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজারের কম। এখানে যে ইংবাজী বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তাহাও পূর্ণাবয়ব নহে। ইংলণ্ডের প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রেরা যে সকল বিষয় শিক্ষা করে, এখানকার স্কুলকলেজের উচ্চ শ্রেণীগুলিতেও সে সকল বিষয় তেমন শিক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানই ইউরোপীয় বিদ্যার সারাৎসার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনা নাই বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্প শুনা হয মাত্র। বিজ্ঞান অফল শাস্ত্র নয়। উহা সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে এত দিনে তাহার সমূহ ফল দৃষ্ট হইত। দেশে কল-কারখানা বাড়িত এবং বিজ্ঞান-শিক্ষিতেরা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদেব এবং আচারের প্রতি সজ্ঞান-ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, আর্য্যশাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মনুষ্যের সাধনচেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবচ্ছিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে অপরাপর দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্য্য-শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্য্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিজ্ঞান আরও অনেক দূব অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌঁছিতে পারিবেন।

অতএব আমরা এ পর্য্যন্ত যে প্রাথমিক বা উচ্চ শিক্ষা পাইতেছি তাহার দ্বারা কোন প্রকৃত শুভ ফল লাভ হয় নাই বলিলেই হয়। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির লোপ, ক্ষতি এবং অকার্য্যে প্রয়োগ হইয়া, দেশীয়

উচ্চশিক্ষার পত্তন হইয়াছে। দেশের শিক্ষকবর্গ তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উঁহাদিগের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য এবং উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করাই এক্ষণকার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ভারতসমাজ রক্ষার উপযোগী অপর কোন কার্য্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে মঠাদি প্রতিষ্ঠার যে ভূয়সী প্রশংসা আছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

উপাধ্যায়স্য যোবৃত্তিং দত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।
কিন্নদত্তং ভবেৎ তেন ধর্ম্মকামার্থমিচ্ছতা॥

যে ধর্ম্ম কাম এবং অর্থ সাধনেচ্ছুক ব্যক্তি উপাধ্যায়কে বৃত্তি দান পূর্ব্বক দ্বিজগণকে অধ্যাপিত করেন, তিনি কি না দিলেন ?

ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা করাও আমাদের অপর একটি রক্ষণোপায়। সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে সাধিত হইলে, উহা একটি প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্যই হইবে। শাস্ত্রে বিধি আছে—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
... ...
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।

অবর লোক হইতেও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভকরী বিদ্যার গ্রহণ করিবে।···সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্পবিদ্যার সমানয়ন করিবে।

দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দুই প্রকারে হইতে পারে। এক, স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাতে বেতনভোগী শিল্প-বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোকের দ্বারা দেশীয়দিগের শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া। অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা। এই দুই উপায়ের মধ্যে জাপানীয়েরা স্বদেশে দ্বিতীয় পথটি লইয়াছে, চীনীয়েরা কিয়ৎ পরিমা.ণ প্রথম পথটিরই অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয় পথই যুগপৎ অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। তবে ইউরো:প লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ, প্রমোদ, বাহাদুরী, সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত-

যাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাতফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য ভক্তিভাবে আগ্রহ ও দীনতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও দু এক স্থলে ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণোবিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ ॥

ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন; স্বয়ং ব্রাহ্মণাচার থাকিবেন।

অতএব যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপর, সংযতেন্দ্রিয় এবং আত্মগৌরববিশিষ্ট সুতরাং আত্মসমাজত্যাগে অনিচ্ছু, এমন লোকদিগকেই পাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটিলে বিদেশীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শিল্প ঐ রূপেই আসিয়াছিল। ইরান, স্তাম্বল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারুকরেরা আসিয়া গালিচা, বিদ্রি বন্দুকাদি শিল্প এ দেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

দেশীয় যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পাদি এখনও নানা স্থানে সজীব আছে তাহার শিক্ষা এবং রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করাই উচিত।

বিদ্যাহীনতা নিবারণ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বক্তব্য। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা শাস্ত্রের ফল এবং সিদ্ধান্তের প্রতি অল্প দৃষ্টি করিয়া বিচার-মল্লতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহাতে তথ্য-জ্ঞানের প্রতি ক্রমশঃ অমনোযোগ হইয়া পড়ে, এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতাই ন্যূন হইয়া যায়। বিদ্যাবত্তা এবং বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও তথ্যোপলব্ধি উচ্চতর শক্তি। ইহাই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিপাক। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি ॥

পরব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, সত্যই পরম তপস্যা, সকল ক্রিয়াই সত্যমূলক, সত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

বিজ্ঞানের অনুশীলনে তথ্যোপলব্ধি তেজস্বিনী হয়। এইজন্য সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রাদি শিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন হওয়া অত্যাবশ্যক।

সে সম্মিলন যে সাধিত হইতে পারে, তাহা বারাণসী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার বালাণ্টাইন্ সাহেব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাহেব যে অভিপ্রায়েই ঐ সম্মিলনের জন্য সচেষ্ট হউন, আর্য্যধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বাস্তবিক বিরোধ নাই। সুতরাং তিনি ছাত্রবর্গকে যে পথে চালাইবার যত্ন করিয়াছিলেন, সে পথে আমাদেরই অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

আর এক বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে। অপর সকল দেশে তত্তদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের হইতেই ক্রমশঃ জনসমাজে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তৃত হয়। আমাদের দেশের রাজকর্ম্মচারীরা বিদেশীয় এবং তাঁহারা কার্য্যাবসানে এ দেশে থাকেন না। এই জন্য দেশের অবস্থা এবং রাজকার্য্য বিষয়ক জ্ঞানলাভ আমাদিগের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে। তজ্জন্য রাজনৈতিক সভা সকলের অত্যাবশ্যক। ঐ সকল সভায় রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা রাজনীতির আলোচনাতেই বিশেষ ফল দর্শিবে। কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, তাহা অবধারণের পূর্ব্বেই এখন তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠিতে থাকে। দেশের নানা স্থানে সভা স্থাপিত হইয়া রাজনীতি বিষয়ে পড়াশুনা এবং বিচার ও অনুসন্ধান হইতে থাকিলে, বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট লোকমাত্রেরই রাজনৈতিক বিষয়জ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সম্বর্দ্ধিত হইবে এবং কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সে সকল লোক আর ইংরাজী গতে ভুলিবেন না এবং হুজুকে মাতিবেন না—আপনাদের তথ্যজ্ঞানের উপরে চলিতে পারিবেন।

অতএব বিদ্যাহীনতার পরিহারার্থে সমাজের করণীয় (১) দেশীয় শাস্ত্র-শিল্পাদির প্রগাঢ় চর্চ্চা, ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, (৩) শাস্ত্রালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এবং (৪) রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনার সভা স্থাপন।

ধনহীনতা।—ধনহীনতা পরিহার করিবার উপায় তিনটি। এক, ব্যয়ের লাঘব, দ্বিতীয় ক্ষতির নিবারণ, তৃতীয়, আয়ের বৃদ্ধি সাধন। আমাদের দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ বিলাসী নহেন। ইঁহারা ইহলৌকিক ভোগসুখের দিকে তেমন মগ্ন হইতে পারেন না ; পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা পারলৌকিক সুখের দিকে ইঁহাদিগকে মতি দিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া ইঁহারা ক্রমশঃ বিলাসী এবং ব্যয়শীল হইয়া পড়িতেছেন। আবার ইউরোপীয়েরা এত প্রকারের নূতন নূতন অর্থাপচয়ের পথ এবং রাজপুরুষে ভক্তি প্রদর্শনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সেই সকল পথ দিয়া দেশীয়দিগের ধনভাণ্ডার হইতে অজস্রধারে অর্থের নির্গম হইয়া যাইতেছে।

ভারতবাসী সাধারণতঃ বিলাসী নহেন, কিন্তু সাধারণতঃই দানশীল। পূর্ব্বে দানশীলতা নিবন্ধন দেশের কোন হানি হইত না। দেশের ধন দেশেই থাকিত। কিন্তু এখন ঐ দানশীলতার মুখ ক্রমশঃ ফিরিয়া যাইতেছে। পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে, দেবপূজায়, এবং কন্যাপুত্রাদির বিবাহে যে দান হইত তাহাতে দেশের টাকা দেশেই থাকিত। এখন ঐরূপ দানেরও কিয়দংশ দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। এখন ইউরোপীয় দোকানদারেরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন ৺দুর্গাপূজাপর্ব্বোপক্ষে প্রস্তুত ইয়র্ক সাইয়রের হাম (শূকর মাংস) বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে—মূল্য সেরকরা —টাকা।" পর্ব্ব, উৎসব এবং ক্রিয়াদির উপলক্ষেও ইউরোপীয়দিগের নিমন্ত্রণ না করিলে নয়! ইউরোপীয় অতিথিবর্গ স্বজাতিবৎসল। তাঁহারা এতদ্দেশীয় কোন দ্রব্য দেখিয়া অথবা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করেন না। তাঁহারা দ্রব্য সরঞ্জাম বিলাতী এবং খাদ্যসামগ্রী খাস্ ইউরোপীয় দোকানদারের প্রস্তুত না দেখিলে প্রায়ই ঘৃণা প্রকাশ করেন। দেশীয় নিমন্ত্রণকারীরা কি করিবেন, আপনাদের ঘর, বাটী, আসবাব, গাড়ী, ঘোড়া এবং উপভোগ্য সমস্ত দ্রব্য ইউরোপীয় রুচির যোগ্য করিয়া রাখিতে বাধ্য হয়েন। এবং ক্রমশঃ আপনারাও বিকৃতরুচি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাই ঈশ্বরীপূজার উপলক্ষে ইংলণ্ডের ইয়র্ক সাইয়র প্রদেশে ভারতবাসীর টাকায় শূকরমাংস প্রস্তুত হয়!

দেশীয় জনগণকে এরূপ ক্ষুদ্রাশয়তা এবং চিত্ত-দৌর্ব্বল্য ছাড়িতে হইবে। তাঁহারা যদি স্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতি বিস্তারের যত্ন করেন, তাহা হইলেই ইউরোপীয় অনুকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পারিলে ইংরাজ-জাতির চক্ষেও গৌরবান্বিত হইবেন। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজ স্বভাবতঃ খোসামোদ ভালবাসিতে পারেন না। এবং ধনিগণ তাঁহাদের মন রাখিবার জন্য যেরূপে নিজদেশের, পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া চলেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি মনে মনে তাচ্ছিল্যই করিয়া থাকেন। ভারতবাসীকে প্রতি হুজুকেই না মাতিতে দেখিলে ইংরাজ ভারতবাসীর অধিকতর গৌরব করিবেন। কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সময়বিশেষ বলিয়াছেন—"মহারাজা আমাদিগকে খানা এবং নাচ দিবার জন্য আজি —র স্থানে —হাজার টাকা ধার করিয়াছেন। পাগলেরা কেন এরূপে অর্থব্যয় করিয়া নষ্ট হয়।"

অতএব নিজের ভোগসুখের ইচ্ছা (যদি কিছু থাকে) তাহা ন্যূন করা এবং ইউরোপীয়দিগের মনরক্ষা বা খোসামোদের নিমিত্ত যে ধন ব্যয় হয়, তাহার লাঘব করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাহা হইলে পূর্ব্বকালে যেমন পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা এবং

মঠপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জলাশয় সংস্কারাদি ও চতুষ্পাঠী স্থাপন হইত, এখনও তাহা হইয়া দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা যে অত্যুচ্চ পুণ্যকার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। দেবমন্দির, কূপ, জলাশয়াদির সংস্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা তু লভতে মৌলিকং ফলম্।

অতএব সংস্কারকর্ত্তাও প্রতিষ্ঠাতার ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন। ফলতঃ পূর্ব্বকালের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা পুষ্করিণ্যাদি প্রায়ই যথাযোগ্য স্থান সকলে বিদ্যমান আছে। সেগুলি পঙ্কিল বা ভরাট হইয়া যাওয়াতে অনেক প্রকারে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। এই জন্য নূতন পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা বদ্ধ, পচা ও পুরাতনের সংস্কারই এখন অধিকতর প্রয়োজনীয়। এইরূপে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান এবং দূষিত ভূম্যাদিভাগের উদ্ধার একই কার্য্যের দ্বারা হইয়া গেলে এদেশে একমাত্র সদাচার রক্ষা দ্বারা চিরকাল যেরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া আসিয়াছে তাহাই চলিতে পারিবে। সেজন্য অন্য প্রকার ব্যাপকতর চেষ্টার আবশ্যক হইবে না।

এখন মূলধনের বিশিষ্ট বিনিয়োগ ব্যতিরেকে ধনবৃদ্ধির কোন উপায়ই হইতে পারে না। এই জন্যও ধনের অনর্থ ব্যয় করিতে নাই। শাস্ত্র বলেন—"নাকার্য্যে ধনমুৎসৃজেৎ।"

দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে। দেশীয় শিল্প কতকটা রক্ষা করিতে পারিলে দেশের ধনক্ষতি নিবারণ হয়। দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া আমাদের অবশ্যপোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশপ্রসূত বিলাস-দ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। কতক আবশ্যকীয় দ্রব্য (যথা শিশি, বোতল, পেন্সিল, ঘড়ি প্রভৃতি) এদেশে প্রস্তুত হয় না। যতদিন ঐগুলি এদেশে প্রস্তুত না হয় ততদিনই বিদেশজাত ঐরূপ দ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাতে ঐ সকল জিনিস এদেশে প্রস্তুত হয় সে জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং এদেশে প্রস্তুত হইলে আর সেই সকল জিনিস বিদেশ হইতে লওয়া উচিত নয়। একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, এদেশে কোথাও না কোথাও প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস এখনই পাওয়া যায়। তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, পুস্তকাদি, যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায়, তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া উচিত।

আর এক প্রকারেও ব্যয় লাঘবের এবং ক্ষতি নিবারণের পথ আছে। এখন মোকদ্দমা মামলায় বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই ধন এবং ধর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে। অতএব সকল কথাতেই রাজদ্বারে নালিশবন্দ হইবার যে অশুভকারী প্রবৃত্তি প্রবলা হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তির সম্যক্ দমন করা উচিত। দেশীয় বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ এবং চরিত্রবান্ লোকদিগকে মধ্যস্থ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের বিবাদ আপনারাই ঘরে ঘরে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে আরম্ভ কবিতে হইবে। তাহা হইলে উৎসন্ন যাইবার একটি অতি বিস্তৃত পথই বন্ধ হইবে।

দেখিতে দেখিতে দেশের অন্তর্বাণিজ্যও ইউরোপীয় বণিক্বর্গের হস্তগত হইয়া যাইতেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে আমরা অনেককালাবধি অপসৃত হইয়া আছি। উহা দাক্ষিণাত্য ভাগে অতি অল্প মাত্রাতেই এখনও আছে। কিন্তু এখন আমাদের দেশের নদীগুলিতেও বিদেশীয়দিগেব বাষ্পীয় তরীর যোগে আমদানি রপ্তানি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে দেশীয় মহাজনদিগের লভ্যাংশও বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। অতএব কোন সম্প্রদায়ের লোকেই আর এখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন না। যদি সকলে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বৃত্তিরক্ষার নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে পারেন তবেই সমাজের বল রক্ষা হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম সাধন হয়।

দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য প্রথমতঃ দুই তিন জন করিয়া ধনশালী ব্যক্তি সম্মিলিত হউন। ইউরোপ হইতে কল এবং কারিগর আনয়ন করুন, এবং কারবারের নামে অংশ (শেয়ার) খুলিয়া সাধারণের স্থানে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক অতি সাবধানে সত্যনিষ্ঠ এবং বাঙ্নিষ্ঠ হইয়া কারবার আরম্ভ করুন—প্রতি কারবারের মধ্যে যেন দুই একজন মাড়বারি, বা সাহু বা শ্রেষ্ঠী, অথবা তিলি, তামুলি, বণিক্ প্রভৃতি বৈশ্য ধর্ম্ম পালনে নিপুণ লোক থাকেন। ভারতবর্ষে সকল কারবারই অত্যুত্তম রূপে চলিতে পারে। এখানে সকল কারুকার্য্যের উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে শ্রমজীবীর বেতনও অল্প, এখানে অধ্যবসায় এবং কার্য্যকরী শিল্পবিদ্যা সম্মিলিত হইলেই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। দেশীয় ধনশালিবর্গ এবং তাঁহাদের সহকারী হইয়া মধ্যবিত্ত লোকেবা এখনও এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হউন। নচেৎ এদেশে ইউরোপীয়েরাই সকল কারবারে হাত দিবেন এবং আমাদের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে তিরোহিত হইবে—আমরা মজুবদার হইয়াই থাকিব। ইংলণ্ডে শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘটে জয় লাভ করিয়া আপনাদিগের বেতন ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। তথায় শ্রমজীবীর বেতন আবও বাড়িবে। তাহাতে মূলধনীর

লাভ আরও কমিবে। সুতরাং ইংলণ্ডের ধনীরা স্বদেশের বাহিরে আসিয়া কারবার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইবেন, এবং ভারতবর্ষের ন্যায় তাঁহাদের সুবিধার স্থান আর কোথাও পাইবেন না। অতএব এখন হইতেই দেশীয়দিগের মধ্যে সম্মিলনে এবং কারবারে প্রবৃত্তি জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নচেৎ রক্ষা নাই। শাস্ত্রে যৌথ কারবারের বিধি আছে—

সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথাদ্রব্যং যথা বা সম্বিদা কৃতম্॥

বণিকেরা লাভের নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইয়া ব্যবসায় করিবেন। যিনি যেমন মূলধন দিবেন, অথবা যেরূপ নিয়ম নিরূপিত হইবে, তদনুসারে ফলভাগী হইবেন।

অতএব ধনহীনতা পরিহারের উপায় (১) বিলাসিতার পরিহার (২) অকার্য্যে অর্থব্যয় পরিহার (৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব (৪) দেশীয় সালিসের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি (৫) যৌথ কারবারের দ্বারা শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি।

বিদ্যা- ও ধনহীনতা বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভারতবাসীর (১) আয়ুর খর্ব্বতা ও (২) সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণে চেষ্টা করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আয়ুর খর্ব্বতা। ভারতবাসীর আয়ু খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। দারিদ্র্য-বৃদ্ধি তাহার মুখ্য কারণ। যদি ধনহীনতার নিবারণ হয় তাহা হইলে আবার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। ইংলণ্ডনিবাসী ইংরাজদিগের পরমায়ু গড়ে প্রায় তিন বৎসর বাড়িয়াছে।

ভারতবাসীর পরমায়ু খর্ব্ব হইবার অপরাপর যে সকল কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আচারভ্রষ্টতাই প্রধান। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের পক্ষে স্বদেশীয় শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ। ঐ আচারই এদেশের যোগ্য। উহার রক্ষায় আয়ুর বৃদ্ধি, উহার ত্যাগে আয়ুক্ষয় হয়। শাস্ত্রীয় আচার বলিলে লোকে ব্রত উপবাসাদি মনে করেন। কিন্তু যোগাভ্যাসের জন্যই কঠোর ব্রত উপবাসাদির উপদেশ। অর্থসাধনের পক্ষে শরীরক্ষয়কর ব্রতাদি নিষিদ্ধ।

"সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থান্ অক্লিশ্নন্ যোগতস্তনুম্।"

গৃহাশ্রমী যোগ দ্বারা শরীর ক্ষীণ না করিয়াই অর্থের সাধন করিবে।

শাস্ত্রানুসারী হইয়া পবিত্র আহার এবং পানীয় গ্রহণ, বিহিত আবাস এবং

পরিমিত ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে শরীর সুস্থ সবল, এবং দৃঢ় হয় এবং সন্তানও সুস্থশরীর এবং দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন,—

আচারাল্লভতেহ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।

আচার হইতে আয়ুর বৃদ্ধি হয়, এবং অভীষ্টরূপ সন্তান জন্মে।

সমাজ-সংস্কার। ভারতসমাজের সংস্কার করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া একটা তুমুল গোল উঠিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কারের চেষ্টা উচিত কি না, কেমন সূত্র ধরিয়া কোন্ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কারকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে দৃক্‌পাত নাই, অথচ সংস্কারের জল্পনা সর্ব্বত্র। সংস্কারকের দল অসংখ্য। অতএব মূল সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কি হয়, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

সমাজপ্রচলিত কোন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনকে সমাজের সংস্কার বলে। ঐরূপ সংস্কার-কার্য্য যে ভারতবর্ষে অনেকবার হইয়াছে, তাহা স্মৃতিসংহিতা এবং পুরাণাদি হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সকল সংস্কার অন্ধ অনুকরণমূলক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। একটি স্থলে কোন্ কারণে এবং কি প্রণালীতে সংস্কারকার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়া আছে। স্মার্ত্তশিরোমণির উদ্ধৃত কয়েকটি পৌরাণিক বচনের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥

লোকের রক্ষার নিমিত্তে, কলির পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে, মহাত্মগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্য সকলের নিবারণ হইয়াছিল। সাধুদিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়মও বেদতুল্য প্রমাণিত হয়।

অতএব উল্লিখিতরূপে, অর্থাৎ সমাজের রক্ষার নিমিত্তে, নিবৃত্তিমার্গে যে সমাজ-প্রণালীর সংস্কারচেষ্টা তাহা অশাস্ত্রীয় নহে। তবে চেষ্টাটি (১) সমাজের রক্ষার নিমিত্ত, অতএব রক্ষাকার্য্যের অনুকূল যে ধর্ম্ম তাহার অনুগত হওয়া আবশ্যক এবং (২) মহাত্মগণের অর্থাৎ অনেক প্রধান ব্যক্তির অনুমোদিত, সুতরাং কোন একব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নয়, এবং পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে, সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মতি-ক্রমে হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ সংস্কারের ব্যবস্থা বেদের সদৃশ মান্য হইবে।

কিন্তু এখন সমাজ-সংস্কারের যে চেষ্টা হয়, তাহাতে (১) প্রবৃত্তিমার্গে বিদেশীয় রীতির অনুকরণেচ্ছাই বলবতী থাকে ; (২) ব্যক্তি বিশেষের বাহাদুরীর প্রখ্যাপন হয় ; এবং (৩) দেশীয় পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই তাহার একটি মুখ্য অঙ্গ। তদ্ভিন্ন, বৈদেশিক রাজার সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নব্য সংস্কারকদিগকে অতিশয় লালায়িত হইতেই দেখা যায়—সুতরাং আত্মসমাজের সংরক্ষণ ঐ সকল সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না।

কিন্তু স্বদেশীয় বিদ্যার বাহুল্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চ্চা এবং প্রচার, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা, যৌথকারবারের বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তার, সালিসি প্রণালীর সম্বর্দ্ধন, সদাচার পালন—এইরূপ বিষয়গুলিতে চেষ্টার দ্বারা সমাজের যে সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহাতে দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অনভিমতি হইতে পারে না, তাহাতে রাজসাহায্যের প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের রক্ষা-সাধন হয়।

উপসংহার

ভারতবর্ষের অতি উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র আছে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব বলিয়া যে কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে তাহা আমার জানা নাই। সমাজতত্ত্ব ইউরোপের একটি নূতন শাস্ত্র। উহা ইতিহাসমূলক বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাসমূলকও বটে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে ঐ শাস্ত্রে এখনও কল্পনার প্রভাব বলবান। এখনও উহাতে লেখকের যদৃচ্ছাসম্ভূত মতামতগুলিই সমধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ হয়। যাহা সার্ব্বভৌমিক সমাজসূত্র বলিয়া নির্ণীত তাহাও সর্ব্বস্থলে দেশবিশেষের সমাজ-সূত্র নয়।

এইজন্য ইউরোপীয়দিগের সমাজ-তত্ত্ব হইতে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিণতি বিশিষ্টরূপে নির্ণয় করিবার সুগম পথ পাওয়া যায় না। ওখানকার কোন গ্রন্থে ভারতবর্ষের অবস্থাপন্ন কোন দেশের কোন কথাই নাই। যাঁহারা শুদ্ধ আপনাদিগের মনঃকল্পিত সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও কেহ পরাধীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। যদি কোন গ্রন্থকার প্রসঙ্গতঃ

বিদেশ বিজয়ের কোন উল্লেখ করেন, তাহাতে ঐ কার্য্য যে অতি দূষ্য এবং বিজেতা এবং বিজিত উভয়ের অপকর্ষ-জনক, এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। প্রত্যুত বৈদেশিকের সংস্রবে সমাজের কি প্রকার পরিবর্ত্ত হইতে পারে, ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ যেন বিশেষ যত্ন পূর্ব্বকই সে বিষয়ে কোন কথা কহেন না। নব্য ইউরোপের বেকন নামক অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তাঁহার মনঃকল্পিত আদর্শ-সমাজে বৈদেশিকদিগের প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, এবং তৎসমাজস্থ কতিপয় মহামহোপাধ্যায়ের পক্ষে যদিও বিদেশভ্রমণ শুভকর বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সম্বন্ধেও বিদেশভ্রমণ অতি ছদ্মবেশে এবং গুপ্তভাবে করণীয়, এই কথা বারবার বলিয়াছেন।

ফলতঃ, বৈদেশিকের অধিকার সমাজের হানিকর এবং বৈদেশিকের অধিকারে সমাজের জীবনচ্যুতি হয়, ইহাই ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের অভিমতি। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস, এই দেশের বর্ত্তমান বৈদেশিক অধিকারকে, তেমন সর্ব্বতোভাবে বিষবৎ দুষ্ট বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করে না; প্রত্যুত সমস্ত মহাদেশে অবিচ্ছিন্ন শান্তির রক্ষা এবং একচ্ছত্রে ক্রমশঃ দৃঢ়তর সম্মিলন, এই দুইটি চিরাভিলষিত বস্তু, ভারত-সমাজ ইংরাজ হইতে প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া এখানে ইংরাজ-অধিকারের স্থায়িত্বই প্রার্থনীয় বলে; অথচ ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিৎদিগের কথাকে একান্ত মিথ্যা না করিয়া বৈদেশিক অধিকারের যে সমূহ দোষ আছে, তাহাও দেখাইয়া দিয়া ভারতবাসীকে চক্ষুষ্মান্, অবহিত এবং আত্মদোষ-সংশোধনে যত্নবান্ হইতে বলে।

বস্তুতঃ ভারত-সমাজের ভাবী অবস্থার অনুমান করিবার জন্য মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ত এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই বিচার করিতে হয়; অপরাপর দেশের ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বাভিহিত গ্রন্থাদি হইতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায় মাত্র। ঐ ইতিহাসাদি হইতে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের সূত্র গ্রহণ করা, অথবা এই সমাজের পরিণতির নিয়মাবধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ভারতবাসীর সমাজ-তত্ত্ব অপর একটি কারণেও ইউরোপীয়দিগের সমাজ-তত্ত্ব হইতে ভিন্নরূপে বিচার্য্য।

সমপ্রকৃতি কোন একটি মাত্র বস্তুতে পরিণতি সংঘটন হয় না। বিভিন্ন বস্তুর সমবায় হইতেই পরিণতির প্রবৃত্তি হয়। এ নিয়মটি জাগতিক সকল কার্য্যের পক্ষেই খাটে। বাহ্যব্যাপারেও যেমন একাধিক দ্রব্যের সমবায়েই দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, তেমনি অভ্যন্তরীণ কার্য্যেও একাধিক ভাবের সমবায়ে ভাবান্তর আইসে।

সামাজিক পরিণতিও এই নিয়মের অধীন। প্রতি সমাজের মধ্যেই বিভিন্নাবস্থ এবং বিভিন্ন-প্রকৃতিক লোকসকল বিদ্যমান থাকে। তাহাদিগের পরস্পর সংযোগে সমাজের অভ্যন্তরে বিবিধরূপ পরিবর্ত্ত সাধিত হয়। কিন্তু তাদৃশ পরিবর্ত্তস্রোতঃ চিরকাল সমান বেগে চলে না। সম্মিলনের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের অভ্যন্তরে বহু পরিমাণেই সাম্যাবস্থা অবস্থাপিত হইয়া যায়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এবং বিবিধ দ্বীপাবলী নিবাসী বর্ব্বরেরা আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলির গঠন করিয়া বহুকালাবধি সমভাবেই রহিয়া গিয়াছিল। যদি ইউরোপীয়েরা তাহাদিগের বিনাশসাধন না করিতেন, তাহা হইলে তাহারা চিরকাল সেই একভাবেই থাকিতে পারিত, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

তাদৃশ সাম্যাবস্থ সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে একটি সমপ্রকৃতিক বস্তুর ন্যায় হইয়া থাকে এবং তাহাতে বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত্ত চলে না। কিন্তু যদি ঐ সাম্যাবস্থ সমাজের মধ্যে কোন নূতন লোকের অথবা নূতন ভাবের সমাগম হয়, তবে সেই ভিন্ন উপাদানের সংযোগে আবার পরিণতির বেগবত্তা জন্মে এবং পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পবিবর্ত্তস্রোতঃ চলিতে থাকে।

সাম্যাবস্থার এবং পরিবর্ত্তের এই পর্য্যায়ক্রম ভারতভূমিতে অতি বহু পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ভারত-সমাজের উপাদান মূলতঃই অতি বিভিন্ন-প্রকৃতিক ; তদ্ভিন্ন, এদেশের ধনবত্তার বিপুল খ্যাতি বহুকালাবধি বৈদেশিকদিগকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে অথবা বিজিগীষায় এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছে। এইজন্য ভারতসমাজের পরিণতি-কার্য্য বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে এবং কখনও স্থগিত-গতি হইতে পারে নাই। অন্যান্য প্রাচীন-জাতীয়েরা কেহ বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেহ বা বহুকালাবধি কোন নূতন উপাদানের সমাগম অভাবে অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ভাবেই আছে। তাহাদের তুলনায় ভারতসমাজের পরিণতিসূত্র যে সাতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ঐ সূত্র সুদীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া যে, উহার সহিত নব্য ইউরোপীয়দিগের পরিণতিসূত্রকে জুখিয়া কোন্‌টি বড় কোন্‌টি ছোট, অবধারিত করিতে পারা যায়, তাহা নহে। যদি সকল সমাজের পরিণতি একই প্রণালীক্রমে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা হইলেই ঐ প্রকার জোখা দেওয়া চলিতে পারিত এবং তাহা হইলেই কোন্ সমাজ অগ্রবর্ত্তী এবং কে বা পশ্চাদ্বর্ত্তী, তাহা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু সকল মনুষ্যসমাজের পরিণতিব্যাপার একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না।

যেমন বাহ্যব্যাপারে দেখা যায়, দ্রব্যের উপাদানের ভিন্নতা নিবন্ধন সমুৎপাদিত মিশ্রপদার্থের ভিন্নতা জন্মে, সেইরূপ সামাজিক উপাদানের ভিন্নতা হইতেও সামাজিক পরিণতির প্রকার-ভেদ হয়। ভারত-সমাজের প্রধানতম উপাদান—কল্পনাপ্রবণ বিবিধ অনার্য্য জাতি এবং কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বোধে পটুতম আর্য্যগণ। ইউরোপীয় সমাজের উপাদান—রোমীয়দিগের শাসনগুণে একীকৃত সুসাহসিক কেল্টীয় লোক এবং সাতিশয় স্বাতন্ত্রিক এবং স্বৈরস্বভাব টিউটোনীয় বর্ব্বরগণ। এইরূপ অতি বিভিন্ন-প্রকৃতিক উপাদানের সমবায়ে সংঘটিত সমাজদ্বয়ে মূলতঃই ভেদ থাকায়, উভয়ের পরিণতি একই প্রকার হইতে পারে নাই। শুদ্ধ উপাদানের ভিন্নতাও নহে—ভারত এবং ইউরোপীয় সমাজে তাহাদের স্ব স্ব উপাদানের বিনিবেশও ভিন্নরূপ হইয়াছিল। ইউয়োপীয় সমাজের নিম্নস্তরে রোমের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা, উপরিস্তরে রোম-বিজেতাদিগের বর্ব্বরতা; ভারত-সমাজের নিম্নস্তরে অনার্য্যদিগের বর্ব্বরভাব, উপরিস্তরে আর্য্য-সভ্যতার সমাবেশ। এরূপ স্তর-বিন্যাসের ভেদ হইতেও পরিণতি-সূত্রের ভেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

এই সকল কারণে ভারতবর্ষের সহিত অন্য কোন প্রাচীন অথবা নব্য জাতীয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উপমান-উপমেয়-সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে না। এবং সেইজন্য ইউবোপীয় সমাজের সূত্র ধরিয়া ভারত-সমাজের পরিণতির বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাই করা হয় বলিয়া, সমূহ ভ্রম জন্মিয়া যাইতেছে। এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারত-সমাজের পরিণতি ব্যাপার এখনও ইউরোপের পশ্চাদ্বর্ত্তী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ইউরোপের বহু বিগত শতাব্দীব অনুরূপ। অপর কেহ বলেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে এখনও জাতীয়ভাব পর্য্যন্ত জন্মে নাই।

ইউয়রাপীয় সমাজেব ভিত্তিস্বরূপ বোম-সাম্রাজ্যের উপরিস্তরে বর্ব্বর-জাতীয়দিগের অবস্থান, ভারতবর্ষে বর্ব্বরদশাপন্ন বিবিধ জাতীয় লোকের উপরিভাগে আর্য্যজাতির নিবেশ। সংক্ষেপতঃ ইউরোপে রজোগুণাত্মক লোকের প্রাধান্য, ভারতবর্ষে সত্বগুণাবলম্বীর প্রাধান্য। কিন্তু তজ্জন্য ভারতবর্ষের পরিণতি ভিন্ন পথে বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করাই উচিত হয়। ইউরোপের মধ্যে এখনও যোদ্ধৃদশা জাজ্বল্যমান, সকল ইউরোপীয় লোকই সিপাহী সাজিয়া উঠিয়াছে, রাজস্বের অর্দ্ধাংশ সৈনিক এবং সমরপোত এবং সংহারাস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। ভারতসমাজের ঐ ভাব যদি কখন হইয়া থাকে, তবে যখন একটি স্বতন্ত্র যোদ্ধৃজাতির সৃষ্ট হইয়াছিল, উহা তখন হইতেই গিয়াছে—ইউরোপের

সকল লোকই ভোগ-সুখ-লালসায় প্রপীড়িত রহিয়াছে, ভারত-সমাজের ঐ অবস্থা চতুরাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়া অবধি আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই—ইউরোপের সাধারণ লোকে এখনও সাতিশয় নিষ্ঠুরস্বভাব এবং অকারণ প্রাণিবধে উদ্যতহস্ত। ভারত-সমাজে যখন অহিংসাই পরমধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন হইতেই ঐরূপ স্বৈরাচার গিয়াছে; ইউরোপ অপর সমুদায় ভূভাগকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেছেন, পরের ছেলের মুখের গ্রাস নিজের ছেলেকে খাওয়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যদি কখনও ঐ ভাব দেখা দিয়াছিল এমত হয়, তাহা বহুকাল হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবাসী অন্যের অন্নে ভাগ বসাইতে চাহেন না। এ সমাজের সহিত এমন সকল বিষয়ে ইউরোপীয় সমাজের তুলনা হইতে পারে না। তবে ইউরোপের কল-কারখানা বাড়িয়াছে এবং ইউরোপ বিজ্ঞান-বিদ্যায় এক প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণতা বা পূর্ণতাই উৎকর্ষের প্রকৃত লক্ষণ। সমাজের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, অর্থাৎ সমধিকসংখ্যক লোকের সুপালনে, ভারত-সমাজ পৃথিবীর অপর কোন সমাজের অপেক্ষায় ন্যূন ছিল না—এখনও ইউরোপ অপেক্ষায় ন্যূন হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারত-সমাজের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয়ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয়ভাবটি মনুষ্যহৃদয়ের খুব উচ্চভাব বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চভাব নয়। জাতীয়ভাব একটি মিশ্রপদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা দুইই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অতি উদার ভাব; আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাব। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় পণ্ডিতেরা ইহার উৎকর্ষের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যত বড় বড় লোক সকলেরই হৃদয় এই ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপে স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিবৎসল, তাঁহারাই নরকুলে দেবতা। নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকটা ঐরূপ। উঁহারাও স্বদেশ এবং স্বজাতি বাৎসল্যের যথেষ্ট গৌরব করেন—কিন্তু প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়েরা যতদূর করিতেন, ততটা করেন বলিয়া বোধ হয় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—স্বদেশানুরাগের মূল অভিমান; ইহার শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-বিটপাদি বাহ্য আড়ম্বর; ইহার কাণ্ড পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ; ইহার ফলপুষ্পাদি যেমন স্বদেশের সমৃদ্ধি, তেমনি পরদেশের পীড়ন; ইহা একটি দোষে-গুণে জড়িত উপধর্ম্ম মাত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জাতীয়ভাবটিকে উপধর্ম্ম বলিয়া নিন্দাও করেন নাই, আর উহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াও ব্যাখ্যাত করেন নাই। তাঁহারা এক পক্ষে স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশেই সমুদায় পবিত্র তীর্থের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বদেশেরই আপাদমস্তক মহাদেবী সতীর দেহদ্বারা বিনির্ম্মিত এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার স্বজাতীয় আর্য্যগণকেই প্রকৃত-জ্ঞানের অধিকারী, বিশুদ্ধ-আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃশরীর-প্রসূত বলিয়াছেন; আর ভারতবর্ষের বহির্ভাগকে অপকৃষ্ট দেশ এবং তদধিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গালি দিয়াছেন—পক্ষান্তরে, তাঁহারাই সর্ব্বত্র সাম্য এবং একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। জাতীয়ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে—উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতিসোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়।

জাতীয়ভাবটি হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক-ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ—অগস্ট কোম্‌টির মতানুযায়ী-দিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে, আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয়ভাব সেটি আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীররক্ষার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্ব্বজনীন প্রীতিকে হৃদয়-নিহিত করিয়া ভারতবাসী

স্বদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃপুরুষোত্তমের প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্ম্মসূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্রসহায়ে আপনার রক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যে কু-শিক্ষালব্ধ স্বাতন্ত্রিকতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরিহার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন, এবং আত্মসমাজকেই ধর্ম্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ় ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে এই স্বজাতি-বাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যাবৃদ্ধিকর, ধনবৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর কার্য্যসকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল ঐ সকল কার্য্য সত্যাবলম্বনে, সতেজে সুবিস্তৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকশিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতর আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পর-জাতি-বিদ্বেষ এবং পর-জাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্য-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক। অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

ইংরাজীতে 'রোমান্স্ অব হিস্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদ্দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত হজ্‌সন্ প্রাট্ সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্টরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের বিশিষ্ট আনুকূল্যে ইহার সংশোধন করা হইয়াছে।

সফল স্বপ্ন

প্রথম অধ্যায়

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত ; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তিসুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্য গুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।

অনুমান হয়, পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় সম্মুখস্থ নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে হঠাৎ সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গর্জ্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মৃগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলৎশক্তিরহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বিদারণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় তেজে উদ্দীপ্ত এবং কেশর উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ

কোন কার্য্যকারী হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন; দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পথিক বাহনবিনাশে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন—কিন্তু কি করেন, অপ্রতিবিধেয় দুঃখে দুঃখী হওয়া অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, দিবাভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপৃষ্ঠে যাবৎ পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী ছিল, সমুদায় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করত দ্রুতবেগে গমনোন্মুখ হইলেন। বহুক্ষণ কাননের কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখেন, প্রান্তরমধ্যভাগে এক নবপ্রসূতা হরিণী স্বীয় শাবক সমভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পথিক সত্বরপদে আসিয়া অনতিবেগবান্ সদ্যোজাত সেই হরিণশিশুকে গ্রহণ করিলেন। ভয়বিহ্বলা হরিণী প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মৃগয়া সফল হওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম উপযোগ দ্রব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি যাপন করিতে হইলেও হানি নাই। এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মৃগশাবকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণশিশুকে একটা বৈদ্যুতাগ্নি-শুষ্ক বৃক্ষমূলে স্থাপন করত দুইখানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর অসিধারণপূর্ব্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল। আহা! পশুজাতির মধ্যেও অপত্য-স্নেহ কি প্রবল! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলাধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক পুনর্ব্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ব্ববৎ অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশুযোনিতে ঈদৃক্ মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয়? পথিক কারুণ্যরসের প্রাদুর্ভাবে

বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরঙ্গের কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দানুভব করিলেন। মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধমনোরথা হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল—কিন্তু শাবক সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, একবার সন্তানের জীবন-রক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ দ্বারা অতীব চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতর প্রেমাস্পদ পদার্থ আর কি আছে? বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও ইন্দ্রিয়প্রীতিপরায়ণ। এই জন্য জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। হায়! তাহারা কি নির্ঘৃণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর জগদীশ্বরপ্রদত্ত সর্ব্ব-সুখনিদান প্রাণাপহরণ করিয়া আপনাদিগের চিত্ত কলুষিত করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! অনুমান হয়, পবিত্রচিত্ত ধর্ম্মাত্মার অন্তঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ, পথিক কুরঙ্গশাবককে মোচন করিয়া অবধি সেই ভয়াবহ গহনবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন এবং পাথেয় তণ্ডুলের কিয়দংশ হইতে যথাকথঞ্চিৎরূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাশান্তি করত অতীব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জ্যোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বন-দেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র-বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তি প্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া পথ-পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, মৃগাঙ্কমণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—"রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখদুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর

"পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জ্জিত হইও না, অদ্য পশুযোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নবলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।"

এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন নিশা অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লানকিরণ দ্বিজবাজ বিরাজ কবিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্ন দর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিমীলিত করিতে পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাম্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরিশৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্ঝটিকারাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পরে সহস্রাংশুব তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্ঝটিকাজাল বিদীর্ণ করিযা বনমধ্যে প্রবেশ করিল—দূরস্থ মহীধরশৃঙ্গসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিবাশিপ্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্রবিটপাদি বালাতপ-সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল—এবং শিশির-সিক্ত শষ্পশয্যা যেন, রাত্রিবিহারী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাকচিক্যশালী হইতে লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অম্বুভারে অবনত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদ্‌গুণাধার বশতঃ নিজ নিজ নম্রতা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি-সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—কবিয়া, সকলে শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পান্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুষ্ক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জালনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া ভূতলে জানু পাতনপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযতমনোবৃত্তি হইয়া স্বীয় ধর্ম্মেব শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিজ্ঞাত কাননপথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নটি বারম্বার স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটি তাঁহার চিত্তপটে এমনি স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে; আবার

ভাবিলেন, আমি এই দেশে নামধামবিহীন আগন্তুক ব্যক্তি, আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে ; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র ; জাগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, মনুষ্য তাহা বুদ্ধিবলে দমন করিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন ; স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি ? অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না—বিশেষতঃ এরূপ দুরাশা সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা ; কারণ যদিও ইহা কস্মিন্‌কালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের আধিক্য কি ? আর যদি সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল লোভরূপ দাবাগ্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে ; অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ দুশ্চিন্তা নিমগ্ন হইলে স্খলিতপদ হইয়া অধঃপতিত, অথবা অন্যমনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে ! আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্য অবিনশ্বর ধর্ম্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বারা উদ্রিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিলকানন-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকূটধূম পানে কেহ বা অন্যান্য উপযোগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্য্যাটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শত্রুতাই করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?—মিত্রতা করিলেও করিতে পারে। অতএব ইহাদিগের সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনেচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ওহে ভাই সকল ! আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানি না, অনুগ্রহ করিয়া কহিয়া দেও।" এই

কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল "ওহে পথিক! ভাল, বল দেখি, যদি এই খানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হানি কি?" পর্য্যাটক উত্তর করিলেন "তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সে সকল কথা কহিবার অবকাশ নাই—এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম—নচেৎ চলিলাম।" বনেচর কহিল "তুই আর কোথা যাবি?—জানিস না, আমরা এই কানন-রক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমরা শুল্ক আদায় করি—আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিয়া যাইতে পারে না।" পথিক কহিলেন "ভাই, আমি পণ্যজীবী বণিক্ নহি, কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য করি না।—আমার স্থানে কি শুল্ক পাইবে?" তস্কর তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, "ওরে মূর্খ! তুই নিঃসহায়, আমরা আট জন, তোর দুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আট জনের সহিত একাকী যুদ্ধ কবিবি?—যদি ভাল চাহিস্ তবে বাক্‌ছল পরিত্যাগ কর, সমভিব্যাহারে যে ধন-সম্পত্তি বা ভক্ষ্য-সামগ্রীসম্ভাব আছে সমুদায় আমাদিগকে আনিয়া দে, দিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যা, নিবারণ কবিব না—আমাদিগব এই ব্যবসায, কেহ কখন আমাদিগের কথাব অন্যথা করিতে পারে না।" "তবে তোমরা চৌর্য্যবৃত্তি?" "আমবা চোব হই বা না হই সে কথায় তোর প্রয়োজন কি?" "এই প্রয়োজন যে, তোমাব সাতজন মাত্র সহায়, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসত্ত্বে আমি আজ্ঞাবহ হইব না।" তস্কর পথিকেব সাহসেব কথা শুনিযা আপন সহযোগিগণকে কহিল, "এ বেটা বলে কি রে?—এ যে মরিতে বসেও কার্দ্দানি ছাড়ে না। ভাল, দেখা যাউক, দুই এক ঘা ওসাবিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে" এই বলিযা পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল—"আইস তোমার পিঠ্‌ বোচ্‌কাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুব্জের মত পিঠে থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে, একবার সোজা হইয়া রূপখানি দেখাও।" পথিক তস্করেব উপহাসে ক্রুদ্ধ হইযা কহিলেন "রে চোর! আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন সুখ পাই নাই এবং কখনও পাইব এমত আশাও করিতেছি না যে, জীবনভয়ে কাতর হইয়া তোর শবণ প্রার্থনা করিব—মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয়—অতএব সাবধান হইয়া আমার গতি বোধ কর্।" এই বলিয়া পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা কবিলেন। চোরেবা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল। পরে একজন দুরাত্মা দূব হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ করিল। পথিক তৎক্ষণাৎ

শরকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শরধারে বাহুর শিরা ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভুজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত্র করিল, এবং তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত থলিয়া মোচন করিয়া ফেলিল।

লুব্ধেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির করিয়া দেখে তাহাতে এমন কিছুই নাই যে, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ অদ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিল। অনন্তর তস্করপতি নিজ অনুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন "দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘা-টা আরাম না হয়, আমাদিগের সঙ্গেই থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে।" এইরূপ কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করত তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যবর্ত্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতিপয় কুটীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটীর তস্করদিগের নির্ম্মিত এবং তাহাদিগের পরিজনের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটীর প্রস্তুত করিয়া দিল। পান্থ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন দিবস যাপন করিলেন। তাঁহার বাহুর ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, আর দুই চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমত সময়ে তস্করেরা একত্র হইয়া তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল, "শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণের পুরস্কারে পরাঙ্মুখ নহি, তোমার পাথেয় দেখিয়া নিতান্ত দুরবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম; দেখ আমাদিগের কন্যা কলত্রাদি আছে এবং আমরা বনেচর বলিয়া নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না—ইচ্ছা হয় ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূর্ব্বে যে অভিসন্ধি করিয়াছি অবশ্য তাহাই করিব।" পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিব না—বরং তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যে, আমাকে কোন রহস্যানুসন্ধান জ্ঞাত করিও না, করিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা জানিবে।" তস্করপতি কহিলেন—

"আমরা সে ভয় করি না। সাহসী বীরগণ কখন বিশ্বাসহন্তা হইতে পারে না, বিশ্বাস-ঘাতকতা নীচপ্রকৃতি ভীরুগণেরই ধর্ম্ম।" পথিক কহিলেন "তোমরা সে আশা পরিত্যাগ কর, চোর ও দস্যুপ্রভৃতি যে সকল দুরাত্মা মনুষ্যমাত্রেরই অপকারক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্রভল্লুকাদির ন্যায় উচ্ছেদ করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—না করিলে, ধার্ম্মিকগণের অনুপকার করা হয়।" চৌরপতি পথিকের ভর্ৎসনা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আর তোর সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুই না ধার্ম্মিক জনের, না সাহসীপুরুষদিগের সংসর্গী হইবার যোগ্য—অতএব তুই যাদৃশ নীচপ্রকৃতি অচিরাৎ তদুপযুক্ত দাস্যবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি।" পথিক উত্তর করিলেন "নিরস্ত্র এবং আহত ব্যক্তিকে অধার্ম্মিক ভীরুজনেরাই অপমান করে—তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই।" চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত কহিলেন "ভাল ভাল, এত বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই—তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি।" এই বলিয়া তস্করেরা পথিককে সমভিব্যাহারে করিয়া চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্ব্বোধ যে, এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমত কোন কর্ম্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়।

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন আলয়ে আনিয়া বিশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক ভেষজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়া ঐ দাসটির প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দাসটির জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না—কি করি?—অথবা উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে পাই, তাহাতে উহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে পারে, তবে দাস্যবন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে

উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না?" "মহাশয়! এ কথা কি জিজ্ঞাস্য? পিপাসাতুর কি জল পান করিতে পরাঙ্মুখ হয়?" "ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না?" "কি প্রকারে তুষ্ট করিব, অনুমতি করুন।" "অর্থদ্বারা।" দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল "স্বাধীনতা প্রাণিমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি—তাদৃশ অধার্ম্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে।" এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে লোহিতবর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। দাস-বণিক্ ভয়ে সঙ্কুচিতচিত্ত এবং ম্লান-বদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল। সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল, যাহাতে দাসকে অন্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায়।

কিয়দ্দিনান্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান-প্রদেশাধিপতি অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান্ অলেপ্তাগীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণে বদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামিবাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। একদিন দুইজনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা খ্যাপন করিলে দাস কহিতে লাগিল।—

"মহারাজ! আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অতি সঙ্ক্ষেপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা 'কালিফ্ ওথ মানের' আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল 'ইস্‌দগর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম-অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাঁহার সন্তানেরা তদ্দেশের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয়জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি।—

আমার পিতা নির্ধন ছিলেন, সুতরাং বালককালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বপু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রমানুরক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমঙ্কর বলিয়া মানি।—পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্দ্রিয়দমন করিতে এবং জগৎপাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে অভ্যাস করিয়াছিলাম। শৈশবাবধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশমোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল, কোন রাজসংসারে যোদ্ধৃকর্ম্ম স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দস্যুকর্তৃক পরাভূত এবং দাস্যে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্দ্ধমান আশালতা একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে।”

আলেপ্পাধীন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে এবং সর্ব্বসৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ উচ্চপদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। তাঁহার দান্তস্বভাব ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সুশিক্ষাসম্পন্ন হইল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাজ্যও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণে চক্ষুকর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমৎকার! যে ব্যক্তি সহায়সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহ-ভল্লুকের সহবাসী হইয়াছিল, যে নানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন্মৃত্যুস্বরূপ দাসত্ব দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথ্বীপতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া তাহাদিগের

আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল! পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া এবং অতি অধমকেও প্রধান পদারূঢ় করিয়া মানবকুলকে সর্ব্বদাই সাংসারিক বিভবের অস্থায়িত্ব এবং ধর্ম্মপদার্থের অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান মন্ত্রী এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং বাল্যাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরম সুখ অধিকতর প্রীতিজনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেপ্তাগীন্ রাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার যাদৃশ লাবণ্য-মাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে আসিয়া নিরন্তর উপাসনা করিত। কিন্তু রাজকন্যা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়া অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজার অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়িযুগলের প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণ দৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকসিত হইয়া উঠে, এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধান মন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আর্ভিাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বর্ত্ম করিয়া

দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্তৃক সেই বর্ত্ম দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে! প্রধান মন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরলহৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন "আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মতা নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনূঢ়াবস্থায় পিতার অসম্মান করে, সে যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবনা অতি বিরল।" প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম, তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া শঙ্কা হয়।"

সেই দিনই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ, জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান—এই জীবন-বৃক্ষের একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বারা আমার সংসারকানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাঁহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মতা হয় নাই—আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে।" মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার কন্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মতা আছেন; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা; এক্ষণে আপনকার অনুকূলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে।" রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন "যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহ-সংস্কার সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,—যাহাহউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই।"

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মজার উদ্বাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল জনের সহিত

কন্যার পরিণয়-সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ মৎসর-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভূত প্রজাসাধারণ অত্যন্ত প্রফুল্লমনে আনন্দ-মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে আলেপ্তাগীন গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে পুত্রপৌত্রাদি কেহ না থাকাতে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী হইয়া নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবক্তাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁহারই পুত্র গজ্‌নবী মহম্মূদ, যৎকর্ত্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার-সম্ভুক্ত হয়।

অঙ্গুরীয় বিনিময়

প্রথম অধ্যায়

পর্ব্বতশ্রেণীসকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্রাচীরবৎ সমান উচ্চ বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে, এবং সেই সকল দ্বার অবলম্বন করিয়াই নির্ঝরিণী সমস্ত নির্গত হয় এবং মনুষ্যপশ্বাদি এক দিক হইতে অপর দিকে যাতায়াত করে। কিন্তু ঐ সকল পর্ব্বতীয় পথ অত্যন্ত কুটিল, কোথাও কোথাও অতিশয় সংকীর্ণ এবং প্রায় সর্ব্বস্থানেই বন্ধুর। এতাদৃশ পথের নাম গিরি-সঙ্কট। ভারতবর্ষের নৈর্ঋত ভাগে যে মলয় পর্ব্বত সমুদ্রের বেগ রোধ করিতেছে, তাহাতেও ঐরূপ অনেক গিরি-সঙ্কট আছে।

একদা তত্রত্য উপত্যকাবিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি—কেহ বা পাদচারে কেহ বা অশ্ব-পৃষ্ঠ আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতীয় শিলা সকল উদ্ভিদ্-সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া, তাহারা সুস্নিগ্ধ সমীরণবাহী সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্য্যাস্ত না হইতে হইতেই, উদগ্র গিরিশিখরচ্ছায়ায় সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধ-তমসাবৃত হইতে লাগিল। অনতিদূর গমন না করিতে করিতেই, শৈলসমুদয়ের বিচ্ছেদভাগ অন্ধকারপূর্ণ হওয়াতে পথিকেরা আপনাদিগকে অভেদ্য-অসিতবর্ণ প্রাকারবেষ্টিতবৎ অবলোকন করিলেন। ঊর্দ্ধভাগে দৃশ্যমান সমুদায় নভোভাগ নক্ষত্রময় হইয়া শ্বেতকাশ্মিকঘটিত নীল চন্দ্রাতপ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। শ্রুত আছে, সুগভীর কূপাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে দিবসেও গগনবিহারী নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পথিকেরা সন্ধ্যার প্রথমাবস্থাতেই সেই গভীর পর্ব্বততল হইতে তাদৃশ তারাচয় নিরীক্ষণ করিয়া সেই কথা সপ্রমাণ করিলেন। কিন্তু গিরিতলস্থ নিবিড় অন্ধকার, নক্ষত্রগণের মৃদুল-জ্যোতিঃ দ্বারা ভেদ্য হইবার নহে, অতএব পথিকেরা অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যস্থ দিব্যগঠন ও বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রাবৃত যে শিবিকা ছিল, তদ্বাহকেরা ঐ বন্ধুর পথে পাছে স্খলিতপদ হয়, এই জন্য সকলে বিলম্ব করিয়া যাইতেছিলেন। শিবিকা-বাহকগণের অস্পষ্ট শব্দ-পরম্পরা, সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও রক্ষিবর্গের পরস্পর কথোপকথন এবং পথ প্রদর্শকদিগের উচ্চস্বর, চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত

মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, যেন সহস্র সহস্র ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া পথিকদিগের শব্দের অনুকরণ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল।

এবম্প্রকারে যাইতে যাইতে পথিকেরা এমনি একটি সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হইলেন যে, তাহাতে দুই জনও পাশাপাশি হইয়া গমন করা কঠিন। কোন সময়ে ভূমিকম্প দ্বারা তথায় উভয় পার্শ্বে স্থূলোপল-সমস্ত ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পথটিকে তাদৃশ অপ্রশস্ত করিয়া থাকিবে। শিবিকা-বাহকেরা সেই স্থানে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া অতি যত্নে শিবিকা নির্গমন করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এইরূপে শিবিকা নির্গত হইবামাত্র হঠাৎ তদ্বাহকেরা কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ কর্ত্তৃক একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের ন্যায় কতিপয় বলবান পুরুষ তাহাদিগের স্কন্ধদেশ হইতে শিবিকা আচ্ছিন্দন করিয়া অতি ত্বরিত গমনে প্রস্থান করিল। রক্ষিবর্গ ঐ আক্রমণ কোলাহল শুনিয়া শিবিকা-রক্ষার্থে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলে তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী পুরুষ আক্রমণকারী জনৈকেব শূলাগ্রবিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার সেই ভয়ানক রোদনশব্দে পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যচয় ভয়ে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন আক্রমণকারীদিগের মধ্যে একজন সুগভীর স্বরে কহিল—"এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই প্রাণ হারাইবে। যে যেখানে আছ স্থির হইয়া থাক, স্বল্পক্ষণেই নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে দিব।" কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি হাস্য করত কহিল, "কখন দেখিয়াছ একটিমাত্র শাখামৃগ, ভিমরুল চাকের দ্বার বোধ কারিযা কেমন একটি একটি করিয়া সমুদায় ভৃঙ্গ বিনাশ করে? বাহির হইবার চেষ্টা করিলে তোমাদিগেরও সেই দশা হইবে।" রক্ষিবর্গের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আমাদিগের শিবিকা কোথায়?" "শিবিকা যেথায় হউক সে কথার প্রয়োজন নাই—তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা তদারোহিণী কিশোরী কে, তাহা বিলক্ষণ জানি, অতএব তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভ্রমের ক্রটি হইবে না। তিনি এই দুর্গম পথ-পরিশ্রমে অবশ্য শ্রান্তা হইয়াছেন, অতএব একবার আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, হানি কি?" "হায়! আমরা প্রভুকে কি বলিব—তুমি কে?" "আমি যে হই তোমরা বাদসাহকে কহিও তিনি যাহাকে পর্ব্বতীয় দস্যু বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহার আত্মজা সেই দস্যুরই করকবলিত হইয়াছেন।" এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই শিবিকাবাহীরা সেই সুপরিজ্ঞাত পথ দ্বারা অতি দূরে প্রস্থান করিল, এবং যিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনিও হঠাৎ শত্রু সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আরঙ্গেবের সৈন্যগণ বহির্গত হইয়া বাদসাহকে কি প্রকারে এই অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা বাদসাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি অতি ক্রূর-প্রকৃতি ছিলেন। কোন অননুভূতপূর্ব্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ঘটনা কর্ত্তৃক যদি কোন প্রযুক্তকর্ম্মের ত্রুটি হইত তথাপি ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার স্বেচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটিয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পরুষ দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বস্তুতঃ আরঙ্গেবও অন্যান্য নৃশংস-স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ন্যায় একান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ছিলেন—ক্ষান্তি, দয়া ও সমবেদনা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতেন না। অতএব তাহারা সকলে অক্ষতশরীর থাকিতে তদ্রক্ষিতা রাজপুত্রী শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এই সংবাদ লইয়া তাদৃশ প্রভুর সমীপগমনে সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে সকলে একমত হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে, বাদসাহকে কহিব, হিন্দুজাতীয় শিবিকা-বাহকেরাই দুষ্টতা করিয়া আমাদিগকে বিপথে আনয়ন করত দুর্বৃত্ত দস্যুর হস্তগত করিয়াছিল। বাদসাহের প্রথম ক্রোধোদ্যমে ইহারাই বিনষ্ট হইবে, আমরা সকলে রক্ষা পাইলে পাইতে পারি। আহা! প্রকৃতদর্শী পণ্ডিতেরা উত্তম কহিযাছেন যে, অন্যে আমাদিগের সমক্ষে অপ্রিয় বাক্য পরিহারপূর্ব্বক যে, সর্ব্বদাই অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে তাহাও আমাদিগের দোষ। যেহেতু আপনারা ক্ষমাবান হইলে কাহারও মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিবার প্রয়োজন থাকে না। সে যাহা হউক, সামন্তবর্গ এইরূপ স্থির করিয়া দুর্ভাগ্য বাহকবর্গকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইল, এবং যেখানে দিল্লীশ্বর আরঙ্গেব মাদুরা নগর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়া পরম প্রিয়তমা আত্মজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় শীঘ্রগমনে উপনীত হইলেন। বাদসাহ স্বীয় দুহিতা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটন ঘটনা শ্রবণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, সৈন্যগণের অনেক নিগ্রহ করিলেন, এবং দুরদৃষ্ট বাহকেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডার্হ হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

এখানে শিবিকাপহারীরা বাদসাহ-পুত্রীর শিবিকা বহন করত নানা কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হইয়া একটি পর্ব্বতীয় দুর্গসমীপে উপনীত হইল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থান পর্ব্বতের অধিত্যকা, অতএব তারা এবং চন্দ্র কিরণে উপত্যকা অপেক্ষা শিথিলান্ধকার ছিল। তথায় কোন বিশেষ সঙ্কেত করিবামাত্র দুর্গস্থিত ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধ হইতে একটি দোলাযন্ত্র অবতারিত করিয়া দিল। নৃপাল-তনয়া বহুবিধ সম্মানপুরঃসর তাহার উপর আরোহণ করিতে আদিষ্ট হইলে তিনি অগত্যা শিবিকা ত্যাগ করিয়া ঐ দোলাযন্ত্র অবলম্বন করত চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া

রহিলেন। দোলাযন্ত্র নারিকেলত্বঙ্‌ নির্ম্মিত কঠিন রজ্জু-সংযোগে নির্ব্বিঘ্নে শূন্যমার্গে উত্থিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ প্রান্তে উত্তীর্ণ হইলে, দুর্গের কবাট উন্মুক্ত হইল, তখন সকলেই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

বাদসাহ-কন্যার আবাস হেতু ঐ দুর্গমধ্যে যে গৃহটি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দিল্লীর রাজভবনে যাদৃশ মহামূল্য গৃহোপকরণ শোভাসামগ্রী পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এখানে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরও অসদ্ভাব ছিল না। রাজভবনে হেমপাত্রপরিপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যসকল গৃহ আমোদিত করিত, এখানে অগুরু চন্দন ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধ সুগন্ধি পুষ্পাদি তাঁহার সেবার্থে সমাহৃত হইয়াছিল। পিত্রালয়ে কাশ্মীর দেশ প্রসূত সালের শয্যায় উপবিষ্ট হইতেন, এখানে সুকোমল রোমশ পশুচর্ম্মে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অন্তঃপুররক্ষিগণ সর্ব্বদা নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদৃশ কিছুই দৃষ্ট হইল না।

তৎকালে বাদসাহ-পুত্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে যদিও প্রধানা সুন্দরীদিগের মধ্যে গণ্য করিতে না পারা যায়, তথাপি অবশ্যই প্রশংসনীয়রূপা বলিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি একটি করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা সুস্থশরীর এবং আনন্দযুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাদৃশ মনোহারিতা হয়, নৃপদুহিতা সেই শোভাতেই জনগণের কমনীয়া ছিলেন। পিতৃ-শত্রুর কবলিত হওয়াতেও তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি মনে মনে জানিতেন পিতা সকল সন্তান অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ করেন, অতএব অচিরাৎ তাঁহার উদ্ধারার্থ যত্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই ; এবং প্রবলপ্রতাপ আরঙ্গেব যত্ন করিলে কৃতকার্য্য হইবার অসম্ভাবনা কি ? এই ভাবিয়া রোসিনারা নিশ্চিন্তপ্রায় ছিলেন। বরং মধ্যে মধ্যে এমনও মনে করিতেছিলেন, এই দুর্ব্বোধ দস্যুরা পিতার সন্নিধানে বিপুল অর্থ পাইবার লোভেই আমার শরীর আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের অর্থ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, জাতক্রোধ বাদসাহের সমক্ষে প্রাণ রক্ষা হওয়াও ভার হইবে—আমি সেই সময়ে তাঁহার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত যত্ন করিয়া ইহাদিগের মহাসম্ভ্রমসূচক ব্যবহারের প্রত্যুপকার প্রদান করিব। এইরূপে রোসিনারা অনুদ্বিগ্ন-মনা হইয়া কিঞ্চিৎ উপযোগানন্তর রাত্রিযাপন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় আবাসগৃহ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ফর্দৌসি, হাফেজ, সেখ সাদি প্রভৃতি মহাকবিগণের পারস্য ভাষায় বিরচিত রমণীয় কাব্যগ্রন্থসকল সংস্থাপিত রহিয়াছে। রোসিনারা বাল্যাবস্থায় স্বজাতীয় ভাষা পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। কাব্য পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থসকল তাদৃশ স্থলে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অত্যন্ত চমৎকার জন্মিল। অতএব স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার ঐ সকল পুস্তক এবং কে বা সেই দুর্গস্বামী, জানিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই তাঁহার কৌতূহল পরিপূরণ করিল না। দাসীগণ কেহ বা মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল, আর কেহ বা মাতঃ কেহ বা স্বামিনি অথবা কিশোরি ইত্যাদি সমর্য্যাদ সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিল, "আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন—আমরা এই বিষয় কিছুই বলিতে পারিব না—কর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন—আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি তোমার মনোরঞ্জনার্থেই এই সকল পুস্তক এবং তোমার সেবার্থই আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন।" এই সকল কথায় বাদসাহ-পুত্রীর কৌতূহল আরও শতগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় উদ্ধারের জন্য যত উদ্বিগ্ন না হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি তাদৃশ ভাবসম্পন্ন কে, ইহা জানিবার জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইলেন।

এইরূপে তিন রাত্রি গত হইল, চতুর্থ দিবস প্রাতে দুর্গ মধ্যে বহুজন-সমাগমের শব্দ কর্ণগোচর হইল, এবং দাসদাসীবর্গ চকিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। রোসিনারা এই সকল লক্ষণে অনুমান করিলেন, দুর্গস্বামী আসিয়াছেন, অতএব শীঘ্রই তাঁহার সন্দর্শনলাভ করিব। এই স্থির করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যহ যে সকল দাসদাসী তাঁহার পরিচর্য্যার্থ যাতায়াত করিত, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই গৃহান্তরালে আসিল না। ক্রমে বেলা অধিক হইল, এবং বাদসাহপুত্রী অত্যন্ত চঞ্চলচিত্তা হইয়া আহারে অনিচ্ছা খ্যাপন, পরিচারিকাদিগের প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অশ্রুবিনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ, অথবা আপনাকে দুর্গস্বামীর অবজ্ঞেয় বোধ, তাহা নির্ণীত হয় নাই—তাহা ভাবুক জনেরই নির্দ্ধার্য্য।

এমত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার

সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘচ্ছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষঃ, বিশাল গ্রীবা এবং আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদায় বীর-লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্র, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম। কোন মহাকবি কহিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া উহাই অন্যান্য অবয়ব এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বভাবজ্ঞাপক হয়। কারণ যাহা হউক, ফল সত্য বটে তাহা নিঃসন্দেহ। ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখিলেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত। যাহার প্রতি সেই দৃষ্টিপাত হইত তিনি বুঝিতেন, এই ব্যক্তি আমার সমুদায় গূঢ় অন্তঃকরণবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, অতএব কেহই তাঁহার নয়নের সহিত নিজ নেত্রের সঙ্গতি করণে সাহস করিত না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই কেবল অধৃষ্যতার লক্ষণ ছিল; নচেৎ আর সর্ব্বমুখাবয়ব মাধুর্য্যভাব-প্রকাশক এবং যথাবিন্যস্ত প্রযুক্ত সুদৃশ্য ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ। ফলতঃ পুরুষশরীর বলবিক্রম-প্রকাশক না হইলে সম্পূর্ণরূপে সুশোভন হয় না। ঐ শরীরে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু উহা অপরিসীম বীর্য্যবান্ হইয়াও একান্ত কর্কশ অথবা অকোমল বলিয়া অনুভব হয় নাই।

তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ বাদসাহ-পুত্রীর সম্মুখীন হইয়া ঈষদবনত মস্তকে অভিবাদন করত নিজ বক্ষে বাহুবিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ-পুত্রী তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন বোধ হয় না। যাহা হউক, আগন্তুক তাঁহার প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টি সহকারে মৌনাবলম্বনে রহিলেন দেখিয়া রোসিনারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্যক্তি আমাকে এইরূপ আতিথ্য স্বীকার করাইতেছেন আপনি বলিতে পারেন?" আগন্তুক উত্তর করিলেন 'শিবজী'। রোসিনারা কহিলেন—"আমি দিল্লীশ্বর আরঙ্গেবের কন্যা, কি জন্য এবং কোন্ সাহসেই বা শিবজী আমার গমনের ব্যাঘাত করিয়া এই দুর্গমধ্যে আনয়ন করিলেন?" "আপনি বাদসাহ-পুত্রী তাহা অপরিজ্ঞাত নহে—এবং শিবজী বাদসাহের সহিত স্থির সৌহার্দ্দ এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তদ্দুহিতাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন।" "এ কি অসঙ্গত কথা! তৈমুরবংশসম্ভূত দিল্লীশ্বরের সহিত পর্ব্বতীয় দস্যুর সম্বন্ধ নিবন্ধন!" শিবজী, কিঞ্চিৎক্ষণ নতশিরঃ থাকিয়া মুখোত্তোলন পুরঃসর উত্তর করিলেন "আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পর্ব্বতীয় দেশের

স্বাধীন রাজা। যদি বলেন আমার বংশমর্য্যাদা এরূপ নহে যে তৈমুরলঙ্গবংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণযোগ্য হই, তাহার উত্তর এই যে, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্তবিশ্রুতনাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন? আমি এই পর্ব্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান্ নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্ত্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে। সে যাহা হউক, আপনি এক্ষণে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে থাকুন। কেবল মাত্র এই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, নচেৎ আর আর সর্ব্ব বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার সাক্ষাৎকারমাত্র প্রার্থনা করি। বোধ হয় কালে আমাকে দস্যু অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে বিদায় হই।"

এই বলিয়া শিবজী অতি মধুর হাস্যমুখে বাদসাহ-পুত্রীর প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি করত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অস্মদ্দেশে 'মোগল পাঠান' নামক একটি যুদ্ধানুকরণ ক্রীড়া প্রচলিত আছে, সকলেই জানেন। কিন্তু যাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করা নাই তাঁহারা জানেন না যে, ঐ ক্রীড়াটি দুই প্রবল মুসলমান জাতির পূর্ব্বকালীন বাস্তবিক বৈরিতার প্রকাশক। ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথমে সিন্ধু-নদের পশ্চিমাঞ্চলবাসী পাঠান-জাতীয় মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়। তাহারা অগ্রে ইহার উত্তরাংশ পরে দক্ষিণ ভাগ জয়লব্ধ করে। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য বহুকাল একচ্ছত্র থাকিবার নহে। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চল অতি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভূপাল-বংশের অধিকৃত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে হিমালয়ের উত্তরাংশ-নিবাসী মোগল-জাতীয়েরা আসিয়া দিল্লীস্থ পাঠান বাদসাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশের পাঠান রাজারা

বহুকাল স্বাধীন ছিলেন। প্রবলপ্রতাপ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের দিন দিন বল হীন হইতে লাগিল, তথাপি উঁহাদের রাজধানী বিজয়পুর কখনও সর্ব্বতোভাবে শত্রুগ্রস্ত হয় নাই।

এতাদৃশ সময়েই শিবজীর জন্মগ্রহণ হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অসামান্য বুদ্ধি সহকারে কখনও বা মোগলদিগের সহায়তা করিয়া কখনও বা পাঠানদিগের পক্ষ হইয়া, আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার স্থির সখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিতেন যে, একজাতীয় রাজারা যে সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার শেষে সন্ধি-বন্ধন হইয়া সমুদায় বিবাদ নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জাতিবিশেষ প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর জাতীয়দিগের পরম প্রিয়তর ধন ধর্ম্ম বিনাশে যত্নশীল হয়, সেখানে আর সন্ধির কথা থাকে না। সেখানে যত কাল একের সম্পূর্ণ তেজোহ্রাস, অথবা সমূলে সংহার না হয়, তাবদ্দিন সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকে। শিবজী এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাদৃশ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চতুরতা অপেক্ষাও তিনি যে সকল নিয়ম-নিবন্ধন এবং সৈন্য-শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় করেন, তদ্দ্বারা অধিক কার্য্য সাধন হয়। তাঁহার পৈতৃক অধিকার পুনা প্রদেশে অতি সবলশরীর এবং প্রভুপরায়ণ এক প্রকার সঙ্কর জাতি নিবাস করিত। শিবজী সেই সকল লোককে সুশিক্ষা-সম্পন্ন করিয়া খড্গ- এবং মল্ল-যুদ্ধ-বিশারদ 'মাওলী' নামক পদাতি সৈন্য প্রস্তুত করেন। আর অনতিদূরবর্ত্তী বরণা, রেবা ও ভীমা প্রভৃতি নদীকূলে এক প্রকার খর্ব্ব-গঠন বীর্য্যবান্ অশ্বজাতি প্রসূত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সেই সকল স্থান স্বাধিকার-সম্ভুক্ত করিয়া 'বর্গী' নামক উত্তম অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করেন। অপরন্তু, পরশুরাম-ক্ষেত্র (যাহাকে কঙ্কণ দেশ বলে) জয়লব্ধ হইলে তত্রত্য নিকৃষ্ট জাতীয় অনেককে সৈন্য-সম্ভুক্ত করিয়া গোলন্দাজ এবং ধানুষ্ক প্রস্তুত করত পদাতিদিগকে 'হিতকরী' এবং অশ্বারোহী সকলকে 'সিলিদার' আখ্যা প্রদান করেন। আর তথাকার যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সৈন্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া—কখনও সন্ন্যাসী কখনও গণক এবং কখনও বা ফকীর অথবা ঐন্দ্রজালিক ইত্যাদি বেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থলের সমুদায় রহস্য সন্ধান আনিয়া শিবজীর কর্ণগোচর করিত। এই সকল চর 'যাসু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ যাসুদিগের সহায়তায় শিবজী নানা সঙ্কট উত্তরণ এবং বিবিধ প্রকারে শত্রুদ্রোহ করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারাই

দিল্লীশ্বর-কন্যার পিতৃসন্নিধানে আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে, এবং সেই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোসিনারাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হরণ করিয়া আনেন।

শিবজী বাদসাহ-পুত্রীকে হরণ করিয়া যে দুর্গ মধ্যে আনয়ন করেন, তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। তথায় শত জন সাহসী ব্যক্তি মিলিত হইলে দশসহস্র বিপক্ষ সেনাকে পরাভব করিতে পারে, বিশেষতঃ তাহার পথ শিবজীর নিজ অনুচর ব্যতীত আর প্রায় কাহারও জ্ঞাত নহে, সুতরাং তথায় রাজপুত্রীকে আনিয়া তিনি তদপগমন বিষয়ে এককালে নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন।

রোসিনারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্য্যভাবে বশীভূতা হইলেন। তিনি এক দিনের জন্যও শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এমত অনুভব করিতে পারেন নাই। যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুতঃ পিত্রালয়ে যেরূপ সর্ব্বদা গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধা থাকিতেন, ঐখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বাধীনা হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যহ এক এক বার করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কথোপকথনকালে অতি সরল মনে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য্য বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণা সমুদায় পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহ-পুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীরপুরুষের সহিত মিলিত-জীবন হওয়া প্রার্থনীয় বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই শুনিয়া এমন অনুমান করিবেন যে, সুবুদ্ধি শিবজী কেবল কৌশল দ্বারা রোসিনারার মনোহরণ করিলেন, তাঁহারা মনুষ্য-প্রকৃতির বাস্তবিক রহস্যানুসন্ধায়ী নহেন। সত্য বটে, যখন শিবজী আরঙ্গেব-কন্যাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূর্ব্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত ঝটিতি সক্ষম হইলেন। মনুষ্যেরা যতই কেন কৌশল অবলম্বন করুন না, এবং ঐ কৌশলকে যতই কেন কার্য্যক্ষম বোধ করুন না, ফলতঃ তদ্দ্বারা অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রোসিনারা স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন যে, মিষ্ট কথা সুসামাজিকতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপঢৌকন প্রদাম কেবল বদান্যতা হইতেও জন্মে, কিন্তু যে নায়ক নানাকার্য্যব্যাপৃত হইয়াও নিজ সময় দানে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনি বাস্তবিক স্নেহভাবসম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। শিবজী প্রত্যহ যে সকল মন্ত্রণা করিতেন তাহা ব্যক্ত করিয়া রোসিনারাকে শ্রবণ

করাইতেন, এবং পরদিবস, পূর্ব্বদিন কিরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আবার নূতন নূতন মন্ত্রণা স্থির করিয়া যাইতেন। অতএব বাদসাহপুত্রী আপনাকে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস- এবং প্রীতি-ভাজন বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত একমত হইবেন আশ্চর্য্য নহে।

এই সময়ে আবার এমত একটি ঘটনা উপস্থিত হয়, যৎকর্ত্তৃক বাদসাহ-কন্যার মন শিবজীর নিতান্ত বশীভূত হইল। রোসিনারা প্রত্যহ বৈকালে বিমল-পর্ব্বত-বায়ু সেবনার্থ দুর্গপ্রাকারে গমন করিতেন। একদা ঐ সময়ে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের নয়নগোচর হয়েন। সেনানী তাঁহার লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসমীপে স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশাহপুত্রীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন। শিবজী সেই সময়ে কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনান্তর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোসিনারার নিকট গমন পূর্ব্বক তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় বিদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে দুর্গরক্ষী তাবৎ ব্যক্তিকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া উক্ত সেনানীর সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিলেন, "তুমি অদ্য অতি জঘন্য কর্ম্ম করিয়াছ, দুর্ব্বলদিগের রক্ষা করাই যোদ্ধাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পীড়ন করা বীরপুরুষের কর্ম্ম নহে, তুমি যে স্ত্রীলোকের অপমান করিয়াছ আমাকেই তাহার রক্ষিতা বলিয়া জান, এবং এইক্ষণে অস্ত্রধারী হইয়া আমার সহিত দ্বৈরথ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সর্ব্ব সমক্ষে অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে এক একটি কর্ম্ম করেন, তাহার নানা ফল হয়, অস্মদাদির শত কার্য্যও একটি অভিপ্রেত সাধনে সমর্থ হয় না। দেখ, শিবজী রাজ-শক্তি অবলম্বন দ্বারা অনায়াসেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ বলবান পুরুষের সহিত দ্বন্দ্বসংগ্রামে প্রাণপণ করাতে একেবারে বাদসাহ-পুত্রীকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ এবং নিজ অনুচর বন্ধুবর্গকে বিশিষ্ট ভক্তিভাজন করা হইল।

পরে শিবজী এবং সেনানী উভয়ে সমান রূপ অস্ত্রধারণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই এক সময়ে স্ব স্ব কৃপাণকোষ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইলেন এবং উভয়েই একোদ্যমে পৃথ্বী, আকাশ, পর্ব্বত প্রভৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া যেন সকলের স্থানে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে পরস্পর নিকটাগত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ শিবজী শ্যেনবৎ বেগে উল্লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেনানীর ঢালে আপন ঢালের দৃঢ় প্রহার করত সেই উদ্যমেই তাহার প্রতি খড়্গ প্রয়োগ করিলেন।

প্রযোগ ব্যর্থ হইল না। সেনানীর স্কন্ধদেশ হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আক্রমণেও ঐরূপ হইল। প্রতিপক্ষ এইরূপে দুই বার আহত হইলে ব্যথিত-মর্ম্ম হইয়া মহা ক্রোধ সহকারে মহারাষ্ট্রপতির প্রতি আক্রমণ করিল। সেনানী, শিবজী অপেক্ষা শিক্ষা এবং বিক্রমে ন্যূন ছিল বটে, কিন্তু শারীরিক বলে এবং দীর্ঘতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। অতএব তাহার বিক্রান্ত ভুজবলে পরিচালিত তীক্ষ্ণধার অসির প্রহার হইলে শিবজী তৎক্ষণাৎ ছিন্নশীর্ষ হইতেন। কিন্তু তিনি নিজ ফলক দ্বারা সেই খড়্গবেগ নিবারণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ আঘাতে তাঁহার ফলক একেবারে দ্বিধা হইয়া গেল। শিবজী ব্যর্থ চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণে বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ, ক্ষণে দূরে পলায়ন, কখনও শত্রুর দক্ষিণ ভাগে, কখনও বামে, এই তাহার সম্মুখে, আবার নিমেষ মধ্যেই পশ্চাতে, এইরূপে হুহুঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করাতে, শত্রু অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ক্রমশঃ শোণিত-প্রস্রবণে নিতান্ত হীন-বল হইয়া দণ্ডায়মান হইল। শিবজীও তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, এবং সেনানী সেই আঘাতেই আর্ত্তনাদ সহকারে ভূতল-শায়ী হইল।

মহারাষ্ট্রপতি এই প্রকারে লব্ধবিজয় হইলেন বটে, কিন্তু আপনিও সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ ছিলেন না। সেনানীর দারুণ প্রহারে কেবল তাঁহার ফলকই ভিন্ন হইয়াছিল এমত নহে। খড়্গটা ঢাল ভেদ করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রীভাবে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হওয়াতে তথাকার অস্থি ভগ্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য অধিক শোণিতপাত হয় নাই। কিন্তু আন্তরিক পীড়ার পরিসীমা ছিল না। তথাপি ক্লেশসহিষ্ণু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনের কি মানসিক বল! শিবজী যুদ্ধ কালে অথবা তদবসানে তিলার্দ্ধেও কাতরতা প্রকাশ করিলেন না, সেনানীব মৃতবৎ দেহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া দুর্গবহির্ভাগে অবতারিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অম্লান মুখে সকলকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে কহিয়া পরে নিজ আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু অল্প ক্ষণেই প্রচার হইল মহারাষ্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুঃসমাচার রোসিনারার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া এক জন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিয়া শিবজীর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিবামাত্র শিবজী উন্মীলিতনেত্র এবং সহাস্যমুখ হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রোসিনারা বাক্য দ্বারা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু

শিবজী তাঁহার জিজ্ঞাসু নয়নদ্বয়কে আশ্বাসবাক্যে উত্তর করিলেন, "শস্ত্রব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া এমত সুখ হইতেছে যে, তজ্জন্য এমত বেদনা শত শত বার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান হয়।" রোসিনারা ঈষল্লজ্জান্বিতা হইয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন, "আমিই এই অনর্থের মূল।" এই বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রপতির গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইনি যে পর্য্যন্ত সুস্থ না হয়েন তাবৎকাল সেবা করিয়া এই কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের যত্ন করিব। আহা! স্ত্রীলোকেরা কি মনুজগণের দুঃখ দূর করণার্থই সৃষ্ট হইয়াছেন! তাঁহারা সম্পদ এবং সুখ সময়ে যেরূপ হউন, কিন্তু প্রিয় জনের দুঃখ উপস্থিত হইলে আর অন্যভাব থাকে না। বিশেষতঃ রোগীর সেবায় সহিষ্ণু-প্রকৃতি স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার নিপুণ এবং মনোযোগী, পুরুষেরা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কে না দেখিয়াছেন, মাতা নিজ পীড়িত শিশুকে ক্রোড়ে শয়ান করাইয়া আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক কেবল তাহার মুখাপিত নয়নেই দিবারাত্রি যাপন করেন?—কোন্ ব্যক্তি রোগসন্তপ্ত হইয়া নিজ সহোদরাদিগের অন্তঃকরণে ভ্রাতৃবাৎসল্য ভাবের অনুভব না করিয়াছেন? আর কে বা তাদৃশ দুঃসময়ে নিজ প্রণয়িনীর কোমল করস্পর্শসুখানুভব করত আপনাকে বিগত-ক্লেশবৎ দর্শাইয়া প্রিয়তমার অন্তঃকরণের দুঃখভার মোচন করিবার যত্ন না করিয়াছেন?—অপিচ, কন্যাপুত্রবন্ত কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার কোন্ সন্ততিগণের কাকলীস্বর অধিকতর মধুর হয়?—কাহারদিগের মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপ একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়?—আর কাহারা ধৃষ্টস্বভাব ভ্রাতৃবর্গকে সান্ত্বনা করিয়া রাখে? অতএব আশৈশব মৃদুস্বভাব স্ত্রীজাতিই পীড়িত জনের প্রতি বিশিষ্ট সমবেদনা খ্যাপন করেন। ইটি তাঁহাদিগের একটি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রায় বোধ হয়! দেখ বাদসাহ-পুত্রী রোসিনারা কখনও কাহারও সেবাশুশ্রূষা করেন নাই। তথাপি স্ব-ইচ্ছায় শিবজীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার ক্লেশ নিবারণার্থ নিরন্তব যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবজী কতিপয় দিবস মধ্যেই স্বাস্থ্যলাভ কবিলেন। আর তাঁহার এই একটি অধিক লাভ হইল, রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করত তাঁহার সহিত মিলিত-মন এবং বদ্ধ-প্রণয় হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন সুবর্ণখণ্ডদ্বয় অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইলে সহজেই সংযুক্ত হয়, তেমনি মনুজদিগের মনও দুঃখপরিতপ্ত হইলে শীঘ্র বদ্ধসৌহার্দ্দ হইয়া থাকে। অতএব মহারাষ্ট্রপতি একদা অনুরোধ করিলে তৎপত্নীত্ব স্বীকার করণে তখন তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি একটি

পারস্য কবিতার অর্থ করিয়া প্রকাশ করিলেন, “গুরু-জনের অসম্মত কর্ম্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে, কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়েই সুখী হই।”

তৃতীয় অধ্যায়

যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবজী কর্তৃক আহত এবং পরাভূত হইয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রাণসম্বন্ধবর্জ্জিত হয়েন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরস্ত্রাণ-বস্ত্র ছিন্ন করত ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং তদ্দ্বারা শোণিতপ্রস্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রি যে তাঁহার জীবদ্দশায় যাপন হইবে এমত কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। মলয় পর্ব্বত বহু হিংস্রজন্তুর আবাস, বিশেষত তথায় ব্যাঘ্র- এবং সর্পভয়, বঙ্গদেশীয় সুন্দরবন অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু দৈবাধীন সেই রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত হইল। পরন্তু পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষাও তাঁহার শরীর অধিকতর ব্যথিত দুর্ব্বল ও তৃষ্ণায় শুষ্ক কণ্ঠ-তালু হইয়াছিল। পিপাসার পীড়ায় কাতর হইয়া সেনানী ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নির্ঝর পার্শ্বে গমন করিয়া সেই পবিত্র বারি পান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিলেন। এবং পুনরায় নিতান্ত দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তথায় নিদ্রা-ভিভূত হইয়া রহিলেন। সেই দিবা এবং রাত্রি এইরূপে গত হইল। কিন্তু পরদিন অনেক সুস্থ এবং সবল হইলেন। তিনি যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, মদ্যমাংসভূক্ হইলে অবশ্যই মৃত্যুকবলিত হইতেন। কিন্তু শিবজীর প্রায় সকল সৈন্যই শিব-পরায়ণ ছিল, মদ্যমাংস ভোজন করিত না, অথচ তাহারা কখনও পরিশ্রম-বিমুখ বা অধ্যবসায়বিহীন হয় নাই। যাহা হউক, সেনানী দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বন্য-ফল ভোজন এবং সেই নির্ঝর-অম্বু পান দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ এইরূপে গত হইলে, তিনি ক্রমে অতি মৃদু গমনে স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করত প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সমুদায় পর্ব্বতীয় পথ উত্তীর্ণ হইলে আরঞ্জেব বাদসাহের কোন সেনানীর স্কন্দাবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। দুর্বুদ্ধি মহারাষ্ট্র সেই শিবিরসন্নিহিত হইয়া প্রহরিগণকে কহিল, তোমরা আমাকে সেনানীর সমীপস্থ কর, আমি শিবজীকে ধৃত করিবার উপায় বলিয়া দিব। শিবির-রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাদর করিয়া সেনাপতির নিকট আনয়ন

করিল। মুসলমান সৈন্যপতি তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কহিলেন, "রে মহারাষ্ট্র! তোর বেশভূষায় দেখিতেছি তুই শিবজীর অনুচর হইবি, অতএব কি প্রয়োজনে এই সৈন্য মধ্যে আসিয়াছিস্ বল্?" মহারাষ্ট্র আপন শরীরের ক্ষতভাগ সকলকে দেখাইয়া কহিল, "যে দুরাত্মা এক্ষণে মহারাষ্ট্রপতি নামধেয় হইয়াছে সেই আমার এই দশা করিয়াছে। এই সকলের শোধ দেওয়াই আমার এখানে আসিবার তাৎপর্য্য।" "কিন্তু তোর কথায় আমার বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা কি? যে স্বজনের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, শত্রুর বিশ্বাসহন্তা হইতে তাহার কতক্ষণ?" মহারাষ্ট্র কিঞ্চিৎ ক্রোধ করিয়া উত্তর করিল, "যদি আমার দ্বারা স্বকার্য্য সাধনে আপনার এতই অনিচ্ছা হয়, তবে অন্য কোন মুসলমান সেনাপতির নিকট যাই।" এই বলিয়া গমনোদ্যম করিলে বাদসাহের সেনাপতি ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণই বোধ হইতেছে যে শিবজী কর্ত্তৃক আহত হইয়া ক্রোধপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আসিয়াছে। যদি অন্য কেহ ইহার সহায়তায় এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহারই সম্পূর্ণ যশোলাভ হইবে। অতএব ইহাকে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রকে আহ্বান করিষা কহিলেন, "তোমাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলাম, যদি কোন প্রকারে সেই দস্যুকে আমার হস্তগত করিতে পার তবে যথোচিত পুরস্কার করিব।" মহারাষ্ট্র কহিল, "আমার অন্য কোন পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থলোভে জন্ম-ভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি, কেবল সেই দুরাত্মার শোণিত দর্শন করিতে চাহি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার সেই মানস সিদ্ধ না হয়, তাবৎকাল বাদসাহের পক্ষ হইলাম।" মুসলমান সেনানী এই কথায় কিঞ্চিৎ চমৎকৃত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, সকল জাতিরই অভ্যুদয়কালে তত্তৎজাতীয় জনগণের ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি, সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট-তামস-প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি লোকান্তরগত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের উপরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহারা সমুদায় ভারত রাজ্যকে কখনও স্বদেশে বলিয়া বোধ করে নাই বটে। কারণ এই বিস্তীর্ণ দেশ নানাপ্রকার লোকের আবাস। এদেশীয়গণের ব্যবহার, ভাষা, বৃত্তি সকলই পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সেই জন্য যখন যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্রখণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা বাস্তবিক

স্বদেশবৎসল ছিল। দেখ, ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্ম্মী শত্রুর স্থানে ভৃতি স্বীকার করিল না। তাহার তেজোগর্ভ বাক্যে মুসলমান সৈন্যপতি বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শীঘ্র ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুরস্কার গ্রহণ কর বা না কর, তুমি কি উপায়ে শিবজীকে আমার হস্তগত করিবে, বল।" মহারাষ্ট্র উত্তর করিল, "এক্ষণে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমি সুস্থ এবং সবল হই। পরে আমার সমভিব্যাহারে দুই শত উত্তম সৈন্য দিবেন। আমি অন্যের অবিদিত পথ দ্বারা তাহাদিগকে শিবজীর আবাসে লইয়া যাইব। পরন্তু আপনি অস্ত্র ধারণ করিতে না পারিলে অন্যের নিকট গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিব না। তিনি যেমন আমাকে দ্বৈরথ্যযুদ্ধে আহত করিয়াছেন, আমিও স্বহস্তে তাহার প্রতিফল প্রদান চাহি।" মুসলমান-জাতীয়েরা স্বভাবতই জাত্ম, তাহাতে অবজ্ঞেয় হিন্দুর প্রমুখাৎ তাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু মুসলমান সৈন্যপতি তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনাভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির যথাযোগ্য সেবা এবং চিকিৎসার্থ ভৃত্য ও ভিষক্ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্র অতি গুপ্তভাবে তাঁহার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুসলমান সেনানী স্বয়ং শিবজীকে ধৃত করিবেন, এই অভিপ্রায়ে নিজ বাদসাহকেও এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন না।

আরঙ্গেব কোন প্রকারে শিবজীর অনুসন্ধান বা আত্মজার উদ্ধারে সমর্থ না হইয়া কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু যাইবার কালীন তাঁহার যে যে সেনাপতির নিকট মহারাষ্ট্র সেনানী বাস করিতেছেন, তাহারই নিকট কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া আদেশ করিয়া গেলেন, শীঘ্র পর্ব্বতীয়-যুদ্ধ-নিপুণ জয়পুর-প্রদেশাধিপতি রাজা জয়সিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবেন, যাবৎকাল তিনি না আইসেন ততদিন কোন বিশেষ চেষ্টা না করেন। এদিকে শিবজী ঐ সুযোগে অনেক পর্ব্বতীয় দুর্গ নিজ অধিকারসম্ভুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে শত্রুসৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া নিজের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি চিরকাল এইরূপ ছিল। বিপক্ষকে প্রবল দেখিলে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গসকলের শরণ লইতেন, আর তাহাদিগকে ক্ষীণবল দেখিলে নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদা মহারাষ্ট্রপতি নিজ দুর্গপ্রাকারোপরি বায়ু সেবন করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন একজন নিম্ন ভাগ হইতে দুর্গে

আসিবার নিরূপিত সঙ্কেত করিল এবং সঙ্কেতানুসারে দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক রজ্জু নিক্ষিপ্ত হইল। ঐ ব্যক্তি তদবলম্বনে দুর্গে প্রবেশ করিলে সকলে মৃত সেনানীকে পুনর্জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেনানী তৎক্ষণাৎ শিবজীর সমীপস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সহকারে কহিল, "সাক্ষাৎ শিবাবতার, শিবজীর জয়! এই অধীনকৃত অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।" শিবজী ঐ সেনানীর প্রতি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্নেহ করিতেন, এবং তাহার অপরিসীম বীর্য্য এবং সাহসিকতাগুণে তদ্দ্বারা তাঁহার অনেকানেক কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়াছিল; অতএব সে তাঁহার হস্তে একেবারে প্রাণবর্জ্জিত হয় নাই দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন, "তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিতে হইলে তোমার মুখদর্শন করাও অযোগ্য, কিন্তু কেবল আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া যে কোন মহারাষ্ট্র স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে নিবৃত্ত থাকিবে আমার এমন অভিপ্রায় নহে—অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, কল্য প্রাতে বিবেচনা করিয়া তোমাকে দুর্গান্তরে নিযুক্ত করিব।" সেনানী অবনত-শির হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রি দুই প্রহর সময়ে ঐ দুরাত্মা আপনার নির্দ্দিষ্ট নিলয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গপ্রাকারোপরি আরূঢ় হইল। জনৈক প্রহরী সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেনানী কহিল, "ভাই রে! অনেক দিন তোমাদিগের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আর কল্য প্রাতেই এখান হইতে যাইতে হইবে, অতএব ভাবিলাম যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় কথাবার্ত্তায় রাত্রি যাপন করিব।" এইরূপ সরল ভাষায় প্রহরীর প্রতীতি জন্মাইয়া দুষ্ট ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং হঠাৎ তাহার পাদদ্বয় আকর্ষণ করত তাহাকে একেবারে দুর্গের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিল। প্রহরী সেই উন্নত স্থল হইতে অন্যূন দুই শত হস্ত নিম্নে নিপতিত হইয়া একেবারে চূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইল। বিশ্বাস-ঘাতক তখন নিরুদ্বেগে অঙ্গাবরণের অন্তর হইতে একটি দীর্ঘ রজ্জু বাহির করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সেই রজ্জু দ্বারা একজন বলবান মোগল যোদ্ধাকে উন্নত করিল। সেই ব্যক্তির স্থানেও ঐরূপ একটি রজ্জু ছিল। উভয়ে স্ব স্ব রজ্জু সংযোগে আর দুই জনকে দুর্গে আনয়ন করিল। এইরূপে মুহূর্ত্তেক মধ্যে শতাধিক বিপক্ষ সেনা শিবজীর দুর্গাভ্যন্তরালে প্রবিষ্ট হইল।

মহারাষ্ট্র সেনানীর মানস ছিল কোন গোলমাল না করিয়া শিবজীর গৃহে প্রবেশ করত স্বহস্তে তাঁহাকে হনন করে। কিন্তু মোগল সৈন্যেরা ক্রমশঃ

আপনাদিগকে বৰ্দ্ধিত-বল বুঝিয়া সাবধানতা চ্যুত হওয়াতে দুর্গরক্ষিগণ অনেকে জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের একজন উৰ্দ্ধশ্বাসে মহারাষ্ট্রপতির গৃহদ্বারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহারাজ! শত্রুসেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, উপায় করুন।" শিবজী তৎক্ষণাৎ নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে বাহির হইয়া কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই নিশীথ সময়ে মহারাষ্ট্র ভট সকলের 'হর হর ভবানী!' এবং মোগল সেনার 'আল্লাঃ আকবার!' এইরূপ যোধ-রাব পুনঃ পুনঃ গগন বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীযরা দুর্গের পথ সকল উত্তম জানিত বলিয়া হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াও অতি উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মোগলেরা অন্ধকারে অপবিজ্ঞাত স্থানে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিকটবৰ্ত্তী কতিপয় পর্ণ এবং তৃণ কুটিরে অগ্নিদান করিল। শিবজী দেখিলেন যুদ্ধে বিজয়-সম্ভাবনা নাই। অতএব সত্বরগমনে বাদসাহ পুত্রীর গৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার পিতৃসৈন্যে আমাব দুর্গ অধিকার করিল—তোমাব কোন বিপদ হইবাব সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধ্য হইব।" রোসিনারা ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "যদি কোন উপায় থাকে, নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও না, পলায়ন কব, আর কখনও যদি পুনৰ্ব্বার মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমাবই রহিলাম জানিও।" এদিকে মোগলদিগেব জয়ধ্বনি ক্রমে নিকটবৰ্ত্তী হইতে লাগিল, সুতরাং আর বিলম্বের অবকাশ নাই, শিবজী শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্গের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন।

দুর্গের সেই ভাগ অন্যান্য দিক্ অপেক্ষাও বরং অধিক বন্ধুর হইবে। কিন্তু সেই পার্শ্বে পৰ্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখি-সকল জন্মিয়াছিল, আর নীচে একটি নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিবজী সেই বৃক্ষসকলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিলেন। মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র গাছটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা পদভরে উন্মূলিত হইল। কিন্তু ভাগ্যবলে শিবজী বহুদূর নিপতিত না হইতে হইতেই আর একটি অধিকতর-বদ্ধমূল বৃক্ষকে ধারণ করিতে পাইয়া রক্ষা পাইলেন। সেই স্থান হইতে নদীজল অন্যূন বিংশতি হস্ত দূর হইবে। শিবজী নিকটস্থ কতকগুলি তৃণ লইয়া আপন পৃষ্ঠতলে বিন্যস্ত করিয়া বাঁধিলেন, এবং পৰ্ব্বতপার্শ্বে পিচ্ছলাইয়া অবনতি-ক্ষতশরীরে নদীজলে পড়িলেন। সেই স্থলে নদী গভীর ছিল, এবং তন্মধ্যে বৃহৎ শিলাদি কোন কঠিন পদার্থও ছিল না। অতএব বেগে জলমগ্ন হইলেও মহারাষ্ট্রপতির কোন

ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি জলে ভাসমান হইয়া সন্তরণ দ্বারা স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন।

গ্রন্থকার এইবার বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পাঠকবর্গকে উদার-চরিত্র শিবজী এবং কোমল-প্রকৃতি রোসিনারার সহিত পরিচিত করাইয়া তাঁহার এমত অনুভব হইয়াছে যে, সকলেই ইঁহাদিগের পরে কি হইয়াছিল জানিতে ব্যগ্র হইবেন। যতদিন তাঁহাবা উভয়ে একত্র ছিলেন, একের বিবরণেই অপরের আনুষঙ্গিক বর্ণন হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের বিচ্ছেদ হইলে কাহার বিষয় অগ্রে বর্ণনীয়?—সর্ব্ব স্থানেই পুরুষের সম্মান অধিক। স্থতরাং শিবজী পুরুষ বলিয়া তাঁহারই বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু এইক্ষণে কোন কোন সুধীর-স্বভাবা কামিনীরাও কাব্য-শাস্ত্রাদি পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন, অতএব পাছে তাঁহারা কেহ রোসিনারার কথা না বলিলে মনোদুঃখ করেন এই জন্য বাদসাহ-পুত্রীর বিবরণ অগ্রে বলাই বিধেয় হইতেছে। যাঁহারা মনের দুঃখ মনেই রাখেন, তাঁহাদিগের মন রাখাই সাধু পরামর্শ! বিশেষতঃ মুসলমানেরা তাহাদিগের পরম শত্রু শিবজী মরিয়াছেন এই বিবেচনাই করিয়াছিল এবং তিনিও কয়েক দিবস কোথায় কি করিতেছিলেন, প্রথমতঃ তাহার কিছুই প্রকাশ হয় নাই, অতএব এই অধ্যায় মধ্যেই সংক্ষেপে বাদসাহ-পুত্রীর কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মুসলমান সৈন্যপতি দুর্গাধিকার বার্ত্তা প্রাপ্ত হইবামাত্র মহা আনন্দসহকারে যাত্রা করিয়া পর দিবস তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ বাদসাহ-পুত্রীকে সহস্রাধিক সামন্ত সমভিব্যাহারে পিতৃ-সদনে প্রেরণ করিলেন। রোসিনারা কতিপয় দিবস পরে পথিমধ্যে রাজা জয়সিংহের সৈন্যে উপস্থিত হইলেন। সিংহ মহারাজ মুসলমান সৈন্যপতির লিপি প্রাপ্ত হইয়া জানিলেন, শিবজীর দুর্গ জয় হইয়াছে এবং তিনিও প্রস্থানকালে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। অতএব তিনি যেমন শীঘ্র সসৈন্যে আসিতেছিলেন, তাহা না করিয়া বাদসাহকে সমুদয় শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন এবং পরে, আপনি কি করিবেন, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সেই স্থান হইতে রোসিনারা নির্ব্বিঘ্নে পিত্রালয় প্রাপ্ত হইলে বাদসাহ, একেবারে আত্মজার উদ্ধার এবং শিবজীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। কিন্তু কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথাপ্রসঙ্গে তৎপ্রমুখাৎ শিবজীর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ কন্যার আর

মুখাবলোকন করিবেন না। অতএব যে কারাগৃহ-তুল্য-অবরোধ মধ্যে আপন পিতা সাজাহানকে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহারই এক দেশে কন্যার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। সেই স্থানে রোসিনারা কিরূপে কালযাপন করিতেন, এবং কালে তাঁহার মানস কতদূর কিরূপে সফল হইয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে ব্যক্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

যে দেশে প্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং রাজবর্ত্ম সকল পরিপাটিরূপ না থাকাতে বণিক্-বৃত্তি সুসম্পন্ন হয় না, তথাকার রাজাদিগের কর্ত্তব্য প্রজার স্থানে সুবর্ণরজতাদিরূপে কর না লইয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করা। এইরূপ না করিলে প্রজার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাদিগকে অল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, অথবা দূরস্থিত আপণে কৃষি-প্রসূত দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয়। শিবজী এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রজারা যাহার যেরূপে ইচ্ছা, তাঁহার ভাগধেয় প্রদান করিবে। এই নিয়মানুসারে তাঁহার পর্ব্বতীয় দুর্গ সন্নিহিত প্রজাগণ ঐ দুর্গস্থিত তৃণ- ও পর্ণকুটির সকল নির্ম্মাণার্থ তদুপযোগী পত্র তৃণ প্রভৃতি উপকরণ-সামগ্রী প্রদান করিত; তাহাদিগের স্থানে আর অন্য করাদান ছিল না। পরন্তু যখন তাহারা ঐ নিয়মানুসারে তৃণাদি প্রদান করিতে আসিত, সেই সময়ে পরস্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধা হয় বলিয়া দুর্গ মধ্যে এক প্রকার বাজার বসিত।

মুসলমান সৈন্যপতি তাঁহার অধিকৃত দুর্গের সকল কুটির অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া প্রজাদিগের স্থানে ঐরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি করিলেন। তাঁহার মানস ছিল ঐ দুর্গে বহুতর সৈন্য নিযুক্ত রাখেন, অতএব এককালে অনেক কুটির নির্ম্মাণের আদেশ করিয়া যাবৎ তৎসমুদায় সমাপন না হয় তাবৎ আপনি শিবির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘোষণানুসারে দুর্গ জয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে শতাধিক ব্যক্তি নানা দ্রব্যজাত লইয়া দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে দুর্গ মধ্যে প্রবেশিত হইল তাহার সহিত একজন মোগল যোদ্ধার

এইরূপ কথোপকথন হয় এবং সেই অবসরে আর আর সকলে ক্রমে ক্রমে দুর্গোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল। মোগল যোদ্ধা প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, "কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল, তেমনি একেবারে জাহান্নমে গিয়াছে।" মহারাষ্ট্র কহিল, "হাঁ শুনিয়াছি, শিবজী নাকি মরিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যিনিই রাজা হউন, উচিত কর দিব, রাজ্যে বাস করিব; আমাদিগের ভালও নাই মন্দও নাই—ভাল, তবু বল দেখি শিবজী মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে; তোমরা কি তাঁহার শব দেখিয়াছ?" "বেটা নদীর জলে পড়িয়া কোথায় মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে কিরূপে দেখিব।" "তবে তিনি মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে?" "আমরা সেই রাত্রি মসাল জ্বালিয়া সকল জায়গা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না—পর দিন গড়ের মুর্চার উপর উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একটা গাছ উপড়িয়া গিয়াছে—আর বালিতে পায়ের দাগও পড়িয়া রহিয়াছে। যে নেমকহারাম্ আমাদিগকে এই গড়ে আনিয়াছিল সেই ঐ পায়ের দাগ দেখিয়া কহিল শিবজীই এই খান দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া মরিয়াছেন।" মহারাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই নেমক্‌হারাম্ এখন কোথায়?—তাহার কি হইয়াছে কিছু বলিতে পার?" মোগল দুর্গজয় হওয়াতে নিতান্ত আনন্দমগ্ন অন্তঃকরণ হইয়াছিল বলিয়াই জিজ্ঞাসুর তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখিয়াও সন্দিহানমনা হইল না। সে হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "সে এই খানেই আছে, কিন্তু তাহার জিয়ন্তে কবর হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় তোদের সকলকেই সেইরূপ করি।" মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমরা তোমাদের কি করিয়াছি?" "তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস্।" মহারাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কহিল, "রে বিধর্ম্মী মুসলমান, তুই মনে করিয়াছিস্ শিবজী মরিয়াছেন, তাঁহাকে সম্মুখে দেখ্।" এই বলিতে বলিতে কৃষীবল-বেশধারী শিবজী আপন আনীত তৃণকাষ্ঠাদি মধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ বাহির করিয়া ঐ ভয়ার্ত্ত মোগলের শিরশ্ছেদন করিলেন। আর আর মহারাষ্ট্র-সকলেও ঐরূপে নিজ নিজ অস্ত্র বাহির করিরা 'শিবজীর জয়! শিবজীর জয়!' এই শব্দসহকারে মোগলদিগকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। মোগলেরা অনেকেই নিরস্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়াছেন জানিয়া একান্ত অনবধান ছিল। অতএব শিবজী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহা ভয় প্রযুক্ত যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। আর যাহারা যাহারা সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল, তাহারাও সুশিক্ষিত

মাওলীগণ কর্তৃক স্বল্পায়াসেই পরাজিত হইল।

এইরূপে শিবজী নিজ দুর্গ পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া সেই বিশ্বাস-হন্তা সেনানীর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। পরে যথানিয়মে লোক নির্দ্দিষ্ট করত তৎক্ষণাৎ দুর্গের আরক্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। তাহা করিতে করিতে দুর্গের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখেন একটি ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বার নূতন প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং চতুর্দ্দিক্স্থ সকল গবাক্ষ সেইরূপে বদ্ধ হইয়া আছে। ছাদের উপর উঠিয়া দেখেন, কেবল তন্মধ্যভাগে একটি ছিদ্র মাত্র আছে, আর সর্ব্ব দিক সর্ব্ব প্রকারে বদ্ধ, অন্য কি, বায়ু গমনাগমনেরও পথ নাই। তখন স্মরণ হইল, মোগল কহিয়াছিল সেনানীর জীবৎসমাধি হইয়াছে। অতএব তাহাই বুঝি এই হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার উন্মুক্ত করণের অনুমতি করিলেন। দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থানান্তরিত হইলে সেই অন্ধতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক প্রবেশ করাতে একটা মৃতকল্প-মনুষ্য-দেহ দৃষ্ট হইল। তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বয়ং ঐ পরিশ্রমে বিমুখ হইলেন না। পরে গৃহান্তরালে প্রবেশ করিয়া যেরূপ দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে—ঐ স্থান সাক্ষাৎ-প্রেতভূমি। গৃহমধ্যে স্থালী স্থালী পূর্ণ শোণিত সংগত হইয়া তিমিরবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিসহ মাংসখণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে সেই মহারাষ্ট্র সেনানীর শীর্ণ এবং পাংশুবর্ণ শরীর নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন হইবামাত্র মহারাষ্ট্রপতি ব্যস্ত হইয়া বহির্ভাগে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ঐ মৃতকল্প শরীর বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। বহির্ভাগের পবিত্র বায়ু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্ব্বার রক্ত সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া শিবজী কহিলেন, "এখনও জীবন আছে, শীঘ্র শীতল জল আনিয়া উহার মুখে সেচন কর।" কেহ বারদ্বয় ঐরূপ করিলে ঐ হতভাগ্য হঠাৎ করদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া কম্পিত শরীরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!—আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!" সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, "অনুমান হয়, দুরাত্মা মুসলমান কর্ত্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উঁহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য হয় নাই, অতএব তাহাই পান করিবে না কহিতেছে।" পরে কহিলেন, "বোধ হয় নাই, পাপিষ্ঠেরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে, বুঝি তাহাই ঐ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম।

হায়! ভারত-ভূমি আর কত দিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে?” তিনি এইরূপ কহিতেছেন এমত সময়ে সেনানী একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু শিবজীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন, এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য-সামগ্রী আনয়ন করিতে কহিলেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক শিবজীর মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! তবে কি আমি সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম? তবে কি আমি আপনকার বিশ্বাস-ঘাতী নহি?—আমি মুসলমানদিগকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করি নাই?—আমি কি আপনকার মৃত্যু ইচ্ছা করি নাই?—না, না, সে সকল স্বপ্ন নহে! আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে সে যে উৎকট আর্ত্তস্বর করিয়াছিল তাহা এক্ষণেও আমার কর্ণকুহর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে—আব আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথ্যা হইবার নহে।”

শিবজী নিজ সেনানীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “তুমি এই ক্ষণে আব সেই সকল কিছু মনে করিও না, এই কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং জল পান কর, পরে যাহা যাহা হইয়াছে সবিস্তার শ্রবণ করিব।” সেনানী কহিল, “মহারাজ! আব আমাকে আহার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে যাহা বলি সকলে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।” এই বলিয়া সেনানী উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদসাহী সৈন্যে মিলিত হইয়াছিলেন, এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যেমন করিয়া মোগলদিগকে দুর্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সমুদায় ব্যক্ত করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন—“মহারাজ! দুর্গ অধিকার হইবার পর আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, অবশিষ্ট জীবিত কাল তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন কবিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিয়া দুরাত্মা মুসলমান সৈন্যপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছিল, বলিতে পারি না, বিদায় প্রদানে সম্মত না হইয়া বিশ্বাস-হন্তা বলিয়া আমায় বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল, ‘তুই মুসলমান হইয়া বাদসাহের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ।’ তাহার ভর্ৎসনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। না হইবে কেন? যে ব্যক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহার সেই দোষটি কহিলেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং আমি মুসলমান ধর্ম্মের অনেক নিন্দা করিলাম। সৈন্যপতি তখন কতিপয় অনুচরেব প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা

পূর্ব্বেই শিক্ষিত হইয়াছিল, অতএব আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন হইয়াছিলাম। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যেন যমালয়ে আসিয়াছি। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার—সমুদায় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল গত হইলে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিয়াছিলাম। 'জল! জল!' এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ! দেখিলাম যে আপনকার আরাধ্যা ভবানী দেবী ঘোর-বেশা ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিতেছেন, 'রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহবিবর্জ্জিত হইয়া তাহা বিধর্ম্মী শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস্ না গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর পক্ষে এই দেশের সমুদায় জল গোরক্ত এবং সকল ভক্ষ্য বস্তু গোমাংস হইয়াছে—এই লইয়া আহার কর্'—মহারাজ! ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে গোরক্ত এবং গোমাংস প্রদান করিল—মহারাজ! পৃথিবীতে আমার আর ভক্ষ্যও নাই পানীয়ও নাই।"

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার প্রায় চৈতন্যশূন্য হইলেন, এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যনিঃসরণ হইল না। এমত সময়ে একজন মহারাষ্ট্র সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! ভগবান্ রামদাস স্বামী দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।" পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সরল-শরীর, প্রশস্তললাট, সহাস্যমুখ, বিভূতি-ভূষণ এবং আরক্তবহির্ব্বাসপরিধান ও ত্রিশূলহস্ত সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সন্ন্যাস-স্বরূপ পুরুষবর তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রপতি নিজ দীক্ষাগুরুর দর্শনলাভমাত্র একাকী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণবন্দন করিলে, গুরু আশীর্ব্বাদ সহকারে কহিলেন, "বৎস, তোমার মঙ্গল হউক! আমি যে যে কর্ম্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদায় সুসিদ্ধ হইয়াছে। যে শিষ্য প্রতিনিধি হইয়া ফকীর বেশে শত্রুসৈন্যে গিয়াছিল, সে এই মাত্র আসিয়া কহিল তথায় দুর্গবিজয়ের কোন সংবাদ যায় নাই, আর তোমার সকল সেনাপতিই স্ব স্ব দুর্গ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর—আমি তোমার স্বস্থানপ্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়া আশ্রমে গমন করি।" শিবজী উত্তর করিলেন, "গুরো! আপনি প্রসন্ন আছেন, আমার অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু প্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলেরা এই দুর্গ অধিকার

করে এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়া আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই, তখন বোধ হইয়াছিল সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুসৈন্য পরাভব না করিলে দুর্গ অধিকার করিবার উপায়ান্তর নাই। সেই ভাবিয়াই আপনার শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ দুর্গে দুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের উপায় করি। পরন্তু, যাহা কর্ত্তৃক আমার কৌশল সমুদায় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্ম্মী শত্রু তাহারই প্রতি অত্যাচার করিয়া আমার কার্য্য-সাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তজ্জন্য এক প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইতেছে।" এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেনানীর প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অবিকল আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আগামী যুদ্ধে অবশ্য বিজয় লাভ হইবে!" পরে শিবজীকে বলিলেন, "তোমার ঐ সেনানীকে অদ্য রাত্রি আমার সমীপে আসিতে কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব না;—এক্ষণে যুদ্ধের যাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিধানে মনোযোগ কর।"

পঞ্চম অধ্যায়

সেই রাত্রে অন্যূন বিংশতি মহারাষ্ট্রসেনা বাদসাহী সৈন্য-শিবিরাভিমুখে গমন করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে এক দল ধানুষ্ক গমন করিল। তাহাদিগের গতি ব্যাঘ্রবৎ এবং কর্ম্মও ব্যাঘ্রবৎ। তাহারা কোন উচ্চ শিলা বা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সম্মুখভাগ সমুদায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে এবং শত্রুনিযুক্ত প্রহরী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থসন্ধান বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করে। এই সকল ব্যক্তি রাত্রি-যুদ্ধে কুশল। শিবজীর শিক্ষায় ইহারা পুনঃ পুনঃ নিশাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক "হিৎকরী" সেনা গমন করিল। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু কটিবন্ধে এক এক খানি অসি দোদুল্যমান হইতেছিল। ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তৎশিক্ষিত অস্মদ্দেশীয় শিপাহিগণের বন্দুকে যেরূপ সঙ্গিন থাকে, শিবজীর সেনার সেরূপ ছিল না—তাহারা যুদ্ধকালে স্ব স্ব কৃপাণ দ্বারাই সঙ্গিনের কার্য্য নির্ব্বাহিত করিত। ঐ 'হিৎকরী' সেনার অনতিদূর পশ্চাতে মহারাষ্ট্রপতির বিশিষ্ট সমাদৃত অসি-

চর্ম্মধারী 'মাওলী' সৈন্যদল গমন করিল। তাহারা সকলেই অতি বলিষ্ঠ এবং বিক্রমশালী। তাহাদিগের খড়্গ সাধারণ খড়্গ অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। এই জন্য অসিযুদ্ধে ইহারা প্রায় কখনই কাহা কর্তৃক পরাভূত হইত না। পর্ব্বতীয় দুর্গম স্থান গমনেও ইহারা অত্যন্ত পটু ছিল। যে উন্নত গিরিশিখরে অজ এবং সরীসৃপ ব্যতিরেকে অন্য ভূচর জন্তুর গমন অসাধ্য, বোধ হয়, শিবজীর মাওলীগণ সেই সকল স্থানও লঙ্ঘন করিতে পারিত। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সকল সৈন্য লইয়া পাদচারে যুদ্ধ করিতেন। ইহাদিগের পশ্চাতে 'বর্গী' নামক অশ্বারোহী সেনা গমন করিল। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র সুদীর্ঘ শেল। কিন্তু কাহারও কাহারও স্থানে একটি একটি বন্দূকও ছিল, এবং সকলেরই কটিবন্ধে করবাল দোদুল্যমান হইতেছিল। এই সকল সৈন্যের বহুদূর পশ্চাতে 'শিলিদার' নামক অশ্বারোহী দল দৃষ্ট হইল। তাহারা ইহাদের সকলের ন্যায় সুশিক্ষিত বা সুব্যবস্থিত নহে। তাহাদিগের বেশভূষা অস্ত্রশস্ত্র বিবিধপ্রকার। তাহারা পার্য্যমাণে কখনও সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রেরিত হইলে পলায়নপর শত্রুর অনেক অপচয় করিতে পারিত।

'শিলিদার' ভিন্ন আর সকল সৈন্যের বেশ প্রায় একবিধ ছিল। সকলেরই মস্তকে উষ্ণীষ এবং সকলেরই সেই উষ্ণীষের এক এক ফের্ চিবুক-নিম্নভাগ দিয়া উদ্বদ্ধ। সকলেরই অঙ্গ এক একটি অঙ্গরক্ষিণী দ্বারা আবৃত, সকলেই কটিবন্ধ বিশিষ্ট, এবং সকলেরই পায় পা-জামা পরিধান। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেরই কর্ণে এক এক প্রকার কর্ণভূষণ এবং হস্তে বলয় ছিল। সাধারণ সৈন্যের এইরূপ বেশভূষা। সেনানায়কগণের পরিধেয় বিবিধপ্রকার। পরন্তু তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ পরিচ্ছদের উপরিভাগে লৌহজালবিনির্ম্মিত এক প্রকার অনতিগুরুভার সন্নাহ ধারণ করিতেছিলেন।

সৈন্যগণ এইরূপে গমন করিয়া সূর্য্যোদয় সময়ে যে স্থলে উপস্থিত হইল, তাহারই নিম্নে বাদসাহী সৈন্য-শিবির সন্নিবেশিত ছিল। তত্রত্য তাম্বু সকলের বিচিত্র বর্ণ, এবং সোণালী কলস সকলের প্রভা, সেই পর্ব্বততলী হইতে অতি ঈষদ্ভাবে প্রকাশমান হইতেছিল। কিন্তু মুসলমান সৈন্যপতি, শত্রু এমত নিকট আসিয়াছে, ইহার কিছুই জানিতেন না। বিশেষতঃ তৎপ্রদেশীয় দুর্গাধিকার হওয়াতে তিনি সেই দিক্ হইতে এইরূপে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার কোন শঙ্কাই করেন নাই। অতএব যখন কোন মোগল প্রহরী পর্ব্বতের উপরিভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাণিত অস্ত্রে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া

তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিলেন না। পরে অনেকেই ঐরূপ দেখিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিলে তিনি স্বয়ং বাহির হইয়া দর্শন করিলেন। তখন সম্পূর্ণ সূর্য্যোদয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্ব্বতের উপরিভাগ কোন স্থান অপ্রকাশ নাই। অতএব সৈন্যপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্রসেনায় পর্ব্বতের শিরোদেশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন দুই প্রজ্বলিত আগ্নেয় শরীর সেই শত্রুসৈন্যের উর্দ্ধভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। মুসলমানেরা দেবশরীর তেজোময় বলিয়া জানে। অতএব মোগল সৈন্যপতির বিলক্ষণ প্রতীতি হইল, দেবতাদ্বয়ই বুঝি শত্রুর অনুকূল পক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। পরে দেখিলেন ঐ দুয়ের মধ্যে একজন একটি সুদীর্ঘ খড়্গ গ্রহণ করিয়া অপরেব হস্তে প্রদান করিলেন এবং পরক্ষণেই সমুদায় শত্রুসৈন্য হইতে গগন-স্পর্শী গভীব জয়ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহর ভেদ করিল। তখন তিনি নিজ সৈন্যের প্রতি নিতান্ত দৈবাঘাত বুঝিলেন। অতএব এই তাঁহার পরম সাহস বলিতে হয় যে, একবারও পলায়ন করিবার মনন করেন নাই। তিনি শীঘ্র "সাজ! সাজ" শব্দসহকারে যথাস্থানে সৈন্যবিনিবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আসিয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

কিন্তু যেমন পর্ব্বতের উপরিভাগে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার পর প্রভূত জলরাশি ভয়ঙ্কর বেগে নিপতিত হয় এবং সম্মুখস্থ গিরিশৃঙ্গ ও বিস্তীর্ণ শাখাপল্লববিশিষ্ট তরুবর-সকলকে উন্মূলিত করিয়া যায়, বেগবান্ মহারাষ্ট্র-সৈন্য সেইরূপে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত্রুদল তাহাদিগের সমক্ষে সেইরূপে পরাভূত হইতে লাগিল। যদি কোন শত্রুসেনাপতি বিশিষ্ট সাহস করিয়া কোন কোন সৈন্যদলকে রণস্থলে সুস্থির করিবার চেষ্টা করেন, তখনই কোথাও বা শিবজী স্বয়ং পাদচারে, আর কোথাও বা অশ্বারূঢ় এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দীর্ঘকায় পুরুষ, শীঘ্র উপনীত হইয়া নিমেষ মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে পরাভূত করেন। সেই অশ্বারোহীর প্রজ্বলিত দীর্ঘ খড়্গ দর্শন মাত্রেই শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, অথবা বিনা যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপে শিবির সম্মুখস্থিত মোগল যোদ্ধা সকল ভগ্ন হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা শত্রুর তাম্বু মধ্যে প্রবেশোদ্যম করিল।

কিন্তু সেইখানে মোগল সৈন্যপতি স্বয়ং দৃঢ়-প্রহরী উত্তম উত্তম সামন্ত সমস্ত পরিবৃত হইয়া রহিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বেগে তন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, যেমন জ্বলন্ত হুতাশন খরধার বৃষ্টিপাতে স্তিমিত-তেজঃ হয়, তেমনি সেই সুশিক্ষিত প্রতিপক্ষ ভট সকলের প্রযুক্ত গুলি প্রহারে তাহারা খর্ব্ব-বেগ হইল, এবং,

পলায়নপর মোগলেরাও ঐ অবকাশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্থির হইতে লাগিল। মুসলমানেরা বহুকালাবধি হিন্দু জাতিকে রণে পরাভব করিয়া আসিতেছিল, অতএব অবজ্ঞেয় শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়া বিশিষ্ট ঘৃণাকর বোধ করিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিবিধান চেষ্টা না করা অত্যন্ত দোষ। কিন্তু রণস্থলে শত্রুর প্রতি তাচ্ছিল্যভাব থাকিলে প্রায়ই জয়লাভ হয়। এই স্থানেও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইল। শিবজী সঙ্কট দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রামসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তথাপি কিছুই করিতে পারিলেন না। হস্তিপৃষ্ঠারূঢ় মোগলসৈন্যপতি কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া তাঁহার মাওলী দলও ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, হঠাৎ দৃষ্ট হইল, সেই অশ্বারূঢ় পুরুষ বিপক্ষ সৈন্যপতির প্রতি বেগে ধাবমান হইতেছেন, এবং তাঁহার অপসব্য হস্তে সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গ অনলশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে। মুসলমান সৈন্যপতি সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া অবধি, যেমন কোন বিষধর জন্তু বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে শরীর নিশ্চল হয়, তদ্দংশন নিবারণার্থেও পলায়ন করিবার শক্তি থাকে না, তিনিও সেইরূপ হইয়া একদৃষ্টে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন ঐ পুরুষবর অশ্ববেগে সামন্ত সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন, পর্য্যাণ-রেকাবের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরাক্রান্ত ভুজবলে খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, তখনও সেনাপতি পলায়ন বা সেই প্রহার নিবারণের যত্ন কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং একেবারে ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

মোগল সেনাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিল, একেবারে নিরুৎসাহ হইল, এবং পলায়ন করিতে লাগিল। সেনাপতির বিনাশে সর্ব্বদেশীয় সৈন্যই যুদ্ধে নিরুৎসাহ হয় বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ যেরূপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে এরূপ অন্যত্র অধিক শ্রুত হওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, এখানকার রাজারা একাধিপত্য-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া আপনাদিগের শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। তাঁহাদিগের সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কোন রাজকার্য্যে প্রজাদিগের কোন মতামত থাকে না। সুতরাং যিনি রাজা হউন না কেন, আমাদিগের সেই দশাই থাকিবে বুঝিয়া, সেনাগণ রাজার অথবা রাজ-প্রতিভূ সৈন্যপতির বিনাশ হইলেই রণস্থল ত্যাগ করিয়া যায়। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বেষ-ভাব-সম্পন্ন ছিল। তথাপি সৈন্যপতির বিনাশে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল।

শিবজীর অনুগত্যনুসারে পদাতি-সমস্ত শত্রু-শিবির প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য বিপুল

অর্থ এবং দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিল আর অশ্বারোহিগণ পলায়নপর শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পরে মহারাষ্ট্রপতি আপনিও কতক সামন্ত সমভিব্যাহারে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার গুরুদেব ভগবান রামদাস স্বামী সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, "বৎস! অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ—জয় সম্পূর্ণই হইয়াছে—আর স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন নাই, এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।" শিবজী তাহাই করিয়া কহিলেন—"গুরো! আপনকার আশীর্ব্বাদে বিজয় লাভ সম্পূর্ণই হইল—কিন্তু অদ্য সেনানী কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি—সে না থাকিলে আজি ঘোর বিপদ্ ঘটিত—সে অদ্য অতিমানুষ কর্ম্ম কবিয়াছে।" গুরু উত্তর করিলেন, "আমি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তাহাকে ভবানী প্রদত্ত খড়্গ প্রদান করিয়া অবধি তাহারই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম, তৎকৃত সমুদায় কর্ম্ম দেখিয়াছি। মহারাজ! দেবতারা যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহার কার্য্যসাধনের উপায়ও অগ্রে করিয়া রাখেন! ঐ দেখ দেখি, যে আসিতেছে উহার শরীরে কি তাদৃশ বল সম্ভব হয়?" শিবজী রামদাস স্বামীর অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টি করত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই মোগল সৈন্যপতির বধকারী অশ্বারোহীর সমীপস্থ হইলেন; এবং তিনি বেগে গমন করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন বলিয়াই সে ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল না! এক্ষণে আর সেই বীরমূর্ত্তি নাই। অঙ্গের নানা স্থানে অস্ত্রাঘাত হওয়াতে অজস্র শোণিত প্রস্রুত হইতেছিল। শিবজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আপন ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুমূর্ষু কালে মুখ যেরূপ শ্রীহীন্ হয়, তাঁহার মুখ সেইরূপ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও সেই যুদ্ধবীর হস্তের খড়্গ পরিত্যাগ করেন নাই। শিবজী ঐ অসি লইবার জন্য যত্ন করিলে, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন—মুখ ঈষৎ হাস্যপ্রভাযুক্ত হইল—এবং পরক্ষণেই সমুদায় শরীর একেবারে নিস্পন্দ হইল। রামদাস স্বামী কহিলেন, "মহারাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন সম্বরণ কর—সেনানী তাঁহার জীবন ঋণ পরিশোধ করিলেন।"

এই ব্যাপার হইতে হইতেই অনেক মহারাষ্ট্র সেনা সেই স্থলে প্রত্যাগত হইয়াছিল। সেনানীর মৃত্যু দর্শনে কাহারও চক্ষু নিরশ্রু ছিল না, এবং সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া আপনাদিগের অন্তকালও যেন সেইরূপ হয়, মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। রামদাস স্বামী কিঞ্চিদ্বিলম্বে মৃত সেনানীর খড়্গ উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! এই খড়্গ ভবানী-প্রদত্ত। অতএব ইহারও নাম ভবানী হইল। ইহা আপনি গ্রহণ করুন—অদ্য ইনি যে প্রকারে শত্রু নিধন

করিলেন, চিরকাল এইরূপ করিবেন।" এই বলিয়া গুরুদেব সেই খড়্গ মহারাষ্ট্রপতিকে প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই অবধি ঐ খড়্গের মূর্ত্তি মহারাষ্ট্রদিগের ধ্বজে চিত্রিত হইল, এবং অদ্যাপি সেতারা-প্রদেশীয় ভূপালবংশীয়েরা প্রতি বৎসর মহা সমারোহ করিয়া ঐ খড়্গের পূজা করেন। ক্ষণকাল পরে রামদাস স্বামী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! তুমি সচ্ছন্দে স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন করিতে থাক, আমি এক্ষণে বিদায় হই; বৈষয়িক কার্য্যের কেমন মাহাত্ম্য, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মনকেও ক্রমে ক্রমে আপনার বিধেয় করিয়া ফেলে—অতএব আমি আর বিলম্ব করিব না। সম্প্রতি আশ্রমে চলিলাম, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে, শীঘ্রই তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইব। মহারাজ! দুঃখিত হইও না—যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার তৎসাধনে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কেমন বিশ্বাস হইতেছে, স্থানান্তরে তোমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার পর শিবজী আপন সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমরা অদ্যকার যুদ্ধে যেরূপ বলবিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন এইরূপ করিলে ভগবানের অনুগ্রহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আজি তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা প্রথম বারেই সম্মুখসংগ্রামে প্রবল মোগলসৈন্যের পরাভব করিলে, অতএব তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিব। সৈন্য-সাধারণকে একটি একটি রৌপ্য বলয় এবং সেনানায়ক-সকলকে একটি একটি স্বুবর্ণালঙ্কার প্রদান করিবার অনুমতি করিলাম।" মহারাষ্ট্র সেনাগণ শিবজীর স্থানে প্রায় কদাপি অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার নিয়মানুসারে তৎকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও রাজকোষসম্ভুক্ত হইত। অতএব এই যৎসামান্য পুরস্কার প্রদান করিবেন শ্রবণ করিয়াও তাহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ যাহারা সর্ব্ববিষয়েই ভৃত্যবর্গকে অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁহারা ঐ রীতির সমুদায় দোষ অনুভব করেন না। একবার অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে আর অন্য কোন পুরস্কার মনঃপূত হয় না। বরং ক্রমশঃ প্রশংসনীয় কার্য্যের প্রতি অনুরাগ হ্রস্ব হইয়া অর্থের প্রতিই লোভ জন্মে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিবজী জীবদ্দশায় আছেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যপতিকে পরাজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই রাজা জয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎশ্রবণমাত্র নিজ পরাক্রান্ত রাজপুত্র-সৈন্য সমভিব্যহারে মহারাষ্ট্র-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সেনা শিবজীর অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক ছিল, এবং আপনিও পর্ব্বতীয় যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। দিল্লীশ্বর যেখানে যেখানে অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন, সেই সকল স্থানেই রাজা জয়সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দু রাজাদিগের সহিত বিবাদকালে রাজা জয়সিংহই আরঙ্গেবের ব্রহ্মাস্ত্র প্রায় ছিলেন। অতএব এই সংগ্রাম-সাগর মহারাষ্ট্র-পতির পক্ষেও দুস্তর বোধ হইবে আশ্চর্য্য কি? অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি তিনি এইবার মগ্ন হইলেন।

কিন্তু মহাত্ম-জনের মানসাকাশ কখনও দুর্ভাবনা কর্তৃক এমন আচ্ছন্ন হয় না যে, আশারূপ নির্ম্মল নক্ষত্র-জ্যোতিঃ তাঁহাদিগের নির্ণীত পথ প্রদর্শন না করে। শিবজী সেই বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও এমন একটি অসমসাহসিক কর্ম্ম করিলেন, যাহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল অসাধ্য মাত্র নহে, তাহাদিগের বুদ্ধিরও অগম্য। সেই কর্ম্ম তিনি যে কি সাহসে বা কি বিবেচনায় করিলেন তাহা অন্যের বুঝিবার নয়। তদ্দ্বারা তাঁহার অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাঁহার পরামর্শ কেবল ফলানুমেয় এবং তাঁহার সাহস সকল লোকের চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহারাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। জয়পুরপতি তৎক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীরপুরুষেরা উপযুক্ত প্রতিপক্ষেরও গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনার সৈন্যসংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্ট সমাদর সহকারে ভ্রাতৃ-সম্বোধন এবং আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক স্বপার্শ্বে আসন-পরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্ট্রপতি

মৌনী হইয়া বসিলেন। রাজা জয়সিংহ ভাবে বুঝিতে পারিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল। শিবজী কহিতে লাগিলেন।—

"মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে দুরাশার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়াবিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন যাহা বলে তাহা কখনও নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিছু কাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য্য অবগত হইলেই এই দুরন্ত সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে একপরামর্শী এবং এককর্ম্মা হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্ত্তব্য নহে ? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা-কর্ত্তৃক হ্রস্বতেজা হয়েন, উভয়ই আরঙ্গেবের মঙ্গলাবহ। স্মরণ করুন, তিনি এই উপায়দ্বারা ক্রমে ক্রমে কোন্ হিন্দু মহীপালকে স্বপদাবনত না কবিলেন ? শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভারতভূমি তাঁহার কবলিত হইয়াছে। কোথাও একটি স্বাধীন হিন্দু রাজা নাই। কেবল রাজপুতানায় আপনারা এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি। আরঙ্গেব কেবল আমাদিগকেই কিঞ্চিৎ ভয় করেন, বুঝি তাহাও আর অধিক কাল করিতে হইবে না। ফলতঃ মহারাজ! আমি আর পরস্পর যুদ্ধে স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন।

"মহারাজ! বাদসাহ কখনও আপনার অগৌরব করেন নাই সত্য, কারণ তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদি আপনি আজি লোকান্তরগত হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারেরা বুঝিবেন বাদসাহ আপনকার কেমন সুহৃদ্। মহারাজ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান বাদসাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন, ইঁহার মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না। আমি জানি কেহ কেহ আরঙ্গেবকে জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করেন।

কিন্তু বাস্তবিক তিনি জাল্মস্বভাব হইলে আমার এমত ভয় হইত না। নৃশংস নির্ব্বোধ রাজারা যে সকল অত্যাচার করেন, তজ্জনিত দুঃখ স্বল্পকালব্যাপী হয়, কিন্তু ক্রুর-মতি নৃপালগণের যে বিষবৃক্ষ-রূপ মন্ত্রণা তাহার ফলাস্বাদনে সন্তান-সন্ততি সমুদায় খর্ব্ব-বীর্য্য হইয়া যায়। আমি জানি, অনেকেরই মনে এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বর-নির্দ্দিষ্ট জাতি প্রণালী হইয়া আসিতেছে, মুসলমানও সেইরূপ বাদসাহের জাতি। মুসলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ বোধ থাকাতেই এত হিন্দু রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাহা করুন—রাজ-শক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবরসাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাতশূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাঁহার সময়ে রাজকার্য্যে বুদ্ধি নিয়োজন করিয়া সুশাসন-বিধি সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। আরঙ্গেব এত চেষ্টা করিয়াও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েক জন সুমহৎস্তম্ভবৎ তাঁহার রাজ্যভার বহন করিতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহেরা যদি ইঁহার দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া চলেন, তবে স্বল্পকাল মধ্যেই সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি-প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট নবরত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা, যেন এমন দিন কখনও উপস্থিত না. হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্ব্বল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়—তাহা সুষুপ্তি-সুখানুভব নহে।”

রাজা জয়সিংহ মহারাষ্ট্রপতির আগমনেই আপনার প্রতি তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, আবার এই সকল সরল তথ্য-ভাষা শ্রবণ করিয়া উন্মীলিতজ্ঞান-চক্ষুঃ এবং উন্মুক্ত-প্রণয়-প্রণালী হইলেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগের কি বাঙ্‌নিষ্ঠা! তিনি শিবজীকে ধৃত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতে পারিলেন না। অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর

করিলেন, "মহারাজ! তোমার কথায় আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার উত্তর করিলে পর আমার যেরূপ পরামর্শ হয় বলিব।" "কি জিজ্ঞাস্য আছে অনুমতি করুন।" "আমি তোমার নিকট যদি এমত প্রতিশ্রুত হই যে, বাদসাহ তোমার কোন অপমান করিলে, আমি সেই অপমান আপনার হইল বোধ করিয়া তাহার প্রতিফল প্রদানের চেষ্টা পাইব, তবে তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস কর কি না।" শিবজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে আমি নিরুদ্বেগে গমন করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। কারণ তিনি আমার কোন অপমান করিলে আপনি তাঁহার শত্রু হইবেন এবং তাহা হইলেই হিন্দু জাতির অভ্যুদয় কাল পুনরুপস্থিত হইবে, অতএব এমত স্থলে আমি মৃত্যু স্বীকার করিতেও সম্মত আছি।" রাজা জয়সিংহ আশ্চর্য্যম্মন্য হইয়া কহিলেন,—"এমত সাহস না হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্য্য-পরতন্ত্র না হইলে কি মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয়!—মহাবাজ! কোন সন্দেহ নাই, আরঙ্গেব এত নির্ব্বোধ নহেন যে, আমি নির্ভয় করিলে তিনি কাহারও অপমান করিবেন—এক্ষণে আমার যেরূপ পরামর্শ শ্রবণ করুন। আপনি যাহা যাহা বলিলেন কিছুই মিথ্যা নহে। এতদ্দেশীয় তাবল্লোকেরই প্রতীতি হইয়াছে, তৈমুবলঙ্গবংশীয় ব্যতিরেকে আর কেহ বাদসাহ-পদাভিষিক্ত হইতে পারে না। আমি সেই জন্যই বিবেচনা করি, প্রকাশ্যে আরঙ্গেবের প্রতিকূলতাচরণে কোন বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। শুনিয়াছেন ত, মহব্বৎ খাঁ নামক জাহাঙ্গীর বাদসাহের একজন প্রধান সেনাপতি পাঁচ সহস্র রাজপুত্র সেনার সহায়তায় বিংশতিসহস্রাধিক মোগল সৈন্যের মধ্য হইতে বাদসাহকে নিজ করকলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে, প্রজা সমস্ত তাঁহার প্রতি অনুরাগ-শূন্য হওয়াতে আপনাকেই পুনর্ব্বার বাদসাহের শরণ প্রার্থনা এবং পলায়নপর হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিয়া যে, কোন প্রকার চেষ্টা করিব না তাহাও বলিতেছি না। বাদসাহের মনে যাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় থাকে এমনটি করিয়া চলা উচিত। তাহাও, উত্তরে আমি আর দক্ষিণে তুমি থাকিলেই সম্পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে বাদসাহের নামে আমি তোমার সহিত সন্ধি-নিবন্ধন করিতেছি। কিন্তু পাছে আরঙ্গেব সন্দিহানমনা হয়েন, এই জন্য তোমাকে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। আমার সৈন্যেরা বাদসাহের নামে যে কয়েকটি দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে না। কিন্তু আমার সহিত মিলিত হইয়া তুমিও দিল্লীশ্বরের

প্রতিপক্ষ বিজয়পুর বাদসাহের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে চল। আরঞ্জেব তাহাতে তুষ্ট হইবেন, এবং সেই সুযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমিও আপন রাজ্যের সুদৃঢ় সংস্থাপন করিতে পারিবে।”

রাজা জয়সিংহ এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে, শিবজী মনে মনে ‘যথালাভ’ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি অত্যুদার-প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এই জন্য তাঁহার চরিত্র-লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিলস্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাহউক, তিনি এইক্ষণে বিবেচনা করিলেন আমার পক্ষে কি দিল্লীশ্বর, কি বিজয়পুর-বাদসাহ, উভয়ই সমান। একোত্থমে দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। অতএব কখনও বা ইহার কখনও বা উহার পক্ষতা অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ বলবর্দ্ধন করাই সদ্যুক্তি; আর হয় ত, আরঞ্জেব তুষ্ট হইলে পরিণামে রোসিনারা লাভ হইলেও হইতে পারে। মহারাষ্ট্রপতি মনোমধ্যে এই সকল অনুধাবন করিয়া নিজ সম্মতি প্রকাশ পুরঃসর কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপই করিব, কিন্তু আমার সৈন্যগণ বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাদসাহ নিজকোষ হইতে তাহাদিগের ভৃতি প্রদান না করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিজিতভূমির নির্দ্দিষ্ট করের চৌৎ অর্থাৎ চতুর্থাংশ প্রদানের অনুমতি করিলেই সৎপরামর্শ হয়! কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে আপন ধনাগার হইতেও কিছু দিতে হইবে না, আর সৈন্যগণও বিশিষ্ট যত্ন করিয়া অধিক ভূমি জয় করিবে।” রাজা জয়সিংহ এই কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন কি না বলা যায় না। ফলতঃ শিবজী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাষ্ট্রীয় রাজারা ঐ চৌৎ আদায়ের নামেই ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ভারত-ভূমির উপর আপনাদিগের কর্ত্তৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাহউক, জয়পুরপতি তখনই স্বীকার করিয়া এই সকল নিয়মানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখাইলেন, এবং বাদসাহের সম্মতির নিমিত্ত তাহার অনুলিপি প্রেরণ করিয়া অচিরাৎ শিবজী সমভিব্যাহারে সসৈন্য বিজয়পুর প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই কথাটি দ্বারা বাদসাহের পার্থিব বিভবের মাত্র আতিশয্য দেখিয়া জগদীশ্বরের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়াতে অত্যন্ত অত্যুক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা অবশ্য দূষ্য বটে। কিন্তু যে সকল পর্য্যাটক তৈমুরলঙ্গবংশীয় বাদসাহদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তত্রত্য রাজসভার শোভা নয়নগোচর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভা-বিহীন হইয়াছিল বলিয়া আরঙ্গেবের পিতা সাজাহান সমুদায় নগরটি নূতন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ নবদিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল!—তন্মধ্যে এবং উভয় দিকে কেমন পরিপাটীরূপ বিন্যস্ত পাদপগণ নগরটিকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল! এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলণ্ডীয় সম্রাট্‌দিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পায়েন। নগরের প্রাসাদগুলিও কি সুন্দর! বিশেষতঃ শ্বেত মার্‌বেলে নিৰ্ম্মিত মসীদ্‌টির শোভার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। রাজবাটী দুর্লঙ্ঘ্য-প্রাকার-বেষ্টিত—এবং বহুমূল্য মার্‌বেল প্রস্তরে অতি পরিপাটিরূপে নিৰ্ম্মিত। মুসলমানেরা যে হর্ম্ম্যশিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের নিৰ্ম্মিত অট্টালিকা সকলের খোদকতা কার্য্যের আধিক্য, তথাপি দ্রষ্টৃবর্গের মনে অদ্ভুতরসের বই অন্য রসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পর্য্যাটক কহিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের নির্ম্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় সূক্ষ্মকারুতা এবং অসুরের ন্যায় অতিমানুষত্ব প্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ ঐ সাজাহান ভূপাল কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত আগ্রা নগরস্থিত জগদ্বিখ্যত তাজ্‌মহল অট্টালিকা ঐরূপ নির্ম্মাণ-কীর্ত্তির অসাধারণ দৃষ্টান্তস্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশমণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকস্তবকখচিত হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের আবির্ভাব করে, তাজ্‌মহলও সেইরূপ অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা দর্শকমাত্রের মনে অদ্ভুত রসের উদয় করে। আর ঐ সাজাহান নিৰ্ম্মিত 'ময়ূরতক্ত' নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব? সেই রাজাসন দুইটি দিব্য-গঠন ধাতুনিৰ্ম্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছদ্বয় সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিত। নৃত্যকারী ময়ূরের পক্ষ ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুঁচ্ছেও নানাবিধ

মণিমাণিক্যাদি দ্বারা সেই সমুদায় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল।

যে সাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী, এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদসকল ও মহামূল্য পরম শোভাময় রাজাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? যেমন অন্যান্য সংসারাশ্রমী জনেরা যৌবন সময় স্ব স্ব বিভবের ভোগ ও বৃদ্ধি করিয়া চরমে তৎসমুদায় সন্তানদিগকে প্রদান করিয়া যায়েন, তিনিও কি সেইরূপে আত্মজ আরঙ্গেবকে সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন?— না; তাঁহার দুরবস্থার উপমাস্থল নাই। তিনি স্বীয় আত্মজ আরঙ্গেব কর্ত্তৃকই জীবন্মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! সাজাহানের দুরবস্থা স্মরণ করিলে কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আর স্পৃহা হয়? অথবা কোন্ দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী নহেন বলিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান না করেন? অহো! বিভব কি ভয়ানক বস্তু! প্রভুত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ প্রার্থনীয় যে, তজ্জন্য মনুষ্যদিগের মন হইতে আশৈশব-প্রতিপালনকারী পিতার প্রতিও শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায়! বৃদ্ধ বাদসাহ সাজাহান, দুষ্ট পুত্র আরঙ্গেব কর্ত্তৃক অপহৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া কারাবাসীর ন্যায় অবরোধ-নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি যে তথায় কি পর্য্যন্ত ক্লেশ অনুভব করত কালযাপন করিতে লাগিলেন তাহা বলা বাহুল্য। যিনি সমুদায় ভারতভুমির একাধিপতি হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যের ধনপ্রাণের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, তিনি কি কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ সাজাহানের যে এই দুঃখ কালেও কখন হ্রাস হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। কালে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা সহ্য হইয়া যায়, বন্ধুবিচ্ছেদ-ক্লেশও অল্প হইয়া আইসে, অন্য কি, মাতাও ক্রমশঃ অপত্য-বিরহ-বিষাদ বিস্মৃতা হইয়া থাকেন। কিন্তু যে দুর্ব্বিষহ শোকসন্তাপ অন্তঃকরণকে স্নেহ-বর্জিত করে, যাহাতে একজনের দোষে স্বজনমাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হয়, সেই দুঃখদাবাগ্নি-নির্ব্বাণে কালও কুণ্ঠিত-শক্তি হইয়া থাকে। ঐ অনল, নীরস জীবন-বৃক্ষকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হয়, অথবা স্নেহরসবর্ষণে সক্ষম ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেই কিছু মন্দতেজ হইতে পারে।

রোসিনারা নিজ পিতার ক্রোধ-ভাজন হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান প্রাপ্ত হইলে, সাজাহানের ঐরূপ সহচরী লাভ হইল। আরঙ্গেব-পুত্রী উত্তমপ্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের কেমন দোষ! রোসিনারা অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর পিতার প্রিয়তমা হইয়া প্রথমাবস্থায় আমোদপ্রমোদেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

তখন দুঃখ যে কি পদার্থ ইহা জানিতেন না বলিয়াই পিতামহের দুঃখে সমদুঃখতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উদার-চরিত্র শিবজীর সহবাসে তাঁহার মনের সেই ভাবটি দূর হইয়াছিল। শিবজী বাক্য দ্বারা কখনও রোসিনারাকে হিতাহিত বিবেচনার শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু স্বয়ং একাগ্রমনে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতেন বলিয়াই তৎপ্রতি প্রণয়-বদ্ধা বাদসাহ-পুত্রী তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থা হইয়াছিলেন। কার্য্য দ্বারায় যে উপদেশ হয়, তজ্জনিত সংস্কারের প্রায় অন্যথাভাব হয় না। অতএব, পরমেশ্বর মনুষ্যজীবন কেবল হাসিয়া খেলিয়া আমোদপ্রমোদে কাটাইবার জন্য সৃষ্ট করেন নাই, এই ভাব রোসিনারার অন্তঃকরণে সেই মহাপুরুষের সাহচর্য্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে এমত পদার্থও আছে যাহার জন্য জীবন এবং জীবনের সমুদায় সুখ পরিত্যাজ্য হইতে পারে।

শিবজীর সাহচর্য্যে রোসিনারার মানসিক ভাবসকল পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তিনি নানা ইন্দ্রিয়-সুখ-নিধান অন্তঃপুরের অন্যান্যভাগে বাস অপেক্ষা তাহারই একদেশে পিতামহ সন্নিধানে অন্য-সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করিতে প্রীতিপূর্ব্বক অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সাজাহান তাঁহাকে আরঙ্গেবের কন্যা বলিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃণা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোসিনারা আপনার বিনীত ব্যবহার, শীলতা ও মধুরালাপ দ্বারা তাঁহার দুঃখ-শৈথিল্যের যত্ন করিয়া পিতামহকে পরম পরিতুষ্ট করিলেন। সাজাহান নিজ আধিপত্য সময়ে অনেক সুখসম্ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রোসিনারার প্রতি স্নেহসঞ্চার হইলে তাঁহার অন্তরাত্মা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। রোসিনারাও পিতামহ সন্নিধানে মনের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দুঃখের লাঘব করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, পিতা অপেক্ষাও পিতামহের সহিত শিশুদিগের কেমন অধিক প্রণয় হয়! সাজাহান নানাকার্য্যাসক্ত থাকাতে সেই প্রণয়-সুখ পূর্ব্বে ভোগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে নাতিনীকে সহচারিণী ও সমদুঃখভাগিনী পাইয়া তাঁহার মনে যে কি অপূর্ব্বভাব উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

ইঁহারা উভয়ে নানা কথাপ্রসঙ্গে কালহরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শিবজী-সম্বন্ধীয় বিবরণই রোসিনারার অধিক মনোগত হইত বলিয়া বৃদ্ধ বাদসাহ তৎকালে শিবজীর সহিত আরঙ্গেবের সেনাপতিদিগের যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, যত্নপূর্ব্বক সমুদায়গুলি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতেন, এবং রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন। রোসিনারা, যখন শিবজী মুসলমান সৈন্যপতিকে সম্পূর্ণ পরাজয়

করিয়াছেন শ্রবণ করিলেন, তখন আর পিতার সহিত সন্ধি হওয়া ভার হইল বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রপতি রোসিনারার নিমিত্ত আপনার প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার লোভেও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন, ইহা জানিয়া বাদসাহ-পুত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরে যখন শুনিলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে দিন দিন ক্ষীণবল হইতেছেন, তখন নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি যেদিন পিতামহপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যে, শিবজী আরঙ্গেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া জয়সিংহের সহায়তায় বিজয়পুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহার ম্রিয়মাণ আশালতা পুনরুজ্জীবিতা হইতে লাগিল। অনন্তর যেদিন রোসিনারার কর্ণগোচর হইল যে, মহারাষ্ট্রপতির সাহায্যে কৃতকার্য্য বাদসাহ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া নিজসভায় আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু পিতার অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাবতা ভাবিয়া মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ শঙ্কাও উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন "যদি পিতা আমাকে সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার মনন করিতেন, তবে, এতাবৎ আমার প্রতি অক্রোধ না হইলেন কেন? আমি তাঁহারই গুণানুবাদ করিয়াছিলাম বই আর ত কোন অপরাধ করি নাই।"

সাজাহান, যেদিন শিবজী বাদসাহের সম্ভাষণার্থ আসিতেছেন, সেই দিন রোসিনারাকে এই সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক কৌতুক করিয়া কহিলেন, "মহারাষ্ট্রপতি আসিতেছেন—কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও না যে তিনি আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন।" রোসিনারা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই হাস্যপ্রভা আন্তরিক দুঃখান্ধকারই প্রকাশ করিল, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষ-জ্ঞাপক হইল না। পরে বাদসাহ-পুত্রী কহিলেন, "বৃদ্ধ আমাকে স্বয়ং ত্যাগ না করিলে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। কিন্তু মহাশয়! আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—আমি পদে পদে বিপদ শঙ্কা করিতেছি।" বৃদ্ধ বাদসাহ এই কথা শ্রবণে বিস্ময় এবং ঈষৎ ক্রোধযুক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন।—"বিপদ্ শঙ্কা কি?—আরঙ্গেব স্বয়ং পত্রদ্বারা সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছে—সে কি আপনার কথা মিথ্যা করিবে?—দিল্লীর বাদসাহ হইয়া প্রতিশ্রুত পালনে পরাঙ্মুখ হইলে কি সেই আসনের আর গৌরব থাকে?" এই বলিয়া রোসিনারার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে অধোবদন দেখিয়া বৃদ্ধ আপনার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিলেন—"হায়! আমার আসনের অগৌরব হইবে বলিয়া আমি আরঙ্গেবের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস

করিতেছি; কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার অপমান করিতে পারে সে কি না করিতে পারে?—আমি এমন অল্পবুদ্ধি না হইলেই বা কেন রাজ্যচ্যুত হইব—অধিক বিশ্বাসই আমার কাল হইয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকেই আমাকে কহিয়াছিল পুত্রদিগকে এত বিশ্বাস করিবেন না—আমি কহিতাম যদি আপনার পুত্রদিগকে বিশ্বাস না করিব, তবে কাহাকে করিব? আর পুত্রের প্রতিও অবিশ্বাস করিয়া যদি রাজ্য করিতে হয়, তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাজ কি?—হায় রে! জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বিশ্বাস-ভাজন দারসীকো! তোমারই সচ্চরিত্রতা দেখিয়া আমি সকলের প্রতি সমান বিশ্বাস করিয়াছিলাম—তুমি সরল-হৃদয় হইয়াছিলে বলিয়া পাপ-পূর্ণা পৃথিবীতে স্থান পাইলে না!—আমি আর কতকাল এই দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিব? রে কঠিন প্রাণ! তোমার কি আরো দুঃখ ভোগ করিতে অভিলাষ আছে? বাহির হও! যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।" বৃদ্ধ বাদসাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার মৃত্যু স্মরণ করিয়া একেবারে বিচেতনপ্রায় হইলেন। বৈষয়িক ভোগের প্রতি নিস্পৃহতা এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্মৃতিশক্তির হ্রাস বশতঃ তিনি আর আর সকল দুঃখ ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছিলেন, কিন্তু আরঙ্গেব কর্ত্তৃক প্রিয়তম পুত্র দারা নিহত হইয়াছিল, এই মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহার মনে চিরকাল সমানরূপে জাজ্বল্যমান ছিল। রোসিনারা ঐ সকল সময়ে পিতামহের সান্ত্বনার জন্য অন্য কোন উপায় না করিয়া তৎসমক্ষে দারার স্বরচিত কাব্য পাঠ করিতেন। তিনি জানিয়াছিলেন, যেমন অগ্নিদগ্ধের অগ্নিতাপই স্বাস্থ্যকর, তেমনি সুহৃৎ বিরহ-যাতনা সেই সুহৃদ্বিষয়িণী কথাতেই শান্ত হয়;—অন্য কথা সেই সময়ে বিষতুল্য বোধ হইতে থাকে। রোসিনারা এই বারেও সেইরূপ করিলেন। দারার বিরচিত কাব্যপাঠ একতান মনে শ্রবণ করিতে করিতে সাজাহানের নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ পরে কহিলেন, "আহা! এমন পুত্রও মরে—আহা! সে মরিয়াও কবিতামৃত দানে আমার তাপিত মনকে জুড়াইতেছে—হায়! যে ব্যক্তি আমার এই সকল দুঃখের মূল তাহার কোন সুখেরই অভাব নাই—আমি এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার ঔরসে এই রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিল?—বুঝিলাম—বুঝিলাম—যে পিতাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অবশ্য অপমান-গ্রস্ত হইতে হয়।" বোধ হয়, সাজাহান যৌবনাবস্থায় নিজ জনক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলেন।—পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন—"আমি আপনার কর্ম্মের ভোগই ভুগিতেছি—তবে আরঙ্গেবও নিষ্পাপ?—আমার পিতাও স্বীয় জনকের

প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন—তবে আমি কি জন্য অপরাধী হইলাম?—কপালের লিখন?—না! না! তাহা হইলে অসৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অনুতাপাগ্নি অন্তর্দাহ করিবে?"

সাজাহান স্বীয় আত্মজের কৃতঘ্নতায় অসাধারণ দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানলাভের পথবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বোধের উপক্রম হইতেছিল যে, পরমেশ্বর পৃথক্‌রূপে সুকৃতির পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। এক জনের পাপ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা মনুষ্যের পক্ষে বিধেয় নহে। দুষ্টের প্রতিও দুষ্ট ব্যবহার করিলে দোষ হয়। যাহা হউক তাঁহার মন এমন না হইলে তিনি কি সেই দশায় জীবিত থাকিতে পারিতেন? বৃদ্ধ বাদসাহ ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে রোসিনারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, তুমি বুদ্ধিমতী যাহা পরামর্শসিদ্ধ হয় তাহাই কর। আমার বুদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে—বোধ করি আর বহু দিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না—অনুমান করিয়াছিলাম জগতে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই—কিন্তু তোমার গুণে বশীভূত হইয়া এক্ষণে এই মাত্র ইচ্ছা হয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া যাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধ, পৌত্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোসিনারাও ক্ষণকাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন—"পিতা, মহারাষ্ট্র-পতির যেরূপ সমাদর বা অনাদর করেন তাহা দেখিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব।" বৃদ্ধ কহিলেন, "তুমি অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীগণের সমভিব্যাহারে যাইয়া জালরন্ধ্রের অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমুদায় দেখিও।"

অষ্টম অধ্যায়

দিল্লীশ্বরদিগের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্‌খাস্‌। তাহার তিন দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদায় স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। উত্তরাংশে যে প্রাচীর তাহারই পশ্চাদ্ভাগে অন্তঃপুর। যে দিবস শিবজী রাজসম্ভাষণে আইসেন, রোসিনারা অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া সেই প্রাচীরের গবাক্ষ-বিবর হইতে সমুদায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপরিভাগে আরঙ্গেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পবিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ সুবর্ণময়, তন্নিম্নে অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে, এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আরঙ্গেবের মুখাবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা, এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল দাস্ত স্বভাব, কুটিল বুদ্ধি, এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্ত্তী কতকটা ভাগ রজত-রেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান ওম্রা ও রাজা এবং রাজপ্রতিভূগণ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া নতশিরা হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহাদিগের মস্তকোপরি কিংখাপের চন্দ্রাতপ সুবর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে। রেইলের বহির্ভাগে আর যাবৎ স্থান, তাহাতে মনসব্দার প্রভৃতি যোদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আমখাসের বহির্দ্দেশে এবং রাজতক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল। বাহির হইতে সেই তাম্বু উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমন সুন্দররূপে চিত্রিত যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন রমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম, চতুর্দ্দিক যেন ফল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই সভামণ্ডপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই শত শত ব্যক্তি নানা কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসম্ভাষণের কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে দিল্লীশ্বর স্বকীয় বিভব সমুদায় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, এমত সময়ে একজন নকীব্ যথানিয়মে রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্রদেশাধিপতি শিবজীর আগমন সংবাদ প্রদান করিল। সকলেই শিবজীর নাম শ্রুত ছিলেন, অতএব চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ সকলেই উৎসুক হইলেন, বিশেষতঃ রোসিনারা নির্নিমেষ চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজীকে কিঞ্চিদ্বিমর্ষ বোধ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইতে লাগিল। শিবজী ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া নকীবের আদেশক্রমে রেইলের বহির্ভাগ হইতে বাদসাহকে তিনবার অভিবাদন করিলেন। এই করিয়া তিনি যেমন পুনর্ব্বার অগ্রসরণোদ্যম করিবেন নকীব উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আলম্‌গীর বাদসাহের অনুগ্রহে শিবজী পঞ্চ-হাজারি মনসব্দারের পদে উন্নত হইলেন।" মহারাষ্ট্রপতি এই অপমান-সূচক বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্ষুব্ধ এবং অবশাঙ্গপ্রায় হইয়া সম্মুখস্থ রেইল ধারণ করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি স্বাধীন

দেশের রাজা, আমাকর্ত্তৃক আপনি অল্পকাল হইল উপকৃত হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনকার প্রতিভূ রাজা জয়সিংহ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন আমি এখানে সমাদৃত এবং সম্মানিত হইব, কিন্তু আপনি আমার এই অগৌরব করিয়া সেই কথা মিথ্যা করিলেন।" আরঙ্গেব উত্তব করিলেন, "তুমি কি জন্য আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি আমার সেনাপতির যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছ—যুদ্ধে জেতার যাহা ইচ্ছা বিজিতের প্রতি তাহাই করিতে পারে—তথাপি জয়সিংহের সহিত তোমার কি কি কথা হইয়াছিল তাহা আমার বিদিত নাই—অতএব যাবৎ কাল পত্রদ্বারা তৎসমুদায় বিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাবৎ তুমি এই নগরে অবস্থান কর, নগরপাল তোমার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং রামসিংহ সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন—পরে আমি যথাযোগ্য শিরোপা দিয়া বিদায় করিব।" আরঙ্গেবের মানস শিবজীকে কবলিত করেন, কিন্তু জয়সিংহ তাঁহাকে অভয়দান করিয়াছেন, অতএব প্রকাশ্যরূপে কারানিরুদ্ধ করায় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া এইরূপ কৌশলদ্বারা অভীষ্টসাধনের পরামর্শ করিলেন। "সাপের হাঁচি বেদে চেনে"—শিবজী এবং আরঙ্গেবের উপাখ্যান এই জনপ্রবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। মহারাষ্ট্রপতি বাদসাহপ্রমুখাৎ ঐ সকল কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় একেবারে বুঝিতে পারিয়া আপনিও শাঠ্য অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "বাদসাহের জয় হউক ;—আমি অবশ্য আপনার আদেশানুসারে রাজা জয়সিংহের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিব—কিন্তু এই দেশের জলবায়ু আমার অনুচরদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—আর দক্ষিণ দেশ হইতে আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর আসিতেও বহুকাল বিলম্ব হইবে—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে নিজ সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্ত সকলকে বিদায় করিয়া কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে করিয়া অবস্থান করি।" ইহা শুনিয়া আরঙ্গেবের অনুমান হইল যে, শিবজী সত্য সত্যই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সরলান্তঃকরণে এই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে শিবজী নিতান্ত অসহায় হইবে অতএব তখন যাহা ইচ্ছা হয় অনায়াসে করিতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়া বাদসাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন এবং শিবজীকে তাঁহার যে অত্যন্ত ধূর্ত্ত বলিয়া বোধ ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। মহারাষ্ট্রপতি অতি সাবধানে বাদসাহের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিলেন। অতএব অনুমতি প্রদান করিতে করিতে বাদসাহ যে ঈষৎ হাস্য করিলেন তদ্দর্শনেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল বুঝিতে পারিয়া আপনি তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহারাষ্ট্রপতি বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্দিবসীয় রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন। আরঙ্গেব বাস্তবিক কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য্য সমুদায় সমাধা না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনিই সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীয় ওম্রা প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্য্যসচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আম্‌খাসে এবং সন্ধ্যার সময়ে গোসল-খানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালতখানায় গিয়া কিরূপে ব্যবহারসকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্য্যে মনোযোগী আছে কি না দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কাওয়াজ দেখিয়া কাহারও বা বেতন বৃদ্ধি কাহারও বা কর্ত্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমুদয় দিবসাবসান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটি নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির পাণ্ডুলেখ্যসকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেই স্থান হইতেই নির্ব্বাহিত হইত। অমাত্যেরা তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতেন না।

যে দিবস শিবজী আইসেন সেইদিন রজনীতে আরঙ্গেব একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না—তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—"রজনী গভীর হইয়াছে—এই সময়ে আমার দীন দুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কিন্তু আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজ্বরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?—ভাবিচিন্তাবিরহিত হইলে ভূতকালের দুষ্কৃত সমুদায় স্মরণ হয়!—যাহারা কখনও পঙ্কিল পাপপথের পথিক হয়েন নাই তাঁহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল। মনুষ্যজীবন শতরঞ্চ খেলার ন্যায়—ইহাতে যত ভাবনা করা যায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত হইবার সম্ভাবনা!—দেখ এমত

ধূর্ত্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্খ! 'জয়সিংহ'—'জয়সিংহ'—এই নামটা আমার অত্যন্ত কর্ণ-জ্বালাকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপকারেও অসমর্থ নহে—আর কার্য্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপায়েরই বা আবশ্যকতা কি? ফল পাড়া হইলে আকর্ষীতে কি প্রয়োজন?—কিন্তু জয়সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়াছিলেন?—আমারও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাবধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাল হয়"—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশ-দত্ত দৃষ্টি হইয়া কহিলেন, "জয়সিংহ! সাবধান—এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে,—আমার দোষ নাই—পুত্র! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার যত্ন করিও না।" এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"হে আত্মজ! তুমি আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম সঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয়, অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না। তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা দিয়াছি; অধিককাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করিয়াছিলে। আমি অনেক ক্লেশে এই ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্ব্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান! যেন তোমারও সেই দশা না হয়। তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি পিতার প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ করিবে। এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে, আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে।"

বাদসাহ দুই তিন বার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, যদি পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখনও সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার

মনন করিলে কাহা কর্ত্তৃকও বিশ্বাস্য হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান্ দেখিয়া এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্ত্তব্য?—প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য সাধন হয় না—হায়! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য্য সাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক এবং আমি একলা এক দিক হইলেও, বুঝি জয় হইত —পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একজন অতি বিশ্বাস-ভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি সংগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গ যখন পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাহিও, যদি পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাঁহার তাম্বূলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইও—পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহকরণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মসলা এই—আরঙ্গেব এই বলিতে বলিতে ভৃত্যের হস্তে একটি কাগজের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়সিংহের তাম্বূলবাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিয়াছ!" ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশিরা হইল এবং বাদসাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

নবম অধ্যায়

মহারাষ্ট্রপতি নগরপাল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে উপনীত হইয়া অবিলম্বে সমভিব্যাহারী সামন্তবর্গের অধিপতিকে আহ্বান করত তাঁহাকে স্বদেশ গমনের আদেশ করিলেন। সৈন্যপতি রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ পাথেয় সামগ্রী সকল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। শিবজী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন অনুচরবর্গ নিকটে থাকিতে বাদসাহ আমাকে বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইতে দিবেন না, কিন্তু বাহির হইতে না পারিলেও প্রস্থানের উপায়াবধারণ হওয়া দুর্ঘট; এই জন্যই তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া নিজ-সৈন্যগণকে বিদায় দিবার অনুমতি গ্রহণ করেন, আর সেই জন্যই যে কয়েক দিন তাহারা সকলে নির্গত না হইল, আপনি পীড়ার ভান করিয়া রহিলেন,

একবারও বহির্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু আরম্ভেব তখন মহারাষ্ট্রপতিকে কারারুদ্ধ করণের মনন করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে, শিবজী সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বাস করিতেছে, অতএব যে পর্য্যন্ত জয়সিংহ বিষয়ক কোন সংবাদ না পাওয়া যায় তাবৎ ইহাকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই —নগরপালের নজরবন্দি করিয়া রাখিলেই চলিবে। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় সমুদায় সেনা বিদায় হইয়া গেলে, শিবজী একদিন নগরপালের সহিত কথায় কথায় স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন নগরপাল অবিলম্বে সম্মত হইয়া স্বয়ং কতিপয় বলবান্ পুরুষ সমভিব্যাহারে অনুগমন করত মহারাষ্ট্রপতিকে বাসাবাটী হইতে নির্গত করিল।

শিবজী এপর্য্যন্ত পলায়নের কোন পন্থা নিশ্চয় করিতে পাবেন নাই, কিন্তু যে দিন প্রথমে বাটীর বহির্গত হইলেন সেই দিনেই তাহার সোপান হইল। তিনি রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে যমুনাতটে ক্ষণকাল পরিভ্রমণ করিয়া অন্যমনস্কতা বশতঃ ক্রমে ক্রমে বাদসাহ ভবনের সম্মুখবর্ত্তী বিপণিতে উপনীত হইলেন। তথায় বিবিধ দ্রব্যজাত এবং নানা দেশীয় লোকের সমাগম দর্শনে কিঞ্চিৎ তন্মনস্ক হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যাঁহারা বহুকাল বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপরিচিত-জনময়স্থানে স্বদেশীয় পরিচিত ব্যক্তির সন্দর্শন লাভে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হয়" বুঝিতে পারেন। মহারাষ্ট্রপতি ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শিবজী, ঐ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আপনার গুরুদেব রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি যে দিকে গমন করিলেন, আপনিও ক্রমে ক্রমে সেই পথে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমভিব্যাহারী নগরপালের ভয়ে কেহই পরস্পর অভ্যর্থনা দ্বারা পূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ করিলেন না।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ রামদাস স্বামী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে একটি বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন। মহারাজ মনে মনে তাঁহার চরণবন্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরামর্শাবধারণ করত নগরপালকে কহিলেন, "অদ্য আর অধিক গমন করিব না—চল, বাসায় ফিরিয়া যাই—কিন্তু ঐ তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া স্মরণ হইতেছে, আমি পীড়িতাবস্থায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলাম সুস্থ হইলে দেবার্চ্চনা করাইব, উঁহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যদি উনি স্বয়ং আমার স্বস্ত্যয়নের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে বাসায় গমনের

নিমন্ত্রণ করিয়া যাই।” নগরপাল তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রামদাস স্বামীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকৃত-প্রায় হইলেন, পরে শিবজী স্বয়ং যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নগরপাল পাছে কোন সন্দেহ করে, এই জন্যই রামদাস স্বামী প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নচেৎ শিবজীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। অতএব তিনি পরদিবস অতি প্রত্যুষেই মহারাষ্ট্রপতির আলয়দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরপাল অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজসমক্ষে উপনীত করিল। গুরু-শিষ্যে একত্র হইয়া যে কথোপকথন হইল, তাহার মর্ম্ম এই—রামদাস স্বামী কহিলেন, “আমি তীর্থদর্শনে নির্গত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণান্তর মথুরাধীশ সন্দর্শনার্থ সশিষ্য আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রতিগমনকারী মহারাষ্ট্র সৈন্যপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় অবগত হই, এবং অবগত হইয়া মনে মনে বিপদাশঙ্কায় শীঘ্র দিল্লীতে আসিয়া নানা স্থানে শিষ্য নিয়োজন করত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার উপায় চেষ্টা করি,—এক্ষণে সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে, অতঃপর আরঙ্গেবের শাঠ্যজাল হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি?” শিবজী কহিলেন, “যখন এই ঘোর বিপদকালে আপনকার সন্দর্শন পাইলাম, তখন অনুমান হয়, বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাহা হউক অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু যেরূপ স্বস্ত্যয়নের ভান করিয়া আপনকার সহিত সংগোপনে সন্দর্শন হইল, বোধ হয়, এই উপায়েই কোন সুযোগ হইয়া উঠিবে।”

এইরূপ পরামর্শ হইলে রামদাস স্বামী প্রত্যহই প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত জপ পূজা হোমাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন, এবং নগরপালের যাবৎ হিন্দুজাতীয় অনুচরগণ শিবজীর আদেশানুরূপ বাজার হইতে বিবিধ দ্রব্যজাত আনিয়া স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল। আর পূজাবসানে নগরপালের নিযুক্ত প্রহরিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যথেষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াতে মহারাষ্ট্রপতির এই কর্ম্ম তাহাদিগের সমূহ সুখাবহ হইয়া উঠিল। শিবজী ঐ সকল সামগ্রীর অনেক ভাগ নগরস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগের বাটীতেও প্রত্যহ প্রেরণ করিতেন। এইরূপে প্রায় এক মাস বহির্ভূত হইল। কিন্তু শিবজী এই কাল মধ্যে কেবল আপনারই প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন এমত নহে, প্রিয়তমা রোসিনারার উদ্ধারার্থেও সবিশেষ চেষ্টা দেখিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা কি, এবং উহা কিরূপ সফল হইল, তাহা পরে প্রকাশ হইবে, এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, তিনি রোসিনারাকে পাইবার সুযোগ-কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়াই

তাঁহার আপনার প্রস্থানের এত বিলম্ব হইতেছিল, নচেৎ ইতিপূর্ব্বেই তদুপায় নিশ্চিত হইত।

দশম অধ্যায়

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রাজবাটী এবং রাজধানীতে মহাসমারোহে আনন্দ-মহোৎসব হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ভারত রাজ্য লাভ করিয়া এই স্থানেই নিবাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব হইয়াছিল। এই হেতু উভয় জাতীয় লোকেরাই পরস্পর ব্যবহারের অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমান বাদসাহেরা পূর্ব্বকালীন হিন্দু সম্রাটদিগর ন্যায় অনেক আচরণ করিতেন এমত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয় তাঁহারা বর্ষে বর্ষে নিজ নিজ জন্মতিথির উপলক্ষে আপনারা যেরূপ স্বর্ণ রজতাদির সহিত তুলিত হইতেন তাহা হিন্দু রাজাদিগের তুলা পুরুষদানের অনুকৃতি হইবে, যেহেতু অপর কোন দেশীয় মুসলমান নৃপালদিগের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত ছিল এমত বোধ হয় না।

আরঞ্জেব ঐ দিন স্বর্ণনির্ম্মিত তুলা যন্ত্রে উত্থিত হইয়া আপনি এক দিকে এবং ধান্যাদি নানা প্রকার শস্য অপর দিকে রাখিয়া তুলিত হইলেন। পরে তাম্র কাংস্যাদি ধাতুদ্রব্যের সহিত, অনন্তর স্বর্ণ রজতাদির সহিত, তৎপর কিংখাপ শাল প্রভৃতি মহামূল্য বস্ত্রাদির সহিত এবং সর্ব্বশেষে হীরক মণিমাণিক্যাদির সহিত তুলারূঢ় হইলেন। ঐ সময়ে নাগার-খানায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান রাজামাত্য এবং ওমরা সকল নানা প্রকার দ্রব্যজাত আনিয়া বাদসাহকে নজর দিতে লাগিলেন। বাদসাহও হেমনির্ম্মিত কৃত্রিম বাদাম পেস্তা খর্জ্জুর লইয়া স্বহস্তে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। অশ্বপালেরা দিল্লীশ্বরের সমক্ষে অশ্ব-শিক্ষার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। মাহুতেরা সুশিক্ষিত হস্তিযূথ আনিয়া বাদসাহকে সেলাম করাইতে লাগিল। এইরূপে রাজকর্ম্মচারী সকলেই অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরেও অতি চমৎকার উৎসব হইতেছিল। প্রধান প্রধান অমাত্য এবং ওমরাদিগের মহিলাগণ ও দিল্লীবাসিনী অনেক বার-যোষারাও সেই

দিন বাদসাহের অন্তঃপুরে আগমন করিত। যাঁহারা বারবনিতাদিগের তাদৃশ স্থলে গমন হওয়া অসম্ভব বোধ করিবেন, তাঁহারা স্মরণ করুন যে, অদ্যাপি এমত অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আপন আপন স্ত্রী-পরিজনকে প্রায় মুসলমান বাদসাহদিগের ন্যায় দৃঢ়তররূপে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন, অথচ মধ্যে মধ্যে বাটীর ভিতরেও নেড়ীর কবি শ্রবণ করাইয়া স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কলুষিত করা নিতান্ত দূষ্য বোধ করেন না। বরং মুসলমান বাদসাহদিগের এই প্রশংসা করিতে হয় যে, তাঁহারা ঐ দিন অশ্রাব্য কাব্যসংগীতাদি শ্রবণার্থ বারবধূগণের আনয়ন করিতেন না। সেই দিন নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক সমস্ত স্ব স্ব প্রস্তুত রমণীয় শিল্পসামগ্রী লইয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে যাইতেন। কেহ বা উত্তম জামদান, কেহ বা সুদৃশ্য পশমী জুতা, কেহ বা বুটোকাটা শাটিন, কেহ বা কিংখাপনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, কেহ বা স্বহস্তপ্রস্তুত আতর গোলাপাদি সুগন্ধি দ্রব্য, আর অনেকেই মোহনভোগ প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন। তথায় অন্য পুরুষমাত্রের যাওয়া নিষেধ ছিল। কেবল বাদসাহ স্বয়ং বা তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ ক্রেতৃস্বরূপে ঐ মনোহর বাজারে বেড়াইতেন। ক্রয় বিক্রয় কালে কতই কৌতুক হইত। বাদসাহ কোন দ্রব্যটি মনোনীত করিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণার্থ কতই বিতণ্ডা করিতেন। একটি পয়সার দর প্রভেদ হইলেও বাক্যব্যয়ের ত্রুটি হইত না। পরন্তু দ্রব্যটি গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দিবার সময় যেন ভ্রান্তিক্রমে বিক্রয়িণীকে এক পয়সার পরিবর্ত্তে কখন এক থান সুবর্ণমোহর কখন বা বহুমূল্য হীরকখণ্ড প্রদান করিয়া যাইতেন।

সাজাহান নিজ রাজ্যকালে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট আমোদ প্রকাশ করিতেন। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অবধি তাঁহার ঐ আমোদ ছিল না বটে, কিন্তু এইবার রোসিনারাকে অন্যমনস্ক করিবার আশায় অনেক অনুরোধ সহকারে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ মনোহর বিপণিস্থলে আনয়ন করিলেন। রোসিনারা কেবল পিতামহের অনুরোধ রক্ষার্থই আসিয়াছিলেন, নচেৎ আমোদপ্রমোদে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে অবধি শিবজী আরঞ্জেব কর্ত্তৃক সভাস্থলে অপমানিত হইয়া যান্ সেই অবধি তাঁহার আন্তরিক সুখ সমুদায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্মধ্যে কত দুঃখ ও কত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যমাত্রকেই বিবিধ দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ ইঁহাদের, ভক্তি ও স্নেহের উপযুক্ত পাত্রের প্রতি যদি কোন কারণ বশতঃ ভক্তি ও স্নেহের হ্রাস হইয়া যায় তবে, তাহাদিগকে যেমন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তেমন যন্ত্রণা আর কাহাকেও ভোগ করিতে হয়

না। রোসিনারা নিজ পিতার একান্ত অধর্ম্ম মতি বুঝিয়া সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিতা ছিলেন। সুতরাং সামান্য আমোদ প্রমোদে তাঁহার দুঃখশান্তি হইবার সম্ভাবনা কি ?

তিনি দ্রব্যবিক্রয়িণীগণের কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, পিতামহ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণানন্তর পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মানস করিয়াছেন এবং সাজাহানও তাঁহাকে আমোদিত করিতে না পারিয়া সেই চেষ্টায় ক্ষান্তপ্রায় হইয়াছেন, এমত সময়ে এক বারযোষা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া একটি অঙ্গুরীয় এবং উষ্ণীষ প্রদর্শনানন্তর সহাস্য বদনে কহিল "বাদসাহ-নন্দিনি! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয় ?—ইহা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তুমি গ্রহণ করিলেই সার্থক হয়।" রোসিনারা শিবজীর হস্তে ঐ অঙ্গুরীয় এবং তাঁহার মস্তকে ঐ উষ্ণীষ অনেকবার দেখিয়াছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া বারবনিতাকে কহিলেন, "তুমি আমাদিগের সমভিব্যাহারে নিভৃতে আইস, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করি।" বারবনিতা শুনিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইল। পরে অন্য সকলের শ্রবণ ও দর্শনের অগোচর হইলে রোসিনারা ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সকল সামগ্রী কোথায় কি প্রকারে পাইলে ?" বার-যোষা কোন উত্তর না করিয়া সাজাহানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোসিনারা ঐ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "ইনি আমার পিতামহ, ইঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তুমি নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর।" তখন বারবনিতা কহিতে লাগিল, "যাঁহার এই সকল সামগ্রী তিনিই আমাকে এই স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কহিয়া দিয়াছেন যে, যদি আপনি এতদিনেও তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত প্রস্থানের উপায় করুন। এইক্ষণে সকলই আপনার হাত, তাঁহার হাত কিছুই নাই।" রোসিনারা এই কথায় কোন উত্তর না করিতে করিতে সাজাহান কহিলেন, "আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি রোসিনারা! তুমি অবিলম্বে প্রস্থানের উপায় কর—আর উপায়ই বা বিশেষ কি করিতে হইবে—ইহার সহিত ছদ্মবেশে গমন করা অত্য বড় কঠিন হইবে না।" রোসিনারা ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া পিতামহের কথার কোন উত্তর না করিয়া বার-যোষিৎকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতে পার, তিনি আপনার প্রস্থানের কোন উপায় করিতেছেন কি না ?"

বার-বধূ কহিল—"তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে কহিয়াছেন যে, যদি তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইতে তোমার সম্মতি হয়, তবে এই

রাত্রি শেষে অমুক স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত দুই জনে মিলিত হইবে।" এই বলিয়া শিবজীর নির্দ্দিষ্ট স্থানের নামটি রোসিনারার কর্ণে অতি মৃদুস্বরে কহিল। তাহা সাহাজানেরও শ্রুতিমূলসংলগ্ন হইল না। রোসিনারা তাহার তাদৃশ ব্যবহারে বিশিষ্ট তুষ্টা হইলেন এবং শিবজী নিজ নৈসর্গিক মহানুভবতাগুণে অন্য ব্যক্তিকে কেমন বদ্ধ করিতে পারেন, তাহা তাঁহার জানা থাকিলেও, তিনি অল্পকালের মধ্যেই দুশ্চারিণী বারবনিতাকেও এমত বিশ্বাসভাজন কি প্রকারে করিয়াছেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্যম্মন্যা হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি ?—অথবা কর্ত্তব্য আর কি আছে—ইহার সঙ্গেই দাসীবেশে প্রস্থান করি—কিন্তু তাহা কি উচিত হয়—পিতা আমার প্রতি অন্যায় এবং মহারাষ্ট্রপতির প্রতি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—কিন্তু সেই জন্য কি আমিও অযথাচরণ করিব ? না, আমার যাওয়া হইবে না—ভাল, একবার দেখা করিয়া আসিলেই বা হানি কি ?—কিন্তু যদি যাইবার কালীন ধরা পড়ি—অথবা যাইবার পূর্ব্বে ইহা কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আরঞ্জেব এই দোষ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিবেন—আর এই স্ত্রীলোক আমাদিগের উভয়ের হিতকারিণী ইহার পক্ষেও অনিষ্ট ঘটিবে, কি করি ?"

রোসিনারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে সাজাহান একজন দাসীর একখানি পরিধেয় বস্ত্র স্বহস্তে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং কহিলেন, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এই পরিচ্ছদ ধারণ কর এবং ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া যাও, আমাকে স্মরণ রাখিও এবং নিশ্চয় জানিও যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমার সদাচরণ আমার অন্তঃকরণ মধ্যে দেদীপ্যমান থাকিবে।" এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অক্ষিদ্বয় সজল এবং বচন গদ্গদ-স্বর হইল। তিনি আর অধিক বলিতে পারিলেন না। রোসিনারা পিতামহের প্রদত্ত দাসীবেশটি একবার হস্তে লইয়া পুনর্ব্বার রাখিয়া দিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার যাওয়া কি উচিত হয় ?" সাজাহান ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, "কিসে অনুচিত ?—সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এ পর্য্যন্ত আসিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে; সে হিন্দু, তোমাকে বিবাহ করিলে তাহার জাতিনাশ হইবে তাহাও সে স্বীকার করিতেছে; এখানে তুমি এমন কি সুখে আছ যে, যাইতে অনিচ্ছা হয় ?"—"অনিচ্ছা! আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছা যে কি পর্য্যন্ত বলবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্ত্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারিত হইতেছে না, কিন্তু এইক্ষণেই আপনি যাহা বলিলেন

তাহাতেই সেই ইচ্ছার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছে, কারণ বিবেচনা করুন, যদি পিতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিতেন, তবে পিতাই নিজ জামাতার প্রধান সহায় হইতেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রপতির স্বজাতীয়েরা বিরক্ত হইলেও তাহারা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাষ্ট্রজাতি উভয়কেই শিবজীর শত্রু করা হইবে, সুতরাং আমা হইতেই সেই প্রণয়াস্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমত কর্ম্ম কেমন করিয়া করিব?" সাজাহান এবং ঐ বারবনিতা উভয়ের কেহই জানিত না যে, যথার্থ প্রীতি কি অদ্ভুত পদার্থ! উহার আবির্ভাবে মনুষ্যের মন একেবারে স্বার্থশূন্য হয়। অতএব তাঁহাদিগের কেহই রোসিনারার বাক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদ্‌গত করিতে পারিলেন না। না পারুন, কিন্তু বৃদ্ধ বাদসাহ তাঁহার যুক্তির ঔদার্য্য উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—"তুমি বুদ্ধিমতী যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয়, কর—আমি ভাবিয়াছিলাম শিবজীর সহিত মিলিত হইলেই তুমি সুখভাগিনী হইবে—এবং তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে দেহযাত্রা সম্বরণ করিতে পারিব, কিন্তু যদি না যাওয়াই সৎপরামর্শ হয় তবে, ইহাকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া বিদায় কর।" রোসিনারা অবিলম্বে বারবনিতাকে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইতে কহিয়া আপনি স্বগৃহে গমন করিলেন এবং স্বল্পক্ষণ মধ্যেই একটি লিপি আনিয়া তাহার হস্তে প্রদানান্তর আপনার হস্তাঙ্গুরীয়টি বারযোষাকে সমর্পণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন। বারবনিতা বাদসাহ-পুত্রীকে প্রণাম-করিয়া মনে মনে তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিতে করিতে বিদায় হইল।

একাদশ অধ্যায়

মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারেন যে, উচিত, অনুচিত, বিবেচনাসিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্য্যন্ত নিরূপণ করাই মনুষ্যের আপনার হাত, কর্ম্মের ফলাফল মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতারই অধীন। কত কত ব্যক্তি কত কত মহতী মন্ত্রণা-সকল নিরূপণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আর কত কত স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াও জনগণ সুমহৎ ফল-ভাগী হইয়াছেন। অতএব সাধুশীল ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই ফল-সিদ্ধির

উদ্দেশ না করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কোন কার্য্যে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য্য সফল হইলেও গর্ব্বিত হয়েন না। তাঁহারা অকৃতার্থ হইলে জগদীশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, এবং সফলচেষ্ট হইলে তাঁহারই ধন্যবাদ করেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে ; তাহাদিগের দুষ্ট মন্ত্রণা সকল সিদ্ধ হইলেও দুঃখ এবং অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপ জন্মায়।

শিবজী, যে প্রকারে আরঞ্জেবের শাঠ্যজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরঞ্জেবের ও আপনার দুর্মন্ত্রণা সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতে যে প্রকার অনুতাপ এবং কতক বিফল হওয়াতে তাঁহার যে প্রকার দুঃখ জন্মিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত কথাটি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়। যে সময় বাদসাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গণিকা প্রবিষ্ট হইয়া রোসিনারার স্থানে পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া বিদায় হয়, তাহারই কিয়ৎক্ষণ পরে বাদসাহ, যে ব্যক্তিকে জয়সিংহের বিনাশার্থ প্রেরণ করেন, সে এক পত্র হস্তে বাদসাহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বরদিগের এমত রীতি ছিল না যে, স্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ করেন। শুদ্ধ সেই কর্ম্মের জন্যই তাঁহাদিগের সমীপে দুই জন প্রধান ওম্‌রা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু আরঞ্জেব ঐ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া লিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সমীপবর্ত্তী সকলেরই অনুভব হইল যে, পত্রবাহক কোন অতি প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। বাদসাহ পত্রার্থ অবগত হইয়া হাস্যবদনে নগরপালকে আনয়ন করিতে কহিয়া সত্বরে সভার কার্য্য সমাপনানন্তর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আরঞ্জেব কখনই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন না, অতএব তাঁহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেরূপ মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ তখন প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রায় অনেকেই, যে যাহার আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা ছিল তাহারাও তদ্দিবসীয় কার্য্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অতএব বাদসাহ কোথাও বিলম্ব না করিয়া একেবারে একাকী রোসিনারার মহলে উপস্থিত হইলেন। আরঞ্জেব নিজ কন্যার আরক্ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষমুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতি-পূর্ব্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহা অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি জন্য রোদন করিতেছিলে ?" রোসিনারা ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিবজীর

সহিত গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল—আবার মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর যে কখনও পাইবেন এমত বোধও ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি পূর্ব্বে তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভয়ের আস্পদ হইয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ হঠাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি ভয়ে এবং দুঃখে একান্ত অধীরা হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন ; সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ শোক-সূচক চিহ্ন সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আরঙ্গেব যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতেও পারিলেন না। বাদসাহ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন—"তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ—আপনিই আপনার দুঃখ উপস্থিত করিয়াছ—ভাবিয়া দেখ, আমাদিগের বংশীয় কন্যাগণ প্রায়ই কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিতে পায় না, কিন্তু তোর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম বলিয়া উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার মনন করিয়াছিলাম—সে যাহা হউক, যদি এক্ষণও তোমার দুর্ব্বুদ্ধি গিয়া থাকে, তবে পারস্যরাজ-তনয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করি—কিছু উত্তর করিলে না যে ?—তবে বোধ হয় তোমার অসম্মতি নাই।" রোসিনারা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "পিতঃ! আমি তোমার অসম্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না—এই বংশীয় কন্যাগণের চিরকৌমারাবস্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও তাহাই হউক—অন্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন।" আরঙ্গেব সর্ব্বদাই আপনার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের অন্যথা করিতে চাহিলে বৈরক্তির পরিসীমা থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল রোসিনারার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবেন বলিয়াই তথায় আসিয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ আত্মজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আঃ পাপীয়সি! তোর লজ্জাভয় সকলই গিয়াছে—তুই যে পামর দস্যুর কুহক মন্ত্রের বশীভূতা হইয়াছিস্ তাহার জীবন সত্বে তোর এই দুর্ব্বুদ্ধি যাইবার উপায় নাই, অতএব এই দণ্ডে তাহার ছিন্ন মস্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব—তোর দোষেই সে নিহত হইবে!" রোসিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার পদমূলে নিপতিতা হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন "তাত! ক্ষমা করুন—আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতিথির প্রাণবধ করিবেন না, তাহাকে স্বদেশে

যাইবার অনুমতি দিউন—আমি আর যত কাল বাঁচিব ভুলিয়াও আপনার মতের বিপরীতাচরণ করিতে চাহিব না।" আরঙ্গেব বিকট হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "তবে তুমি পারস্যরাজতনয়ের ধর্ম্মপত্নী হইতে স্বীকার করিলে?"—"আমি সকলই স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি অপরাধ করিয়া থাকি আমারই দণ্ড বিধান করুন, আমার দোষে অপরের দণ্ড করিবেন না।" নিষ্ঠুর আরঙ্গেব কন্যার এই সকল বচনে কিছুমাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত না হইয়া উত্তর করিলেন—"শুন রোসিনারা! তুমি আমার উপরোধ রক্ষা কর নাই—আমার কথা বড় নয়, সেই দস্যুর প্রাণই তোমার মনে বড় বোধ হইয়াছে—স্বচক্ষে তোমাকে তাহার বিনাশ দেখিতে হইবে, এবং আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে।" বাদসাহের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোসিনারা বিচেতনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আরঙ্গেব আত্মজাকে তদবস্থ রাখিয়াই সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন।

বাদসাহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পূর্ব্বাহূত নগরপাল সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে অভিবাদনাদি করিল। বাদসাহ তাহাকে সরোষ-বচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আরঙ্গেব ক্ষণকাল সেইখানেই দাঁড়াইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—"আর কি!—আমার ত সকল মানসই সুসিদ্ধ হইল—পুত্র আমার আদেশানুসারে বিদ্রোহের ভান করিয়া সকলের অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে—অতএব সে আর কখনও কাহারও বিশ্বাস্য হইবে না—জয়সিংহও, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল, অতএব সে পরীক্ষায় ঠেকিয়াই প্রাণ হারাইয়াছে—তাহাতে আমার পাপ কি?—বিদ্রোহীকে কোন্ রাজা দণ্ড না করিয়া থাকেন—বিষ দ্বারাই হউক আর বধ্যভূমিতে ঘাতকের শস্ত্র দ্বারাই হউক, জীবনবিনাশ একই পদার্থ—আর এতক্ষণে শিবজীরও নিধনসাধন হইল, সে ব্যক্তি পূর্ব্বাবধিই আমার শত্রু আছে এবং বিশেষতঃ সে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, অতএব সে অবশ্যই দণ্ডার্হ—আরঙ্গেব! তুমি এত দিনের পর সত্য সত্যই দিল্লীশ্বর বাদসাহ হইলে, এত দিনে তোমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল।" দিল্লীশ্বর এইরূপে চিন্তা করিতেছেন এবং তাদৃশ গুরুতর পাপ-সমস্তজনিত প্রবল অনুতাপাগ্নিকে মনে মনে ব্যর্থযুক্তিরূপ বারিকণা দ্বারা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমত সময়ে নগরপাল ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া বাদসাহের পদতলে নিপতিত হইল। আরঙ্গেব নগরপালের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াই আপনার মন্ত্রণার বৈফল্য অনুভব করত যে কি পর্য্যন্ত বিষাদে নিমগ্ন হইলেন তাহা কথনীয়

নহে। কিন্তু দিল্লীশ্বর অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, ইচ্ছা করিলেই দুঃখ ক্রোধ ভয়াদি নিবারণ করিয়া সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিতেন। অতএব বাদসাহ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া নগরপালকে সমীপবর্ত্তী একজন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করত স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠাবলম্বনে শিবজীর বাসাবাটীর প্রত্যভিমুখে ধাবমান হইলেন। অমাত্যবর্গও বাদসাহের সমভিব্যাহারী হইল, এবং মহারাষ্ট্রপতির পলায়নবার্ত্তা প্রচরদ্রূপ হওয়াতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহা-কোলাহল পুরঃসর সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিল।

বাদসাহ কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, নগরপালের কতিপয় অনুচর এক ব্যক্তিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছে। বাদসাহ দূর হইতে ঐ ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুভব করিলেন সেই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হইবে। অতএব অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সকল লোক নিকটবর্ত্তী হইলে বন্দীর মুখাবয়ব দ্বারা বোধ হইল যে, সে শিবজী নহে। পরে সে ব্যক্তিও বাদসাহ সমীপে আনীত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যর্থ তাড়না করিতেছে।" পরে প্রকাশ হইল যে, ঐ ব্যক্তি নগরপালেরই একজন অনুচর; শিবজীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাহার খট্টায় শুইয়া ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, নগরপাল তাহাকে মহারাষ্ট্রপতির খট্টায় শয়ান দেখিয়া একেবারে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আপনি তৎক্ষণাৎ বাদসাহের নিকট আইসে এবং উহাকেও পরে আনয়ন করিতে আদেশ করে। আরঙ্গেব এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "অনুমান হয়, এই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া শিবজী ইহার সহিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনানন্তর ছদ্মবেশে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অধিকদূর যাইতে পারে নাই, তাহাকে ধৃত করিতে হইবে—নচেৎ;—আমার অন্য কোন হানি নাই, কেবল যথাযোগ্য প্রসাদ না লইয়া গেলে বাদসাহী পদের অগৌরব করা হয়—তোমরা কেহ বলিতে পার, সে কি জন্য এমত কৌশল করিয়া পলায়ন করিল?—আমার অনুভব হয় যে, সে সভাতে আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিয়াছিল, অতএব রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে লিপি আসিলেই পাছে সেই মিথ্যা প্রচার হয় এই ভয়ে পলায়ন করিয়াছে—যাহা হউক, এক্ষণে রাজা জয়সিংহ তাহার নিকট কিছু প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কি না, তাহা প্রমাণ করিবারও আর উপায় নাই—অন্য এক লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্দ্বারা জানিলাম আমার পরম হিতকর চিরসুহৃৎ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শিবিরে প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন—হায়! তাঁহার ন্যায় আমার হিতকারী আর কে হইবে?” কপটমতি আরঞ্জেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চাটুকার অমাত্যগণ, আকাশাভিমুখ হইয়া বাদসাহের বাক্য দৈববাণীর ন্যায় ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আকর্ণন করিতে লাগিল। জনসাধারণ আরঞ্জেবের কৌটিল্যে মুগ্ধ হইয়া ভাবিল—“আহা! বাদসাহ কি করুণহৃদয়!”—প্রাচীন অমাত্যগণ যাঁহারা আরঞ্জেবের মন্ত্রণার ভুক্তভোগী ছিলেন, তাঁহারা কেবল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাদসাহের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, নিজ নিজ মুখাবয়বে সুখ দুঃখ কোন ভাবই প্রকটিত করিলেন না। আর যে সকল অমাত্য, মৃত রাজা জয়সিংহের প্রতি বাদসাহের মনে মনে মৎসরভাব ছিল, ইহা জানিতেন, তাঁহারা কেহ কেহ বাদসাহের কর্ণগোচর হয় এমত করিয়া মৃদুস্বরে ‘কাফের’ (বিধর্ম্মী) এই শব্দটি দুই একবার উচ্চারণ করিলেন।

আরঞ্জেব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও এইরূপ কৌশল সহকারে মনের ভাব সকল গোপন করত ভৃত্যদিগের উপর যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার এই ভাবনা হইতে লাগিল—“হায়! যদি শিবজী ধরা না পড়ে তবে সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কেনই বা জয়সিংহকে হনন করিলাম! কেনই বা এই দুর্ব্বহ পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিলাম। জয়সিংহ ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, আর কিছুদিন হইলেই কালবশে লোকান্তর গমন করিত —হায়! তাদৃশ সেনাপতিই বা আর কোথায় পাইব।”

দ্বাদশ অধ্যায়

সেই দিন নিশীথসময়ে পূর্ব্বোক্ত বারাঙ্গনা একাকিনী সেতুদ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দিক্ প্রাচীন দিল্লী, তথায় অনেকানেক ভগ্ন প্রাসাদ এবং বৃহৎ বৃহৎ দেবালয় সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে এক্ষণকার অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। ঐ স্থানে একটি মনুষ্যেরও গমনাগমন নাই। কেবল স্থানে স্থানে শৃগালাদি হিংস্র জন্তুরই উপদ্রব আছে। যাহা হউক ঐ স্ত্রী একাকিনী নিঃশঙ্কহৃদয়ে ঐ স্থান দিয়া গমন করত কিয়ৎদূর অন্তরে একটি ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তথায় মহারাষ্ট্রপতি তাহাকে দর্শন করিয়া

সম্ভাষণপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি? অথবা, সংবাদই আর কি জিজ্ঞাসা করি—তুমি একাকিনী আসিয়াছ—তবে আমার সকল যত্নই বিফল হইয়াছে।" বার-নারী উত্তর করিল—"হাঁ মহারাজ! আপনকার চেষ্টা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা মুখে বর্ণন করিয়া আর কি জানাইব, এই পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া সমুদায় অবগত হউন।" শিবজী ব্যস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেই অঙ্গুরীয় যে, রোসিনারারই অঙ্গুরীয় তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—"তবে বাদসাহ-পুত্রীর সহিত তোমার সন্দর্শন হইয়াছে —তিনি কি বলিলেন? কেমন আছেন? আমার প্রদত্ত সামগ্রী সকল দেখিয়াই কি চিনিতে পারিয়াছিলেন? না তোমাকে পরিচয় দিতে হইয়াছিল? আর তাঁহার আগমনেরই বা কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সমুদায় একেবারে বল।" স্ত্রী উত্তর করিল, "মহারাজ! সেই বাদসাহ-পুত্রীর ন্যায় উদার-চরিত্রা কামিনী কখনও দেখি নাই শুনি নাই—যাহা ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন"—এই বলিয়া বার-বনিতা সমুদায় বর্ণন করিলে শিবজী চমৎকৃত হইলেন, পরে বহুক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন, "রোসিনারা অন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন—যদি তাঁহার নিমিত্ত আমার রাজ্য বিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি সুখী হইতাম—তাদৃশ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে অরণ্য-বাসেও অসুখ নাই।" বার-যোষা কহিল, "মহারাজ! যাহা বলুন কিন্তু বাদসাহ-পুত্রী উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন—এবং তিনি উচিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সমুদায় গুণ আপনার অনুভূত হইতেছে!"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এবং শিবজী আপনি দুই এক দিন সেইখানেই থাকিয়া রোসিনারাকে আনয়নার্থ পুনর্ব্বার যত্ন করিবেন এমত পরামর্শ করিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীমান্ রামদাস স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। অতএব ঐ বার-বনিতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল। শিবজী শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণবন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে একটি কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই—আর আপনকার নিকট আমার দোষ গুণ কিছুই অব্যক্ত নাই, অতএব শ্রবণ করুন"—এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সংক্ষেপে রোসিনারা সম্বন্ধীয় তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন। রামদাস স্বামী তৎশ্রবণে ঈষৎ কোপযুক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি মহারাষ্ট্রে ইহার কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম— তথায় কেহ কেহ এমত কথাও কহিত যে, তুমি স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে তাদৃশ

উৎসাহশীল নহ। অর্থাৎ যদি আরঙ্গেব তোমার সহিত সন্ধি করেন তবে তাঁহার মণ্ডলেশ্বর হইতেও তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা নাই।—তখন ঐ সকল কথায় আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় নাই।—কিন্তু এই ব্যাপার শ্রবণে সেই লোকপ্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে না—এমত উদার-প্রকৃতি হইয়াও যে, স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহা না দেখিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস হইবে।—বাদসাহ-পুত্রী যে, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আসিলেন না ইহাই ক্ষেমঙ্কর করিয়া মানি।” শিবজী এই সকল কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। তখন রামদাস স্বামী ঐ বার-বধূর স্থানে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আমি অন্যায় করিয়াছি—বাদসাহ-পুত্রীর যেরূপ বিবেচনা শুনিলাম, তাহাতে আমারও অন্তঃকরণে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইতেছে, তিনি সামান্যা স্ত্রী নহেন এবং তুমি সেই জন্যই তাঁহার প্রতি প্রণয়বদ্ধ হইয়াছ—আমি তজ্জন্য তোমাব নিন্দা করিয়া ভাল করি নাই—যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া শ্রবণ করাই।” শিবজী তৎক্ষণাৎ ঐ পত্র গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ কবিলেন এবং তিনি সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাষ্ট্ররাজ!—হে প্রিয়তম!—আমি কি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব—আর কি বা লিখিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না।—তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না—কিন্তু আমি তোমাব মন জানি। অতএব আমি যে জন্য তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলাম না, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহিলেই বুঝিতে পারিবে এবং আমার প্রতি অক্রোধ হইবে। আমি আর অধিক কি বলিব—তুমিই আমার স্বামী, তাহার চিহ্নস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমাব অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম—অতএব অদ্যাবধি আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল।—কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে—এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামিসহবাসসুখে বঞ্চিত করিলাম।—যদি বল, আমাকে লইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না—সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই—কিন্তু মনে করিয়া দেখ, শুদ্ধ রাজা হওয়া মাত্র তোমার মনের মানস নহে।—অতএব আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই—একান্ত অধীনা রোসিনারা।”

রামদাস স্বামী এই পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতাদৃশ উদারচরিতা কামিনী আছে তাহা আমি জানিতাম না। মহারাজ! যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দ্বারা পাতিব্রত্য রক্ষা করেন তাঁহারাও ইহার ন্যায় পতিপরায়ণা নহেন। মহারাজ! আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন—এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহ-কন্যাই আপনকার সহধর্ম্মিণী হইবেন ইহাব সন্দেহ নাই।"

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভূমিকা

আমার কোন আত্মীয় একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাঁহার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া আমি ঐ পুস্তক তাঁহার সহযোগে পাঠ করিয়া দেখিতেছি। যে দিন তাঁহার অনুবাদিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া পড়িল। পাঠ নিবৃত্ত করিয়া ঐ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুস্থ হইবার মানসে শয়ন করিলাম। নিদ্রাবস্থায় যে কত স্বপ্ন দেখিলাম, আনুপূর্ব্বিকক্রমে মনে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, কয়েক খণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে। তাহার লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের লেখাই হইবে, কখন বোধ হয়, আমার না হইতেও পারে। ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার যো নাই। নিদ্রাবস্থাতেও যে কেহ কেহ কখন জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার অনেক উদাহরণ ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। আমার ওরূপ হয় না, এ সময়েও হয় নাই। কিন্তু যেমন ঘুমাইয়াও জাগা যায়, তেমনি জেগেও ঘুমান যাইতে পারে। যাহা হউক, শাস্ত্রে বলে—স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রানুবর্ত্তিকার্য্য করাই উচিত বোধে এই "স্বপ্নলব্ধ ভারত ইতিহাস" এডুকেশন গেজেটে প্রচারিত করিতে দিলাম। *

গ্রন্থ প্রচারক

---

* এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ই কার্ত্তিক হইতে প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যায় করিয়া প্রকাশিত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পানিপথের যুদ্ধ

তখন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে, জাতিভেদে যেমন অন্যান্য বিষয়ের প্রভেদ হয়, তেমনি যুদ্ধপ্রণালীও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে যাহার আপনার অভ্যস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বিজয়ী হইতে পারে, তাহার অন্যথা করিলে পরাজিত হয়। যেমন চকিতের ন্যায় এই ভাব তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইল, অমনি তিনি সেনানায়কগণকে সম্মুখ-সংগ্রাম হইতে অপসৃত হইয়া শত্রুর পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অনুজ্ঞার সমগ্র তাৎপর্য্যই বুঝিল, ক্ষণমাত্রে আপনাদিগের ব্যূহের রূপান্তর করিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই প্রভূত সেনারাশি অর্দ্ধচন্দ্রের আকার হইয়া দাঁড়াইল। আহম্মদ সাহের পরাক্রান্ত অশ্বারোহি-দল সবেগে আসিতেছিল। কাহার সাধ্য যে সেই বেগ সহ্য করে? নদীস্রোতের অভিমুখে কোন্ প্রতিবন্ধক স্থির হইয়া দাঁড়ায়। এক পাষাণময় পর্ব্বতখণ্ড দাঁড়াইতে পারে, আর লঘু বালুকাস্তূপ যদিও স্থির হইয়া না দাঁড়ায়, তথাপি ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্রোতোজল শোষণ করিয়া লইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমে মনে করিয়াছিল, অচলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে, এবং ঐ আক্রমণবেগ সহ্য করিবে, কিন্তু দৈবানুকূলতাবশতঃ তাহারা সে চেষ্টায় বিরত হইল। তাহারা বিশুষ্ক বালুকারাশির প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রবল স্রোতোমুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহার উভয় পার্শ্ব ঘেরিয়া শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। নদীর জল ক্রমে ন্যূনবেগ, ক্রমে হ্রস্ব, অনন্তর সমুদায়ই বালুকা মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আহাম্মদ সাহ এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিলেন। মনে করিলেন, আর স্বদেশে ফিরয়া যাইবেন না; সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি আপন সহচর দুরানিদিগকে এবং স্বপক্ষ রোহিলাদিগকে, আর অযোধ্যার সৈন্যগণকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে নবাব সুজাউদ্দৌলার অনুগৃহীত কাশীরাজ নামক একজন হিন্দু রাজা তাঁহার সমীপাগত হইয়া যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বন্দী হইয়া এক্ষণে তাহাদিগের দৌত্যকর্ম্মে আপনার নিকট

আসিয়াছি। অনুমতি হইলে তাঁহাদিগের বক্তব্য নিবেদন করি।” “বল”।

“সাহেবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরি প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া চোহান বংশাবতংস মহারাজ পৃথ্বীরাও কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু পরবর্ষে স্বয়ং বন্দীকৃত হইলে সাহেবুদ্দীন কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দুরা মুসলমানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের প্রতি কেমন আচরণ করিয়াছেন, তাহা ঐ বিবরণেই প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া যদিও বরাবর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তথাপি হিন্দুদিগের জাতীয় প্রকৃতির অন্যথাচরণ হইতে পারে না। হিন্দুরা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও সদয় আচরণ করিতে প্রস্তুত। আপনি নিজ দলবল সহিত নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে গমন করুন। ভারতবর্ষনিবাসী যদি কোন মুসলমান আপনার সমভিব্যাহারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। তবে তাদৃশ মুসলমানের পক্ষে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশে প্রত্যাগমন নিষিদ্ধ।” দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিল।—

“মহারাষ্ট্র-সেনাপতি আরও একটি কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনি সসৈন্যে তাঁহার অতিথি। অতএব সিন্ধু-পরপারে আপনার নিজ রাজ্যে যাইতে যে কয়েক দিন লাগিবে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। আপনার ঐ কয়েক দিনের ব্যয় তিনি নিজ কোষ হইতে নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।”

দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে আহম্মদ সাহ ক্ষণকাল মৌনভাবে চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, “দূত! তুমি মহারাষ্ট্র-সেনাপতিকে গিয়া বল, আমি তাঁহার উদার ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইলাম—আর কখনও ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যম করিব না।” এই কথা শুনিয়া দূত অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, “মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমার প্রতি আর একটি কথা বলিবার আদেশ আছে। এদেশীয় যে সকল মুসলমান নবাব, সুবাদার, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি আপনার সমভিব্যাহারী না হইবেন, তাঁহারা অবিলম্বে যে যাঁহার আপনাপন অধিকার এবং আবাসে প্রতিগমন করুন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বলিয়াছেন, ‘ঐ সকল লোকের পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা হইল’।” দূতের এই কথা শেষ হইবামাত্র অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোলা, রোহিলখণ্ডের জায়গীরদার নজিবউদ্দোলা, হায়দরাবাদের নিজাম সলাবতজঙ্গের সেনাপতি ও ভ্রাতা নিজাম আলি ইঁহারা পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, “সেনাপতি মহাশয়ের

সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্ব স্ব অধিকারে গমন করিতে হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি মনোভঙ্গ হইবে।" দূত সকলের নিকট প্রণত হইয়া বলিল, "তবে আপনারা দিল্লীনগরে গমন করুন, সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে—আমার প্রতি এইরূপ বলিবারও অনুমতি আছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্ত

প্রাচীন দিল্লীর মধ্যে যে স্থানের নাম ইন্দ্রাপৎ (ইন্দ্রপ্রস্থ) তাহার অনতিদূরে একটি সভামণ্ডপের মধ্যভাগে পৃথ্বীরাওয়ের আয়সস্তম্ভ নিখাত ছিল। পূর্ব্বে পৃথ্বীরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যজুর্বিদ্ ব্রাহ্মণেরা ঐ শুভ স্তম্ভ নিখাত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাসুকির শিরোদেশ স্পর্শ করিল—ইহার উপর যে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হইবে, তাহা চিরকাল অচল থাকিবে। আজি আর সেই স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে না, ভূমি-মধ্যে আরও বসিয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি একটি অত্যুচ্চ দিব্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সভামণ্ডপের যে অকালজীর্ণ প্রাচীর ছিল তাহাও আর সেরূপ নাই, সমস্ত নবীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজা, নবাব, সুবাদার প্রভৃতি সকলে ঐ সভামণ্ডপে আপনাপন যোগ্যস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সভার কি শোভা! রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানববিনির্ম্মিত সভাগৃহ ইন্দ্রের সভা অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং মনোহর বলিয়া বর্ণিত। এই স্থানেই সেই সভাগৃহ ছিল—তাহাই কি এতদিন কালতরঙ্গে মগ্ন থাকিয়া পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিয়াছে! সভামণ্ডপের মধ্য-ভাগে যে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুই দিকে দুইটি সোপান-শ্রেণী। সর্ব্বনিম্ন-সোপানে একজন গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যবয়স্ক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

"আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্ব্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।

"ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইঁহার পর নহেন, ইনি

উঁহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইঁহার পালিত সন্তান।

"এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ-নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্ব্বের মত বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত এবং অপরের উদরপূরণ করিব? (এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই সভা হইতে "না না" —"না না"—"না না"—এই ধ্বনি উঠিল) কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল—! আমার কর্ণে?—আমি কে?—ভারতভূমির কর্ণে—ঐ মৃত্যুসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। দেখ—তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল—মুখমণ্ডলে হাস্যপ্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন—এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন।

এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা একজন না থাকিলেও সম্মিলন হয় না। কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন? দৈবানুকূলতায় এ বিষয়েও আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিমূল পৃথিবী ভেদ করিয়া বাসুকির শীর্ষদেশ সংলগ্ন হইয়াছে, পৃথিবী টলিলেও আর ইহা টলিবে না—আর ঐ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদসাহ স্বেচ্ছাতঃ রাজা রামচন্দ্রকে আপন শিরোভূষণ মুকুট প্রদান করিয়া তাঁহার হস্তে সাম্রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।"

সভামণ্ডপের দক্ষিণ এবং উত্তর প্রান্তবর্ত্তী দুইটি প্রশস্ত পটমণ্ডপ হইতে একেবারে দুইটি ভেরীরব বিশ্রুত হইল—দক্ষিণদিক্ হইতে একজন গৌরকান্তি, দীর্ঘচ্ছন্দ, ম্লানবদন মধ্যবয়স্ক পুরুষ সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ সত্বর-পদে সিংহাসন সমীপে উপনীত হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত বক্তার হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক এক এক পা করিয়া সিংহাসনের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিতে লাগিলেন। তিনি যে সময়ে উঠিতেছিলেন, তৎকালে উত্তর দিক্‌স্থ পটমণ্ডপ হইতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যচ্ছন্দ একজন কৃশাঙ্গ যুবা পুরুষ সুগভীর চিন্তাবনত মুখে শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে সিংহাসনাভিমুখে আসিয়া বিনা সাহায্যে তাহার সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ ভাগে উপস্থিত হইলে দুই জনেই একেবারে সিংহাসনের উপর পরস্পর সম্মুখীন!

গৌরাঙ্গ পুরুষ তৎক্ষণাৎ আপনার শিরস্ত্রাণ হইতে মহামূল্য হীরক-মণ্ডিত স্বুবর্ণময় মুকুট খুলিয়া অপরের মস্তকোপরি বসাইয়া দিলেন, এবং তাহা করিয়াই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সিংহাসনের একটি সোপান নিম্নে আসিবার উপক্রম করিলেন। যুবা উভয় হস্তদ্বারা তাঁহার উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত তাঁহাকে নামিতে দিলেন না।

সভা মধ্যে কি হিন্দু কি মুসলনান দ্রষ্টৃমাত্রেরই চক্ষু বাষ্পাকুলিত হইল—সকলেরই কণ্ঠ হইতে গদ্‌গদ স্বরে "সম্রাট রাজা রামচন্দ্রের জয়—সাহ আলম বাদসাহের জয়" এই বাক্য নিঃসৃত হইল। সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রণত হইয়া পড়িল।

নিমেষ মধ্যে সকলের প্রতি গাত্রোত্থানের আজ্ঞা হইল। উঠিয়া আর কেহই সাহ আলমকে দেখিতে পাইলেন না। দিল্লীর সিংহাসনোপরি শিবজী-বংশ-সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র একাকী উপবিষ্ট—তাঁহার শিরোদেশে সাহ আলম প্রদত্ত সেই রাজমুকুট!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মূল ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপক সভা

সাজাহান-বিনির্ম্মিত নবদিল্লীর মধ্যভাগে জুমা মসজিদ। জুমা মসজিদের উর্দ্ধ হইতে দেখিলে দিল্লী নগর যেরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় যে ঐ মসজিদটিই নগরের নাভিস্থল। তাহা হইতে কিরণজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে রাজবর্ত্ম সকল বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং প্রতি রাজবর্ত্ম হইতে পরস্পর সমদূরে অন্যান্য পথ নিঃসৃত হইয়াছে। সমুদায়টি যেন একটি লূতাতন্তুজাল। ঐ জাল-মধ্যভাগে জুমা মস্‌জিদ এবং প্রতিতন্তুর পার্শ্বদেশে প্রজাবর্গের আবাসগৃহ।

দিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল জনতায় পরিপূর্ণ। জুমা মস্‌জিদে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়াছে। এই সভায় অভিনব সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ পালনাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইবে। প্রজাদিগের কৌতূহলের পরিসীমা নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, জাঠ, মহারাষ্ট্র, মুসলমান প্রভৃতি নানা প্রদেশবাসী জনগণ পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া

পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, অন্তঃকরণ উৎসাহপূর্ণ। একজন ব্রাহ্মণ একজন মুসলমানকে বলিতেছেন, "যে রাম সেই রহীম, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।" মুসলমান বলিতেছেন, "ঠাকুর যথার্থ কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভূতি মাত্র, মানুষ-ভেদে যেমন আচারভেদ—পরিচ্ছদভেদ—ভাষাভেদ—তেমনি উপাসনার প্রণালীভেদও হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরাইয়া দেখিতেছেন। কিন্তু সকলেরই চামড়ার নীচে লহু লাল বই কাহারও কাল কাহারও জরদ নহে।" একজন ক্ষত্রিয় ঐ কথায় যোগ দিয়া বলিল, "তা বই কি —আসলে কিছুই তফাৎ নাই—আমরা হিন্দু বলিয়া কি মুসলমানের দেবতা মানি না? আমরাও প্রতিবর্ষেই তাজিয়া করিয়া থাকি।" একজন বাঙ্গালী কহিল—"আমাদিগের দেশে সকল কর্ম্মেই সত্যপীরকে সিন্নি দেওয়া হইয়া থাকে, যিনি সত্যপীর তিনিই সত্যনারায়ণ।" আর একজন মুসলমান বলিল, "তোমরাই যে আমাদের দেবতা মান, আমরা তোমাদের দেবতা মানি না, একথা বলিতে পারিবে না। কোন্ মুসলমান হিন্দু-দেবতার এবং ব্রাহ্মণ-ঠাকুরদের যথোচিত সম্মাননা না করে? আমার জানত অনেক মুসলমান ব্রাহ্মণদিগকে খরচপত্র দিয়া দুর্গোৎসব করান। দরাপ খাঁ "সুরধুনি মুনিকন্যে" বলিয়া কেমন ভক্তি সহকারে গঙ্গাদেবীর স্তব করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অজানত আছে?" নগরময় এইরূপ কথোপকথন, কোথাও হাস্যপরিহাস, কোথাও গানবাজনা, কোথাও প্রীতিভোজের সমারোহ।

জুমা মসজিদের মধ্যে ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি একত্র সমাগত। উত্তর দিকে মহারাষ্ট্র-মন্ত্রিবর বালাজী বাজীরাও পেশোয়া, তাঁহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎদূরে মলহর রাও হুলকার, তাঁহার দক্ষিণে মাদাজী সিন্ধিয়া, তাঁহার দক্ষিণে দম্মাজি গুইকবার, তাৎপার্শ্বে জানোজী ভোঁসলা, তাঁহার পার্শ্বভাগে সদাশিব রাও। পেশোয়ার বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎদূরে সলাবত জঙ্গ, তৎপার্শ্বে সুজাউদ্দৌলা, তাঁহার পার্শ্বে নজিব উদ্দৌলা, তাঁহার পার্শ্বে সূর্য্যমল; পেশোয়ার সম্মুখভাগে উদয়পুর যোধপুর আজমীর জয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের ক্ষত্রিয়রাণা সমস্ত এবং তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে তজ্জাতীয় বীরাবয়ব ঠাকুর দল।

পেশোয়া কহিতেছেন, "অদ্য আপনারা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ পরে যাঁহারা এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনাদিগের যশঃ কীর্ত্তন করিবেন। সকলের অভিমতানুসারে রাজ্য

স্থাপনের এই কয়েকটি মূল নিয়ম অবধারিত হইয়া স্বর্ণ ফলকে লিখিত হইল, স্বর্ণ যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাতু, কখনও কলঙ্কিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, এ নিয়মগুলিও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়।—

১ম। সাক্ষাৎ শিবাবতার মহারাজ শিবজীর বংশ-সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র, বৈদেশিক শত্রু পরাভূত করিয়া নিজ বংশমর্য্যাদা ও বীরতাগুণে প্রদেশাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং প্রজাসাধারণের ভক্তি- এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট হইলেন।

২য়। তাঁহার বংশে ঔরসাদি জ্যেষ্ঠ পুত্রে চিরকালের নিমিত্ত সাম্রাজ্যাধিকার ন্যস্ত থাকিবে।

৩য়। সম্রাট আপনার মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিবেন, এবং সেই সভার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

সাম্রাজ্যের রক্ষার হেতু কয়েকটি ব্যবস্থা স্থির হইয়া রৌপ্য ফলকে লিখিত হইল। এ নিয়মগুলি সৌবর্ণ নিয়মাবলীর ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় নহে—কিন্তু সম্রাট ভিন্ন অপর কেহ ইহাদিগের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেও পারেন না। নিয়মগুলি এই—

১মতঃ। শিখ এবং মহারাষ্ট্রীয় মিলিত একটি সৈন্যদল সিন্ধুনদের উপকূলে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিবে। ঐ সৈন্যের ব্যয় সাম্রাজ্যের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। উহার অধিনায়কবর্গের নিয়োগও সম্রাটের সাক্ষাৎ অধীন থাকিবে।

২য়তঃ। সমুদ্রোপকূলভাগে যে যে স্থানে বিদেশীয় লোক বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আসিয়া আছে, সেই সেই স্থানেও সম্রাটের সাক্ষাৎ অধীন ঐরূপ এক একটি সৈন্যদল থাকিবে।

৩য়তঃ। কোন রাজা বা নবাব অথবা সুবাদার আপনার নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্যের অধিক বা অল্প সৈন্য রাখিতে পারিবেন না।

৪র্থতঃ। তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার সন্ধিবিগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। যদি কোন কারণে পরস্পর মনোবাদ উপস্থিত হয়, সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিয়া তৎকৃত মীমাংসা গ্রহণ করিবেন।

৫মতঃ। সম্রাট অনুজ্ঞা করিলেই সকলে সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন।

৬ষ্ঠতঃ। প্রতি প্রদেশাধিকারীর প্রধানতম দুর্গ মধ্যে সম্রাটের খাস কতক সেনা অবস্থাপিত হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত স্থির হইয়া যাহা তাম্রফলকে লিখিত হইল, তাহা পরিবর্ত্তনীয় এবং তাহার পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব সম্রাটের মন্ত্রীদল অথবা প্রদেশাধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারী সকলেই করিতে পারেন। নিয়মগুলি এই—

১মতঃ। প্রতি গ্রামের ভূমি কত, এবং তাহার উৎপন্ন কত, তাহা অবধারিত করিতে হইবে; অনন্তর ঐ উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ রাজকোষে প্রেরিত হইবে। যাহা থাকিবে, তাহার দ্বিষড়্ভাগ ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারী উভয়ে সমান পরিমাণে ভাগ করিয়া লইবেন। অবশিষ্ট সমুদায় গ্রামিকদিগেরই থাকিবে। ভূমির উৎপন্ন বিভাগ সম্বন্ধে যে নিয়ম, অপর সর্ব্বপ্রকার রাজস্বের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম চলিবে।

শান্তি রক্ষার ভার গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ধর্ম্মাধিকরণের ভারও গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ফলতঃ প্রতি গ্রাম যেন একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়া থাকিবে। ভূম্যধিকারিগণ এবং প্রদেশাধিকারিগণ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যথাসাধ্য বিরত থাকিবেন—গ্রামগুলিকে আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্ম্মাধিকরণ এবং রাজস্বপ্রদান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। ভারতভূমির চিরপ্রচলিত ব্যবহার এই এবং এই ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত।

নগরের শাসন-প্রণালীও ঐ রীতির অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে। প্রতি নগর কয়েকটি পল্লীতে বিভক্ত হইবে এবং যেমন গ্রামে গ্রামে মুখ্য মণ্ডলাদি থাকিবে পল্লীতেও সেইরূপ মুখ্য মণ্ডল নিযুক্ত হইবে।

ভারতসাম্রাজ্য পালনের নিমিত্ত এই কয়েকটি স্থূল স্থূল ব্যবস্থা এক্ষণে নিরূপিত হইল। পরে এই সকল মূল নিয়ম রক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবধারিত হইবে। তাহা করিরার নিমিত্ত অদ্য এই সূত্রপাত করা যাইতেছে—ভারতবর্ষের অষ্টাদশ প্রদেশাগত অষ্টাদশ জন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপুরুষ এবং সম্রাটের মন্ত্রিবর্গ ইঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ভারতসাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক মহাসভার সদস্য হইবেন। এই সভার দ্বারা রাজ্য সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সর্ব্ব বিষয়ের বিচার হইবে। সাম্রাজ্যের মধ্যে যাঁহার যে কোন নিয়ম প্রচলিত করিবার ইচ্ছা হইবে, এই সভায় তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়া বিচারিত হইবে। এই সভা হইতে ব্যবস্থাপিত এবং প্রচারিত হইয়া না গেলে কোন ব্যবস্থাই লোকের গ্রাহ্য হইবে না। যেমন ভগবানের

বিরাট মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক তেমনি সম্রাটের শরীরও ভারতবর্ষব্যাপক। কৃষ্যুপজীবী এবং শিল্পব্যবসায়ী শ্রমশীল প্রজাব্যূহ সেই শরীরের নিম্নভাগ, বণিক সম্প্রদায় এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাহার মধ্যদেশ, যোদ্ধৃগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার হস্ত—পণ্ডিত মণ্ডলী তাহার শিরোদেশ—এই সভা তাহার মুখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উন্নতির পথ মোচন

আগরা নগরের ক্রোশৈক মাত্র পশ্চিমে আকবর সাহের সমাধিমন্দির—উহার নাম সেকন্দ্রা। সকলেই তাজমহলের শোভা অনুভব করিয়াছেন—এবং ঐ নির্ম্মাণ-কীর্ত্তি যে পৃথিবী মধ্যে অতুল্য, তাহাও বলিয়া থাকেন। কিন্তু অনুমান হয়, নিজ চিত্তবৃত্তি পর্য্যালোচনে সক্ষম এমত প্রকৃতদর্শী পর্য্যাটকের চক্ষে তাজমহলের শোভা অপেক্ষা সেকন্দ্রার শোভা অধিক। তাজমহলের অভ্যন্তরে গমন করিলে বোধ হয় যেন আকাশ-মণ্ডলের অনুরূপ-রূপ সংঘটন করিবার উদ্দেশ্যেই নির্ম্মাতা উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেকন্দ্রার প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে গমনকারীর বোধ হইয়া যায় যেন তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে উত্থাপিত হইতেছেন। নির্ম্মাতা তাঁহাকে মর্ত্ত্যভূমি হইতে স্বর্গারূঢ় করিবার সোপান-শ্রেণী বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা আকবরের সমাধি-বিবরের উপরিভাগের প্রস্তরখণ্ডটি ফাটিয়া রহিয়াছে। লোকে বলে, বিদ্যুৎপাতে ঐরূপ হইয়াছে, তাহাই কি? না, ঐ মহাপুরুষের প্রভাময় আত্মা আবরণ-প্রস্তরকে উদ্ভিন্ন করিয়া সমীপবর্ত্তিনী দিব্যভূমিতে বিচরণ করিতে গমন করিয়াছে? সেকন্দ্রার চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। হাতি, ঘোড়া, উট, তামজান, রথ অসংখ্য। সম্রাট্ রামচন্দ্র সেকন্দ্রা দর্শনে আসিয়াছেন, এবং প্রধান মন্ত্রী পেশোয়ারকে সমভিব্যাহারে করিয়া যে সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আকবরের সমাধিস্থান, সেই স্থানে গমন করিয়াছেন। দুই জনে তথায় উপবিষ্ট, রাজা রামচন্দ্র কহিতেছেন—"পিতঃ, আমি আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি—তাজমহল অপেক্ষাও এই স্থানটি অধিকতর রমণীয় বলিয়া আমার বোধ হয়।" বাজীরাও কহিতেছেন, "বৎস! তাজমহল একজন সমৃদ্ধিশালী বাদসাহের নির্ম্মিত বটে, কিন্তু যিনি সেকন্দ্রার নির্ম্মাতা, তিনি কেবল

ধনশালী বাদসাহ ছিলেন না, তিনি একজন সুদূরদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। আকবর সাহই বুঝিয়াছিলেন, কেমন করিয়া অন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন মহাদেশটিকে একচ্ছত্র করিয়া রাখিতে হয়। ধর্ম্মবিদ্বেষ কখনই তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান লাভ করে নাই। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে এক-ধর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি ঐ পথে না চলিবেন তিনিই ভারতবর্ষের সিংহসেন হইতে স্খলিতপদ হইবেন।" রামচন্দ্র কহিলেন, "মুসলমান সম্রাটেরা পরধর্ম্মবিদ্বেষী হইতে পারেন, হিন্দুসম্রাটেরা কখনই সেরূপ হইতে পারেন না।" বাজীরাও বলিলেন, "সে কথা সত্য। হিন্দুরা স্বধর্ম্মে ভক্তি করেন, অথচ পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না। কিন্তু যেমন পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ নাই, তেমনি আমাদিগের আর একটি দোষ আছে। আমরা আবহমানকাল সকল বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছি, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিতে চাহি না। কিন্তু সকল সময়ে কি এক নিয়ম চলে? আমি সম্প্রতি বঙ্গদেশে গিয়া যাহা যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। শুনিলেই বোধ হইবে যে, আমাদিগকে পূর্ব্বরীতির কিছু কিছু ব্যত্যয় করিতে হইবে—তাহা না করিলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।"—বাজীরাও কহিতে লাগিলেন, "বাঙ্গালার সুবাদার তাঁহার অধিকারস্থ কতকগুলি বিদেশীয় লোকের একটি নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। ঐ বিদেশীয়েরা এক প্রকার ফিরিঙ্গী। তাহাদিগেরও বর্ণ সাদা ও চক্ষু কেশ লোম কটা। তাহারাও বিলক্ষণ সাহসী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি? তাহা না হইলে কি মহাসমুদ্র পার হইয়া এই দূরদেশে আইসে? ঐ ফিরিঙ্গীদিগের নাম ইংরাজ। তাহারা যে নগরটিতে থাকে তাহার নাম আলীনগর। শতাধিক বর্ষের মধ্যে তাহারা ঐ নগরটিকে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ঐ নগরে অন্যূন ৭০ সহস্র লোকের বাস, এবং শুনিলাম উহার রাজস্ব বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকারও অধিক। অতএব ইংরাজেরা শুদ্ধ সামান্য বণিক নহে, তাহারা রাজনীতিও বুঝে। যাহা হউক, বাঙ্গালার নবাব কলিকাতা লুঠ করিলে ইংরাজেরা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়, এবং মান্দ্রাজে তাহাদিগের যে অপর একটি আড্ডা আছে, তথা হইতে ৫।৬ খানি জাহাজে চড়িয়া তাহাদের অনেক লোক বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছেন। আলীনগর ত তাহারা আসিবামাত্রই পুনরধিকার করে। অনন্তর কিছুদিনের মধ্যে সুবেদারকেও সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সেনাপতিকে তাঁহার গদিতে বসায়। ঐ সেনাপতি সুবেদার হইয়া তাহাদিগকে অনেক ধন এবং কতক ভূমি জায়গীর দেয়। রাজ্যপালনে সক্ষম, সুহৃদ্‌ভেদে সমর্থ, নিতান্ত সাহসিক

এবং অধ্যবসায়শালী ইংরাজ জাতি এইরূপে লব্ধপ্রবেশ হইতেছিল। আমি তাহাদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলাম। কিন্তু ইংরাজদিগের পূর্ব্ব অধিকার যাহা যাহা ছিল—তাহা সমুদায় তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। উহাদিগের কর্ত্তার নাম ক্লাইব। সে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং তেজস্বিতা অসাধারণ। তাহার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না যে, জায়গীর পরিত্যাগ করে। কলিকাতার দুর্গটিও পুনর্নির্ম্মাণ করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু তাহারও সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিতে পারলাম না। আমাদিগের সৈন্যে তাহাদিগের বাণিজ্য-কুঠির রক্ষা করিবে, অতএব দুর্গ নির্ম্মাণে তাহাদের প্রয়োজন নাই—আর তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, বাণিজ্য করুক, এদেশে ভূমিসম্পত্তি লওয়া তাহাদের অনাবশ্যক, এই সকল যুক্তি প্রদর্শনে তাহাকে নিরস্ত করি। কিন্তু তাহার আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে যদি সাম্রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল থাকিত, এবং আমার সহিত এত অধিক সুশিক্ষিত সৈন্য না থাকিত, তবে সে কখনই ঐ সকল যুক্তি গ্রহণ করিত না। সে একটি বাঘের বাচ্চা। কিন্তু যখন দেখিল যে, কোন ক্রমেই আমার অভিমতির অন্যথা হইল না—তখন তর্জ্জন গর্জ্জন ছাড়িয়া দিল, এবং আমার সহিত সৌহার্দ্দ-বন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। একদিন আমাকে তাহার সিপাহীদিগের কাওয়াজ দেখাইল—একদিন তাহার যুদ্ধপোতে লইয়া গেল। ঐ সমস্ত দেখিয়া আমার এই বোধ হইয়াছে যে, ফিরিঙ্গীরা আমাদিগের অপেক্ষা যুদ্ধকৌশল এবং রণপোত নির্ম্মাণের প্রণালী উত্তমরূপে বুঝে। অতএব আমি মনে করিয়াছি কতকগুলি ফিরিঙ্গীকে নিজ কার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এ-দেশীয়দিগকে যুদ্ধকৌশলের এবং পোত প্রস্তুত করিবার রীতি শিখাইয়া লইব। তদ্বিষয়ে এই এক সুবিধা আছে, ফিরিঙ্গীরা নিতান্ত অর্থগৃধ্নু। উহাদিগকে মোটা মোটা মাহিয়ানা দিলে উহারা আমাদিগের নিকট চাকুরি করিবে।

ক্লাইবের নিকট আমি আর একটি দ্রব্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহার রণ-পোতে তথায় একখানি বৃহৎ পুস্তক দেখিয়া উহা কি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে উহাতে নানা দেশের চিত্র আছে, এবং সেই চিত্র খুলিয়া তাহাদিগের নিজের দেশ কোথায়, এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গীদিগের দেশ কোথায়, তাহারা কে কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া এখানে আইসে, সমুদয় দেখিয়াছিল। পরিশেষে ঐ চিত্রময় পুস্তক আমাকে উপঢৌকন দিয়াছে। চিত্রগুলি যে সত্য, তাহা অপরাপর ফিরিঙ্গী এবং নাখোদা প্রভৃতি দেশীয় সওদাগরদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি। এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, ফিরিঙ্গী কারিগর দিগের দ্বারা

কয়েকখানি সমুদ্রগমনোপযোগী পোত প্রস্তুত হইলেই তদ্দ্বারা এদেশীয় কতকগুলি সদ্বংশজাত বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন যুবা পুরুষকে ফিরিঙ্গীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিব। তাহারা সেই সকল দেশের ভাষাভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহাদিগের দ্বারা সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এমত কার্য্যে সমুদ্রগমনের এবং ম্লেচ্ছসংসর্গের দোষ জন্মিতে পারে না। ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি যখন মহাচীনে গমন করিয়াছিলেন—তখন স্বয়ং চীনাচার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন নাই।

আঁমরা যদি কোথাও না যাই, বিদেশ দর্শন না করি---চিরকাল এই নিজ গৃহের মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি---তবে আমাদিগের প্রকৃতি স্ত্রীলোকের প্রকৃতির ন্যায় হইয়া যাইবে। আমবা স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কিছুই করিতে পারিব না, এবং যেমন স্ত্রীলোক পুরুষের বশীভূত হয়, এ দেশীয়রাও সেইরূপ ফিরিঙ্গীর বশ হইয়া পড়িবেন---অতএব এই তিনটি ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিবার অভিলাষ করিয়াছি (১) অন্যূন ২ শত কৃতকর্ম্মা ফিরিঙ্গীকে বেতন দিয়া সৈনিকশিক্ষায় নিযুক্ত করিতে হইবে। ২য়তঃ অপর এক শতকে রণপোত-নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিতে হইবে। ৩য়তঃ, অন্যূন তিন শত এদেশীয় যুবককে রাজকোষ হইতে বৃত্তি প্রদান করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের দেশে তাহাদিগেব ভাষা এবং বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হইবে।”

সম্রাট্ বিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন---“পিতঃ, আপনি যাহা অভিমত করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল হইবে।” তাহা পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ

লাহের নগর হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে অনুমান দেড় ক্রোশ পথ আসিলেই একটি অতি অপূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। ঐ স্থানটির নামক “শালেমার বাগ” উহা সাজাহান বাদসার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উহার নির্ম্মাণ-প্রণালী এই---সম্মুখে একটি প্রশস্ত উদ্যান, নানা জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ---তাহার অভ্যন্তরে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিলেই একটি সোপানশ্রেণী দৃষ্ট হয়---ঐ সোপানদ্বারা উঠিলে আর একটি

প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহারও প্রান্ত-সীমায় আবার একটি সোপান-শ্রেণী, আবার একটি উদ্যান। এইরূপ ক্রমে ক্রমে এবং উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বৃক্ষবাটিকা অতিক্রান্ত হইলে সুরম্য রাজভবন এবং স্নানাগার-শ্রেণী দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সুবিখ্যাত রাণী সেমিরেমিস বিনির্ম্মিত বেবিলন নগরের নিরবলম্ব উদ্যানের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, "শালেমার বাগ" দর্শন করিলে তাঁহাদিগের সেই কথা মনে পড়িতে পারে।

সম্রাট্ এবং প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বদাই ঐ স্থানে যাইতেন। বৈদেশিক রাজপ্রতিভূদিগের দরবার প্রায় ঐ স্থানেই নির্ব্বাহিত হইত। কোন বর্ষের ফাল্গুন মাসে অতি সমারোহ পূর্ব্বক ঐ স্থানে দরবার হইয়াছিল। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, পারস্য, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি নানা দেশীয় প্রতিভূগণ সমাগত। ফ্রান্স-প্রতিভূর ইচ্ছা, তাঁহার দেশে যে প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভারত-সম্রাট্ তাহার অনুমোদন করেন, এবং তাহা করিয়া রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের বিরূপতা নিবারণ করেন। মাসাবধি ঐ বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ এবং তর্ক বিতর্ক হইয়া আসিতেছে। পরে সম্রাটের অভিমতি প্রকাশের নিমিত্ত ঐ দিন সভা হইয়াছে, এবং পেশোয়া প্রতিভূবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"দেশভেদে মনুষ্যের আচারভেদ, ব্যবহারভেদ, ধর্ম্মভেদ এবং শাসনপ্রণালীর ভেদ হইবে। যাহারা নিতান্ত অবিবেচক এবং অপ্রকৃতদর্শী তাহারাই সকলকে একরূপ করিতে চায়। সকলেই কখনও একরূপ হইতে পারে না। একরূপ হইলেও ভাল হয় না, ভাল দেখায়ও না। এই যে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানটি সম্মুখে দেখিতেছি, ইহাতে নানা জাতীয় ফল ফলিয়াছে—ঐ বিভিন্নতাটি না থাকিলে—সকল পুষ্পই একরূপ হইলে কি এত সুন্দর দেখাইত? ভিন্নভিন্ন-রূপ ফল যত প্রকার উপকারে আইসে, একরূপ হইলে কি তত উপকারে আসিত; অতএব ফ্রান্সের শাসন-প্রণালী যদি প্রজাতন্ত্র করাই সেখানকার লোকের অভিমত হইয়া থাকে, তাহার প্রতি ব্যাঘাত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। ফ্রান্স একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষ—উহাতেও যে ফুল ফুটিতে হয় ফুটুক, যে ফল ফলিতে হয় ফলুক, রুশীয় অষ্ট্রীয় ইংলণ্ডীয় সম্রাটেরা আমাদিগের সহিত একমত হইয়া ফ্রান্সের প্রতি হস্তক্ষেপ করায় নিবৃত্ত হউন।

তবে একটি কথা এই, ফ্রান্সবাসীরা শুদ্ধ নিজ দেশের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্ত করিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা পররাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়া তত্রত্য প্রজাবর্গকে বিদ্রোহ ব্যাপারে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। এ কার্য্যটি ভাল নয়।

আমরাও যেজন্য ফ্রান্সের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না, ফরাসীরাও সেই কারণে আমাদিগের রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহবীজ বপন করিবেন না। অতএব আমাদিগের অভিপ্রায় এই, কোন ফরাসী যদি আমাদিগের কাহারও অধিকার মধ্যে আসিয়া বিদ্রোহবীজ বপন করিতেছে—এমত প্রমাণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়া হইবে। আর একটি কথা আছে, ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত রাজ্যতন্ত্রতার পক্ষে ভয়াবহ বলিয়া কাহারও কাহারও বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের সেরূপ ভয় হইবে তাঁহারা এক কর্ম্ম করুন, সাবধান হইয়া সত্বরে আপনাপন প্রজা পালনের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া লউন—আর কোন ভয়ই থাকিবে না। আর একটি কথা আছে, কেহ কেহ ভয় করিতেছেন, ফরাসী গ্রন্থকারেরা যে সকল নাস্তিক্যবাদে ও রাজবিদ্রোহ-কথায় পরিপূরিত পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন, তাহা অন্য দেশের লোক অধ্যয়ন করিলে তাহাদিগেরও মত-পরিবর্ত্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। এ ভয়ও কোন কাজের ভয় নহে। এই ভারত-সাম্রাজ্যে উদ্ভাবিত, বিচারিত, এবং প্রচারিত না হইয়াছে এমত মতবাদই নাই। বৌদ্ধেরাও ঈশ্বর স্বীকার করিত না—বর্ণভেদ মানিত না—বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকে নিন্দা করিত। অনেক রাজাও তাহাদিগের মতানুগামী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে?—জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার একমাত্র উপায় সেই ধর্ম্মের প্রচারক এবং উপদেষ্টৃবর্গের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং পবিত্রতা—আর কিছুই নহে। যদি ধর্ম্মের উপদেষ্টৃবর্গ তাদৃশ সক্ষম ও সদাচার হয়েন, তবে ধর্ম্মব্যাঘাতের কোন ভয় থাকে না, তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম সজীব থাকে। সেই ধর্ম্ম অভিনব তথ্য সংগ্রহ দ্বারা সবল থাকিয়া সংসার রক্ষা করে। ফরাসী গ্রন্থকার-দিগের পুস্তক সমুদায় আমাদিগের ছেলেরা অনেকেই অধ্যয়ন করে—তাহারা বলে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে যাহা যাহা আছে তাহা ছাড়া ঐ সকল গ্রন্থে বড় কিছু নূতন নাই। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় আমাদিগের ভ্রাতৃসন্নিভ. রুশীয়, অস্ট্রীয়, ইংলণ্ডীয় সম্রাট্‌দিগের ফ্রান্স দেশের প্রতি এই মতানুযায়ী ব্যবহার করা বিধেয়। ভারতসম্রাট্ এইরূপই করিবেন।” সভা ভঙ্গ হইল।

ঐ সভায় যিনি রুশীয় সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি আপন স্বামীকে যে পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

“ভারতসম্রাটের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী আজিকার দরবারে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকলের অবিকল অনুবাদ প্রেরিত হইল। অন্যান্য রাজপ্রতিভূদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে—তাঁহারা ঐ সারবতী কথায় একান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া

তাঁহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব কর্ত্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করিবেন। ভারতসম্রাটের অভিমতির বিপরীতাচরণ শ্রেয়ঃ নহে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠী

গঙ্গা কল কল শব্দে চলিতেছেন। পূর্ব্বোপকূল অতিশয় উচ্চ—ত্রিংশৎ হস্তের ন্যূন হইবে না। মধ্যে মধ্যে ঐ কূলের ধার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভগ্ন স্থানের অতি নিম্ন প্রদেশও কোথাও মনুষ্যাবাসের চিহ্নশূন্য নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর —কূপের পাট—মৃৎকলসাদি কৃত্রিম পদার্থ সকল সর্ব্বদাই বাহির হইয়া পড়িতেছে। ঐ স্থানটি সুপ্রসিদ্ধ কান্যকুব্জ নগর। উহার প্রান্তে যে অত্যুচ্চ প্রাসাদ একটি দেখা যাইতেছে, তাহার নাম "সীতাকারস্যুঁই"। প্রথিত আছে, সীতাঠাকুরাণী শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বর্জ্জিত এবং বনে প্রস্থাপিত হইলে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আসিয়া যেখানে বাস করেন, সেটি ঐ স্থান। ঐ স্থানে তিনি রন্ধন করিয়া বানপ্রস্থ ঋষিবর্গকে ভোজন করাইতেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি দেবালয় ছিল। অনন্তর ঐ দেবালয় ভগ্ন করিয়া একটি মসজিদের নির্ম্মাণ হয়। পরে ঐ মসজিদ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া উহার প্রস্তর সকল গ্রন্থিবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তরগুলিতে লক্ষ্মী, গণেশ, নারায়ণ প্রভৃতি দেবদেবীর যে সকল প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল—সেই মূর্ত্তিগুলিকে ভিতরে দিয়া মসজিদের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রাচীর ভগ্ন হওয়াতে সেই মূর্ত্তি সকল আবার বাহির হইয়া আসিতেছে।

সীতাকারস্যুঁয়ের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিলে সমস্ত নগরটিকে একখানি শতরঞ্চের ছকের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লীগুলি স্বতন্ত্র; দুইটি পল্লী পরস্পর মেশামিশি হইয়া নাই—মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-রাজি দ্বারা বিভিন্নীকৃত। এইরূপ হওয়াতে নগরটি সমধিক বিস্তীর্ণ—যত লোকের বাস তাহা অপেক্ষা আয়তনে অনেক অধিক বোধ হয়। কনোজের বিভিন্ন পল্লীগুলির নাম অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, বিভিন্ন বর্ণসম্ভুক্ত জনগণ প্রায়ই বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া থাকে। মনুসংহিতায় নগরাদি নির্ম্মাণের যেরূপ বিধি আছে, কনোজ যে সেই বিধানের অনুসারেই প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল,

এবং এখনও সেই নির্ম্মাণের কতক প্রকৃতি ধারণ করিয়া আছে, তাহার সংশয় নাই।

কান্যকুব্জ সম্প্রতি একটি প্রধান সমাজস্থান। এখানে পৃথিবীর যাবতীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাষার সমগ্র চর্চ্চা হইতেছে। নগরের ঠিক মধ্যভাগে একটি চতুষ্পাঠী। তাহার সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতভাষার শিক্ষা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অধ্যাপক গ্রীক ভাষা শিক্ষা করান—তৃতীয় অধ্যাপক লাটিন ভাষার শিক্ষা দিয়া থাকেন—চতুর্থ অধ্যাপক আরবী ভাষার শিক্ষা দেন। এই সকল প্রধান প্রধান অধ্যাপকের সহকারী অধ্যাপক অনেকগুলি করিয়া আছেন। ছাত্রেরা ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে---কতকগুলি আরব পারস্য এবং তুর্ক স্থান হইতে, আর কয়েকটি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষতঃ জর্ম্মনি এবং রুশিয়া হইতে—এখানে আসিয়া পাঠ সমাপন করিতেছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। উল্লিখিত কয়েক ভাষার প্রাচীন এবং নব্য, মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রায় সকল পুস্তকই ঐ চতুষ্পাঠীতে সংগৃহীত হইয়া আছে।

প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে কনোজের চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হয়। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা তাহার তথ্যাতথ্য বিচার করিয়া যেরূপ অভিমতি প্রকাশ করেন, গ্রন্থকার রাজকোষ হইতে তদনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নূতন কাব্য নাটকাদির গুণাগুণও এই চতুষ্পাঠীতে বিচারিত হইয়া থাকে। এখানকার একটি ছাত্র সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জর্ম্মন, গ্রীক, এবং হিন্দু—তিনটি জাতিই এক মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন। আর একটি ছাত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন; ঐ গ্রন্থ এখনও শেষ হয় নাই। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জেন্দভাষার সহিত কাল্ডীয় এবং হিব্রু ভাষার সংযোগ সপ্রমাণ করিয়া পারসীক আবেষ্টা এবং য়িহুদীয় বাইবেলের পরস্পর একান্ত সংস্রবের নির্দ্দেশ করা। এই গ্রন্থের সমুদয় অংশ সংসাধিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, বেদপ্রমাণক হিন্দু, আবেষ্টা-প্রমাণক পারসীক, বাইবেল-প্রমাণক য়িহুদী ও খ্রীষ্টান এবং কোরাণ-প্রমাণক মুসলমান, ইঁহারা সকলেই মূলতঃ একই 'কেতাবী' জাতি। ভারতবর্ষীয় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এইরূপ নানা গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সে সকলের উল্লেখ করা বাহুল্য; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ যে মহাকাব্য সম্প্রতি প্রণীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই চতুষ্পাঠীর সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক

মহর্ষি সঞ্জীবন ঐ মহাকাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন।—উহা এক্ষণে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতীয়ের ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে ভারত-সাম্রাজ্যের "পুনরুত্থান" ব্যাপার যথাযোগ্য রূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাল্মীকির করুণা—হোমরের ওজস্বিতা, বর্জ্জিলের প্রসাদবত্তা—মিলটনের গভীরতা—ব্যাসের লৌকিকতা, মহর্ষি সঞ্জীবন প্রণীত "পুনরুত্থান" নামক মহাকাব্যে যে সংক্রান্ত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বদেশীয় সকল আলঙ্কারিকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারাণসীর বিদ্যালয়

বর্ষাকালে যখন গঙ্গার দুইটি করপ্রদা নদী বরণা এবং অসি পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, তখন আরঙ্গেব বাদসাহের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের ঊর্দ্ধ হইতে দেখিলে মৎস্যোদরী কাশীর কি অপরূপ সৌন্দর্য্যই অনুভূত হইতে থাকে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে বারাণসীর সৌধশ্রেণী অবলোকন করিতে করিতে মনে হয়, ইহাই বুঝি চন্দ্রচূড়ের ললাটনিহিত চন্দ্রকলা। মৎস্যোদরী দেখিলে বোধ হয় এই স্থানটি সত্য সত্যই ত্রিশূলীর ত্রিশূলোপরি সংরক্ষিত। পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিত হইয়া গেলেও এই পুরী মগ্ন হইবে না।

মৎস্যোদররূপা বারাণসীর সম্মুখপুচ্ছের সে স্থান যে পল্লী সেই পল্লীর নাম ত্রিপুরা ভৈরবী। উহা উত্তরে বিশ্বের এবং দক্ষিণে কেদার, এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী। ঐ পল্লীতে একটি প্রধান চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই চতুষ্পাঠীতে বহু শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, যাবতীয় নব্য ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষিত হয়। ফরাসী, জর্ম্মন, ইটালীয়, ইংরাজী, ফারসী, হিন্দী—এই কয়েকটি ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইয়া আছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গের নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। ঐ সকল এবং অপরাপর চলিত ভাষার যাবতীয় পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে। ঐ চতুষ্পাঠীর দক্ষিণপশ্চিমদিকে আর একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। তাহাতে জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থতত্ত্বাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। রাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ঐ চতুষ্পাঠীর মধ্যেই পড়িয়াছে। এক্ষণে সেই মন্দিরের জীর্ণসংস্কার

এবং আয়তনবৃদ্ধি হইয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল আর নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। জ্যোতিষ্ক দর্শনের নিমিত্ত একটি সুপ্রশস্ত যন্ত্রাগারও ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রাগারে অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রের মধ্যে এত বৃহৎ একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে যে, তাহা দ্বারা আর্দ্রা নক্ষত্রের পারিপার্শ্বিক গ্রহ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় এক্ষণে গণনা দ্বারা সেই গ্রহদিগের কক্ষা নিরূপণ করিতেছেন।

এখানকার পদার্থতত্ত্বাধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি একটি আবিষ্ক্রিয়া করিয়া প্রধান রাজমন্ত্রীর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র ইচ্ছানুসারে যান চালাইতে পারা যায়। ঐ কার্য্য অগ্নিতেজেও নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং তাড়িত প্রবাহেও সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এখনও কোন বিশেষ পরীক্ষা বিধান দ্বারা তাহার সম্যক্ কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয় নাই —না হইবার কারণ এই যে, রাজমন্ত্রী অপর একটি সুবৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে পরীক্ষাবিধান করিতেছেন। প্রসঙ্গাধীন এই স্থলেই তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কাঞ্চীপুর নিবাসী পশুপতি নামক একজন মহামহোপাধ্যায় এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে এমনি মারাত্মক বাষ্প নির্গত হয় যে, উহা আঘ্রাত হইবামাত্র প্রাণ বিনাশ করে। ঐ বাষ্পের এরূপ ভয়ানক তেজঃ যে কাচের গাত্রে লাগিলে অমনি কাচ গলিয়া যায়।

মন্ত্রিবর এক্ষণে ঐ অস্ত্রের গুণ পরীক্ষা করিতেছেন। অস্ত্রের যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে বোধ হয়, উহার প্রভাবে পৃথিবী হইতে সংগ্রাম কার্য্য একেবারেই উঠিয়া যাইবে। আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে অস্ত্রের নাম "পাশুপত অস্ত্র" রাখা হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিষয়ক

ভারতবর্ষের বাণিজ্য চিরকালই অতি বিস্তৃত। পুরাবিদ্ ডাইওনিসিয়স্ বলিয়া গিয়াছেন, "ভারতবর্ষের পরম সুন্দর ও সুখসেব্য শিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের লোভে পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকেই ভারতরাজ্যে বাণিজ্য করিতে ধাবমান হয়। এরূপ হওয়াতে সকল দেশের ধনরত্নই ঐ দেশে যাইয়া পড়ে এবং ভারতরাজ্য

প্রকৃত রত্নাকর হইয়া উঠিয়াছে।" এক্ষণে আবার ঐ ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিন্ধুমুখ হইতে কর্ণফুলির মুখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে সুবিস্তৃত সমুদ্রোপকূল, তাহার সর্ব্বস্থল বণিক্-পোতে সমাকীর্ণ। বণিক্‌পোতের মধ্যে দশ আনা দেশীয় মহাজন-দিগের, ছয় আনা মাত্র বিদেশীয়দিগের। কত টাকার আমদানি রপ্তানি হইতেছে তাহা এই বলিলেই বোধ হইবে যে, চীনীয়েরা এখান হইতে শুদ্ধ আফিম লইতেছে না, চা এবং রেশমও লইয়া যাইতেছে। ইংরাজেরা এখান হইতে চীনে, ইজরি প্রভৃতি মোটা এবং ঢাকা-প্রস্তুত সরু কাপড় সকল লইয়া যাইতেছে; ফরাসীরা লক্ষ্ণৌয়ের ছিট মহা যত্ন করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেছে; অন্যান্য দ্রব্য যে কি পরিমাণে কত যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার একটি গোলযোগের উপক্রম হইয়াছিল। তাহার উল্লেখ করিলে সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিকী ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা কতক উপলব্ধ হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ইংলণ্ড দেশে একবার সূত্র প্রস্তুত করিবার এবং বস্ত্র বয়ন করিবার কলের উৎকর্ষ সাধন হইয়া গেলে, এক বৎসর ইংরাজ বণিকেরা কয়েকখানি জাহাজ বোঝাই করিয়া কার্পাস-সূত্র এবং কাপড় পাঠাইয়া ছিল। ঐ সূত্র এবং বস্ত্র এখানে সস্তাদরে বিক্রীত হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটিলে এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় সম্রাটের নিকট এই বলিয়া আবেদন করে যে, বর্ষ কয়েকের নিমিত্ত ইংরাজী সূতা এবং কাপড়ের উপর অধিক পরিমাণে শুল্ক গৃহীত হউক, নচেৎ আমাদের ব্যবসায় মারা যায়। সম্রাট্ আজ্ঞা দিলেন যে, তিন বৎসর মাত্র শুল্ক গৃহীত হইবে। ইংরাজেরা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল, এবং স্বাধীন বাণিজ্য প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা বিচার করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকট আপনাদিগের রাজদূত পাঠাইল।

বিচারে এই অবধারিত হইল যে, বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়মসকল সমস্ত পৃথিবীকে একটি মহাসাম্রাজ্যরূপে জ্ঞান করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব যতদিন পৃথিবীতে রাজ্যভেদ থাকিবে, ততদিন সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, ইতিহাস পর্য্যালোচনার দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইল যে, যখন যে জাতির শিল্পদ্রব্য উৎকৃষ্ট এবং সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হয়, তখনই সেই জাতি স্বার্থসিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শিল্পজাতের স্বাধীন বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অতএব স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়মটি এমন নিয়ম নয় যে, দেশকালাদির অপ্রভেদে প্রচলিত থাকিতে পারে।

যাহা হউক ইংরাজী সূত্র বস্ত্রাদির উপর প্রথম বর্ষে যে শুল্ক নিরূপিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বর্ষে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র রহিল, এবং তৃতীয় বর্ষে এখানকার তন্তুবায়

সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুবোধ করিল। তখন শুল্ক উঠিয়া গেলেও আর ইংরাজী সূত্রবস্ত্রাদি আমদানি হইতে পারিল না। তন্তুবায়েরা কল বসাইয়া এত সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতেছে যে, ইংরাজী বস্ত্র তাহা অপেক্ষা অধিক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না।

ফলতঃ সাম্রাজ্যের বাণিজিকী ব্যবস্থা এই মূল নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। শিল্পপ্রসূত যে সকল দ্রব্য এদেশে জন্মিতে পারে, তাহা ভিন্নরাজ্য হইতে আসিলেই প্রথম দুই এক বর্ষ তাহার উপর শুল্ক নিরূপিত হয়; অনন্তর ঐ দ্রব্য এখানে সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হইলেই অমনি শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্য স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। মার্কিনেরা ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া কোন কোন স্থলে আপনাদিগের শিল্পজাত সম্বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারিয়াছে।

বাণিজ্যের স্থূল নিয়ম এই। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন ভারতসম্রাট্ বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে তেমন ব্যগ্র নহেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী একদিন সবিশেষ চিন্তাকুলিত হইয়াই বলিয়াছিলেন যে, যন্ত্রাদি যোগে শিল্প-কার্য্যের বাহুল্য সাধন করায় যেমন উপকার হয়, তেমনি অপকারও হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক আঢ্য হইয়া উঠে, কিন্তু অপর সকলে অন্নাভাবে হাহাকার করিতে থাকে। অতএব শিল্পকার্য্যের আধিক্য এবং উৎকর্ষ সাধন যেমন এক পক্ষে উপকারক, তেমনি পক্ষান্তরে প্রজাব্যূহের মধ্যে অর্থ-সম্বন্ধীয় বিজাতীয় বৈসাদৃশ্য জন্মাইয়া দিয়া অপকারক হয়। এদেশে যদিও বংশমর্য্যাদানুযায়ী বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকাতে এবং অত্যুদার আর্য্যশাস্ত্রের বিধিপালনে অভ্যাস বশতঃ জনগণ নিতান্ত পরদুঃখে কাতর হওয়াতে ঐ দোষ সম্যক্ অনিষ্ট সাধন করিতে পায় না, তথাপি অর্থ সম্বন্ধীয় তাদৃশ বৈসাদৃশ্য অনেক ভাবী অনিষ্টের হেতু হইতে পারে। মন্ত্রিবর এ কথাও বলেন যে, উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে ঐ দোষের নিবারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যেখানে-সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া পরজাতির লোকের প্রতি অত্যাচার করাও ত বিধেয় নহে।

যাহা হউক, মন্ত্রিবরের পরামর্শানুসারে সম্প্রতি এই ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা পরদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া সেই সেই দেশে কদাপি ভূম্যধিকার গ্রহণের চেষ্টা করিবে না। যে যে দেশে ধনস্পৃহা বশতঃ বাণিজ্য করিতে যাইবে, সেই দেশের ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিবে,—আর যে দ্বীপাদিতে মনুষ্যের বাস নাই অথবা নিতান্ত অল্প মনুষ্যের বাস সেই সেই দ্বীপ ভিন্ন অপর কোন স্থানে

উপনিবেশ সংস্থাপন করিবে না। যদি উপনিবেশিত দ্বীপাদিতে ভিন্নজাতীয় লোক থাকে, তবে তাহাদিগকে সংস্কারপূত করা এবং তাহাদিগের সহিত অনুলোম ক্রমে বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া দেশটিকে সর্ব্বতোভাবে ভারতভূমির অনুরূপ করাই ঔপনিবেশিকদিগের পক্ষে বিধেয়। এখনও ভারতীয় উপনিবেশ অধিক নাই। আন্দামান, নিকোবর এবং মল্ল দ্বীপ পুঞ্জ উপনিবেশিত হইয়া গিয়াছে। সুমাত্রা, যব, বালি এবং সুখতর দ্বীপেও উপনিবেশের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে।

ঔপনিবেশিকদিগের সম্রাটের নিকট কর দিতে হয় না, কিন্তু তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যে কয়েকখানি রণপোত থাকে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়।

ভারতবর্ষীয় ঔপনিবেশিকেরা চিরকাল ভারতভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া জানিবে। পশুশাবকের ন্যায় স্তন্য ত্যাগ করিলেই প্রসূতিকে বিস্মৃত হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

আতিথ্য উৎসবাদি বিষয়ক

ভারতবর্ষীয় জনগণ যে দুইটি প্রধান উপাদানের সমবায়ে সংঘটিত, সে উভয়েরই প্রকৃতিতে দানধর্ম্ম প্রবল ছিল। ঐ উপাদানদ্বয় সম্মিলিত হওয়াতে ঐ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাচুর্য্যই জন্মিয়াছে। গৃহী মাত্রেই বিশিষ্ট সমাদরপূর্ব্বক আতিথ্য করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রতি গ্রামের দেবালয়ে একটি গ্রামিক অতিথিশালা আছে। তাহার কার্য্যভার গ্রাম্য যাজক এবং নাপিতের প্রতি অর্পিত। উহার ব্যয় গ্রামিকদিগের সাধারণ চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

ভূম্যধিকারীরা, নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে যত পান্থাবাস আছে, সমুদায়ের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন, এবং আপনাপন আলয়ে সদাব্রত দেন।

কেহ ইচ্ছা করিলে এক কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় না করিয়াও যাবজ্জীবন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। কাহারও আলাপ পরিচয় নাই বলিয়া কোথাও আহার পরিধেয়ের বা শয়নের ব্যাঘাত হইবে, তাহা হয় না।

দেশীয় জনসমূহের প্রকৃতি এরূপ উদার এবং বিশ্বস্ত হওয়াতে সমাজ মধ্যে যে দোষটি জন্মিবার সম্ভাবনা, রাজ্যব্যবস্থা দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। অনেক লোকেই কার্য্যবিরত হইয়া অপরের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছিল, তজ্জন্য

এক্ষণে এই রাজনিয়ম হইয়াছে—(১ম) বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে না পারিলে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফকিরী লইতে পারিবে না। (২য়) অবশ্যপোষ্য কেহ বিদ্যমান থাকিতে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। (৩য়) কোন ব্যক্তি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে এক স্থানের সদাব্রতে তিন দিনের অধিক অবস্থান করিতে পারিবে না। প্রদেশাধিকারিগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে এইরূপ নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগেরই কয়েকজন প্রথমে প্রস্তাব করিয়া ঐ সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামিকেরা এবং কোন কোন ভূম্যধিকারীও মনে মনে এই সকল ব্যবস্থার প্রতি তেমন অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক ভিক্ষোপজীবিতার যে কতক দমন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করাইবার সময় ব্যবস্থাপক সভায় একজন রাজমন্ত্রী যে বক্তৃতা করেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "প্রকৃতরূপে দানধর্ম্ম পালন বড় কঠিন কর্ম্ম। দান যেমন দাতার পক্ষে পুণ্যবর্দ্ধক, তেমনি গ্রহীতার পক্ষে পাপজনক। তুমি দান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে, আমি তোমার দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানি প্রাপ্ত হইলাম। অতএব একবারে উভয় দিক হইতে দেখিলে দানের দ্বারা যে দেশমধ্যে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইল, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দানের অধিকও ত ধর্ম্ম নাই—সুতরাং উহার পালন না হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধির পথই লুপ্ত হয়। অতএব এমত কোন উপায় করা আবশ্যক, যাহাতে দানগ্রহীতার আত্মগ্লানি জন্মিতে না পারে। তাহা হইলেই দাতার ধর্ম্মবৃদ্ধি হইল, অথচ গ্রহীতার গ্লানি হইল না। সে উপায় কি? সে উপায় এই---দেশের মধ্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বাস্তবিক অন্যের উপকারার্থে আপনাদিগের সাংসারিক সুখচিন্তা পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারাই দানের সর্ব্ব প্রধান পাত্র। যাহাকে তাহাকে দান না করিয়া ঐ সকল লোককেই দান করা বিধেয়। উঁহারা উচ্চপদস্থ ও যেরূপ উন্নতকার্য্যে চিরব্রতী, তাহাতে অন্যের স্থানে দান গ্রহণ করা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে গ্লানিজনক হইতে পারিবে না। তাঁহারা যে দান গ্রহণ করিবেন, তাহা দাতার কৃতজ্ঞতা সূচক বলিয়াই মনে করিবেন; আপনাদিগের অধীনতা ব্যঞ্জক মনে করবেন না। অতএব দানধর্ম্ম পালনের প্রকৃত স্থল দেশের শিক্ষাদাতা ব্রাহ্মণগণ। অন্ধ, অথর্ব্ব, অক্ষম লোকেরা যে দয়ার একান্ত পাত্র, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ উহারা অবশ্যপোষ্যের মধ্যেই গণ্য। সুতরাং তাহারা

অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণ করিলে কখনই আত্মগ্লানির ভাজন হয় না। অতএব দান-ধর্ম্ম পালনের মূল নিয়ম এই—'যাহারা অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণে নীচতানুভব করিতে না পারে, তাহারাই দানের পাত্র, অপরে দানের পাত্র নহে।' যিনি এই মূল সূত্র স্মরণ পূর্ব্বক আত্ম-সংযম সহকারে দান করিতে না পারেন, তাঁহার দান ক্রীড়ার ন্যায় সুখজনক হইতে পারে, কখনই ধর্ম্মবর্দ্ধক হইতে পারে না।"

মন্ত্রি-মহাশয়ের মূল নিয়ম ভারতবর্ষীয়দিগের সরল উদার এবং বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয়ে কি পরিমাণে স্থান গ্রহণ করিবে, কতদূরই বা কার্য্যকালে স্মৃতিপথে আসিবে, তাহা বলা যায় না।

ভারতবর্ষবাসীদিগের এই অসীম দানশীলতাই তাঁহাদিগের উৎসবোপলক্ষে ব্যয়-বাহুল্যের মুখ্য কারণ। তাঁহারা কিছু স্বভাবতঃ তেমন আমোদপ্রিয় নহেন। প্রত্যুত আমোদপ্রিয়তা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পরিণামদর্শিতা এবং মিতাচারিতা পরিমাণে অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও উৎসব উপলক্ষে অজস্র দান করিবার সুবিধা হয় বলিয়া ভারতবর্ষীয়েরা একান্তই উৎসবভক্ত। হিন্দুদিগের এবং মুসলমানদিগের যতগুলি পূর্ব্ব উৎসব ছিল, সকলগুলিই এখনও জাগ্রৎ আছে, তদ্ভিন্ন অপর কএকটি নূতন উৎসব দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য সংস্থাপনের দিন এবং সম্রাটের জন্মদিন, এই দুইটি দিন নূতন পর্ব্বাহ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আবিষ্কর্ত্তাদিগের নামে, তাঁহারা যে যে প্রদেশে জন্মিয়াছিলেন, সেই সেই প্রদেশে, এক একটি মেলা হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও ঐরূপ মেলা এবং প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান পর্ব্ব একদিবসে পড়িয়া তিনটিতে মিলিয়া একটি অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামনবমী, মহরম ও বাল্মীকি পর্ব্ব ঐরূপে একত্রিত হইয়া গিয়াছে। অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যে রাবণ সেই এজিদ্‌, যে হোসেন সেই লক্ষ্মণ, যে হনুমান সেই জেব্রিল, রামচন্দ্রে এবং পাইগম্বরে অভেদ। কেমন করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু যখন প্রাচীন আর্য্যজাতীয়দিগের মদনোৎসব, রোমীয় দিগের কার্ণিবল্‌, এবং টিউটন্‌-জাতীয়-দিগের মেপোল নিত্য সম্মিলিত হইয়া নব্য ইটালীয়দিগের কার্ণিবল জন্মিতে পারিয়াছে, তখন একদেশনিবাসী হিন্দু মুসলমানদিগের পর্ব্ব যে সম্মিলিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? ইটালীদেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এখানকার একটি উৎসব উপলক্ষে তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুকে যেরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"আজি সরস্বতী পূজা—প্রতিগ্রামে প্রতিগৃহে সরস্বতী দেবী-প্রতিমা অর্চ্চিত হইতেছে। মনে করিও না যে, ভারতবর্ষীয়গণ ঐ মৃন্ময়ী প্রতিমাতেই ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া তাহার পূজা করে। প্রতিমার যেরূপ রূপ তাহা বিবেচনা করিলেই বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, সরস্বতী দেবী মূর্ত্তিমতী বিদ্যা বই আর কিছুই নহে। মুর্খেরা এবং নাস্তিকেরাই ওরূপ অর্চ্চনাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া গালি দেয় কিন্তু ঐ সকল লোক আমাদিগকেও ত পোতুলিক বলিয়া থাকে। অতএব উহাদিগের কথায় প্রয়োজন নাই।

"সরস্বতী বিশুদ্ধা, অতএব শুভ্রবর্ণা, সরস্বতী হৃৎপদ্মে বিরাজ করেন, অতএব পদ্মাসনা,—সরস্বতী একান্ত কমনীয়া, অতএব কামিনীরূপা, সরস্বতী গ্রন্থ এবং সংগীতময়ী, অতএব পুস্তকহস্তা এবং বীণাপাণি। আমি যখন ঐ দেবীমূর্ত্তির প্রতি অনিমিষ নয়নে দৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত সাদৃশ্য উপলব্ধ করিতেছিলাম, চতুর্দ্দিকে ধূপ, ধুনা ও গন্ধরসের ধূম উত্থিত হইয়া দৃষ্টি অস্ফুট এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ করিতেছিল। বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত সংগীতরবে কর্ণকুহর অমৃতায়মান হইতেছিল, তখন সেণ্ট পীটরের গির্জ্জার মধ্যে গমন করিলে যে ভাব হয়, অবিকল সেই ভাব মনোমধ্যে উদিত হইল। তথায় ভগবতী মেরি মূর্ত্তি—এখানে সরস্বতী মূর্ত্তি, সেখানেও সুগন্ধি ধূমোদ্গম সহ সুমধুর বাদন, এখানেও তাই; সেখানেও চিরকুমারীগণের সংগীত, এখানেও রূপলাবণ্যবতী কামিনীকুলের কলস্বর; সেখানেও লাটিন ভাষায় সুগভীর স্বরে সমুচ্চারিত ভজনার আবৃত্তি, এখানেও সংস্কৃত ভাষায় সুললিত স্তুতিপাঠ। ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমাদিগের উৎসবপ্রকৃতির সর্ব্বথা সাদৃশ্য আছে। যখন ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া এমন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন কি ইটালীর ভাগ্যবৃক্ষেও কোন কালে ঐ অমৃত ফল ফলিবে না! আমার জানা আছে, কেহ কেহ বলেন যে, কাথলিক মতবাদ এবং তদনুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ না করিলে ইটালীয়েরা কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্যক্ সাদৃশ্য সত্ত্বেও ত ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পদারূঢ় হইয়াছে। অতএব যাঁহারা স্বাধীনতা প্রাপ্তি পক্ষে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের প্রয়োজন প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের কথা একান্ত হেয়, কিন্তু এ পত্রে তোমার নিকট বিচারের কথা লিখিয়া পাঠাইব মনে ছিল না। অনুচিকীর্ষা-পরায়ণ মূর্খদিগের আস্ফালন-বাক্যে নিতান্ত প্রাণ জ্বলে বলিয়া আমার সময় অসময় বোধ থাকে না, সর্ব্বদা ঐ কথাই বাহির হইয়া পড়ে।

"সরস্বতী দেবীর পূজা এবং স্তব পাঠ সমাপন হইলে সকলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

করিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ব বিষয়েই বয়োধিকদিগের সম্মান রক্ষা করে। পুষ্পাঞ্জলি দানেও দেখিলাম, আগে বড়, তার পরে ছোট এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে একে একে আসিয়া সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিল। যে কুলবধূগণ সম্মিলিত হইয়া সুমধুর স্বরে দেবীর স্তবপাঠ করিয়াছিল, তাহাদিগেরও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইল। অনন্তর অতি সুন্দর বেশ ধারণ পূর্ব্বক কতকগুলি বালক এবং বালিকা আসিয়া দেবীর সমক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইল, এবং মৃদু মধুর স্বরে কএকটি গান গাইল। শুনিলাম ঐ গানগুলি ঐ সময়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল।

"এই রীতিটি আমাকে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা ছেলেবেলা অবধি যেমন ভক্তির শিক্ষা দেয়, আমরা কি অন্য ইউরোপীয়েরা তাহার শতাংশও দিই না। এই জন্যই ইউরোপের লোক সকল এত উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বার্থপর হইয়াছে।

"আবার বিচার আসিয়া পড়িল। কি করি, নিজের দেশটি এমন হয় না কেন? এই ভাবটি মনোমধ্যে চিরজাগরূক হইয়া উঠিয়াছে, আর নিবৃত্ত করিবার নহে।

"পরদিন প্রতিমার বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জন? তবে আর কে কোন্ মুখে বলিবে যে, ভারতবর্ষীয়েরা মৃন্ময় দেবমূর্ত্তিকেই ঈশ্বর মনে করে? তাহা করিলে কি বিসর্জ্জন করা সঙ্গত হইত? কিন্তু অমন সুন্দর মূর্ত্তির কিরূপে বিসর্জ্জন করিবে? তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উহা মাটীর, পাথরের নয়। পাথরের হইলে আমাদের মাইকেল এঞ্জিলোর ভাস্করীয় মূর্ত্তির সহিত তুলিত হইতে পারিত, প্রতিমাটির এমনি দিব্য গঠন।

"কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যই পৃথিবীতে তুলনারহিত। উহারা যেমন অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও দরিদ্র হয় না, তেমনি এমন সকল প্রতিমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াও শিল্প-নৈপুণ্যের অভাব হইবে মনে করে না। যাহাদিগের অধিক থাকে তাহারা অধিক ব্যয় করিতে পারে। ভারতবর্ষীয়দিগের সকলই অধিক। ধনও যেমন, বিদ্যাও তেমন, শিল্পচাতুর্য্যও সেইরূপ। উহারা সকলই ফেলিয়া-ছড়িয়া খরচ করিতে পারে। আমাদিগের মত কিছুই পুতু পুতু করিয়া তুলিয়া রাখে না।

"আর একটি কথা বাকী আছে। সরস্বতী দেবীর পরিধেয় একখানি শাটী মাত্র। পূর্ব্বে এদেশের স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ পরিধান মাত্র ব্যবহার করিত। এখনও যতক্ষণ বাটীর ভিতরে থাকে, শাটীই পরে। শাটি পরিলে এদেশে স্ত্রীলোকদিগকে মন্দ দেখায় না। কিন্তু এখন ইহারা বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব

পরিধানেরও পরিবর্ত্ত করিয়াছে। ঢিলে পা-জামা এবং কাঁচুলি পরিয়া তাহার উপর একটি সুদীর্ঘ অঙ্গরক্ষিণী দেয়, এবং সর্ব্বোপরি মাথার উপর বেড় দিয়া ধারণ করে।

"পুরুষেরা পূর্ব্বে কেবল মাত্র ধুতি পরিত। বাটীর মধ্যে এখনও তাহাই পরে। কিন্তু বাহিরে ইজের চাপকান গলাবন্ধ এবং উষ্ণীষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

"এদেশে গ্রীষ্ম প্রধান, এখানে অধিক কাপড় অথবা নিতান্ত মোটা কাপড় সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইলে বড় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের পরিচ্ছদ তাহাদিগের দেশের যোগ্য এবং আকারের যথাযোগ্যই হইয়াছে।"

দশম পরিচ্ছেদ

আভ্যন্তরিক অবস্থা

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ তাহা বলিবার নিমিত্ত কএকটি প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ঐ পর্য্যটকেরা এই মহাদেশের নানা ভাগে পরিভ্রমণ করিয়া যাঁহার চক্ষে যাহা কিছু বিশেষ রূপে লাগিয়াছে, তাহাই সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত হইবে। একজন রুশীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন।—

"ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামই যেন একটি প্রজাতন্ত্র স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্য্য গ্রামের লোকেরাই স্বয়ং নির্ব্বাহ করে। রাজা অথবা রাজ-প্রতিনিধি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। প্রতি গ্রামেই এক একটি দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীদিগের সভা হয়। গ্রামের প্রতিপল্লী হইতে ঐ সভায় এক একজন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, পরে বিচার্য্য বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যাহা অবধারিত হয়, সকলে তদনুযায়ীই কার্য্য করে। আমাদিগের রুশিয়াতেও ঐ প্রণালী প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে কতকগুলি করিয়া লোক দাস্যে নিযুক্ত থাকে। ভারতবর্ষে সেরূপ নাই। আর একটি প্রভেদ এই—রুশিয়ার গ্রামসকলের ভূমিতে প্রজাগণের সাধারণ স্বত্ব আছে, এখানে সেরূপ সাধারণ স্বত্ব নাই। এখানে গ্রামের প্রতি

ভূমিখণ্ডে গ্রামিক বিশেষের অসাধারণ স্বত্ব আছে। কিন্তু রাজস্বদান প্রতি ভূমিখণ্ডের জন্য পৃথক না হইয়া সাধারণতঃ গ্রামের জন্যই একবারে হইয়া থাকে। এক কালে গ্রীকদিগের মধ্যে যেমন এথিনীয়েরা প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ অসাধারণ স্বত্বাধিকার বুঝিয়াছিল ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যেও এক্ষণে সেইরূপ স্বত্বাধিকার প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে স্পার্টার লোকেরা সেরূপ স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুশীয়েরাও সেইরূপ আছেন। রুশিয়ার গ্রামিকদিগের অধিকার স্পার্টার ন্যায়, ভারতবর্ষে এথিনীয়দিগের ন্যায়, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ স্বত্বের চিহ্ন এখানেও বিদ্যমান আছে। গ্রামরক্ষক, নাপিত, গ্রাম্য যাজক এবং গুরু মহাশয়—এই কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক ভূমির সাধারণ স্বত্বের এক এক অংশের অধিকারী। এদেশে ঐ সকল ভূমির নাম চাকরাণ, দেবোত্তর এবং মহোত্তর ইত্যাদি।

"প্রতি গ্রামে যেমন এক একটি দেবালয় আছে, তেমনি এক একটি ব্যায়াম শিক্ষার স্থান এবং বিদ্যালয়ও আছে। ছেলে পাঁচ বৎসরের হইলেই বিদ্যালয়ে যায়, এবং ৮ বৎসরের হইলেই ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করে। ওরূপ করিতে হইবে বলিয়া যে কোন রাজনিয়ম আছে এমত নহে, কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ।... সেখানকার লোকসকল স্বতঃই সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আইনের বলের অপেক্ষা করে না।"

একজন জর্ম্মন পর্য্যটক লিখিয়াছেন, "আমি এদেশে (ভারতবর্ষে) আসিয়া একটি প্রধান তথ্য শিখিলাম। ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র দেখিয়া এবং ইউরোপীয় ইতিবৃত্তের পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে, মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থপরতা বৃত্তিই অধিকতর প্রবল। কিন্তু দেশের জল-বাতাসের গুণেই হউক, আর মিতাহার গুণেই হউক, আর পুরুষানুক্রমিক সুশিক্ষার প্রভাবেই হউক, ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা তেমন প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। আমরা নিজস্ব রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকি, নিরন্তর স্বত্বাধিকার লইয়াই বিবাদ করি, যাহা আপনার বলিয়া বোধ করিয়াছি, তাহা কোন মতেই ছাড়িয়া দিতে পারি না—কিন্তু এদেশীয়দিগের প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহাদিগের মধ্যে আত্মপরবোধ অল্প—ঔদার্য্য-গুণ অধিক।

"তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, এখানকার ভূম্যধিকারিগণ কদাপি স্ব স্ব অধীন গ্রামিকগণের স্বত্ব লোপ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন না—পক্ষান্তরে গ্রামিকেরাও ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি চিরসন্দিগ্ধচিত্তের ন্যায়

ব্যবহার করে না। ইউরোপখণ্ডে ঐ ব্যাপার লইয়া কত তুমুল বিবাদ হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মনির মধ্যে সেই বিবাদ অদ্যাপি চলিতেছে। ভারতবর্ষে তাহার নামগন্ধও নাই। এখানকার ভূম্যধিকারিগণের প্রধান কার্য্য (১ম) গ্রামিকদিগের স্থানে রাজস্ব আদায় করা, (২য়) গ্রামিকেরা শান্তিভঙ্গাদি দোষের কিরূপ বিচার করে, তাহার তত্ত্বাবধান করা, (৩য়) আপনাপন অধিকারের মধ্যে রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, বিপণি এবং দেবালয়াদির রক্ষণ এবং নূতন নির্ম্মাণ করা, (৪র্থ) আপনাপন আবাসস্থানে অথবা তাদৃশ সমৃদ্ধ নগরে একটি চতুষ্পাঠী সংস্থাপন, তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং উৎকর্ষ সাধন করা।

"সম্প্রতি ভূম্যধিকারিগণ আর একটি কার্য্যের সূত্রপাত করিতেছেন। তাঁহারা অনেকে মিলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, ২০ বর্ষ হইতে ৪০শ বর্ষ বয়স্ক যাবতীয় গ্রামবাসী প্রজাকে মাসের চারি দিন সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রণীত হয়। যদিও ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছাতঃ সকলেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সম্রাট্ এই অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাহাতে অনেকেই তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দিগের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্ত যে কিরূপ হইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত এই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদর বড়ই আঁটাআঁটি ছিল। এক্ষণে তাহা অনেক কম হইয়াছে।

"সেদিন একজন ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারীর গৃহে অতিথি হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে আমার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ব্যবহার এরূপ ছিল না, এক্ষণে এরূপ হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটি প্রাকৃতিক মূল আছে; উহা নিতান্ত কৃত্রিম বস্তু নহে, এইজন্য উহা অদ্যাপি চলিতেছে আরও কিছুকাল চলিবে। তদ্ভিন্ন তখন আমাদিগের যে দশা, তাহাতে জাতিভেদের বিশেষ আঁটাআঁটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন ছিল না, ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। সাহিত্যশাস্ত্রেরও উন্নতি হয় নাই। আমাদিগের জাতিত্বই বিনাশ-দশায় পতিত হইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে যদি বিশেষ যত্ন করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন সামাজিক প্রণালী সমুদায় রক্ষা না করিতাম, তবে এতদিন আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম, এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন—ধর্ম্ম সজীব—সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া জাতিত্ব রক্ষা করিতেছে এখন আর কেহ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, প্রত্যুত আমরাই অন্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি।

আমরা পূর্ব্বে যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, এখন আমাদিগের আর সে ভয় নাই।' ঐ ব্যক্তি কিছুকাল পারীস নগরে গিয়া বাস করিয়া আসিয়াছেন। ইহার শিক্ষা বারাণসীর চতুষ্পাঠীতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই এই প্রকৃতির লোক।"

একজন ইংলণ্ডীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন—

"এখন সকলেই এদেশে ভ্রমণ করিতে আইসে, কিন্তু এখানে যে এমন কি অপূর্ব্ব পদার্থই দেখিতে পায় বলিতে পারি না। সত্য বটে, এখানকার নগরগুলি যেমন সমৃদ্ধিশালী তেমন আর কুত্রাপি নাই। পারীস, রোম, মেড্রিড, বার্লিন, প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর নগরগুলি এখানকার লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লাহোর প্রভৃতির তুল্য নয় বটে, আলহাম্ব্রা, কোলিসিয়ম, পার্থিনন্, থীব্‌স এবং পালমাইরার প্রধ্বস্তাবশেষ এখানকার ফতেপুর সিক্রি, ইলাবরা, হস্তীদ্বীপ এবং মহাবলিপুরের নিকট লজ্জা পায় বটে, পারীস লিডেন, গটিঙ্গেন প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয় এখানকার কনোজ, কাশী, মথুরা প্রভৃতির চতুষ্পাঠীর সহিত তুলনায় প্রাথমিক পাঠশালার ন্যায় বোধ হয় বটে, কিন্তু এসকল হইলে কি হয়? এখানকার লোকেরা স্বাধীন নহে। ইঁহাদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী। ইঁহাদিগের মধ্যে আমাদিগের মত পার্লিয়ামেণ্ট সভা নাই। বিশেষতঃ এখানকার খাদ্যসামগ্রী কিছুই ভাল নয়। ভারতবর্ষীয় খাদ্য ফলের মধ্যে একমাত্র নিচুই আমাদিগের স্বদেশীয় ফলের আস্বাদ ধারণ করে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা নিতান্তই সৌন্দর্য্যবিহীনা। উহাদিগের বর্ণ ধবল নহে, চুল রাঙ্গা কিম্বা কটা নহে, ললাট ফলক উচ্চ নহে। আর যদিও ইহারা একান্ত পতিপরায়ণা তথাপি সততই লজ্জাশীলা এবং বিনয়াবনতমুখী। ইহাদিগের এখনও প্রকৃত স্বাধীন ভাব জন্মে নাই। এখানকার বিধবারা প্রায়ই বিবাহ করে না। কোথাও কোথাও দুই একজন স্বামীর অনুমৃতাও হয়।

"পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহিরে যাইতে দিত না। এক্ষণে তাহা অল্প পরিমাণে দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অতএব বড় বড় ঘরওয়ানা অনেক স্ত্রীলোককে আমি দেখিতে পাইয়াছি। সে দিন একজন প্রদেশাধিকারীর ভবনে একটি নাট্যাভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। ঐ প্রদেশাধিকারীর পিতা মুসলমান ছিলেন—ইনি কি হইয়াছেন জানিতে পারি নাই। মুসলমানেরা কখনই স্ত্রীলোকদিগকে ঘরের বাহিরে আনিত না। ইনি সস্ত্রীক হইয়া সভাস্থলে বসিয়াছিলেন। আরও অনেকে সপরিবার সভাস্থলে আসিয়াছিলেন।

এইরূপ পরিবর্ত্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একজন আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দেখুন স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই পুরুষদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বলা অতএব পুরুষ কর্ত্তৃক অবশ্যই পরিরক্ষণীয়া হইবেন। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দেশের পুরুষেরাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে, তবে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আর কিরূপে রক্ষা করিবে; অতএব স্ত্রী-নিরোধটি শুদ্ধ পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা মোচন হইলেই স্ত্রী-নিরোধও রহিত হইয়া যায়। হিন্দুরাও পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে গৃহপিঞ্জরনিরুদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। মুসলমানদিগের অধীন হইয়া পড়িলে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে বদ্ধ করেন। মুসলমানেরাও চিরকাল যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন, এবং বিশেষতঃ বহুবিবাহ-পরায়ণ, এই জন্য তাঁহারাও স্ত্রী-নিরোধে বাধ্য ছিলেন। এখন ভারতবর্ষীয়েরা পরাধীন নহেন। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বের ন্যায় নিরোধও নাই। যতদিন কোন দেশের শান্তিরক্ষা এবং ধর্ম্মাধিকরণের ভার কি বিজাতীয় কি যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগের হস্তে থাকে, ততদিন সে দেশে স্ত্রীলোকদিগের সভারোহণ অথবা যথেচ্ছ বহির্গমন প্রচলিত হইতে পারে না। উল্লিখিত যুক্তি কতদূর যথার্থ, তাহার বিচার করিয়া কি ফল? পূর্ব্বে ইহারা বহু বিবাহ করিত, বোধ হয়, এখনও কতক করে, তবে অনেক কম হইয়া থাকিবে। এ বিষয়ে কোন রাজব্যবস্থা নাই।"

একজন মার্কিন মিসনরী তাঁহার কোন বন্ধুকে ভারতবর্ষ হইতে যে পত্র লিখেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে নিতান্ত হতাশ হইতে হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় আমরা নিতান্ত অবিজ্ঞ, অপবিত্র এবং অকর্ম্মণ্য লোক। ইহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। সুতরাং উহাদিগের ধর্ম্মের কোন ভাগ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গেলেই উহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাদৃশ অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দেয়, এবং এই কথা বলে, যদি ভক্তি মূল করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্রের অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করা যায়, তবে আমাদিগের শাস্ত্রের আপাততঃ প্রতীয়মান অযৌক্তিকতা কিজন্য ভক্তি মূলে বিশ্বসিত না হইবে? এরূপ বিচারে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। বিচারে ত এইরূপ! কার্য্যে ইহাদিগের যত্ন, অধ্যবসায় এবং স্বার্থশূন্যতা জেসুটদিগের অপেক্ষাও অনেক অধিক। ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে যে সকল অসভ্য বন্যজাতীয় লোক থাকে; ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে

শান্ত, ত্যাগী এবং নম্রস্বভাব করিয়া তুলিতেছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। ভারতসাম্রাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তসীমায় আসাম নামে একটি প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অপর কতকগুলি বন্য জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদিগের নাম মিকি, আরব, গারো, নাগা, মিস্‌মি প্রভৃতি। আমি ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি, ঐ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আছেন, এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রীতিভাজন হইতেছেন। আমি তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ঋষির কুটীরে অতিথি হইয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে বিশেষ বর্ণনীয় ব্যাপার এই।—তিনি আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বন্যদিগের গ্রাম মধ্যে গমন করেন, এবং উহাদিগের ক্ষেত্রাদির কর্ষণ কিরূপ হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়া যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন। অনন্তর যদি কাহারও কোন পীড়া হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসা করেন—পরে স্থূল স্থূল কথায় পরস্পরের মুখাপেক্ষিতা এবং পরিণামদর্শিতার শিক্ষা দেন। কোন কোন বন্য ব্যক্তি প্রার্থনা করে, 'ঠাকুর, আমাদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উচ্চজাতীয় করুন।' এরূপ প্রার্থনা নিরন্তরই হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অমন সকল স্থলে জলসংস্কারাদি কোন বিধান দ্বারা কাহাকেও উচ্চজাতীয় করেন না। তিনি বলেন যে, নীচ এবং অপকৃষ্টধর্ম্মক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ মনে করিলেই উচ্চজাতীয় হইতে পারে না—তপস্যা করিতে হয়। এই বলিয়া বিশেষ বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। কাহাকেও বলেন, তুমি বৎসরাবধি এই এই দ্রব্য খাইও না—কাহাকেও বলেন, তুমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে তাহার সিকি বা অর্দ্ধেক অন্যকে দান করিবে; কাহাকেও বলেন, তুমি প্রত্যহ একজন অতিথির সেবা করিয়া তবে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিবে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ের দ্বারা ঐ সকল লোককে ইন্দ্রিয় সংযমন, লোভ সংবরণ, পরোক্ষদর্শন প্রভৃতি পুণ্য সম্পন্ন করা হয়। অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালনপূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে মন্ত্র দান করিয়া বলা হয়,—"এক্ষণে তোমার ম্লেচ্ছত্ব গেল। তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার গ্রাহ্য হইল, এবং তোমার প্রদত্ত সামগ্রীতেও দেবপূজা করা যাইতে পারে। এক্ষণ অবধি যদি ঐ মন্ত্রজপ সহকারে এক বৎসর এই এই নিয়ম পালন কর, তবে তোমাকে আরও উন্নত জাতির মধ্যে লওয়া যাইতে পারিবে।" ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে এইরূপ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতেও ঐ প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,

বন্যেরা সংস্কৃত হইয়া প্রথমে কোচ নাম প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পুনঃ সংস্কৃত হইলে তাহারা কলিতা নাম ধারণ করে, তৎপরে পুনর্ব্বার সংস্কার লাভ করিলে সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'প্রায়ই এক জন্মে পারে না, পরজন্মে পারে।' 'পর-জন্মে পারা আর না পারা তুল্য কথা, কাহার পরজন্ম কি হইল, তাহা ত কেহ জানিতে পারে না' এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'পুত্ররূপেই মনুষ্যের পরজন্ম হয়। অতি অন্ত্যজও ক্রমে ক্রমে সংস্কারপূত হইয়া সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর তাহার পুত্র তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্বেরও অধিকারী হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের সংস্কারপ্রণালী এইরূপ। আর একটি চমৎকারের বিষয় এই, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাতঃ এই দুরূহ ক্লেশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত। কোথাও কোথাও ভূম্যধিকারীরাও তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু অধিক স্থলে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই আপনাদিগের ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন।"

... ...

নিশান্ধকার অপগত, পূর্ব্বাকাশ দীপ্যমান। আমি আর মর্ত্ত্য ভূমিতে অবস্থিতি করিতে পারি না। কিন্তু পাঠকের ভ্রম নিবারণার্থ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া যাই। কালপুরুষ, সূর্য্য ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়াসখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সখীর কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সকল সময়ে পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হই।

আমার নাম আশা। উষা আমার ভগিনী, আমি উষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম।

সমাপ্ত

পুষ্পাঞ্জলি

উৎসর্গ

পরমপূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ পিতৃঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু

হে স্বর্গীয় পিতৃদেব !

তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু। আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অত্যুদার, সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন শাস্ত্রার্থ সকল শ্রবণ করিতাম, তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত হইত—যাবতীয় কূটার্থ উদ্ভিন্ন হইয়া রূপকমলার স্নিগ্ধ রশ্মিজাল প্রকাশ করিত—আপাত-বিরুদ্ধ মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহারপ্রণালী জন্মিত—এবং চিত্তক্ষেত্রের সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইত। ইহলোকে আর আমার ভাগ্যে সে সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা আর ভঞ্জন হয় না। এখন জগৎকার্য্যের কোন বিষয় বোধাতীত হইলে তাহা বোধাতীতই থাকিয়া যায়। এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিব এবং যাহা জানিব তাহা ঠিকই জানিব, এ প্রতীতিটি এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। এই যে পুস্তকখানি লিখিয়াছি ইহার কোন স্থানে কি ভ্রম আছে তাহা আর কে বলিয়া দিবে ? এবং আর কে বলিয়া দিলেই বা ভ্রম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিবে ?

কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি—ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য আছে। একবার যদি তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনাইয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।

তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর্ব্বাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু—অতএব কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কি পরম্পরাসম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার—তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।

প্রণত

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থের আভাস

প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটি আখ্যায়িকা বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই ইচ্ছা ছিল যে দেশীয় প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিব। কিন্তু ইংরাজী নবেলের উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান স্বতন্ত্ররূপ। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথেষ্ট বিস্তার থাকে ; অতিশয়োক্তি এবং রূপকালঙ্কারেরও আধিক্য হয়।

এক্ষণে দেখিতে পাই অনেকেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রতি বিরক্ত। কিন্তু ঐ অলঙ্কারটি অদ্ভুতরসের সহচর। অদ্ভুত, অতি পবিত্র রস। বিস্ময়, মনুষ্যমাত্রের স্বভাব এবং অবস্থার উপযোগী। সরলচেতার হৃদয়মুকুরে এই আশ্চর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ডের ছবি নিয়তই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব-স্বরূপ পুরাণ-শাস্ত্র এই জন্যই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে সমাকীর্ণ।

পুরাণশাস্ত্রে লিখিত নায়কনায়িকা এবং দেবাসুরগণ বহু স্থলেই রূপ-কালঙ্কারবিভূষিত। তাহারা বস্তুগত্যা আভ্যন্তরিক মনোভাব-স্বরূপ অথবা বাহ্য প্রকৃতির শক্তিবিশেষ। সুতরাং রক্তমাংসসম্ভূত প্রকৃত জীবশরীরের ন্যায় তাহারা দেশকালসম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পুরঞ্জনোপাখ্যান ভবাটবী প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অন্যান্য পুরাণের বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ সকল কথা কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা রূপক বর্ণনার সমগ্র প্রকৃতিই সম্যক্‌রূপে হৃদ্‌গত করিয়াছেন। এই পুস্তক যে তেমন নয়—তেমন হইতেই পারে না—সে কথা বলিবার অপেক্ষা নাই। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ইহা অলৌকিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট একটি অদ্ভুত বর্ণনা মাত্র নহে।

এই পুস্তকের উল্লিখিত বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, দেবী প্রভৃতি কেহ বা বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন, কেহ বা অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করেন, কেহ বা অপর সকল দেবদেবী হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়া স্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন বটে। কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস স্বজাতি-অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ স্বরূপ বর্ণন করা গিয়াছে ; তাহা হইলে আর ঐ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না।—তাহা হইলে বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্রু বিসর্জ্জনে সঙ্কুচিতা সরস্বতীর বৃদ্ধি, এবং তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্তিতে জ্বালাদেবীর আবির্ভাব, আর অলৌকিক

ব্যাপার থাকিবে না। অপিচ বিনাশমাত্রে সংসারের পর্য্যবসান এই প্রতীতি সমুদ্ভূত নাস্তিকতার প্রভাবে যে স্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং ইচ্ছাবৃত্তির স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আস্তিক্য সংস্থাপিত হইয়া চেষ্টাশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয় এ কথাও সহজ বোধ হইবে। অনন্তর দেশের পুরাবৃত্তের স্মরণে আশা এবং প্রজ্ঞার সংস্কৃতির উপায় উদ্ভাবন, এবং প্রীতির উদারতা অনুভূত হওয়া সাহজিক ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হইবে। এই পর্য্যন্ত হইলেই যে সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া প্রশস্ত ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয়, এবং অভেদ জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়া সহিষ্ণুতার সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতীত হয় তাহাও লৌকিক যুক্তিসঙ্গত বোধ হইবে। পরিশেষে নিজ সমাজের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির মূল নিরূপিত হইলে যে অপর কোন বিভীষিকার উপদ্রব থাকিতে পারে না, এবং স্বজাতীয়ানুরাগ তাহার প্রীতিভাজন পদার্থের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া আপন অভীষ্টসাধনের উদ্দেশে সংগোপিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে ইহাও লৌকিক যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া বোধ হইবে না।

আর একটি কথা বলিলেই গ্রন্থাভাস শেষ হয়। তরুণবয়সে সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে, অপৌরুষেয় কোন গ্রন্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ ধর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে দেখিতেছি যে, প্রকৃতি পুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রন্থ। নরজাতি আদিমকাল হইতে জন্মজন্মান্তরে পুরুষানুক্রমে ঐ পুস্তকের তাৎপর্য্যগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। উহাতে যাহা আছে তাহাই তথ্য—উহাতে যাহা নাই তাহা জানিবারও যো নাই। এক্ষণে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় হইয়াছে যে, যিনি প্রকৃতিপুস্তকের তাৎপর্য্য গ্রহণে যতদূর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দুশাস্ত্রার্থের জ্ঞানলাভেও কৃতকার্য্য। যোগাভ্যাসরত হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ অপরিসীম সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী, অন্তর্দর্শী এবং এবং প্রকৃতিদর্শী ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়

বেদব্যাসের তপস্যা—মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন—ধ্যানগম্য দেবীমূর্ত্তি—বেদব্যাসের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা

ভগবান বেদব্যাস কলিযুগ প্রবর্ত্তমান দেখিয়া স্বকীয় প্রকৃতিসুলভ দয়ালুতাগুণে প্রণোদিত হইয়া মানবকুলের কলি-কলুষাপনোদনকামনায় একান্তধ্যাননিমীলিত নয়নে 'স্বস্তি' শব্দব্রহ্মের মানসজপ করিতেছিলেন। বহু সহস্র বর্ষ এইরূপে অতিবাহিত হইলে কোন সময়ে হঠাৎ ভগবানের সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত, মুখারবিন্দ বিকসিত এবং আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ব্যাসদেব নেত্রোন্মীলন করিলেন। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন, সম্মুখে সপ্তকল্পান্তজীবী মৃত্যুঞ্জয় মার্কণ্ডেয় তপোধন দণ্ডায়মান।

ব্যাসদেব, মহামুনিকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া আসনপরিগ্রহ করাইলে মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "সমগ্র বেদের বিস্তারকর্ত্তা ব্যাসদেব তুমিই সাধু, তুমিই জ্ঞানী, তুমিই ভগবদ্ভক্ত! তুমি এইক্ষণে যে অনুপম আনন্দসম্ভোগ করিতেছিলে, তাহার তুলনা নাই, সীমা নাই; তাহা হ্রাস-বৃদ্ধি-পরিশূন্য পবিত্র অমৃতানন্দ! আমি তোমার তপঃসিদ্ধিব সমস্ত লক্ষণ অনুভব করিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম।"

ভগবান ব্যাসদেব কহিলেন—"মুনিরাজের সন্দর্শনে চক্ষুঃ পবিত্র, বাক্য-শ্রবণে অন্তর পবিত্র—আমি সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইলাম। এক্ষণে যদি এই শিষ্যানুশিষ্যকে নিতান্ত অপাত্র বোধ না হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রষ্টব্যবিষয়ে জ্ঞানদান করিয়া চরিতার্থ করুন।"

মহামুনি, ব্যাসদেবের বিনয়বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মৌনাবলম্বনদ্বারা সন্তোষ ও সম্মতিখ্যাপন করিলে ব্যাসদেব আগ্রহাতিশয় সহকারে কহিতে লাগিলেন—"মুনিরাজ! আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জাজ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইঁহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইঁহাকে

মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না ; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইঁহার সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে—কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেব দেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন। মুনিবর! ইনি কোন্ দেবী? ইঁহার উপাসনায় কাহারা অধিকারী? ইঁহার সাধনে কি কি বিঘ্নের সম্ভাবনা? ঐ সকল বিঘ্নবিনাশের উপায়ই বা কিরূপ? ইঁহার সিদ্ধিলাভে ফল কি?—এই সমস্ত বিষয়ে সবিস্তার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অকিঞ্চনকে চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।”

মহামুনি মার্কণ্ডেয় একতানমনে নির্নিমেষদৃষ্টি সহকারে ব্যাসদেবের মুখারবিন্দস্ফুরিত আগ্রহাতিশয়প্রপূরিত ব্যাকামৃতপানে বিমুগ্ধবৎ ছিলেন। বাক্যাবসানে চকিতের ন্যায় কহিলেন, “সাধু! বেদব্যাস, সাধু! মাতা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সন্তানের জ্ঞানচক্ষুঃসমক্ষে আপন প্রকৃত মূর্ত্তিতেই সমুদিতা হইয়াছেন। বেদব্যাস ভিন্ন ঐ মূর্ত্তিসন্দর্শনলাভের উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? যিনি নিরন্তর চিন্তাবলে সমস্ত বেদার্থ হৃদ্‌গত করিয়া যাবতীয় নরলোকের হিত-কামনায় তৎসমুদয় পুরাণরূপে ব্যক্ত করিতেছেন; যিনি খ্যাতিপ্রতিপত্তি-প্রলোভপরিশূন্য হইয়া সর্ব্ববিষয়ে পরোপকারসাধনে আপন তপস্যার ফল বিনিয়োজিত করিতেছেন; যিনি অপ্রতিহতগতিপ্রভাবে কি রাজদ্বারে কি দেবকুল সমক্ষে যথায় উপনীত হন, সর্ব্বস্থান সত্যপূত করেন; যাঁহার মুখবিনির্গত যাবতীয় বাক্যাবলী ও লেখনীবিনিঃসৃত সকল কথা সেই মহাদেবীর স্তবপাঠেই পর্য্যবসিত হয়; সেই ব্রহ্মচারী, যতি, সত্যবতীতনয় ভিন্ন দেব-কুলমাতা সনাতনী সতী আর কাহার সমক্ষে স্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করিবেন?—সাধু! বেদব্যাস, সাধু!”

এই বলিতে বলিতে মুনিবর গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাসদেবের শিরোদেশে আপন করপদ্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং “আমার সহিত আইস” এই কথা বলিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। ব্যাসদেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র দর্শন—সঙ্কুচিতা সরস্বতী—ক্ষোভ

কুরুক্ষেত্র কি রমণীয় স্থান! চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, আরক্ত বালুকাময় মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। স্থানে স্থানে পলাশ বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন সমস্ত দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যভাগে সুগভীর বারিপূর্ণ তড়াগে হংসগণ জলকেলি করতঃ পদ্মবন আন্দোলিত, তড়াগবারি আলোড়িত এবং সুমধুর কলস্বরে বায়ুপ্রবাহ স্বনিত করিতেছে।

কুরুক্ষেত্র কি ভয়ানক স্থান! ইহার সমুদয় মৃত্তিকা শোণিতবিলিপ্ত, পুষ্পিত-পলাশবৃক্ষ সমস্ত রুধিরপরিষিক্ত, হ্রদগুলি ভৃগুবংশসন্তর্পণ ক্ষত্রিয়হৃদয়লোহিত দ্বারা প্রপূরিত। এইস্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও নিহত, মহারাষ্ট্র সেনা বিনষ্ট, এবং হিন্দুজাতির উদয়োন্মুখ আশা বহুকালের নিমিত্ত অস্তমিত।

কুরুক্ষেত্র কি শান্তরসাস্পদ স্থান! এখানে কুরুপাণ্ডব, হিন্দু মুসলমান, শত্রু মিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা বৈরিতার নামগন্ধও নাই। ভয়, বিদ্বেষ, ঈর্ষাদিভাব একেবারে বিসর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শান্তিনিকেতন। ঐ যে অরবিন্দনিচয় একই দিবাকরের করস্পর্শে হাস্য করিতেছে, উহারা পুরাতন বীরপুরুষদিগের হৃদয়পদ্ম; ঐ যে কলহংসমণ্ডলী, উহারা প্রচীন কবিকুল—একতানস্বরে বীরগণের গুণগরিমা গান করিতেছে।

কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরস্বতীনদীকূলে একটি সুপ্রশস্ত বটবৃক্ষতলে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম। মুনিবর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে ভগবান বেদব্যাস তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন।

মুনিরাজ সম্মুখবর্ত্তিনী নির্ঝরিণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিলেন—"ঐ যে জীর্ণা, সঙ্কীর্ণা তটিনী তোমার পাদমূলে পতিতা রহিয়াছে দেখিতেছ, আমি স্বচক্ষে ইঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও জরা দর্শন করিলাম। কোন সময়ে এই সমস্ত প্রদেশ ইঁহারই গর্ভস্থ ছিল। অনন্তর সত্যযুগে কুরুক্ষেত্র ভূমির উৎপত্তি হইল এবং সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ এই ভূমিতে আবাস প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষীণা, মলিনা স্রোতস্বতী তৎকালে অতীব প্রবলা ছিলেন, তখন

সরিৎপতি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করেন নাই। তখন সমুদ্র সমুদয় প্রাচ্যভূমি অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়া সরস্বতীর পাণি গ্রহণার্থে এ পর্য্যন্ত আপনার কর প্রসারিত করিয়াছিলেন। আহা! সে দিন যেন কল্য মাত্র হইয়া গিয়াছে! এই স্রোতস্বতী কি আবার বেগবতী হইবে? ইঁহার উভয় কূল কি আবার ব্রহ্মগুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে? ইনি অন্যের করপ্রদা না হইয়া আবার সরিৎপতির সংসর্গ লিপ্সায় কি স্বয়ং বাসকসজ্জা হইবেন?"

এই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান ব্যাসদেবের অক্ষিদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং তাহার দুই এক বিন্দু সরস্বতীজলে নিপতিত হইল। অমনি নদীজল যেন প্রবল বাত্যাঘাতে অথবা ভয়ঙ্কর ভূকম্প প্রভাবে বিলোড়িত হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; উভয় কূল ভগ্ন করিয়া মূর্ত্তিমতী সরস্বতী ক্রমশঃ আয়ত হইতে লাগিলেন; বায়ুতে হোমাগ্নিসম্ভূত ধূমগন্ধ বহিতে আরম্ভ হইল; ব্রহ্মর্ষি-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বেদধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল; এবং জল স্থল ব্যোম সমুদয়ই জীবময় লক্ষিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, অতিরথ, মহারথ, অর্দ্ধরথ, কবি, ভট্ট, বৈতালিক প্রভৃতির বিভূতি দ্বারা সর্ব্বস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা সকলেই আপনাপন প্রকৃতিসুলভ স্বরে ব্যাসদেবের কর্ণকুহরে কহিলেন—"মাভৈঃ—মাভৈঃ—আমরা কেহই যাই নাই—সকলেই বিদ্যমান আছি।"

ভগবান বেদব্যাস চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বা ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া একান্ত স্তম্ভিতভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস, সাধু! তুমি ভগবতী সরস্বতী এবং তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রের কলিযুগোচিত অবস্থা দর্শন করিতেছিলে, কিন্তু তোমার হৃদয়কন্দরোত্থিত নয়নবারির এমনি মাহাত্ম্য যে, তৎকর্ত্তৃক যুগধর্ম্মের বিপর্য্যায় হইয়া ক্ষণমাত্রে সত্যযুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল। যেখানে এরূপ মনঃ সেখানে সত্যযুগ চিরকালই বিরাজমান। সাধুদিগের নয়নবারিই কলিকল্মষপ্রক্ষালনের অমোঘ উপায়; মহামনাদিগের অশ্রুবারিই প্রকৃত সরস্বতীজল। যতদিন তপঃসিদ্ধ মহাত্মাদিগের হৃদয়কন্দর হইতে ঐ জল নির্গত হইবে, ততদিন সরস্বতী জীবিতা এবং বলবতী থাকিবেন—এক্ষণে চল, কিন্তু আর এ দেশে নয়—কলিযুগ প্রবর্ত্তমান হইয়াছে, দেখিলে ত। এক্ষণে কালোচিত রূপধারণ কর। আমি অলক্ষিতে তোমার সমভিব্যাহারে থাকিব।"

তৃতীয় অধ্যায়

জ্বালামুখী দর্শন—ক্রোধোদ্দীপ্তি

দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্তসীমায় পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবীর আবাস ছিল। এই জন্য সেই স্থানের নাম অম্বালয়—এক্ষণে অপভ্রংশে উহাকে অম্বালা কহে। এক দিন একজন মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যভাগে বহুসহস্র সৈন্যের স্কন্ধাবার দেখিতেছিলেন।

ঐ সেনাদলের মধ্যে কতকগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের চিত্ত নিরতিশয় শঙ্কাকুলিত হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত্র করিয়া অপর সৈন্যদিগের নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক কোন বিশেষ উপদ্রবশঙ্কার কারণ ছিল না। সন্দেহাস্পদীভূত সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই কর্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া চলিতেছিল। তাহারা রাজদ্রোহিণী কোন গুপ্তমন্ত্রণায় যোগ দেয় নাই। এমন কি, তাহাদিগের আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে যে পত্রাদি আসিত, তাহাও আপনারা খুলিয়া পাঠ করিত না—অগ্রে কর্তৃপক্ষকে পাঠ করিতে দিত। কিন্তু তাহারা যতই করুক, কোন মতেই আর রাজপুরুষদিগের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিল না। এ দিকে যে সকল রাজসৈন্য তাহাদিগের উপর প্রহরিস্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। প্রধান রাজপুরুষ অবিশ্বাস্য সৈন্যগণের বিনাশসাধন করিতে অনুমতি দিলেন। মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ দেখিলেন অম্বালয়ের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সমস্ত সৈন্য একত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিরস্ত্রীকৃত দল মধ্যস্থলে এবং সশস্ত্র সসজ্জ সেনাবৃন্দ তাহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। সৈন্যপতি উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন, "যখন তোদের আত্মীয় ও সুহৃদ্ স্বজনগণ রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত, তখন তোরাও যে মনে মনে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছিস্, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—তোরা কি সাহসে এখনও এখানে স্থির হইয়া রহিয়াছিস্?—তোরা এতদিন প্রস্থান করিস্ নাই কেন?" নিরস্ত্রীকৃত সেনাগণ এই কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এমত সময়ে অপর একজন সৈন্যপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পলাও, পলাও।" সৈন্যদল বিচলিত হইল, দুই একজন শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল—অমনি অস্ত্রসমূহের একটি ঝনৎকার শব্দ—আর্ত্তনাদ এবং

নিমেষমধ্যে দ্বিসহস্রাধিক সৈনিকের শবস্তূপ হইল। তদ্দণ্ডেই সেনাপতি কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন—"কল্য রাত্রিতে মহাশয়ের আজ্ঞালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কাওয়াজের সময়ে বিদ্রোহিদল পলায়নপর এবং বিনষ্ট হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে যাত্রা করিব।" *

যে মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন, তাঁহার শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল, এবং অক্ষিদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতেছিল। তিনি যেন কিছু বলিবেন—বা কিছু করিবেন এইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কিছুই পারিলেন না। যেন কেহ তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া ঐ স্থান হইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি উদ্ধর্শ্বাসে চলিতে লাগিলেন, এবং বহু নগর, নদী, বন, উপবন উত্তীর্ণ হইয়া যে স্থলে জ্বালামুখীগামী ও ইন্দ্রপ্রস্থগামী উভয় পথের সম্মিলন, সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন।

তথায় খাণ্ডবপ্রস্থের প্রশস্ত বর্ত্মাভিমুখে নয়ননিক্ষেপ করিবামাত্র অদূরে একটি অশ্বারোহ দল দৃষ্ট হইল। তাহাদিগের রণভেরী বাজিতেছে—পতাকা সকল বায়ুপ্রবাহে পত পত শব্দে উড্ডীন হইতেছে এবং সৈনিকবর্গের অট্টহাসের সহিত অশ্বগণের হ্রেষারব মিলিত হইয়া একটি অতিমানুষ ধ্বনি সমুৎপাদন করিতেছে। অশ্বারোহিগণ নিকটতর হইল—কোলাহল চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিল, এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে বামাকুলের ক্রন্দনস্বর মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহর ভেদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, হস্তীর অস্থি, গণ্ডারের চর্ম্ম, তাম্র-শলাকাময় লোম—এই সকল উপাদান দ্বারা বিধাতৃবিনির্ম্মিত সহস্রাধিক নরপিশাচ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া যাইতেছে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের পার্শ্বে দুই একটি অনুপমরূপা রমণী হস্তপদসম্বদ্ধা হইয়া অবগ্রহমলিনা লতিকার ন্যায় নীত হইতেছে।

ঐ কামিনীগণের মধ্যে দুই একজন আর তাদৃশ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দেখিতে দেখিতে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিল। অশ্বারোহী পিশাচেরা অমনি তাহাদিগের অঙ্গ হইতে বস্ত্রালঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক নির্জীব দেহ দূরে নিক্ষেপ করিল। কোন কোন রমণী একেবারে উন্মাদগ্রস্তা হইয়া আপনা আপনি নানা অলীক কথা কহিতেছিল। কেহ 'আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি' এই বলিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ 'আমি পিত্রালয়ে যাইতেছি' বলিয়া অতি অস্ফুটস্বরে গান করিতে লাগিল। আবার কেহ আপন রিক্ত হস্তদ্বয় এমন ভাবে স্থাপন করিল যেন ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে, এবং দুগ্ধভারে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে

* পৌরাণিক আখ্যায়িকায় জনপ্রবাদ অলীক হইলেও স্থান পায়।

'খাও বাবা খাও—কেন খাও না?' বার বার এই হৃদয়বিদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। অপর কতকগুলি ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য এবং নিস্পন্দকলেবর হইয়াছিল। তাহাদিগের চৈতন্যের এই মাত্র লক্ষণ যে, অক্ষিদ্বয় হইতে অজস্র বারিধারা প্রবাহিত হইতেছিল। অনেকে আপন আপন পিতা, মাতা, ভ্রাতা অথবা সন্তানগণের নাম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল। নৃশংস অশ্বারোহিগণ স্ত্রীলোকদিগের কাতরতায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অথবা তাড়না করিতেছিল।

এই সকল ব্যাপারের দ্রষ্টা এবং শ্রোতা ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি অধরোপরি এমনি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ হইল যেন দশনচ্ছদ ভেদ করিয়া বসিয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছুই করিতে বা কিছুই বলিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার নিরতিশয় বলে আকৃষ্ট হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথ ক্রমশঃ উর্ম্মিবৎ উচ্চাবচ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড যেন মৃত্তিকা উদ্ভেদ করিয়া উঠিল। অনন্তর ক্ষেত্র সকল স্বল্পশস্য, পরে কণ্টকীবনসমাকীর্ণ, পরিশেষে উদ্ভিদ্‌সম্বন্ধরহিত আরক্তকঙ্করময় দৃষ্ট হইল। সহসা সম্মুখভাগে যেন তুষারসংঘাত, যেন স্ফটিকস্তূপ, যেন প্রভূত রত্নরাশি, সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবরূপী অতি প্রোজ্জ্বলাঙ্গ একটি পর্ব্বত বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণ আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একান্ত নির্জ্জন, এবং সর্ব্বতোভাবে দুরারোহ। কিন্তু ব্রাহ্মণ অতি বেগেই গমন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ স্থিরবিদ্যুন্নিভ আলোকমালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। উর্দ্ধে হিমসংঘাত, নিম্নে তাদৃশ প্রভা!—বোধ হইল, যেন দেবাদিদেবের অঙ্কে অর্দ্ধাঙ্গভূতা গৌরী স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তটস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়া তাঁহার বেদব্যাসমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। ভগবান মার্কণ্ডেয় বামহস্তদ্বারা তাঁহার কর ধারণ করিয়া আছেন—সম্মুখে জ্বালামুখী কুণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং কুণ্ডের অভ্যন্তর হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্যাদি বিবিধ বাদ্যের ধ্বনি শুনা যাইতেছে। অকস্মাৎ সমুদয় নীরব হইল। নিমেষমধ্যে গিরিগর্ভ হইতে গভীর গর্জ্জন ধ্বনিত হইল এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড সমস্ত হইতে প্রভূত ধূমরাশি উদ্গীর্ণ হইল এবং জ্বালামুখী মুখব্যাদান করিয়া সুদীর্ঘ জিহ্বাগ্রদ্বারা পর্ব্বতের শিরোদেশ লেহন করিলেন!

ভগবান মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"দেবি! পূর্ব্বকালে অনেকবার এবম্ভূত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। আর যে কখনও দেখিব, তাহা মনে করি নাই। যখন যখন দেবকুলের নিরতিশয় কষ্ট হইয়া ক্রোধের উদ্দীপন হইয়াছে—যখন যখন ভগবান ভূভারহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—যখন যখন সাধু সমূহের হৃদয়কন্দরোত্থিত রৌদ্ররস পরপীড়ন এবং অত্যাচারে একান্ত নিষ্পেষিত হইয়াছে—সেই সেই সময়েই তুমি এবম্প্রকারে চীয়মানা হইয়া সিদ্ধপুরুষদিগকে স্বমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছ। কেবল মূর্ত্তিপ্রদর্শন মাত্র কর নাই—স্বকীয় যাবতীয় তেজোরাশি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের চিত্ত অমেয় রৌদ্ররসে পরিষিক্ত করিয়াছ। যেমন এক্ষণে আমাদিগের পদতলস্থ রসাতল পর্য্যন্ত তোমার তেজে দ্রবীভূত হইয়া স্ফুটিত হইতেছে, তাঁহাদিগের মনের অভ্যন্তরভাগও তেমনি ক্রোধে বিলোড়িত হইতে থাকে। যেমন তোমার জিহ্বা তুষাররাশিকেও লেহন করিয়া শীতল হইতেছে না—প্রত্যুত তাহাকে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রজ্বালিত করিতেছে, তাঁহাদিগের রসনাও সেইরূপ অগ্নিময়ী হয়, আত্মসমৃদ্ধি রসপানে তৃপ্ত না হইয়া তীব্রতর ভাব ধারণ করে, এবং যেমন এই প্রকাণ্ড ভূধরের দুর্দ্ধর্ষভার তোমাকে সংরুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না, স্বয়ং প্রকম্পিত এবং উন্নমিত হইতেছে, সেইরূপ তোমাকর্ত্তৃক উত্তেজিত মহাত্মগণও অপরিমেয় আন্তরিক বলে বলবান হইয়া সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়েন।"

ভগবান মার্কণ্ডেয় এই সকল কথা বলিতে বলিতে ব্যাসদেবের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস, সাধু! জ্বালাদেবী তোমাতে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন—চল।"

চতুর্থ অধ্যায়

জীবলোক—মরুস্থল—ত্রিপুষ্কর

যে অচলশরীরের পূর্ব্বভাগে জ্বালামুখী তীর্থ তাহার পশ্চিমপ্রান্তসীমা হইতে একটি নির্ঝরিণী দক্ষিণাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে। দুইজন ব্রাহ্মণ, একজন বৃদ্ধ অপর মধ্যবয়স্ক, সেই নির্ঝরিণীর গতির অনুক্রমে আসিয়া ক্রমে একটি অতি রমণীয় প্রদেশে উপনীত হইলেন। প্রদেশটি ত্রিকোণাকার। উহা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন

নদীর সম্মিলনস্থল। ঐ সকল স্রোতঃস্বতীর মূল উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী গগনভেদী শৈলমালার ঊর্দ্ধ ভাগে—চর্ম্মচক্ষুর দর্শনীয় নহে। উহাদিগের গতি দক্ষিণাভিমুখে অগাধ অকূপারে। দেশটি কর্ম্মক্ষেত্রের মুখভাগ। তাহার উর্ব্বরতা শক্তি অসীম। ঐ দেশে না জন্মে এমন পদার্থই নাই।

ব্রাহ্মণেরা ঐ ভূভাগের নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

বহুদিন এইরূপে গত হইলে একদা মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারী বৃদ্ধের প্রতি সভক্তিক দৃষ্টিপাত সহকারে কহিলেন, "আর্য্য! এতদিন এই দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার শরীর যেন ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাম আর তেমন সতেজ নাই। দৃষ্টি তেমন দূরগত হয় না। দূরে উচ্চারিত কোন কথাও আর শ্রুতিমূলকে আহত করে না। গতিসামর্থ্যও যেন লঘু হইয়া পড়িতেছে। অন্য কথা কি, ভগবানের মুখজ্যোতিও আমার চক্ষুতে মলিন বলিয়া অনুভূত হইতেছে। আমি পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি—কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, কিছুই আর মনে হইতেছে না।"

বৃদ্ধ কহিতেছেন—"কলিযুগোচিত শরীর পরিগ্রহ করিলে সেই শরীরের ধর্ম্ম অনুভব করিতে হয়। তুমি এক্ষণে তাহাই করিতেছ। কিন্তু পুণ্যতীর্থের দর্শন লাভ হইলে আর ঐ ভাব থাকিবে না—আবার স্বস্বরূপতা উপলব্ধ হইবে।"

শেষোক্ত কথাগুলি যেন বিদূরগত কোন ব্যক্তির কণ্ঠবিনিঃসৃতের ন্যায় মধ্যবয়ার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি আপন পার্শ্বভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া আর সহচর মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এই বায়্বগ্নিভূজলাকাশসম্ভূত প্রশস্ত প্রদেশ মধ্যে কোথা হইতে আসিলাম—কেন আসিলাম—আমি কি আপনি আসিয়াছি—না কেহ আমাকে আনিয়াছে, কৈ কেহ ত আমাকে আনিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার সহচর ঠাকুর কোথায়?—সহচর ঠাকুর!—কি সত্য সত্যই কেহ ছিলেন? তাঁহারই প্রদর্শিত সেই সুপ্রশস্তা সরস্বতী, সেই অত্যুগ্রা জ্বালামূর্ত্তি এখনও ত আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন—তবে কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে। না, ও সমস্ত জন্মান্তরের সংস্কার, এ জন্মের মধ্যে ত সে সকল কিছুই দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে না।

এ কি! আর যে সত্য মিথ্যা কিছুই স্থির হয় না—সকলই যেন ঘোর ইন্দ্রজাল বলিয়া বোধ হয়। অকস্মাৎ ভয়ের উদ্রেক হইতেছে—আর একাকী ভ্রমণ করিব

না—লোকালয়ে যাই। লোকে কি করে দেখি, কি উপদেশ দেয় শুনি।”

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তাব্যাকুলিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সম্মুখভাগে একটি ক্ষুদ্র তটিনী দৃষ্ট হওয়াতে তাহার তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন।

হিমাচলের গগনভেদী শিখরের বহু উর্দ্ধ হইতে ঐ নির্ঝরিণী নির্গতা হইয়াছে। ঐ নির্ঝরিণী কিয়ৎকাল পর্ব্বতক্রোড়ে এবং গুহাভ্যন্তরে বাস করিয়া অনন্তর নিম্নগা হইয়া একটি প্রশস্ত স্রোতস্বতীর আকারে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। নদীটি নীচে আসিয়াই এমনি প্রশস্ত হইয়াছে যে তাহার এককূল হইতে অপর কূল দর্শন হয় না। নদীর জল কর্দ্দমাক্ত, সর্ব্বত্র আবর্ত্তসঙ্কুল, নিতান্ত কুটিলগতি এবং অতি প্রখরবেগসম্পন্ন।

কিন্তু এই সমস্ত দোষ এবং অন্তরায়সত্ত্বেও নদীগর্ভে অসংখ্য নৌকাবৃন্দ নিরন্তর চলিতেছে। প্রতি নৌকায় এক একজন আরোহী, কোনটিতেই নাবিক নাই এবং সকলগুলিই নদীর খরতর বেগে ভাসিয়া যাইতেছে। কোন কোন নৌকা প্রবলতর আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিলেও কোন নৌকারোহী প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে না। সকলে অনিমিষ নয়নে সম্মুখভাগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাইতেছে এবং প্রখর রবিকরসন্তাপে উত্তাপিত হইয়া ঐ কর্দ্দমাক্ত নদীজল চক্ষুতে, শিরোদেশে, সর্ব্বশরীরে সিঞ্চন করিতেছে এবং পিপাসার্ত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ পান করিতেছে।

যদি আরোহীদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহারা কোথায়, কতদূর, কি জন্য যাইতেছে, সকলেই উত্তর করে ‘আমরা ঐ শৌভপুরে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছি।’ সকলেই শৌভপুর অদূরবর্ত্তী দেখে এবং বোধ করে যেন আর একটা বাঁক ফিরিলেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে ; কিন্তু শত শত বাঁক উত্তীর্ণ হইলেও আর একটা বাঁক বাকী থাকে, এবং প্রতি বাঁকেই শত শত নৌকা চরবদ্ধ হইয়া যায়।

নৌকা চরে লাগিলে আর রক্ষা নাই। তথায় যে রাজার অধিকার তাঁহার অনুচরেরা আসিয়া উপস্থিত হয়। নৌকারোহীদিগের যাবতীয় দ্রব্যসম্পত্তিতে আপনাদিগের রাজার মুদ্রা অঙ্কিত আছে দেখাইয়া দেয় এবং নৌকারোহীদিগকে পরস্বাপহারী সপ্রমাণ করিয়া কোথায় বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, কেহই বলিতে পারে না।

কিন্তু এই সমস্ত বিপৎপরম্পরা সত্ত্বেও নৌকারোহীরা কেহ শৌভপুর গমনোদ্দেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের সকলের চক্ষেই ঐ পুরীর

সৌন্দর্য্য অপরিমেয় বোধ হয়। কেহ উহাকে সুবর্ণময় এবং সমস্ত রত্নরাশি-বিভূষিত দেখিয়া আকৃষ্ট হন, কেহ উহার সমৃদ্ধি এবং প্রতাপশালিতা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হন, কেহ উহার সর্ব্বাবয়বে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতেছে দেখেন, আর কেহ বা উহার অপ্সরোনিভ কামিনীগণের রূপমাধুরীদর্শনলোভে মুগ্ধ হইয়া চলেন।

কখন কখন অপরের নৌকা চরসম্বদ্ধ হইল দেখিয়া ভয় এবং শোকের উদ্রেক হয়। সেই সেই সময়ে সম্মুখবর্ত্তী শৌভপুরের মূর্ত্তি আর পূর্ব্বের ন্যায় সুপরিস্ফুট সুন্দর দেখায় না। কেহ কেহ তত্তৎকালে পশ্চাদ্ভাগে এবং পার্শ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন; কিন্তু ঐ ভাব স্বল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। সকলেই দেখিতে পায় যে, চতুর্দ্দিক হইতে নূতন নূতন নৌকা নিরন্তর আসিয়া স্রোতোমুখে পতিত হইতেছে, তাহাতে নদীস্থিত নৌকার সংখ্যা বর্দ্ধিত বই কুত্রাপি ন্যূন হইতেছে না। ইহাতেই সকলে আশ্বস্ত হইতেছে। অনন্তর নদীর জল পান করিলে, সেই জলের এমনি ধর্ম্ম যে, অতি দুর্ব্বলের শরীরেও বলের সঞ্চার করে, অতি ভীরুর অন্তঃকরণেও সাহস উত্তেজিত করে, এবং অন্ধের চক্ষুতেও জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত করিয়া শৌভপুরকে সমীপবর্ত্তী দেখাইয়া দেয়।

ব্রাহ্মণরূপী বেদব্যাস নদীর জল স্পর্শ করিলেন না। তিনি একান্ত চিন্তানিমগ্নের ন্যায় নদীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন। নদীর কুটিলপথ বাহিয়া আসিতে নৌকারোহীদিগের যে প্রকার বিলম্ব হইতেছিল, তাঁহার সেরূপ বিলম্ব হইল না। তিনি বহুদূর অগ্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে ঐ নদী একটি সুবিস্তীর্ণ, জীবসম্বন্ধপরিশূন্য, অতি ভয়াবহ বালুকাময় মরুভূমিতে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ সেই উষরভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কোথাও একটি সামান্য কীট—কি তৃণ—কি জলবিন্দু—কিছুই দৃষ্ট হইল না। সকলই নির্জীব, লঘু এবং পরস্পর সম্বন্ধশূন্য বোধ হইল। বহুদূর গমন করিতে না করিতে পিপাসার উদ্রেক হইল, কণ্ঠ ও তালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সমুদায় ভাব একরূপ নীরস বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কোথাও চক্ষুঃ স্থির করিবার স্থল পাইলেন না। ঊর্দ্ধভাগে নভোমণ্ডল উত্তপ্ত তাম্রকটাহের ন্যায় বসিয়া গিয়াছে। অধোভাগে নিশ্চল বালুকারাশি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া আছে। কামনার কলুষিত বারি পান করাও সে সময়ে শ্রেয়োবোধ হইল। শৌভপুরগমনোদ্যত ভ্রান্ত নৌকারোহীদিগের অবস্থাও ইহার অপেক্ষা সুখকর বোধ হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন—"তাহাদিগের ভ্রম ত

সুখের ভ্রম—এ কি!—সকল ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে যে কিছুই থাকে না। তাহাদিগের ন্যায় নৌকাযোগে না আসিয়া এতই কি বিবেচনার কর্ম্ম করিলাম?—ইহা অপেক্ষা তাহাদের আর কি অধিকতর দুঃখ উপস্থিত হইবে?"

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন অদূরে তর তর করিয়া নদীজল বহিয়া যাইতেছে এবং তীরবর্ত্তী হরিত-পল্লবশোভিত পাদপসমূহের ছায়া ঐ সুবিমল জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ সবেগে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু যত দূর যান, জল আর নিকটবর্ত্তী হয় না। সমান দূরে থাকিয়াই তাঁহাকে প্রলোভিত করে। ব্রাহ্মণ তখন জানিলেন যে, ঐ নদীটি অলীক—মরীচিকার ন্যায় কেবল ভ্রমোৎপাদিকা। তিনি নিরস্ত হইলেন এবং যদিও ক্ষণকাল পূর্ব্বে সুখকরী ভ্রান্তিকেই তাঁহার শ্রেয়স্করী বোধ হইয়াছিল, তথাপি যাহা অসৎ বলিয়া প্রতীত হইল, আর তাহার অনুসরণে প্রবৃত্তি থাকিল না।

এইরূপে ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অদূরে দুইটি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার একটি স্ত্রী অপরটি পুরুষ বোধ হইল। উভয়েরই আকার বিশাল ও বর্ণ ঘোর তিমিরের ন্যায়। উভয়ের শিরোদেশে রাজমুকুটের শিরোভূষণ এবং উভয়েই একটি ঘূর্ণ্যমান বায়ুর উপরে অধিষ্ঠিত। মূর্ত্তিদ্বয় ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি দৃকপাতও করিল না—স্বেচ্ছানুসারেই চলিল। পুরুষের নাসাবিনির্গত নিশ্বাসবায়ু শরীরে স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি পদরজোদ্বারা তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া গেল।

পুরুষটি ঐ মরুদেশের রাজা। তাঁহার নাম নৈরাশ্য। স্ত্রীলোকটি তাঁহার প্রিয়তমা রাজ্ঞী—নাম স্বেচ্ছাচারিতা। লোকে বিশেষ না জানিয়া ইহাদিগকেই 'লু' বলিয়া অভিহিত করে। এই দম্পতি চিরকাল একত্র অবস্থান করে এবং সর্ব্বত্র একযোগে বিচরণ করে। সরস ক্ষেত্রেও ইহাদিগের প্রতাপ একান্ত দুঃসহ। মরুভূমিতে ইহাদিগের সন্দর্শন হইলে কোন ক্রমেই রক্ষা থাকে না। সকলকেই ইহাদিগের প্রভাবে সঙ্কুচিত এবং জড়ীভূত হইতে হয়।

ব্যাসদেব হে কলিযুগোচিত ব্রাহ্মণশরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সে শরীরের কি সাধ্য যে, ঐ প্রখর আঘাত সহ্য করে। ব্যাসদেবের আত্মাও তাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ শরীরের সংসর্গবশতঃ নিস্তেজঃ হওয়াতে ঐ আঘাতে বিকৃত হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বতোভাবে চেতনাপরিশূন্য না হউন, কিন্তু নিতান্ত বিচলিত এবং কেন্দ্র-পরিভ্রষ্ট হইলেন।

মরুদেশের রাজা ও রাণী চলিয়া গেলেন। তাঁহাদিগের পারিষদবর্গ নভোমণ্ডল

আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে আঁধি লাগিল। তিনি আর আপনার দেহও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার চক্ষুঃ নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং সমস্ত জীবিতকাল একটি সুদীর্ঘ স্বপ্নমাত্র বোধ হইল।

যখন বাহ্যশরীর দৃষ্ট হয় না—আত্মবিস্মৃতিও জন্মে, তখন আর কি? সকলই নৈরাশ্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার ক্রীড়ামাত্র বোধ হয়। বালুকারেণু সকল ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। এই একটি স্তূপ জন্মিল, আবার পরক্ষণেই তাহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। এই সম্মিলিত—সংযত—দৃঢ়ীভূত, আবার বিচ্ছিন্ন—বিভাজিত—বিলীন! তপস্যা, অধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চ্চা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বা কর্ত্তব্যসাধন—এ সকলেরই মূল সত্যপ্রতীতি। "সত্য কৈ? এ ত নৈরাশ্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্য; এখানে রাজ্ঞী স্বেচ্ছাচারিতার প্রসাদলাভে যত্নবান হও; তিনি আশুতোষ, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কর্ত্তব্যসাধনোদ্দেশে কষ্টস্বীকার করিও না—এই অনুজ্ঞামাত্র পালন করিলেই হইল।"

মোহাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ এই সকল আকাশবাণী শুনিয়া ক্ষুভিত, ভীত এবং বিহ্বল হইলেন। তাঁহার আত্মহত্যার ইচ্ছা জন্মিল। 'আর এ অকিঞ্চিৎকর জীবনরক্ষার প্রয়োজন নাই'—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমত সময়ে হঠাৎ তিনি সবলে আকৃষ্ট হইয়া উত্তোলিত এবং প্রধাবিত হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখেন, সম্মুখে তিনটি অপূর্ব্ব প্রাসাদ। তাহার প্রথমটির নাম রত্নপুর; তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, তাহার অভ্যন্তরে নানা প্রকোষ্ঠ। সকলগুলিই প্রোজ্জ্বল এবং দিব্যগঠন। তুইটি প্রকোষ্ঠ এক প্রকার নয়। প্রত্যেকের বর্ণ এবং আকার স্বতন্ত্র। কোনটি শুভ্র চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, কোনটি নীল ষট্‌কোণ যুক্ত, কোনটি বা লোহিত অষ্টকোণ সম্বলিত—এইরূপে সকলগুলিই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত। কিন্তু যেটি যে বর্ণের এবং যে আকারের হউক, যখন যেটিকে দেখিলেন তখন সেইটিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইল। ঐ প্রকোষ্ঠ সকলের নির্ম্মাতা কে? জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল হইল। অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলেন; আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ নামক কতকগুলি চক্ষুর্বিহীন অন্ধদাস নিরন্তর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কোন উত্তর করিল না—আপন আপন কর্ম্ম করিতেই লাগিল। তাহাদিগের কাজও বড় অধিক বোধ হইল না। ঐ পুরীর মধ্যেই যে সকল সমপ্রকৃতিক পদার্থ রহিয়াছে, কেহ তাহাদিগের এক দিক ধরিয়া টানিতেছে, কেহ অপর দিক ধরিয়া ঠেলিয়া দিতেছে এবং তাহাতেই প্রকোষ্ঠগুলি যথাবিন্যস্ত

এবং সংঘটিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ দাসবর্গের প্রতি এই সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু মূক অন্ধ দাসনিচয়ের এ প্রকার নিরন্তর পরিশ্রমদর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ প্রীত হইল না। তিনি দুঃখ-পরিতপ্ত হৃদয়ে বহির্গত হইলেন এবং 'হরিতপুর' নামক যে দ্বিতীয় প্রাসাদ সম্মুখে দেখিলেন, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

'হরিতপুর' পূর্ব্বদৃষ্ট 'রত্নপুর' অপেক্ষাও সমধিক আয়ত, বিচিত্রগঠন, এবং শোভমান বোধ হইল। ইহারও অভ্যন্তরে বহুল প্রকোষ্ঠ। তাহাদিগেরও বর্ণ এবং গঠনপ্রণালী পরস্পর বিভিন্ন; এবং সেখানেও অনেকানেক মূক অন্ধ দাস নিরন্তর স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্যে ব্যাপৃত। কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট পুরী হইতে ইহার বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে পুরীর বহির্ভাগ হইতে বিশোষণ নামক দাসবর্গের দ্বারা বিষমপ্রকৃতিক উপাদানসকল অভ্যন্তরে নীত হইতেছে এবং পূর্ব্বরূপ অন্ধ কারুগণকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে পুরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন হইয়া প্রতি প্রকোষ্ঠই শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধমান হইতেছে।

তাদৃশ নিপুণতর কারুকার্য্য এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য দর্শনেও মানসিক ক্ষোভের উপশম হইল না। ব্রাহ্মণ উদ্বিগ্ন এবং ভগ্নমনা হইয়া বহির্ভাগে আগমন করিলেন এবং 'প্রাণিপুর' নামক তৃতীয় প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সুসমৃদ্ধ পুরীর তুল্য এ পর্য্যন্ত কিছুই দেখেন নাই। উহাতে নানাবিধ শিল্পযন্ত্র চলিতেছে, ভোগ-বিলাসসামগ্রী সমস্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে, এবং কত প্রকার কল কৌশল যে নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ব্রাহ্মণের চমৎকারজনক জ্ঞান জন্মিল। তাঁহার চমৎকারের এই একটি বিশেষ কারণ, তিনি দেখিলেন যে, ঐ সকল যন্ত্রের পরিচালন প্রভাবে এক একটি প্রকোষ্ঠ সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পুরীর সর্ব্বোচ্চ 'নর প্রকোষ্ঠে' অধিরোহণ করিলেন। ঐ প্রকোষ্ঠ সপ্ততল। তিনি প্রথম ছয় তল উত্তীর্ণ হইয়া শীর্ষতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, প্রকোষ্ঠের সর্ব্বস্থান হইতে ঐ খানে সংবাদাদি আসিতেছে এবং তথা হইতে সর্ব্বত্র অনুজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কে যে ঐ সকল সংবাদগ্রহণ এবং অনুজ্ঞাপ্রচার করিতেছে, তাহা দৃষ্ট হইতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে স্মৃতি, ধৃতি, চিন্তা, মনন, বিচারণ প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রী পুরুষের বিভূতি দৃষ্ট হইল। ইহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছে—কেহ ক্ষণকালের জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারে না। ইহাদিগের প্রতি একটি কঠিন

নিয়মও প্রচলিত রহিয়াছে, বোধ হইল। ইহারা যদি ভ্রমক্রমেও একবার স্বস্থান ত্যাগ করে অথবা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভিন্ন আর কিছু করিতে যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ইহারা কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও আবার পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহারা কাহার আজ্ঞাপালন করিতেছে? কে ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছে? কাহা-কর্ত্তৃকই বা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান হইতেছে? এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন যে, একটি অদৃষ্টপূর্ব্বা লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি নিরন্তর ইহাদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। ইঁহার প্রতি কোন নিয়ম নাই—কোন নিয়মভঙ্গদোষের দণ্ডবিধানও নাই। ইনি একা—স্বাধীনা, সকলের কর্ত্রী এবং বিধাত্রী রূপেই অধিষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু যতই ঐ লাবণ্যময়ীর প্রতি দৃষ্টি করা যাইতে লাগিল, ততই একটি অভুত-পূর্ব্ব ভাব হৃদয় মধ্যে জাগরিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন ঐ মূর্ত্তি এমন একটি পরমজ্যোতির ছায়া যে, তাহার ছায়াও আলোকময়ী।

ঐ প্রখর জ্যোতিঃপ্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, ব্যাসদেবের মোহভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন, পার্শ্বভাগে মহামুনি মার্কণ্ডেয় দণ্ডায়মান এবং পূর্ণ শশধর গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া সুস্নিগ্ধ করস্পর্শে তাঁহার শরীর অমৃতসিক্তবৎ করিতেছেন; চতুর্দ্দিকে পাদপগণের হরিতপল্লব সমস্ত সুমন্দ সঞ্চারিত হইয়া পত পত শব্দে বীজন করিতেছে, বিহগকুল সানন্দকলরবে বিশ্রামসুখ-কামনায় স্ব স্ব নীড়াভিমুখে যাইতেছে, এবং অনতিদূরে তড়াগত্রিতয়ে বিমল জলরাশি স্ব স্ব বক্ষে জলজ কুসুমহার ধারণ করিয়া আনন্দে ঢল ঢল করিতেছে। আর সে মরুভূমিই নাই—সে রৌদ্রসন্তাপ নাই—সে আঁধি নাই—নৈরাশ্য এবং যথেচ্ছাচারিতার অধিকার নাই। ঐ স্থান কোন মহৈশ্বর্য্যশালী অধিরাজের আরাম-নিকেতন।

ভগবান মার্কণ্ডেয় স্মিতমুখে কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস, সাধু! তুমিই এই পরম পবিত্র পুষ্কর মহাতীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত হইলে। কনিষ্ঠ, মধ্যম, জ্যেষ্ঠ, পুষ্কর-ত্রিতয় মূর্ত্তিমান হইয়া তোমাকে দেখা দিয়াছেন, তুমি বিধাতৃসৃষ্ট ত্রিবিধ সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য অবগত হইয়াছ। তুমি অচ্ছেদ্য অভেদ্য সর্ব্বব্যাপী নিয়মশৃঙ্খল দেখিলে। তুমি ভয় শোক সন্দেহাদির অতীত হইলে। যে অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়া আত্মার প্রসাদে ভগবান ব্রহ্মা এই মরুদেশে এই মহাতীর্থত্রয় সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাময়ীও তোমাকে আপন বিভূতি পরিদর্শন করাইয়া তোমার

হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ভ্রম, প্রমাদ, নাস্তিক্যাদি পিশাচগণ আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তুমি সর্ব্বসিদ্ধিলাভের পথে পদার্পণ করিলে; তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য থাকিল না, তুমি স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হইলে—চল।"

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভাস-দর্শন—দৈন্য—আশা—প্রজ্ঞা

রাত্রি প্রভাত হইলে সৃষ্টির পুনর্জ্জন্ম হইল। দুইটি তীর্থবাসী ব্রাহ্মণ পুষ্কর মহাতীর্থে স্নানতর্পণাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পশ্চিমোত্তরাভিমুখে 'প্রভাস' নদীর তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, গম্ভীরস্বভাব ও প্রশান্তমূর্ত্তি; অপর মধ্যবয়স্ক, তেজস্বীপ্রকৃতি এবং অনুসন্ধানপরায়ণ। বৃদ্ধের দৃষ্টি সম্মুখভাগে, মধ্যবয়ার চক্ষুঃ চতুর্দ্দিগ্‌গামী।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মধ্যবয়া কহিলেন—"আর্য্য! এই ভূভাগ নিতান্ত বিশুষ্ক। এখানকার শস্যসম্পত্তি অতি সামান্য। লোকের বাস আছে বটে—কিন্তু গ্রামগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র; অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। কণ্টকী এবং বনখর্জ্জুরবৃক্ষসমাকীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবতী বসুধার ক্রোড় এরূপ জনশূন্য দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ জন্মে।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"এই ভূভাগ পূর্ব্বে এমন অনুর্ব্বর এবং জনশূন্য ছিল না। সত্যযুগে ইহা সাগরতলস্থ ছিল, অনন্তর বিন্ধ্যাচলের উত্থানসহ এই প্রদেশ জন্মে এবং ত্রেতা ও দ্বাপরে অতিনিবিড়বনাকীর্ণ হয়। ঐ সময়ে রাক্ষস-সন্তান জটাসুরগণ ঐ বনে বিচরণ করিত। পরে যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা ঐ রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিয়া এই ভূমি অধিকার করেন। এখনও তাঁহাদিগেরই সন্তানেরা এখানে বাস করিতেছেন। ঐ যে লাঙ্গলস্কন্ধ বীরাবয়ব মনুষ্যটি আসিতেছে, ও একজন যাদব।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আপন সম্মুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। মধ্যবয়া সেই নির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, অনতিদূরে একজন সুদীর্ঘকায় কৃষীবল-বেশধারী পুরুষ দণ্ডায়মান। মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ ঐ পুরুষের সমীপবর্ত্তী হইয়া সুমধুরস্বরে আশীর্ব্বচন প্রয়োগপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন্

জাতীয় ? তোমার আবাসগৃহ কোথায় ?” কৃষীবল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “আমি যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়সন্তান, আমার থাকিবার স্থান ঐ পর্ণকুটীর।” ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তোমার মুখাবয়বে বোধ হইতেছে তুমি কোন সুমহৎদুঃখভার বহন করিতেছ—যদি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বচনের দুঃখপ্রতিবিধান ক্ষমতায় শ্রদ্ধা থাকে, তবে আত্মবিবরণ বল।” যাদব নতশির হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল, “যদি ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের অনুগ্রহ হয়, তবে অগ্রসর হইয়া ঐ কুটীরটিকে পদরজ দ্বারা পবিত্র করুন, অধমের বিবরণ পরে শ্রবণ করিবেন।” ব্রাহ্মণেরা কুটীরাভিমুখে চলিলেন, যাদব পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তাঁহারা কুটীর দ্বারে উপনীত হইবামাত্র একটি স্ত্রীলোক বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের চরণবন্দন করিল। যাদব তাহার পরিচয় দিল—“ইনি আমার গৃহিণী।” মধ্যবয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—“পুত্রলাভ হউক।” যাদব অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিল—“ঠাকুর! ঐ আশীর্ব্বাদটি করিবেন না। আমাদিগের সন্তানকামনা নাই।” মধ্যবয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এরূপ কেন ? গৃহিব্যক্তির পক্ষে সন্তান যেমন নয়নানন্দকর, যেমন চিত্তপ্রসাদজনক, তেমন পদার্থ ইহসংসারে আর কি আছে ? যাহার সন্তান জন্মে নাই, সে জীবলোকের সার্থকতালাভ করে নাই—তাহার গৃহবাস বিড়ম্বনা—তাহার ঘর অন্ধকার।” যাদব এ কথায় কোন উত্তর করিল না। নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আশীর্ব্বাদ গ্রহণে নিতান্ত অনভিরুচি প্রদর্শন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন, “হে যাদব! তুমি ক্ষুব্ধ হইও না —এক্ষণে ওসব কথায় কাজ নাই—বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে—আমরা তোমার অতিথি; ভোজনাবসানে ইনি সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া যথাবিহিত আদেশ করিবেন।” যাদবের ইঙ্গিতক্রমে তাহার পত্নী দুইটি মৃৎকলস লইয়া সমীপবর্ত্তিনী নদী হইতে জল আনয়ন করিতে গমন করিল। যাদব কুটীর হইতে একটি খট্টা বাহিরে আনিল এবং ব্রাহ্মণদিগকে তাহাতে উপবিষ্ট করাইয়া কহিল—“আমি অতি দরিদ্র, আমাকে একবার ঐ গ্রামে যাইতে হইবে—আপনারা কিছু মনে করিবেন না।” যাদব চলিয়া গেল। পরক্ষণেই তাহার পত্নী জল লইয়া আসিলেন এবং এক কলস জল কুটীরদ্বারে রাখিয়া অপর কলসের জল লইয়া একে একে ব্রাহ্মণদ্বয়ের পদ ধৌত করিয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের একদেশ সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কৃত এবং জল দ্বারা ধৌত করিয়া রন্ধনের স্থান প্রস্তুত করিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে যাদব খাদ্যসামগ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং সেসকল কুটীরের ভিতর রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পাকারম্ভ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—“তোমার গৃহে আমাদিগের স্বহস্তে পাক করিবার প্রয়োজন

নাই। আমরা পরিব্রাজক। পান ভোজনাদিতে আমাদিগের স্পর্শদোষ হয় না; বিশেষতঃ, তোমার গৃহিণী সৎকুলসম্ভবা, সাক্ষাৎদেবীরূপিণী। উঁহার রন্ধনগ্রহণে আমাদিগের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।" অনন্তর রন্ধন সমাপন হইলে ব্রাহ্মণদিগের, যাদবের এবং যাদবপত্নীর ক্রমে ক্রমে ভোজন সমাপন হইল।

সন্ধ্যাকালে মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ যাদবকে আত্মবিবরণ কহিতে অনুরোধ করিলেন। যাদব ক্ষণকাল নতশিরে নীরব থাকিয়া হঠাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিল—"এখানে নয়, মহাশয়েরা আমার সমভিব্যাহারে আসুন।" ব্রাহ্মণেরা তাহার সহিত চলিলেন। অনন্তর নদীকূলবর্ত্তী একটি উচ্চস্তূপের উপরে উঠিয়া যাদব সেইখানে ব্রাহ্মণদিগকে বসাইয়া আপনি বসিল এবং দক্ষিণে ও বামে তিন চারিবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল।

"আপনারা দক্ষিণভাগে নদীর অপর পারে দৃষ্টি করুন, একটি সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইবেন—উহাই আমার পিত্রালয়। আর বামভাগে, এই আমার পর্ণকুটীর। ঐ রাজপ্রাসাদ কিরূপে এই পর্ণকুটীরে পরিণত হইয়াছে, তাহাই আপনারা শুনিতে চাহিতেছেন।" যাদব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—"পরিবর্ত্তনই কালধর্ম্ম। সকলেরই নিরন্তর পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে। যে রাজভবন ছিল, সে পরিবর্ত্তিত হইয়া পর্ণকুটীর হইতেছে—আবার যে পর্ণকুটীর ছিল, সে পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজভবন হইতেছে। তোমার পিতৃবাস যদি পর্ণকুটীর হইত, তবে তুমি এক্ষণে রাজভবনে বাস করিতে—তোমার বাস পর্ণকুটীরে হইয়াছে—তোমার পরবর্ত্তী পুরুষদিগের বাস রাজপ্রাসাদ হইতে পারে।" বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টিপাত-সহকৃত এই কথাটি অগ্নিশিখার ন্যায় যাদবের হৃদয়ে প্রবেশ করিল—তথায় চিরনির্ব্বাপিত আশাপ্রদীপ একবার প্রজ্বালিত করিয়া দিল—তাহার মুখমণ্ডলে ঐ দীপপ্রভা স্ফুরিত হইয়া উঠিল—সে কহিতে লাগিল—

"চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, এই সমস্ত দেশ আমার পিতার ভূম্যধিকার ছিল। পিতা অতি প্রশস্তমনা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আত্মপর বোধ ছিল না। তিনি অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব লইয়া থাকিতেন। কেহ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিলেও তিনি দণ্ডবিধান দ্বারা তাহার ক্ষতি করা অপেক্ষা আপনার ক্ষতিস্বীকারে সম্মত হইতেন।

"কিছুকাল এইরূপে গত হইল। অনন্তর সিন্ধুপার হইতে তাঁহার একজন জ্ঞাতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ম্লেচ্ছদেশে বাস করিয়া ম্লেচ্ছাচার এবং

পৈতৃকধৰ্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। তথাপি সে শরণ-প্রার্থনা করিলে পিতা তাহাকে স্থান দিলেন। নিজ বাটীতে রাখিলেন না। বাটীর বহির্ভাগে একটি সামান্য দোকান খুলিয়া সে আপনার দিন গুজরান করিতে লাগিল।

"আমাদের পরিবার অতি বৃহৎ। অনেক জ্ঞাতি কুটুম্বের একত্র বাস। এমত বৃহৎ গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে কখন কখন পরস্পর অনৈক্য এবং মনোবাদ সঙ্ঘটন কোন মতেই অসম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঐ সকল বিবাদ দুই দিনে দশ দিনে আপনা-আপনি মিটিয়া যাইত। বাহিরের কাহাকেও মধ্যস্থ মানিতে হইত না। গৃহচ্ছিদ্রও প্রকাশ পাইত না।

"কিন্তু ঐ চতুর দোকানদারের আগমন অবধি আর সেরূপ হইল না। কোন বিবাদের সূত্র উপস্থিত হইলেই সে অপ্রকাশ্যভাবে তাহাতে যোগ দিত এবং প্রায়ই মোকদ্দমা না বাধাইয়া ছাড়িত না। মোকদ্দমা বাধিলেই সে এমনি সুকৌশলপূর্ব্বক কখন এ পক্ষের কখন ওপক্ষের সহায়তা করিত যে প্রতি মোকদ্দমাতেই উভয় প্রতিপক্ষের ক্ষতি হইয়া তাহার লাভ হইত। কিন্তু এরূপ দেখিয়াও কেহ কখন তাহার প্রতি তেমন অবিশ্বাস করিতে পারিত না।

"ফল কথা, তেমন ধূর্ত্ত, স্বার্থপর এবং ক্ষমতাশালী পুরুষ ভূভারতে আর কখন আইসে নাই। সে ক্রমে ক্রমে সকলকেই স্ববশীভূত করিয়া আনিল, জমিদারীর দেওয়ানীভার পর্য্যন্ত তাহার হস্তগত হইয়া গেল। তাহার পর আর কি বলিব? দেওয়ানজী জমিদার হইয়া উঠিলেন—আমরা পর্ণকুটীরবাসী হইলাম!

"এক্ষণে দেখুন, কি ছিলাম কি হইয়াছি! আমি ভূম্যধিকারীর সন্তান হইয়া লাঙ্গলবহন করিতেছি, আমার সন্তান হইলে সে কি হইবে? আমাদিগের সব ফুরাইয়া গেলেই ভাল হয়। দুঃখ-পরিতাপ-কলঙ্ক-বাহিনী এই পঙ্কিল জীবননদী শুষ্ক এবং বিলুপ্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ!"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই কথাবসরে মধ্যবয়ার শিরোদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন। যাদবের হৃদয়বিদারক শেষের কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং যাদবের করগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন—"চল, এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গিয়া তোমার পিত্রালয়ের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আসি। আর্য্য ঠাকুর তোমার কুটীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই স্থানে আমাদিগের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিবেন।"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন। যাদব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নদীতে জল অল্প। উভয়ে অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া প্রাসাদমধ্যে প্রবিষ্ট

হইলেন। যাদব ঐ ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র এমনি এক প্রখর আলোকশিখা তাহার চক্ষুকে আহত করিল যে, তাহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে, এবং পতননিবারণার্থ সহচর ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া থাকিতে হইল। ক্ষণকাল পরে নেত্রোন্মীলন করিল—কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে দেখিল, তাহার সম্মুখে একটি মহতী রাজসভা। সভার মধ্যভাগে একখানি রত্নময় সিংহাসন। সেই সিংহাসনে একজন রাজচক্রবর্ত্তী অধিষ্ঠিত। রাজার সম্মুখভাগে রাজার অনুরূপরূপ একটি যুবা পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। রাজা ক্রোধ-কষায়িত লোচনে ঐ যুবার প্রতি নির্নিমেষ-দৃষ্টিপূর্ব্বক সজলজলদগভীরস্বরে কহিতেছেন—"তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও রাজ্যভ্রষ্ট হইলে। তোমার বংশে রাজ্যাধিকার লোপ হইল। তোমার সন্তানেরা কেহ কখন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে না।" যুবা ম্লানবদনে বিনয়নম্রস্বরে কহিল—"কখনই পাইবে না?" রাজা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন—"যতদিন তোমার বংশে সেই মহাপুরুষ অবতীর্ণ না হইবেন, যাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া কনিষ্ঠের পুত্রেরা জ্যেষ্ঠের পুত্রদিগকে অতিক্রম করিবে, ততদিন তোমার বংশীয়েরা কনিষ্ঠের বশ্যতা স্বীকার করিবে—রাজপদ অধিকারে সমর্থ হইবে না।"

ব্রাহ্মণ যেন যাদবের মানস প্রশ্নেরই উত্তরে তাহার কর্ণকুহরে কহিলেন—"ইনি মহারাজ যযাতি—ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তোমার কুলের আদি পুরুষ যদুকে অভিশপ্ত করিয়া রাজ্যচ্যুত করিলেন।" যাদব এই কথা শুনিয়া যেন মনে মনে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপ্রদত্ত 'পুত্রলাভ' আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজসভার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সে সভাগৃহ—সে সিংহাসন—সে রাজা—সে রাজপুত্র—সে রাজমন্ত্রিবর্গ—সকলই গিয়াছে। ঐ সকলের স্থানে একটি প্রশস্ত কারাগৃহ; সেই গৃহমধ্যে নিগড়িতকরচরণা সুবৃহৎপাষাণভারাক্রান্তা একটি মনোজ্ঞা কামিনী এবং সেই কামিনীর পার্শ্বদেশে একজন প্রশান্তমূর্ত্তি চিন্তাকুলচিত্ত মহাপুরুষ। তেমন রূপবতী কামিনীর তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে পাষাণেরও হৃদয় করুণার্দ্র হয়। ঐ স্ত্রী পুরুষ কে? কোন্ নিষ্ঠুর নরাধম উহাদিগের ওরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে? ব্রাহ্মণ যেন যাদবের ঐ মানস প্রশ্নের উত্তরদান করিয়াই মৃদুস্বরে কহিলেন—"কংসাসুর-কারাগৃহে দেবকী-বসুদেবকে দেখিতেছ।"

যাদব নির্নিমেষনয়নে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটি প্রভারাশি ঐ অন্ধতমসাচ্ছন্ন আগার আলোকিত করিল। দেখিতে দেখিতে

সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকরাশি হইতে এক একটি করিয়া সাতটি শিশুমূর্তি বাহির হইল। তাহারা একে একে গিয়া দেবকীর এক একটি বন্ধননিগড় মোচন করিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার ঐ প্রভামধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

শুদ্ধ তাহারাই বিলীন হইয়া গেল এমত নহে, সেই ভগ্নপ্রাসাদ এবং সেই যাদবও তৎসহ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বেদব্যাস দেখিলেন, তিনি সেই প্রভাস নদীতীরে দণ্ডায়মান, মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শপূর্ব্বক কহিতেছেন —"সাধু বেদব্যাস, সাধু! তুমি প্রভাস তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী আশামহাদেবীকে প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি আর্য্য যাদবকুলের হৃদয় হইতে রাজ্যাপহারজনিত শোকান্ধকার তিরোহিত এবং তথায় আলোকমালা প্রভাসিত করিতে সমর্থ হইলে।"

ব্যাসদেব মহামুনির চরণযুগলে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিরাজ! অদ্যকার সমস্ত ব্যাপারই কি আপনার মায়ামাত্র? যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার কোন ঘটনাই কি প্রকৃত নহে?"

মার্কণ্ডেয় ব্যাসদেবের শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন—"যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়গণের অনুভূতিও বিভিন্নরূপ। কোন পদার্থের ত্বাচ প্রত্যক্ষ, কাহারও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, কাহারও শাব্দ প্রত্যক্ষ এবং কাহারও ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ হয়। তেমনি বিষয়ভেদে কাহারও অনুভব যুক্তিদ্বারা, কাহারও স্মৃতিদ্বারা, কাহারও আশাদ্বারা হইয়া থাকে। বাহ্য জগতে যাহার ত্বাচ প্রত্যক্ষ না হয়, তাহাই কি অলীক এবং অপ্রকৃত বস্তু? কখনই নহে। তেমনি বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেই কোন ব্যাপার অলীক এবং অসত্য বলিয়া অবধারিত হইতে পারে না। তুমি এই পুণ্যতীর্থ হইতে ত্রিগণ্ডুষপরিমিত বারি পান করিয়া আইস।"

ব্যাসদেব তাহাই করিলেন, এবং করিবামাত্র বুঝিলেন এবং বলিলেন—"ধীশক্তি এবং স্মৃতিশক্তির বিষয়সমস্ত যেমন সত্যপূত এবং সসার, আশাবৃত্তির বিষয়গুলিও সেইরূপ সত্যপূত এবং সারবান্। আমি দেখিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণজননী দেবকীর প্রথমদ্বিতীয়াদিগর্ভজাত শিশুগুলি প্রত্যেকেই তাঁহার কারাবাসমোচনের পক্ষে অষ্টমগর্ভজাত মহাপুরুষের তুল্য সহায়। প্রথমাদি না হইলে কদাপি অষ্টম জন্মিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ নারদ তপোধন তাহাই কংসাসুরকে 'পণ-পূরণ' ন্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস, সাধু! তোমাতে প্রজ্ঞা মহাদেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। তুমি অন্তর্বহিঃ প্রভাস-পূত হইলে—চল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাহা—অভূ—সৃষ্টি—অগ্নিকুলোৎপত্তি—সংস্কৃতি

প্রভাসনদী রাজস্থানের অন্তর্গত অর্ব্বলী পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে নির্গত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদ্বয় ঐ নদীর কূলে কূলে গমন করত ঐ পর্ব্বতসমীপে উপনীত হইলেন এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ 'অভূ' নামক শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ঐ শিখরটি একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড মাত্র। রৌদ্র, জল ও বায়ুর প্রভাবে স্থানে স্থানে অল্প অল্প ফাটিয়া গিয়াছে, এবং সেই সকল বিদীর্ণ স্থলে ভস্মের ন্যায় আপীতবর্ণ দগ্ধ মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়াতে ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ গুল্ম জন্মিবার অবকাশ হইয়াছে। পর্ব্বতীয় পথ একান্ত বন্ধুর এবং কুটিল—কোথাও কোথাও অত্যন্ত দুরারোহ।

ব্রাহ্মণেরা ঐ শিখরের শিরোদেশে উঠিয়া তথায় একটি দেবমন্দির দেখিলেন, এবং তাহার বহির্ভাগে একটি শিলাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেন। মধ্যবয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"আর্য্য! আমার বোধ হইতেছে যে, প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধীভূতা পৃথিবী পুনরুজ্জীবিতা হইলে তাঁহাকে এইরূপ দেখায়। ধরিত্রী যেন অম্বরমণ্ডলের প্রতি অনিমিষদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সদ্যোজাতা কুমারীর ন্যায় বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাবের প্রতিমাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।" বৃদ্ধ কহিলেন—"ওরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে। এই স্থান ভগবতী ব্রহ্মপত্নী স্বাহাদেবীর পবিত্র আবির্ভাবক্ষেত্র। স্বল্পকাল হইল মহাদেবী চতুর্ম্মুখের সমভিব্যাহারে এইস্থানে দর্শন দিয়াছিলেন। যে বিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান-চতুষ্টয় উদ্গীরিত, বর্ণাশ্রম চতুর্থ বিভাজিত, চতুর্ব্বেদ উদ্গীত, চতুঃসংস্কার সংস্থাপিত, অগ্নিই সেই চতুর্ম্মুখের প্রত্যক্ষরূপ। স্বাহাদেবী অগ্নিশক্তি। স্বাহাই পরিবৃত্তি—স্বাহাই সংস্কৃতি—স্বাহাই সৃষ্টি। তুমি মহাদেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ কর।"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল, অন্ধতমসাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশ মধ্যে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্বদিক্ শূন্য, কোথাও কিছু নাই। পাদতলস্থ পৃথিবী নাই, আলোক নাই, শব্দ নাই। তিনি স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার শরীর স্পন্দননিবৃত্ত হইল; চিত্তবৃত্তি স্থগিত হইল; দিগ্‌জ্ঞান, কালজ্ঞান, অস্তিত্বজ্ঞান তিরোহিত হইল; দিগ্‌গণ সঙ্কুচিত হইল;

ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান সম্মিলিত হইল এবং সমুদয় একীভূত অভূ হইয়া গেল!

কতক্ষণ কিরূপে ঐ ভাব ছিল, কে বলিবে? এক মুহূর্ত্তও যাহা, এক কল্প, কি শত কল্পও তাহা।—হঠাৎ পতিপরায়ণা কামিনীর কমনীয় ভুজবল্লী যেমন কান্তের গলদেশ আলিঙ্গন করিতে যায়, সেইরূপ একটি পরম জ্যোতির্ম্ময়ী বাহুলতা যেন ঐ অনন্ত অভূর আলিঙ্গনে উদ্যম করিল। আর, নিদ্রাভিভবের ভঙ্গাবস্থায় যেমন স্বপ্নদর্শন হয়, সেইরূপ বোধ হইল যেন, নির্ম্মল-নীলিম-নভোমণ্ডল-নিভশ্যামল পুরুষশরীর কোন প্রভাময়ীর ভুজবল্লী দ্বারা আলিঙ্গিত রহিয়াছে, এবং শত শত সূর্য্যকান্তমণি, শত শত চন্দ্রকান্তমণি, শত শত মরকতমণি, এবং শত শত হীরক-মুক্তা-প্রবালাদির গুচ্ছ সেই অনুপম শরীরের শোভাসম্পাদন করিতেছে।

ব্যাসদেবের শরীরে স্পন্দনশক্তির পুনরাবির্ভাব হইল। একটি অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যমণির প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন মণিটি সর্ব্বক্ষণ ঝল্ ঝল্ করিয়া চতুর্দ্দিকে সুতীব্র কিরণজাল বিস্তৃত করিতেছে। তাঁহার ইহাও বোধ হইল যে, ঐ মধ্যমণির চতুর্দ্দিকে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্ন সজ্জিত রহিয়াছে; তাহার একটি রক্তবর্ণ—একটি পীতবর্ণ—কয়েকটি শুভ্রবর্ণ—এবং একটি হরিদ্বর্ণ।

ঐ মধ্যমণিই বুঝি ভগবানের বক্ষোদেশস্থ কৌস্তুভ—ব্যাসদেব এইরূপ অনুমান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার দর্শনশক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, যাহাকে সূর্য্যকান্তমণি অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা একটি অতি প্রকাণ্ড পদার্থ—অগ্নিতেজ নিরন্তর ঘর্ ঘর্ করিয়া ঘুরিতেছে এবং অতি প্রচণ্ডভাবে বিলোড়িত হইতেছে। তাহার অভ্যন্তর হইতে জ্বলন্ত পদার্থরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া এই উঠিতেছে, এই পড়িতেছে। ঝঞ্ঝাবায়ু-বিলোড়িত সাগরবক্ষোদেশ যে সকল পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গনিচয় উৎক্ষিপ্ত করে, সে তরঙ্গমালা ঐ অগ্নিতরঙ্গের কোটিতম ভাগের একভাগও হইবে না; নগরদাহে যে প্রকার গগনস্পর্শিনী অনলশিখা উত্থিত হয়, তাহাও ঐ অগ্নিশিখাসমস্তের নিকট কিছুই নহে। ব্যাসদেব ইহাও দেখিলেন যে, ঐ মধ্যমণির চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নরাজি ঐ অগ্নিপিণ্ড-বিনির্গত স্ফুলিঙ্গমাত্র। সে সকলেও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান; তাহারাও নিরন্তর বিঘূর্ণিত এবং বিলোড়িত হইতেছে। ঐ রত্নরাজিমধ্যে যেটিকে হরিদ্বর্ণ দেখিয়া ব্যাসদেবের নয়ন বিশিষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, সেইটি সর্ব্বাপেক্ষায় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হওয়াতে তাহার প্রতি তিনি বদ্ধদৃষ্টি হইলেন—দেখিলেন উহাতেও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান এবং সেই অধিষ্ঠানের প্রভাবেই উহার বাহ্য অন্তর

সর্ব্বত্র স্পন্দন হইতেছে। উহার কোন ভাগ, কোথাও পর্ব্বতরূপে উত্থিত হইতেছে, কোথাও দ্রোণিরূপে নামিতেছে, কোথাও জলরূপে চলিতেছে, কোথাও বায়ুরূপে বহিতেছে, কোথাও ধাতুরূপে সংহত হইতেছে, কোথাও বৃক্ষরূপে বাড়িতেছে এবং কোথাও প্রাণিরূপে চলিতেছে। ব্যাসদেব বুঝিলেন, যে ইহাই মানবজাতির অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী। তৎক্ষণাৎ 'ভূ র্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত এবং মন্দির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ব্যাসদেবের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সম্মুখভাগে কি দেখিতেছ?" ব্যাসদেব কহিলেন—"চারিটি কুণ্ড দেখিতেছি এবং এক একটি কুণ্ডের পার্শ্বে এক একজন মহর্ষি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতেছি—তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমীপে এক এক জন বিকটাকার মনুষ্যও দৃষ্ট হইতেছে।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"মহর্ষিগণ কি করেন মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দর্শন কর।"

ব্যাসদেব দেখিতে লাগিলেন—এক জন ঋষি "ভূর্ভূবঃ স্বঃ স্বাহা" মন্ত্রের উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থিরবিদ্যুন্নিভ একটি দেবীমূর্ত্তি কুণ্ড হইতে উত্থিতা হইলেন এবং ঋষিকৃত পূজা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ঋষি আপন সমীপবর্ত্তী বিকটাকার নরপশুর কর্ণকুহরে মন্ত্রদান করিলেন, এবং দেবী সহাস্যমুখে আপন জ্যোতির্ম্ময় হস্ত দ্বারা তাহার শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। দেবীর করস্পর্শ প্রভাবে ঐ মনুষ্যের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে আর বিকটদর্শন এবং বিকৃতবেশ রহিল না—অসামান্য বীর্য্যশালী রাজচক্রবর্ত্তীর রূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অপর তিন জন ঋষিও ঐরূপ করিলেন—তাঁহাদিগেরও পূজা গৃহীত হইল, তাঁহাদিগের শিষ্যেরাও দেবীর করস্পৃষ্ট হইল, এবং রূপান্তরপ্রাপ্ত হইয়া দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। হঠাৎ সমুদয় তিরোহিত হইয়া গেল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "ঐ যে চারি জন ঋষিকে দেখিলে উঁহারা জমদগ্নি, পরাশর, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র কুল হইতে সমুদ্ভূত। উঁহাদিগের শিষ্যেরা আদৌ খস, ভিল্ল, পুলিন্দ, ও কোল নামে অভিহিত ছিল। স্বাহাদেবীর করস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া উহারা প্রমার, প্রতীহার, রথোড় এবং চৌহান নাম প্রাপ্ত হইল। সমাজভ্রংশকারী ধর্ম্মবিপ্লাবক রাজন্যবর্গের বিনাশসাধনার্থ এই অগ্নিকুলের সৃষ্টি। তুমি তাহাই স্বচক্ষে দেখিলে।

"অসৎ হইতে সৎ জন্মে না। অনন্ত অভূ হইতে পরম পুরুষের আবির্ভাব। তাঁহার হৃদয়াকাশস্থিত কৌস্তভরূপী সূর্য্যশরীর হইতে গ্রহপৃথিব্যাদির উৎপত্তি। পৃথিবী হইতে জীবসংঘ। বহু নিকৃষ্টজীবশরীরের পরিণামে মানবদেহ।

"সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপস্বরূপ মানবশরীরেই দেখ, অভক্ষ্য পদার্থ সমূহ কেমন অগ্নিযোগে পরিবর্ত্তিত এবং বিশোধিত হইয়া ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইতেছে; ঐ ভক্ষিত পদার্থ জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইয়া মাংস অস্থি মজ্জা রূপ ধারণ করিতেছে; অচেতন জড় চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া স্পন্দন, মনন, চিন্তনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে।

"সমুদয়ই স্বাহা মহাদেবীর লীলা। প্রকৃতিবাদীরা তাঁহাকে আকর্ষণী বলেন, কারণ তিনি শক্তি। সাদিবাদি পাশুপতেরা তাঁহাকেই সৃষ্টি বলিয়া থাকেন, কারণ তিনি আদ্যা। অধ্যাত্মবাদীদিগের চক্ষুতে তিনি ইচ্ছাময়ী, কারণ তিনি জ্ঞানাগ্নিশিখা। তাঁহার পবিত্র মহামন্ত্র 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা'।

"ব্যাসদেব! তুমি ঐ মন্ত্রের প্রভাব পরিজ্ঞাত হইলে। তুমি জানিলে যে, কিছুই নূতন সৃষ্ট হয় না। যাহা আছে তাহা—দ্রবীভূত—পরিবর্ত্তিত—সংস্কৃত করা বই কার্য্যান্তর নাই। তোমার জ্ঞানাগ্নি তৎকার্য্যে সক্ষম হইল। স্বাহাদেবী যেমন পূর্ব্বাচার্য্যদিগের আবাহনে আবির্ভূতা হইয়া অনাচার বর্ব্বর পিশাচ-সন্তানদিগকে বিশোধিত এবং রাজচক্রবর্ত্তীর পদযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন। তোমার অগ্নিসংস্পর্শেও অনাচার আচারপূত হইবে, অসংস্কৃত সংস্কারবিশিষ্ট হইবে এবং বিভেদ অভেদ হইবে—চল।"

সপ্তম অধ্যায়

দ্বারাবতী—সৃষ্টির উপাদান—সম্মিলনোপায়—প্রীতি

অর্ব্বলী পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে মাড়বার প্রদেশ। ঐ দেশটি নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমি বলিলেই হয়। কিন্তু ভূমি অনুর্ব্বরা হইলেও দেশবাসিগণ দুঃস্থ বা দরিদ্র নহে। তাহাদিগের নগরগ্রামাদি বিলক্ষণ বর্দ্ধিষ্ণু। প্রজাবর্গ সবলকায়, শ্রমশীল এবং পরস্পর সহায়তাকরণে উন্মুখ। তাহারা পরিচ্ছন্ন, মিতব্যয়ী, মিতাচারী, বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণ এবং বিদেশগমনে উৎসাহশীল। ইহারা অনেকেই বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। কিন্তু অন্যান্য দেশীয় বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহারা সনাতনধর্ম্মবিদ্বেষী নহে। ভগবান জিন বুদ্ধদেব ইহাদিগকে একপ্রকার সনাতন ধর্ম্ম-পান্থই করিয়া গিয়াছেন।

মাড়বার উত্তীর্ণ হইয়া আরও পশ্চিমদিকে গমন করিলে সিন্ধুপ্রদেশে উপনীত হইতে হয়। সিন্ধুদেশ একটি প্রকাণ্ড সমতল ক্ষেত্র। উহার কোন স্থান উচ্চাবচ বোধ হয় না। দেশটি অধিকাংশই বালুকাময় কিন্তু সিন্ধুনদের উপকূলভাগ সকল কোন কোন স্থানে বিলক্ষণ উর্ব্বরতা ধারণ করে। সিন্ধুদেশের প্রজাসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র। গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কিন্তু কয়েকটি নগর বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী। নাগরিকেরা অনেকেই অহিফেনসেবী এবং মুসলমান-ধর্ম্মাক্রান্ত। কিন্তু ইহারা দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে না। জ্যোতির্ব্বিদগণের যথেষ্ট সম্ভ্রম করে এবং বিপৎপাতের শঙ্কা উপস্থিত হইলে দেবতাদিগের পূজার মাননা করে।

ব্রাহ্মণেরা মাড়বার এবং সিন্ধুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি বাণিজ্যবন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বন্দরে নানাদেশীয় লোক সমাগত হইয়া নানাকার্য্যে ব্যাপৃত। রাজপথ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ। গৃহসমস্ত যেন মধুচক্রের ন্যায় অবিরত অস্ফুটস্বরে স্বনিত। নীলাভ সমুদ্রজল বহুদূর পর্য্যন্ত অর্ণবযান্ এবং নৌকাবৃন্দে পরিব্যাপ্ত। ঐ সকল অর্ণবযানকে কূল হইতে দেখিলে বিহগকুল বলিয়া অনুভূত হয়—কতকগুলি যেন পক্ষবিস্তার করিয়া নীড়াভিমুখে আসিতেছে; কতকগুলি যেন নীড়ত্যাগ করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইতেছে। কোন কোনটি যেন উড্ডয়নারম্ভে পাখাঝাড়া দিতেছে। কোন কোনটি গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া পক্ষসঙ্কোচপূর্ব্বক আপন স্থান খুঁজিয়া বসিতেছে এবং নৌকাবৃন্দ তাহাদিগের শাবকসমূহের ন্যায় ব্যস্তসমস্তভাবে চতুঃপার্শ্ব ঘেরিয়া বেড়াইতেছে।

সত্যযুগে মুনিবর সৌভরি যমুনাজলে একটি মৎস্যচক্র দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছিলেন। মৎস্যমাতা সন্তানসমস্তে পরিবৃতা হইয়া যে সুখভোগ করিতেছিল, তাহা অনুভব করিয়া মুনিবর এমনি প্রীত হইয়াছিলেন যে, গরুড়কে তৎপ্রতি হিংসাপরায়ণ দেখিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন। বাস্তবিক জীবসঙ্ঘ দেখিলেই বিশুদ্ধচেতাদিগের অন্তঃকরণে আনন্দসঞ্চার হয়।

ব্রাহ্মণদ্বয় সেই আনন্দানুভব করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটি বাষ্পীয় পোত বন্দরমধ্যে প্রবেশোদ্যম করিল। তাহার দ্রুত সম্বেগ, জলোদ্ঘট্টন, ধূমোদ্গম, এবং বাষ্পনিঃসারধ্বনি ব্রাহ্মণদিগকে তৎপ্রতি মনোযোগী করিল। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, পোতবর সবলে সমুদ্রলহরী ভেদ করিয়া সর্ব্বমধ্যস্থলে উপনীত হইল। হঠাৎ তাহার কুক্ষিদেশ হইতে ধূমোদ্গম হইয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইল। ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহার আয়স হস্ত প্রসারিত হইয়া সমুদ্রতল স্পর্শ করিল। সে স্থিরভাবে

বিরাজ করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে বাষ্পীয় পোতের দুই পার্শ্বে দুইটি সোপান অবতারিত হইল, এবং সেই সোপানযোগে কতকগুলি শুভ্রকায়, রক্তপরিচ্ছদধারী বীরাবয়ব সৈনিক পুরুষ নৌকাবৃন্দে আসিয়া ক্রমশঃ কূলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা কূলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন—সৈন্যপতির আদেশমাত্র যথাবিধি দলে বিভক্ত হইলেন- এবং সুশাণিত শস্ত্রসমূহে সূর্য্য-বিম্ব প্রতিফলিত করতঃ তূষ্ণীম্ভাবে রাজপথ দিয়া চলিয়া গেলেন। পৃথিবী পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল। মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সকল লোকের বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষুঃ ঐ বাষ্পীয় পোত এবং তদানীত সৈনিক দলের দিকে স্থির হইয়া আছে। বলবিক্রম সামান্য পদার্থ নহে। সকলকেই তাহার গৌরব করিতে হয়। জীবসজ্ঞের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে অন্তরাত্মা প্রফুল্ল এবং পুলকিত হয় বটে, কিন্তু সে মনোভাব কোমল এবং মধুর। ঈদৃশ প্রভাব সম্পত্তি দর্শনে যে ভাব জন্মে, তাহা ঐ অপেক্ষাকৃত মধুর মনোভাবকে তিরস্কৃত করিয়া ফেলে। এই জন্যই একজন পুরুষসিংহ সহস্র সহস্র সামান্য ব্যক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন—এই জন্যই একটি প্রবল জাতি বহুল দুর্ব্বল জাতির প্রতি ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থ হয়। অধীন পুরুষেরা অথবা অধীনজাতীয়েরা সম্মিলিত হইয়া বিপক্ষতা করিলে অবশ্যই কৃর্ত্তৃত্বশালী পুরুষকে কিম্বা জাতিকে পরাভূত করিতে পারে; কিন্তু কর্ত্তৃত্ব এমনি সম্ভ্রমের আধার যে অত্যাচার করা দূরে থাকুক, কেহ তৎপ্রতি অসঙ্কুচিত দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হয় না।

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল চিন্তার গভীরতরচ্ছায়ায় মগ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। দিনমণিও অস্তগমন করিলেন।

বৃদ্ধ কহিতেছেন—"নানাজাতীয় মনুষ্যগণের একত্র সমাগম দর্শনে অতি গভীরতর আনন্দের অনুভব হয়। অনেকত্বের মধ্যে একত্বের প্রতীতি হইতে থাকে। এই বিভিন্নদেশীয়, বিভিন্নজাতীয়, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্নবেশধারী, বিভিন্নকার্য্যব্যাপৃত নরগণ পরস্পর এত পৃথক্‌ভূত হইয়াও একপ্রকৃতিক জীব। সকলেরই তলভাগ, ভিত্তিমূল, গঠনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলতঃ দেশভেদই সকল ভেদের কারণ। ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষাভেদ একমাত্র দেশভেদ হইতেই জন্মে। সুতরাং দেশভেদ রহিত হইয়া গেলে কালে আবার একতা জন্মিবে, সন্দেহ নাই। বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষ্মীর বাস নহে নারায়ণেরও বাস।"

মধ্যবয়া উৎফুল্লনয়নে একতান মনে এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং পরস্পর বিদ্বেষভাব-সম্পন্ন নরগণ

কি কখনও একমতাবলম্বী ছিল?—আবার কখনও কি একমতাবলম্বী হইতে পারে?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"মনুষ্যমাত্রেই আকাশতলে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করে; মনুষ্যমাত্রেই পিতৃ-ঔরসে এবং মাতৃ-জঠরে জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই মূল প্রকৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন শিশুদিগের মধ্যে ধর্ম্মভেদের কোন চিহ্নই থাকে না, প্রকৃত আদিমাবস্থাতেও সেইরূপ। ধর্ম্মভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফল মাত্র।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্য! আমার মন নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে, অতএব যেরূপে শিক্ষাভেদের ফলে ধর্ম্মভেদ জন্মে, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলুন।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"আকাশ এবং পৃথিবী—পিতা এবং মাতা—পুরুষ এবং প্রকৃতি—ইঁহারা যে দেশে যে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সে দেশের মনুষ্যেরা সেইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ করে। যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহ্বায়ত, ও সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্রকূলবর্ত্তী সুতরাং আকাশ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্ব্বতময় সুতরাং পৃথিবীবক্ষ উল্লসিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে স্বর্গারূঢ় হইতে পারেন, এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যে দেশে আয়ত সমতলক্ষেত্র, বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্যই সতত বিদ্যমান তথায় ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মনুষ্যের স্বর্গারোহণ করা এই উভয় প্রকার ধর্ম্মতত্ত্বই লোকের হৃদ্গত হইয়া থাকে।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু এমন ধর্ম্মও আছে, যাহাতে ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না—কিন্তু পরমেশ ভূতলস্থ ব্যক্তিবিশেষকে স্বয়ং দেখা দেন, এরূপ উপদেশ দেয়।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"সমতলক্ষেত্রনিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা মরুস্থলীতে বাস করে, তাহারা পাশু-পাল্য অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা কৃষ্যুপজীবীদিগের ন্যায় এক স্থানে থাকিয়া দিগ্বলয় দর্শন করে না। তাহারা যেমন স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করে, দিগ্বলয়ও অমনি সরিয়া যায়, দেখে। তাহারা আকাশ এবং পৃথিবীর যে, সংযোগ হইয়া রহিয়াছে ইহা নিরন্তর দেখিতেছে—কিন্তু ঐ সংযোগ-স্থানটি তাহাদিগের পক্ষে সচল এবং অনির্দ্দিষ্ট। অতএব তাহারা পরমেশকে শরীরপরিগ্রহ করাইয়া

ভূতলে অবতীর্ণ করিতে পারে না। তবে তিনি মনুষ্যবিশেষকে দেখা দেন, তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করেন এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে।”

বৃদ্ধ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন—“মরুদেশবাসী পাশুপাল্যোপজীবী নরগণের ধর্ম্ম-জ্ঞানে আর একটি অতি গুরুতর ত্রুটি জন্মে। তাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না—সুতরাং কোন স্থানবিশেষের প্রতি তাহাদের মমতাও জন্মে না। তাহারা বিভিন্ন ধাত্রীদিগের পালিত শিশুর ন্যায় মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হওয়াতে মাতৃভক্তিতেও বিমুখ হয়। তাহারা ধরিত্রীর সকল দেশেই যাইতে পারে—সকল দেশেই বাস করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা মাতৃপূজা জানে না। তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীতে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু ঈশ্বরী নাই। সরস-উর্ব্বরক্ষেত্রনিবাসীদিগের মধ্যে ঈশ্বরী-পূজারই বিশেষ গৌরব।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়! কোন কোন লোক সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ঘোর অদৃষ্টবাদী হয়। আবার কেহ কেহ তেমন অদৃষ্টবাদ মানে না—অন্ততঃ কার্য্যতঃ মানে না। এরূপ মতভেদ হয় কেন?”

বৃদ্ধ কহিলেন—“সমতলক্ষেত্রনিবাসিগণ—সেই ক্ষেত্র মরুভূমিই হউক আর সরস উর্ব্বরা ভূমিই হউক—অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়ে। সমুদ্রোপকূলবাসী এবং পর্ব্বতবাসিগণ সে পরিমাণে অদৃষ্টবাদ স্বীকার করে না।

“সমতল ক্ষেত্রের সর্ব্বাবয়ব একেবারেই তন্নিবাসীদিগের নয়নপথে প্রবেশ করিয়া কোথায় কি আছে না আছে দেখাইয়া দেয়—একেবারে তাহাদিগের কৌতূহল তৃপ্তি করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ আছে, এরূপ বোধ জন্মিতে দেয় না। তাহাদিগের মনে, সকলই স্থির, নিশ্চল ও নির্দ্দিষ্ট—এই জন্য জ্ঞানের উদ্বোধ এবং দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এই জন্য তাহারা ঘোর অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকে।

“সমুদ্রোপকূলবাসীরা নিত্য নূতন নূতন ব্যাপার অবলোকন করে। সমুদ্র-বক্ষঃ আজি প্রশান্ত এবং সুস্থির, কালি সফেন-বীচিমালা-বিভূষিত, পরশ্বঃ ঝঞ্ঝাবায়ুবিক্ষোভিত ভয়ানক বস্তু। একই প্রকারে একই নিয়মপ্রবাহে সমস্ত ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, এরূপ মনোভাব সমুদ্রোপকূলবাসীদিগের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্য তাহারা অদৃষ্টবাদী হয় না; তাহারা পরস্পরবিরোধী নরকুলবিদ্বেষী পিশাচ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রভাব স্বতই স্বীকার করিয়া থাকে।

পার্ব্বত্য দেশবাসীরা একেবারে আপনাদিগের নিবাসভূমির সর্ব্বাবয়ব দেখিতে পায় না। তাহারা সর্ব্বদা বন্ধুর এবং কুটিল পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহাদিগের চক্ষে নানা স্থানের নানা প্রকৃতি, নানা বৃক্ষজাতি, নানা ফল পুষ্প, নানা জীব জন্তু সর্ব্বদা প্রতিভাত হয়, সুতরাং তাহাদিগের মনে ভবিতব্যতার স্রোতঃ সর্ব্বক্ষণ সমান বলিয়া বোধ হয় না। মানুষী চেষ্টা ঐ স্রোতকে সংরুদ্ধ, মন্দ, বেগবৎ বা বিকৃত করিতে পারে, এ প্রকার সংস্কার জন্মে। এই জন্য পর্ব্বতনিবাসীরা কুত্রাপি ঘোর অদৃষ্টবাদী নহে। বরং তপশ্চরণ দ্বারা ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, তাহারা এরূপ বিশ্বাসেই বিশ্বাসবান হয়।"

মধ্যবয়া কহিলেন—"কোন কোন মনুষ্যজাতি যে কিরূপে একেশ্বরবাদী হইয়াও ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না এবং ঈশ্বরীপূজায় বঞ্চিত থাকে, তথা একান্ত অদৃষ্টবাদপরায়ণ হয়, তাহা বুঝিলাম। আবার কোন কোন মতাবলম্বীরা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও কিরূপে তাঁহার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের অববোধে অসমর্থ হইয়া থাকে, এবং অদৃষ্টবাদ স্বীকার করে না, তাহাও বুঝিলাম। আর কোন কোন লোক কিরূপে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তির অনুভব করে এবং কার্য্যতঃ অদৃষ্টবাদ স্বীকার করে না, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়কে দ্বৈতবাদী ও ত্রিদেবপূজক দেখিতে পাই। তাহাদিগের দ্বৈতবাদের মূল কি ?—এবং ত্রিদেবপূজাই বা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয় ?—জানিবার অভিলাষ হইতেছে।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তৎসমুদয় লইয়াই প্রকৃতিপরিবার। মনুষ্য সেই পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট এবং সেই পরিবার মধ্যে পালিত এবং শিক্ষিত। যদিও আকাশ এবং পৃথিবী—পিতা এবং মাতা প্রথম শিক্ষার গুরু, অতএব মহাগুরু, তথাপি শিশুশিক্ষায় ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি ক্রীড়াসহচরদিগেরও সামান্য প্রভাব নহে। দিবা, রাত্রি, আলোক, অন্ধকার, গ্রীষ্ম, শীত প্রভৃতির পরিবর্ত্ত অনেক জ্ঞানের মূল। পৃথিবীর যে সকল দেশ শীতপ্রধান, তথায় তাপ এবং দিবার ইষ্টকারিতা এবং অন্ধকার, শৈত্য ও রাত্রির অনিষ্টকারিতা বিশিষ্টরূপেই অনুভূত হওয়াতে অনেকেই একেবারে স্থূল দ্বৈতবাদিতায় বিশ্বাস করে। অনন্তর সূর্য্য, সূর্য্যালোক এবং তজ্জাত স্পন্দনশক্তি তিনই এক, এবং ঐ একই তিন, এই বোধের পরিস্ফুটতা সম্পাদিত হইলে ত্রিদেবজ্ঞান জন্মে।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য! ঐ দ্বৈতবাদী ত্রিদেবপূজকদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি এক প্রকারে ঈশ্বরীপূজা করে, অপর কোন জাতি সেই পূজায়

একান্ত বিমুখ হয়, ইহার হেতু কি?" বৃদ্ধ কহিলেন—"উহাদিগের মধ্যে যাহারা বিশিষ্ট-উর্ব্বরতা-সম্পন্ন দেশে বাস করে, তাহারা ঈশ্বরীপূজাবিহীন হইতে পারে না। কারণ জগৎসবিতা সূর্য্য স্বকীয় বিশুদ্ধ করজালদ্বারা ভগবতী জীবজননীকে আলিঙ্গন করিয়াই যে জীবের উৎপাদন করিতেছেন, তাহা ঐ সকল লোকে সাক্ষাৎ দেখিতে পায়। কিন্তু যে দেশ তেমন উর্ব্বর নহে, অথবা শীতপ্রাবল্যে একেবারে শস্যসম্পত্তিবিহীন হইয়া থাকে, সূর্য্যসমাগম ব্যতিরেকে কিছুই প্রসব করে না, সে দেশের লোকেরা জীবজননী ঈশ্বরীর আরাধনা করিতেও শিখে না।"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ আনন্দোৎফুল্লনয়নে ও গদ্‌গদ্ স্বরে কহিলেন,—"মহাশয়! এই মহাদেশমধ্যে নানা ধর্ম্মভেদ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে প্রগাঢ় চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা আপনার বাক্যাবলীশ্রবণে তিরোহিত হইল। আমি বুঝিলাম যে বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা একদেশবাসী হইলে ক্রমশঃ একধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। আমি ইহাও বুঝিলাম যে, সমুদয় ভূমণ্ডলের সারভূত এবং প্রতিরূপস্বরূপ যে ভূভাগ, সেই ভূভাগেই সর্ব্বাপেক্ষায় উদারতর ধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই দেশেই সর্ব্ব ধর্ম্মের সামঞ্জস্যবিধান এবং একতা সম্পাদন হইবে।"

রাত্রি প্রভাত হইল। ব্রাহ্মণেরা একটি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া চলিলেন। প্রথমে সাগরসলিল কর্দ্দমাক্ত, অনন্তর আপীত, পরে নীল এবং পরিশেষে ঘোর তিমিরবর্ণ দৃষ্ট হইল। চতুর্দ্দিক্ জলময়। নীচে চতুঃপার্শ্বস্থ তরঙ্গমালার ঊর্দ্ধভাগে অনন্তদেবের ফণমণ্ডল বিস্তারিত রহিয়াছে এবং তাঁহারই নিশ্বাসানিল বহিতেছে। পৃথিবীর সৃষ্টিই হয় নাই। চর্ম্মচক্ষুতে এই পর্য্যন্ত দেখা যায়। জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিতে পারিলে ভগবানের নাভিদেশোত্থিত রক্তপদ্মাধিষ্ঠিত চতুর্ম্মুখ সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিয়া সৃষ্টিকার্য্য যে, নিরন্তর চলিতেছে, এই স্মৃতি উজ্জাগরিত থাকে।

অর্ণবপোত নিরন্তর চলিল। অনন্তর সম্মুখে একটি শুভ্রপদার্থ দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে উহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিতে লাগিল। পরে একটি দ্বীপ দেখা গেল, এবং শুভ্রপদার্থটি ঐ দ্বীপমধ্যস্থ দেবমন্দির বলিয়া বোধ হইল। অর্ণবপোত দ্বারাবতীকূলে আসিয়া স্থির হইল। তীর্থযাত্রীরা নৌকাযোগে নামিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণদ্বয় দিবাবসানে দ্বারাবতীধামে উত্তীর্ণ হইয়া রুক্মিণীদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। মন্দিরটি দ্বীপের মধ্যস্থলবর্ত্তী এবং কোন পর্ব্বতোপরি অবস্থিত না হইলেও বিলক্ষণ উচ্চ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পথ দুর্গম নহে, এমনি প্রশস্ত এবং

সহজ যে, সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাদবিক্ষেপ করিলেই গম্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দিরের সৌন্দর্য্যও অতি অপূর্ব্ব। প্রথম হইতেই নয়নকে আকর্ষণ করে, ক্রমে গাঢ়তররূপে অনুভূত হইয়া নয়নযুগল পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে।

মধ্যবয়া কহিলেন—"ভগবান বাসুদেব মানবলীলা সম্বরণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, দ্বারাবতী সমুদ্রগ্রস্তা হইবেন, কেবল রুক্মিণীদেবীর মন্দির অবশিষ্ট থাকিবে।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"তাহাই হইয়াছে, দেখিতেছ, কেবল রুক্মিণীদেবীর মন্দিরই রহিয়াছে, ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশের আর কোন চিহ্নই নাই। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা পরেও থাকে না। অপর সকলই যায়; কিন্তু গুণত্রিতয়সম্মিলনকারিণী মহাদেবী চিরকাল অবস্থিতি করেন। তিনিই কামদেবপ্রসূতি, তিনিই আত্মা; তিনি থাকিলেই সকল থাকিল। সমুদয় যদুবংশ তাঁহারই কুক্ষিসম্ভূত। মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শনলাভ কর।"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। করিবামাত্র অতি সুস্নিগ্ধ কৌমুদীজাল তাঁহার নয়নপথে প্রবেশ করিল, মনোরম পুষ্পসৌরভ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিল, অনির্ব্বচনীয় মধুর কলধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহর অমৃতসিক্ত করিল, এবং অমৃতায়মান মলয়ানিল তাঁহার সমস্ত শরীর শীতল করিল। তিনি সুষুপ্তিসুখানুভব করত আত্মবিস্মৃতবৎ হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে আর আপনাকে পৃথক্‌ভূত জ্ঞান করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন ঐ কৌমুদীজাল, ঐ পুষ্পসৌরভ, ঐ কলধ্বনি ঐ মলয়ানিলের সহিত তিনি স্বয়ং মিলিয়া গিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক হইতেছেন; তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই, এবং তিনিও কিছু ছাড়া নহেন। ইহাই মুক্তি—ইহাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

ক্ষণকাল এইভাবে আছেন, এমত সময়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহার শিরোদেশে করস্পর্শ করিয়া কর্ণকুহরে কহিলেন—"চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অবলোকন কর।" ব্যাসদেবের সংজ্ঞাচক্ষুঃ স্ফুটিত হইল, অন্তরাত্মার গতি বিরত হইল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া মন্দিরে পরিণত হইল।

ব্যাসদেব দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি মহাদেশ। নদী ভূধর বন প্রস্তরাদিপরিব্যাপ্ত ভূমণ্ডলের প্রতিরূপস্বরূপ ঐ ভূভাগের নানা স্থানে নানাজাতীয় বিকটাকার নরপশু বাস করিতেছে। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাবয়ব, কোটরচক্ষুঃ, অবনতনাসিক, ও স্থূলশীর্ষ—এমন কি, পুচ্ছমাত্রবিহীন দ্বিভুজ বানরবিশেষ।

দেখিতে দেখিতে ঐ মহাদেশের পশ্চিমসীমাবর্ত্তী মহাসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া শুভ্রকান্তি, দীর্ঘকায়, আয়তলোচন, প্রশস্তললাট, উন্নতনাস, ও সুদীর্ঘশ্মশ্রুরাজি-পরিশোভিত মুখমণ্ডল কতকগুলি নরদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে ঐ নর-পশুগণ সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ধর্ম্মজ্ঞানের উপদেশগ্রহণে সমর্থ হইল, পরস্পর হিংসাদ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া একতাপ্রাপ্তির উপযোগী হইয়া উঠিল! ফলতঃ ঐ মহাদেশের স্থানে স্থানে যে ধর্ম্মভিন্নতা ছিল, তাহা সম্প্রদায়ভেদরূপে—যে জাতিভিন্নতা ছিল, তাহা বর্ণভেদরূপে—যে ভাষাভিন্নতা ছিল, তাহা অপভ্রষ্টতা-ভেদরূপে পরিণত হইল। আর কিছুদিন এইভাবে চলিলেই যেন সম্মিলনকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হয়, এমনি হইয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে একজন উদারচেতা রাজপুত্র ঐ নরদেবকুলে আবির্ভূত হইলেন। তিনি সম্মিলনকার্য্য এতদূর হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া আর কিছুমাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কোন ভিন্নতাই থাকিতে দিবেন না। তাঁহার আদেশক্রমে মুণ্ডিতমুণ্ড ধর্ম্মোপদেষ্টৃসমূহ, মহাবলপরাক্রান্ত অধিরাজবর্গ, এবং তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন তার্কিকগণ সম্মিলনকার্য্যের পূর্ণতাসাধনে ব্রতী হইলেন। উপদেষ্টৃবর্গের উচ্চৈঃস্বর মহাদেশসীমা অতিক্রম করিয়া মহাসাগরপরিব্যাপ্ত দ্বীপাবলীতে এবং গিরিশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরাপর বর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অধিরাজবর্গের পরাক্রমে মহাদেশটি একচ্ছত্রের অধীন হইয়া দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইল। পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের মূর্ত্তি কুক্ষিমধ্যে এবং নামাবলী বক্ষোদেশে ধারণ করিল। তার্কিকদিগের জ্ঞানাগ্নি ভেদ-বুদ্ধির সমস্ত ইন্দ্রজাল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। ফল কথা, মানুষী চেষ্টায় যতদূর হইতে পারে, হইল।

কিন্তু মানুষী চেষ্টায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। কালসহকারব্যতিরেকে ফল সুপক্ব হয় না। ভেদবুদ্ধির প্রকৃত মূল যতদিন উদ্ধৃত না হয়, ততদিন সম্পূর্ণ একতা সাধিত হইতে পারে না। নরদেবকুলের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও গৃহবিচ্ছেদ জন্মিল। অসহিষ্ণু সম্মিলনকারীদল নির্জ্জিত এবং নিরস্ত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা বিজয়ী হইলেন, তাঁহারাও আর সতেজ থাকিলেন না।

বেদব্যাস দেখিলেন যে, ঐ নরদেব-কুলের উভয় দলই সত্ত্বগুণপ্রধান ও পরমভক্তিগুণের আশ্রয়; মহাদেবীর মন্দিরে তাঁহাদিগের আসন সর্ব্বোপরি। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে সৃষ্টি হয় না, এই জন্য তাঁহারা সম্মিলনকার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তেজোহীনের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের

পূজা রহিত প্রায় হইয়া গিয়াছে।

তিনি আরও দেখিলেন, আর একটি নরকুল ঐ মহাদেশে লব্ধপ্রবেশ হইল। ইহারা সাহসিক, বীর্য্যবান্ ও একাগ্রচিত্ত। ইহারা মহাদেশটিকে পুনর্ব্বার একচ্ছত্রের অধীন করিল; ভাষাভেদ প্রায় রহিত করিয়া আনিল; হর্ম্ম্য এবং বর্ত্মাদির নির্ম্মাণদ্বারা দেশের শোভাসম্পাদন করিল, এবং মনুষ্যমাত্রেই পরস্পর তুল্য এই মহাবাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণদ্বারা সম্মিলনসাধনের যত্ন করিল। কিন্তু ইহারা রজোগুণপ্রধান, বিলাস-পরায়ণ ও সুখাভিলাষী লোক। ইহাদিগের সমাগমে মহাদেশমধ্যে সত্ত্ব এবং রজোগুণের একত্র অবস্থানমাত্র হইল—উভয়গুণের সম্মিলনসাধন হইল না। ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পমাত্র লোকেই দেবীর মন্দিরে মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইয়া আছেন।

অনন্তর অকূপার উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌরকান্তি পুরুষগণ ঐ মহাদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহারা আসিয়া দেশটিকে কেবল একচ্ছত্রতলে আনিলেন, এমত নহে; তাহার সর্ব্বাবয়ব আয়সবন্ধনে সম্বদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলনসাধনের কোন চেষ্টাই করিলেন না। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনা হইতেই সম্মিলন ব্যাপারের যথেষ্ট সহায়তা হইতে লাগিল। ঐ সকল লোক নিতান্ত স্বার্থপর—কিন্তু সুদূরদর্শী; একান্ত অহঙ্কারবিমোহিত—অথচ ভোগ-সুখাভিলাষী নহে; অপরিমেয় বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বলশালী—কিন্তু পরোপকারবিরত; জ্ঞানচর্চ্চায় উন্মুখ—কিন্তু মুক্তিভজনা করে না। ইহারা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়। ইহারা যেমন আসিতেছে, অমনি চলিয়া যাইতেছে। মহাদেবীর মন্দির মধ্যে একজনও একটি সম্ভ্রমসূচক আসনপ্রাপ্ত হইতেছে না।

বেদব্যাস এইরূপে সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিবিধ গুণের সমাগম দেখিলেন। কিন্তু ঐ গুণত্রয়ের সম্মিলনচিহ্ন কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। গুণত্রয়ের প্রতিরূপস্বরূপ জনসমূহ পরস্পর পৃথক্‌ভূত হইয়াই রহিল। এইরূপ দেখিয়া তিনি একান্ত বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইলেন।

এমত সময়ে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর মুখমণ্ডলে অলৌকিক স্নেহপ্রভা দেখা দিল; তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে শতধারে প্রস্রুত হইয়া ক্ষীরসমুদ্র জন্মিল। মহাদেশটি ঐ সমুদ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। বেদব্যাস দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন জন সেই ক্ষীরসমুদ্রে ভাসমান হইয়া আছেন, এবং পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষীর পান করিতেছেন।

হঠাৎ ত্রিবিক্রমরূপ দৃষ্ট হইল। মহাদেশটি যথার্থই পুণ্যক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে উদিত হইয়া উঠিল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস, সাধু! তুমি স্বচক্ষে মাতৃরূপা মহামায়া ব্রহ্মময়ীর দর্শনলাভ করিলে—তুমি আপন মনোভীষ্টসিদ্ধি দেখিলে।"

অষ্টম অধ্যায়

লুপ্ততীর্থ—হস্তিদ্বীপ—কুমারদ্বীপ—দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্য—আচারভেদের নিদান

পরদিন প্রত্যূষে ব্রাহ্মণদ্বয় পোতারূঢ় হইয়া চলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে স্থল অদৃশ্য এবং চতুর্দ্দিক জলময় হইল। পূর্ব্বদিন সমুদ্রমূর্ত্তি যেরূপ দেখিয়াছিলেন আজিও সেইরূপ দেখিলেন। প্রথমে সেই আপীত, পরে নীল, অনন্তর ঘোরতিমিরবর্ণ—সেই কুণ্ডলীভূত অনন্তদেহ, উর্দ্ধে সেই বিস্তারিত ফণমণ্ডল। বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হইল না। কিন্তু তাহা না হইলেও, এই যেন প্রথম দেখিলেন, বোধ হইতে লাগিল।

কোন কোন পদার্থ প্রতিনিয়তই অভিনবরূপ ধারণ করিয়া চিত্তের আকর্ষণ করে—মনোভৃঙ্গকে যেন প্রফুল্লপুষ্পরাজি-পরিশোভিত উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতে দেয়। বীণার বিচিত্র বাদন, ক্রীড়াশীল শিশুর অঙ্গভঙ্গী, প্রিয়বাদিনীর মুখমণ্ডল, পার্ব্বতীয় নির্ঝরিণীর গমন—ইহারা নিরন্তরই অভিনবতাগুণে মনোহারী। অপর কতকগুলি পদার্থে নিত্য নূতনত্বের উপলব্ধি না হইলেও মন মুগ্ধ হইয়া থাকে। সরোজমধ্যগত ভৃঙ্গের ন্যায় মনোভৃঙ্গ তাহাতে স্থগিত, স্তম্ভিত, ও বিলীন হইয়া যায়। ভেরীরব, সুপ্ত শিশুর মুখমণ্ডল, কামিনীর প্রীতিবিস্ফারিত নয়ন, এবং সুস্থির সমুদ্রবক্ষ, ইহারা নবতাশূন্য গভীরতাগুণে মনোমোহন করে। ব্রাহ্মণেরা যে সময়ে যাইতেছিলেন, তৎকালে মাধবপ্রিয়া অনন্তশায়ী ভগবানের প্রতি প্রীতিপ্রফুল্ল স্থির দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

পোত চলিতেছে—নিরন্তর চলিতেছে। এক দিবারাত্রি—দুই দিবারাত্রি—তিন দিবারাত্রি গেল। চতুর্থদিন সন্ধ্যার সময়ে পূর্ব্বদিকে একটি শুভ্রবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হইল। শুনা যায়, সমুদ্র হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি। এ কি তাহাই হইতেছে?

কিন্তু চন্দ্রকলা ত উর্দ্ধাকাশে বিরাজ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ঐ শুভ্রপদার্থটি ক্রমে জলরাশি হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। উহা চন্দ্র নয়—সৌধশ্রেণীবিরাজিত মহাসমৃদ্ধিশালী নগর—উহাই বোম্বাই। সাংযাত্রিকবর্গ পোত হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণদ্বয় বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়াই আর একখানি ক্ষুদ্রতর তরণী লইয়া ক্রোশ কতিপয় মাত্র গমনপূর্ব্বক একটি সঙ্কীর্ণ দ্বীপে নামিলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন—"এই স্থানটির নাম হস্তিদ্বীপ। এটি পূর্ব্বে অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। এক্ষণে সে তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে, এবং ইহার প্রায় সর্ব্বস্থল বনময় হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মনুষ্যের শব্দ শুনা যায় না। নিরন্তর ঝিল্লীরবের সহিত বায়ুর নিস্বন এবং সমুদ্রলহরীর গভীরতর ধ্বনি সম্মিলিত হইয়া কর্ণকুহর পূর্ণ করিতেছে।"

এই বলিতে বলিতে তাঁহারা একটি পর্ব্বতগুহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; গুহাটি কৃত্রিম—একটি প্রকাণ্ড পাষাণ কাটিয়া নির্ম্মিত। উহার তিনটি প্রকোষ্ঠ।

প্রথম প্রকোষ্ঠে একটি প্রকাণ্ড পাষাণমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি ত্রিশিরস্ক—চতুর্হস্ত-সমন্বিত।

বৃদ্ধ কহিলেন—"শিল্পকার কেমন নৈপুণ্য সহকারে সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপ গুণত্রয়ের সম্মিলনজাতমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে! মধ্য মুখটি ব্রহ্মার, তাঁহার দক্ষিণে এবং বামে বিষ্ণু এবং শিবের মুখ।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাত চারিটির অধিক নাই কেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"বিশ্বরূপ ভগবানের কোটী কোটী মুখ ও কোটী কোটী হস্ত। কিন্তু মনুষ্যের যেরূপ বুদ্ধি, তাহাতে ভগবানকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে হইলে চারি হস্ত সমন্বিত করিয়াই দেখাইতে হয়। মনুষ্যবুদ্ধিতে ভগবান আকাশ, কাল, জ্ঞান, জীবনের আধার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন। এই জন্য তাঁহাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজরূপী করিয়াই প্রকাশিত করিয়া থাকে।"

ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনটি পাষাণময়মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। একটি শিবের, একটি পার্ব্বতীর এবং একটি কামদেবের।

বৃদ্ধ কহিলেন—"এ স্থলে কামদেবরূপী গাঢ়তম-প্রেম শিবরূপী পুরুষকে পার্ব্বতীরূপা প্রকৃতির সহিত উদ্বাহবন্ধনে সম্বদ্ধ করিতেছেন। ত্রিগুণময় পুরুষ হইতেই সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টিকার্য্যের এই দ্বিতীয় প্রকরণ।"

ব্রাহ্মণেরা গুহার তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাষাণময় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি—তাহার দক্ষিণে গণেশ, বামে লক্ষ্মীসেবিত কার্ত্তিকেয়।

বৃদ্ধ কহিলেন—"প্রকৃতি এবং পুরুষের—শক্তি এবং শিবের—গতি এবং জড়ের—সম্মিলনসাধন হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শিল্পকার গণেশরূপী ব্রহ্মাকে স্থূলদেহ, পশুমুখ এবং লম্বোদর করিয়া তিনি যে সর্ব্বাগ্রপূজ্য ভক্ষ্যগ্রহণের অধিষ্ঠাতা, তাহা কেমন সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন! কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিকেও সুন্দরীসেবিত, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং বিক্রমশালী যুদ্ধবিশারদরূপে মূর্ত্তিমান করিয়া তিনি যে স্ত্রীসংসর্গাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, তাহাও কেমন মূর্ত্তিমান করিয়াছেন!—বাস্তবিক স্পন্দনশক্তিসম্পন্ন জড়ের প্রথমজাত ধর্ম্ম ভক্ষ্যগ্রহণ, এবং দ্বিতীয়জাতধর্ম্ম দাম্পত্য। এই জন্য গণেশ এবং কার্ত্তিকেয় হরগৌরীর সন্তান।"

এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ঐ প্রকোষ্ঠের প্রান্তভাগে গমন করিলেন, এবং তথায় অপর একটি পাষাণমূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"সৃষ্টিকার্য্য দেখিলে, এক্ষণে সংহারকার্য্য কেমন সুকৌশলে মূর্ত্তিমৎ হইয়াছে, দেখ। রুদ্ররূপী মহাদেব যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া অস্থিমালা ভূষণ করিয়াছেন, যে হস্তে বরদান ছিল, তাহা শৃঙ্গ ধারণ করিয়াছে; যে ত্রিশূলের অগ্রভাগে ত্রিলোক স্থাপিত ছিল, তাহা বক্র হইয়া খড়্গরূপ হইয়াছে; যে হস্তে অভয়দান ছিল, তাহা ত্রিপুরাসুরের কেশে বদ্ধমুষ্টি হইয়াছে। ত্রিপুরবধ হইতেছে; সত্ত্বরজস্তমোগুণের সম্মিলন ভঙ্গ হইতেছে। বার্দ্ধক্য-মূর্ত্তিই প্রচণ্ড মহাকাল-মূর্ত্তি।"

ব্রাহ্মণেরা গুহার সমস্ত অভ্যন্তরটিতে পর্য্যটন করিলেন। সর্ব্বস্থলে ভিত্তির সর্ব্বাবয়ব উৎকীর্ণ দেবদেবীর মূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ সমুদয় আবার একখানি মাত্র কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত; ব্রাহ্মণেরা ঐ গুহামধ্যেই রাত্রিযাপন করিলেন।

তাঁহারা পরদিন আর একটি দ্বীপে গমন করিলেন, ইহার নাম কুমার দ্বীপ। ঐ দ্বীপটিও একটি কৃষ্ণপাষাণসম্ভূত পর্ব্বতময়। তাহাতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গুহা প্রস্তুত হইয়াছে। একটিতে ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, অপরটিতে শচীসহ ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি, তৃতীয়টিতে গৌরীসহ মহাদেবের মূর্ত্তি।

বৃদ্ধ একে একে ঐ তিনটি গুহাপ্রদর্শন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ত বুদ্ধদেবের গুহাতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিলেন—"এই গুহাত্রয়ে সৃষ্টি ও পালন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার মূর্ত্তিমৎ রহিয়াছে। প্রথম গুহায় মেঘবাহন ইন্দ্র, বিদ্যুন্মিত্র

শচীসঙ্গ হইয়া জলবর্ষণদ্বারা শস্যসম্পত্তির উপায়বিধান করিতেছেন। দ্বিতীয় গুহায় শক্তিসহকৃত মহাদেব, শ্রমসাধ্য ব্যাপারসমস্ত সম্পন্ন করিয়া যোগিনীরূপা চতুঃষষ্টিকলাত্মিকা বিদ্যা কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আছেন। এই তৃতীয় গুহায় বুদ্ধদেব অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা সৃষ্টির চরম-ফল উপলব্ধ করিয়া স্বয়ং জ্ঞানানন্দ দয়াময় হইয়াছেন।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পালনকার্য্যপ্রদর্শনার্থ ভগবান বিষ্ণুর কোন মূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই কেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"এই শৈবপ্রধান দেশে বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়ের আকারেই সম্পূজিত হয়েন। এখানে কার্ত্তিকেয়দেবকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীসেবিত করিয়া নির্ম্মাণ করে, তাঁহাকে শোভমান ময়ূরপৃষ্ঠে অধিরূঢ় করিয়াই নিবৃত্ত হয় না। ষড়ানন রূপেও মূর্ত্তিমান করে না। ষড়ানন, কার্ত্তিকেয় দেবের আধ্যাত্মিকরূপ—ঐ রূপে কৃতি-মূলক এবং কৃতি-সমর্থ কাম-ক্রোধাদি ছয়টি মনোভাব কার্ত্তিকেয়ের ছয়টি শীর্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ গুহাপ্রাচীরস্থিত একটি খোদকতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"ঐ খোদকতায় কি দেখিতে পাও, মনোযোগপূর্ব্বক দেখ।" মধ্যবয়া তৎপ্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন—"যেন একখানি অর্ণবপোত সমুদ্র হইতে আসিয়াছে, পোতোপরি কতকগুলি লোক দণ্ডায়মান হইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক যেন কূলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে, এবং তীরস্থ একজন পুরুষ তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া যেন অনুমতিপ্রদান করিতেছেন। আগন্তুকদিগের শিরোদেশে যে প্রকার দীর্ঘ উষ্ণীষ এবং অন্যান্য অঙ্গে যে প্রকার পরিধেয় তাহাতে অনুমান হয় তাহারা এতদ্দেশবাসী নহে। তীরাবস্থিত পুরুষেরও মুণ্ডিতমুণ্ড এবং একমাত্র বস্ত্রাচ্ছাদন দেখিয়া বোধ হয় তিনি একজন বৌদ্ধ যাজক বা যতি হইবেন।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"ইহাই মহাসমৃদ্ধিশালী ঐ বোম্বাই নগরীর পূর্ব্ব ব্যাপার—উহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর—

"হিমাচলের উত্তরে উত্তরকুরুদেশ, তাহার উত্তরে হরিবর্ষ, তাহার উত্তরে মেরু-পর্ব্বত। মেরু-পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটি মনোরম দ্রোণিভূমি। সত্যযুগের প্রারম্ভে ঐ দ্রোণিভূমিতে একটি নরদেবগোষ্ঠীর আবাস ছিল। তাহারা পাশুপাল্য এবং কৃষি উভয় কার্য্য দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ক্রমে ঐ গোষ্ঠীর লোকের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া উঠিল এবং তাহারা এক এক দল হইয়া পৈতৃক আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। প্রথম দল উত্তর-পশ্চিমাস্য হইয়া বহুকাল গমনপূর্ব্বক রোমকখণ্ডে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় দল

পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া প্রশস্ত মধ্যদেশ অধিকার করিল। তৃতীয় দল তাহাদিগেরই দক্ষিণ ভাগে গমন করিয়া মধ্যদেশের সন্নিহিত আর্য্যভূমিতে উপস্থিত হইল। এই সকল ঔপনিবেশিক দল বাহির হইয়া আসিলে তাহাদিগের পৈতৃকস্থাননিবাসীরা স্বল্পসঙ্খ্যক এবং ক্ষীণবীর্য্য হইল এবং মেরুপর্ব্বতের পূর্ব্ব-দক্ষিণসীমানিবাসী দৈত্যদিগের কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া একেবারে বিনষ্ট অথবা স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেল।

"যাহা হউক, উল্লিখিত তিনটি ঔপনিবেশিক দলের মধ্যে যাহারা মধ্যদেশে গমন করিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত বিশুষ্ক, পর্ব্বতময় এবং মরুসমাকীর্ণ স্থান পাইয়াছিল। আর্য্যভূমিটি তদপেক্ষায় সঙ্কীর্ণ—উহা প্রায় চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বতবেষ্টিত একটি দ্রোণিদেশ মাত্র। উহা সজল এবং কৃষিকার্য্যের অত্যুপযোগী। তৃতীয় ঔপনিবেশিক দল ঐ স্থানে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে এবং ধনে জনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা জ্ঞানচর্চ্চায় উন্মুখ হইল এবং অনেকানেক প্রাকৃতিক তথ্য অবগত হইয়া উঠিল।

"মধ্যদেশাধিকারী দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক দল তেমন উত্তম বাসস্থান পায় নাই। তাহাদিগের আবাসভূমির উত্তর এবং পশ্চিম দিক পর্ব্বতদ্বারা সংরক্ষিত ছিল না। তাহাদিগের ভূমিও স্থানে স্থানে নিতান্ত অনুর্ব্বর ছিল। অতএব মধ্যদেশবাসীরা ক্রমে ক্রমে আর্য্যদেশবাসীদিগের হইতে ভিন্নপ্রকৃতিক হইতে লাগিল। তাহাদিগের স্বচেষ্টা এবং স্বাবলম্বন অধিক হইল—কিন্তু শান্তি ও সন্তোষের ভাগ অল্প হইল। তাহাদিগের ধীশক্তি উত্তেজিত হইল—কিন্তু বিষয়জ্ঞান ন্যূন হইয়া থাকিল। উভয়েই পূর্ব্বাবধি অগ্নিদেবের পূজা করিত—এখনও তাহাই করিতে লাগিল। কিন্তু মধ্যদেশবাসীরা ক্রমে ক্রমে ঘোর দ্বৈতবাদী হইয়া উঠিল। তাহাদিগের চক্ষে পৃথিবী সমপরাক্রমশালী দেবতাদ্বয়ের রণক্ষেত্রস্বরূপে প্রতীয়মান হইল।

"উভয়েই পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব স্থানে বাস করিয়াছিল। অতএব উভয়েরই মনে, একস্থান হইতে আসিতেছি, অপর একস্থানে যাইব, পুরুষানুক্রমে এই প্রকার চিন্তা দৃঢ়ীভূত হইয়া, পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম জ্ঞানের বীজ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। ক্রমে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আর্য্যদেশবাসীদিগের মনে যেরূপ মধ্যদেশবাসীদিগের অন্তঃকরণে উহা সেরূপ রূপ ধারণ করিল না। মধ্যদেশীয়েরা প্রাকৃতিকতত্ত্ববিমূঢ়; অতএব মনে করিল যে, নরগণ প্রেতত্ত্ববিমোচনের পর সশরীরেই স্বর্গনরকাদি ভোগ করে। আর্য্যদেশীয়েরা জানিত যে, পাঞ্চভৌতিক শরীর কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উহা মৃত্যুর

পর পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া কালবশে অন্যান্য প্রাণিশরীরেও সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। এই মতভেদনিবন্ধন আচারভেদ ঘটিল। মধ্যদেশবাসীরা মৃতদেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহা সমাহিত করিতে লাগিল। আর্য্যবাসীরা দাহাদি দ্বারা শব বিনষ্ট করিত। এই আচারভেদ হইতে আবার বুদ্ধিবৃত্তির প্রণালীও ভিন্ন হইল। আর্য্যবাসীরা পাঞ্চভৌতিক শরীরের নিতান্ত নশ্বরত্ব উপলব্ধ করিয়া পরকালে সুখদুঃখভোগক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাত্মবাদগ্রহণে উন্মুখ হইলেন। মধ্যদেশবাসীরা কি প্রকারে স্থূলশরীর চিরকাল অবিনষ্ট থাকিতে পারে, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

"ইতোমধ্যে উভয় কুলই ধনে জনে সম্বৰ্দ্ধিত হইয়া নূতন নূতন স্থান অধিকারার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল। তুমুল জ্ঞাতিবিবোধ বাধিয়া গেল। এতদূর বিদ্বেষ জন্মিল যে, একের মতে যাহা পাপ, অপরের মতে তাহাই পুণ্য—একের মতে যাহা উপাস্য, অপরের মতে তাহাই অবজ্ঞেয়—একের মতে যাহা দেবতা অপরের মতে তাহা অসুর, বলিয়া গণ্য হইল। ধর্ম্মযুদ্ধে পৃথিবী অনেকবার নরশোণিতে স্নাতা হইয়াছেন। কিন্তু ঐ জ্ঞাতিবিরোধে যেরূপ হইয়াছিলেন সেরূপ আর কদাপি হয়েন নাই। ক্রমে ক্রমে বিরোধী উভয় দল পৃথক্‌ভূত হইতে লাগিল। এক দল পরাজিতপ্রায় হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিল। অপর দল পশ্চিমাভিমুখে অপসারিত হইল।

"কিছুকাল পরে দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে অতি মহাবলপরাক্রান্ত আর একটি জাতীয় লোক আসিয়া মধ্যদেশবাসীদিগকে সবলে আক্রমণ করিল। মধ্যদেশবাসীরা সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। যেমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে গগনস্পর্শী মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূতলশায়ী হয়, তাহারাও সেইরূপে উন্মূলিত হইল। যেমন সেই মহীরুহের পত্র বিটপ সমস্ত ছিন্নভিন্ন এবং বায়ুতাড়িত হইয়া বিদূরে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি মধ্যদেশীয় কতকগুলি লোক সমুদ্রপারবর্ত্তী এই দেশে আসিয়া পড়িল।

"তাহাদিগেরই আগমনব্যাপার ঐ পাষাণফলকে ক্ষোদিত রহিয়াছে। আগন্তুকেরা তাৎকালিক বৌদ্ধরাজার নিকটে আবাসস্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত ভিক্ষা চাহিলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ঐ দ্বীপে বাস করিতে দেন। তাহা হইতেই বোম্বাই নগরের সূত্রপাত হয়।

"নগরাধিবাসীরা এক্ষণে পারসিক নামে খ্যাত। উহারা দ্বৈতবাদী—কিন্তু ঈশ্বরীপূজাবিহীন; অগ্নিদেবসেবী—কিন্তু সৃষ্টিবিদ্বেষী; জ্ঞানচর্চ্চানুরক্ত—কিন্তু

প্রীতিবর্জ্জিত; উৎসাহশীল—অথচ প্রভাববিহীন; বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণ—কিন্তু সহিষ্ণুতাপরাঙ্মুখ।

"ইহাদিগের সন্নিধানে তীর্থগণ বিলুপ্তপ্রভ হইয়া আছে। কিন্তু যে ধর্মজ্ঞান দেশের অস্থীভূত পাষাণে ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহা কল্পান্তেও বিলুপ্ত হইবার নহে। তীর্থগণ আবার জাগরিত হইবে—আবার নূতন সৃষ্টি হইবে।"

নবম অধ্যায়

কঙ্কণ—করালী—সঞ্জীবনী—সহিষ্ণুতা

ব্রাহ্মণেরা বোম্বাই হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যে পথে চলিলেন, তাহার পশ্চিমদিকে সমুদ্র, পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতমালা। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান দুইটি পদার্থ দুই দিকে। পশ্চিমাভিমুখে দৃষ্টি করিলে আকাশমণ্ডল ক্রমে অবনত হইয়া সমুদ্রজল স্পর্শ করিয়া আছে বোধ হয়; পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি করিলে পর্ব্বতশৃঙ্গ আকাশমার্গ ভেদ করিতে যাইতেছে, দেখা যায়।

বৃদ্ধ কহিলেন—"পূর্ব্বকালে সমুদ্র এই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে এতদূর অবস্থিত ছিল না। এখন যে প্রকার প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, তখন সমুদ্রের এমন মূর্ত্তিও ছিল না; প্রচণ্ড তরঙ্গনিচয়দ্বারা নিরন্তর পর্ব্বতকে আহত করিত—যেন উহাকে ভগ্ন এবং উল্লঙ্ঘন করিয়া সমুদয় প্লাবিত এবং আত্মসাৎ করিবে। সেই সময়ে ভগবান পরশুরাম এই পর্ব্বতোপরি তপশ্চরণ করিতেছিলেন। তপস্যা সমাপন হইলে ভগবান সমুদ্রকে ঐ অহিতাচরণ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। সমুদ্র তাঁহার নিবারণ অগ্রাহ্য করে। ভগবান ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সমুদ্রের প্রতি আপন কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। কুঠার আকাশমার্গ প্রদীপ্ত করিয়া আসিতে লাগিল। সমুদ্র তখন মহাভয়ে ভীত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। কুঠার যেখানে ভূতল স্পর্শ করিল, সমুদ্র তদবধি তাহার বহির্ভাগে থাকিল—আর পর্ব্বতের নিকটতরগামী হইতে পারিল না। ঐ দেখ, ভগবানের নিক্ষিপ্ত পরশু পৃথিবী ভেদ করিয়া রহিয়াছে, এবং সমুদ্র সফেন বীচিমালা দ্বারা অদ্যাপি ঐ পরশুর পূজা করিতেছে। মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া পশ্চিমভাগে একটি অতি প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড দেখিতে পাইলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন—"উহাই ভগবানের কুঠার—কলিমাহাত্ম্যে পাষাণময় হইয়া রহিয়াছে। যখন উহা বিক্ষিপ্ত হয়, তখন এই পর্ব্বতের শিরোদেশে ভগবানের ক্রোধাগ্নিশিখা দৃষ্ট হইয়াছিল—পৃথিবী প্রকম্পিতা হইয়াছিলেন—সমুদ্র ভয়ব্যাকুল হইয়া বিলোড়িত হইয়াছিল এবং বাসুকিশীর্ষ এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উন্নমিত হইয়াছিল।

"অনন্তর পরশুরাম অন্য তীর্থে গমন করিলেন। নানাস্থানে বহু তপশ্চরণপূর্ব্বক এখানে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, দেশটি নানা উপজীব্য বৃক্ষলতাদিপরিব্যাপ্ত হইয়া বিবিধ পশুর এবং পশুহিংসাপরায়ণ পার্ব্বতীয় জাতিদিগের আবাসভূমি হইয়াছে। দেশে ব্রাহ্মণ সঞ্চার করাইবার ইচ্ছা হইল।

"ভগবান পর্ব্বতোপরি অবস্থিত হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন—এমত সময়ে একটি অর্ণবযান সমুদ্রতরঙ্গাহত হইয়া জলমগ্ন হইল এবং নয়টি সুন্দর নরশরীর কূলে সংলগ্ন হইল। পরশুরাম তাহাদিগকে লইয়া সঞ্জীবনী শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণত্ব প্রদান পূর্ব্বক এই দেশে স্থাপন করিয়া গেলেন।

"ঐ নয় জনের বংশ হইতে মহারাষ্ট্রীয় নবকুল ব্রাহ্মণ। ইঁহারা শাস্ত্রালোচনাতৎপর, পরম শিবপরায়ণ এবং দুঃখসহনশীল।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ বামভাগস্থ পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিয়া সত্বরে একটি মহারাষ্ট্রীয় গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণেরা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ একটি প্রশস্ত বটবৃক্ষতলে বসিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, তাহারা সকলেই যেন কি একটি মহাক্লেশে ক্লিষ্ট এবং তজ্জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্নমনা হইয়া আছে। কাহারও ভয়ব্যাকুলতা, কাহারও শোকাতিশয্য, কাহারও ক্রোধ, কাহারও একান্ত বিরক্তি, কাহারও বা নিতান্ত নৈরাশ ইত্যাদি কষ্টকর ভাবসমস্ত সকলের মুখাবয়বে প্রতীয়মান হইল। একজন আর একজনকে বলিল, "যাহা হউক, আর এখানে থাকা যায় না। সমস্ত সংবৎসর শীত রৌদ্র ও বর্ষার ক্লেশ সহ্য করিয়া যাহা কিছু উৎপন্ন করা যায়, এতদিন তাহার বার আনা পরিমাণ লইত—এবারে শুনিতেছি সমুদয়ই লইবে?" অপর ব্যক্তি কহিল, "আমার ত শরীর অক্ষম হইয়াছে, পথ চলিবার শক্তি নাই, আমাকে কাজে কাজেই থাকিতে হইবে। কিন্তু এই দারুণ ক্লেশ অধিক কাল সহ্য করিতে হইবে না। শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিয়া জুড়াইতে পাইব।" আর একজন বলিল, "যাইবার কি স্থল আছে? সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়াছে; যেখানে যাইব, ইহাদিগের করাল

কবল অতিক্রম করিবার যো নাই।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে সভাস্থ সকলেই নিস্তব্ধ হইল। অশ্বপৃষ্ঠারোহী, ত্রিপুণ্ড্রধারী, পুস্তকৈককক্ষ একজন আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি করিল, এবং তিনি সমীপস্থ হইলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিল।

আগন্তুক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সভামধ্যবর্ত্তী একটি উচ্চ শিলাসনে গিয়া বসিলেন, এবং নমস্কারপূর্ব্বক পুস্তক খুলিয়া অতিমৃদুমন্দস্বরে ক্ষণকাল পাঠ করিলেন। শ্রোতৃবর্গ নিস্পন্দভাবে রহিল। অনন্তর তিনি পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া মহারাষ্ট্রীর ভাষায় কহিতে লাগিলেন—

"আমরা সহ্যপর্ব্বতনিবাসী। আমরা মহাতপাঃ ভগবান পরশুরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত, আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের অবস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্ব। সহ্য, তপস্যা, এবং যোগাভ্যাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্লেশস্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।

"কষ্টস্বীকার সর্ব্বধর্ম্মের মূলধর্ম্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশস্বীকার করিতে পারে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির-তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চির-সঙ্গিনী।

"রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিজয়ী, দ্বীপনিবাসী, পরস্বাপহারী রাক্ষসের হস্ত হইতে মহালক্ষ্মীর উদ্ধারে সমর্থ হইলেন। যুধিষ্ঠির সহিষ্ণুপ্রকৃতিক। তিনি সকল পাণ্ডবের প্রধান ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা বীর্য্যবান ধীমান ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত ছিল, এবং তাঁহার বশীভূত ছিল বলিয়াই তাহারা নষ্ট রাজ্যের উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিল। সহ্য আমাদিগের আবাস—সহ্যই আমাদিগের অবলম্ব, সহ্যই আমাদিগের বল। যেন কোনকালে আমরা সহ্যভ্রষ্ট না হই।

"শুনিয়া থাকিবে, কোন সময়ে উজ্জয়িনীপতি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার স্বকীয় গুণগ্রামের মনোভঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গুণেরা অহঙ্কার করিয়া বলিল যে, রাজন! তুমি আমাদের বলেই বলীয়ান। রাজা তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলেন। অন্যান্য গুণের কথা কি, শান্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সকলেই গেল। অবশেষে রাজলক্ষ্মীও রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সহিষ্ণুতা দেবী রাজার স্থানে বিদায় যাচ্ঞা করিতে আসিলেন। রাজা তাঁহাকে বিদায়

দিলেন না ; বলিলেন—"মাতঃ ! আমি তোমাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।" সহিষ্ণুতা রহিলেন। অচিরে যাবতীয় গুণগ্রাম আসিয়া জুটিল। রাজলক্ষ্মীও ফিরিয়া আসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য পরমজ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বুঝিতেন। শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাজ বাসুকির শিরোদেশে, এবং বাসুকি স্বয়ং কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত। কূর্ম্মের প্রকৃতি কি ? কূর্ম্মের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিলে কূর্ম্ম অপর কোন প্রতীকার চেষ্টা করে না—আপন মুখভাগ এবং হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া লয়, নিজ আভ্যন্তরিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবলম্ব করিয়া থাকে। কূর্ম্মই সহ্য। অতএব সহ্যভ্রষ্ট হইও না। কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না। অপসৃত হইলে একেবারে রসাতল দেখিবে।

"অর্থাভাব জন্য কষ্ট হইয়াছে ?—আরও হইবার উপক্রম হইয়াছে ?—মনে কর কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ্র বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে ? কূর্ম্মের প্রকৃতি ধারণ করিবে। হাত পা মুখ সব ভিতরে টানিয়া লইবে। ভোগসুখলিপ্সা বিসর্জ্জন দিবে। আমোদপ্রমোদে বঞ্চিত থাকিবে। ব্যয়সঙ্কোচ করিবে। দেব-সেবা অতিথিসেবা পর্য্যন্ত ন্যূন করিয়া ফেলিবে। রাজদ্বারে ন্যায় প্রার্থনা করিতে গিয়া অনর্থ অর্থব্যয় করিবে না। গৃহবিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইয়া লইবে। এইরূপে বলসঞ্চয় কর। কূর্ম্মপ্রকৃতিক হও। তোমাদিগের বল কেমন অধিক, ভক্তি কেমন অধিক, ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহা সপ্রমাণ কর। যে প্রহার করে তাহার বল অধিক, না, যে প্রহার সহ্য করিতে পরে, তাহার বল অধিক ? যে সহ্য করিতে পারে তাহারই অধিক।

"চল, সকলে গিয়া মহাদেবী করালী এবং পরমারাধ্যা সঞ্জীবনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসি।" বক্তা এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলে শ্রোতৃবর্গও উঠিল এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ব্রাহ্মণদ্বয় উহাদিগের সমভিব্যাহারী হইলেন। পার্ব্বতীয় পথে ক্রোশৈক গমন করিয়া তাঁহারা একটি সামান্য দেবমন্দিরের সমক্ষে উপনীত হইলেন। বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়, মন্দিরে আট দশ জনের অধিক লোকের স্থান হইতে পারে না। কিন্তু পীপিলিকাশ্রেণী যেমন গর্ত্তে প্রবেশ করে, সেইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন চারি জন করিয়া সমস্ত লোক মন্দিরাভ্যন্তরে গমন করিল।

ব্রাহ্মণেরা সকলের পশ্চাদ্ভাগে গমন করত একটি সংকীর্ণ সোপানপরম্পরা দ্বারা কতক দূর নামিলেন। পথটি ঘোর অন্ধকারাবৃত। কিয়দ্দূর গমন করিলে

একটি দীপালোক দৃষ্ট হইল। পরে একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে গিয়া দেখিলেন, শবাসনা পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তির সমক্ষে একজন ব্রাহ্মণ একটি প্রদীপ হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। দীপধারী কহিল, 'ইনি মহারাজ শিবজীর প্রতিষ্ঠাপিতা মহাদেবী করালী।' মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী সকলে কোথায় গেলেন?' দীপধারী উত্তর করিল, 'তাঁহারা ভগবান পরশুরামের সেবিতা স্বায়ম্ভবা সঞ্জীবনীদেবীর দর্শনার্থ গিয়াছেন, আপনারাও চলুন।' এই বলিয়া দীপধারী মন্দিরপ্রাচীরে একটি দ্বার উদ্ঘাটন করিল। ব্রাহ্মণেরা আর একটি সোপান দেখিতে পাইলেন, এবং তাহা দিয়া নামিয়া গেলেন।

ঘোর অন্ধকার মধ্যে অনুমান ত্রিংশৎ হস্ত নামিয়া তাঁহারা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, অনেকগুলি মসাল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং সম্মুখবর্ত্তী একটি প্রশস্ত অঙ্গন মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, অঙ্গনমধ্যে একটি উচ্চ বেদী—বেদীর মধ্যস্থলে দেবীমূর্ত্তি—তাহার সমীপে ঐ মহারাষ্ট্রীয় বক্তা।

বক্তা কহিতেছিলেন—"তোমরা সহ্যত্যাগ করিবে না, শপথ করিলে, উত্তম হইল। এ স্থান ত্যাগ করিয়া কি স্থানান্তর যাইবার অভিলাষ করিতে আছে? এমন পবিত্র তীর্থ—এমন জাগ্রৎদেবতা আর কোথায় দেখিবে? দর্শন কর—এই কূর্ম্ম—তাহার পৃষ্ঠে বাসুকি,—তাহার উপর পৃথিবী—তদুপরি সিংহ—সিংহবাহিনী সঞ্জীবনী দেবী সর্ব্বোপরি বিরাজিতা। যাঁহারা পাষাণময় পর্ব্বতবক্ষোভেদ করিয়া এই তীর্থক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা কি সেই তীর্থ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে? তাঁহাদিগের পরিশ্রমশীলতা—তাঁহাদিগের দূরদর্শিতা—তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা কি তাঁহাদিগের সন্তানগণকে একবারে ছাড়িতে পারে?

"তাঁহারা যেমন তোমাদিগের নিমিত্ত ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং সহিষ্ণুতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তোমরাও আপনাদিগের সন্তানগণের নিমিত্ত সেইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য কর। লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই সকল কাজ করে না। যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া মৃত্তিকাতে বৃক্ষবীজ রোপণ করে, সে স্বয়ং সেই বৃক্ষের ফলভোগ করে না। তাহার পুত্রপৌত্রাদি ঐ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকে। তোমাদিগের এই সহিষ্ণুতার ফলও পরবর্ত্তী পুরুষে ভোগ করিবে।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত, সেই স্বয়ং বরলাভ করিত। কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ সাত দশ

পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে তপঃসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃসিদ্ধির ফললাভ করিতে পারে। কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য। কলিযুগ এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।"

বক্তা এই পর্য্যন্ত বলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দেবীর সম্মুখভাগে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অস্ফুট গদ্‌গদস্বরে দেবীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—

"হে মাতঃ! হে ভগবতি!—এই অধঃপতিত দশায় কূর্ম্মধর্ম্ম অবলম্বনই আমাদিগের বিধেয় করিয়াছ—অতএব যথাসাধ্য তাহার উপদেশ প্রদান করিলাম। কিন্তু প্রার্থনা এই, যেন কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে পদদলিত আশীবিষের ন্যায় বীরতার উদ্রেক হয় এবং তাহার শিরোদেশে সংস্থাপিতা পৃথিবী ধর্ম্মশাসন বহনপূর্ব্বক তোমার সঞ্জীবনী মূর্ত্তি চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে।"

বক্তা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন—মহারাষ্ট্রীয়গণ সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং একটিমাত্র বাক্য নিঃসারণ ব্যতিরেকে একে একে সকলে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখমণ্ডলে একান্ত দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার অধিষ্ঠান হইয়াছে।

বৃদ্ধ আবার কহিলেন—"মহাদেবী এই জন্যই এখানে সঞ্জীবনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন; সহিষ্ণুতাই শক্তির প্রকৃত অনুরূপ। সহিষ্ণুতাপরিহীন কত কত লোক স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট স্বজাতিচ্যুত হইয়া আপনাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ দেশের হৃদয়পাষাণে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিমা ক্ষোদিত রহিয়াছে। এখানে সঞ্জীবনী মহাদেবী স্ব-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।"

দশম অধ্যায়

কু-মারিকা—সেতুবন্ধ রামেশ্বর—ধর্ম্মজ্ঞানলাভের পথ—মৃত্যুর স্বরূপদর্শন

ব্রাহ্মণেরা কঙ্কণ হইতে নিরন্তর দক্ষিণাভিমুখে গমন করত নানা জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া অনন্তর একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। উহার পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ সর্ব্ব দিকেই মহাসমুদ্র। কেবল উত্তর ভাগে ভূমি।

বৃদ্ধ কহিলেন—"ইহার নাম কু-মারিকা—ইহাই কর্ম্মভূমির শেষ সীমা। এখানে দেবাদিদেব ধর্ম্মরাজরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করেন। এখানে দিনযাপন কর, রাত্রিকালে তীর্থদর্শনে যাইবে।"

মধ্যবয়া কহিলেন—"এখানে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিতেছি। পশ্চিম দিকে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি। বীচি সকল ধীরে ধীরে আসিয়া কূলসংলগ্ন হইতেছে। সমুদ্র যেন সুকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। শঙ্খ শম্বূকাদি বিচিত্রবর্ণ লক্ষ লক্ষ প্রাণী কেমন ধীরে ধীরে তীর বহিয়া উঠিতেছে এবং বেলাভূমিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্র যেন চিত্রময় বস্ত্রাবরণের দ্বারা পৃথিবীকে আবৃতা করিতেছেন। দক্ষিণে ওরূপভাব নহে। পৃথিবী সুপ্তোত্থিতা যুবতীর ন্যায় উন্নতমুখী হইয়া বসিয়াছেন এবং সমুদ্র তাঁহার গলদেশে যে তরঙ্গমালা পরাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন। কত প্রকার মৎস্য মকরাদি সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কত উড্ডীন মৎস্য পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক ঝাঁকে ঝাঁকে জল হইতে লম্ফ দিয়া উঠিতেছে এবং শতাধিক ধনু দূরে গিয়া আবার জলমগ্ন হইতেছে। পূর্ব্বদিকে কি ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে! সমুদ্রোর্ম্মিসমস্ত পিনাকপাণির অনুচর পিশাচবর্গের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া লম্ফপ্রদান করিতেছে, যেন প্রতি উল্লম্ফনেই পৃথিবীকে প্লাবিতা এবং রসাতলগামিনী করিবে। কিন্তু ঐ দিক যেমন বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ, এমন আর কোন দিক নহে। ঐ দিকে পক্ষীর কলরব এবং অপরাপর প্রাণীর শব্দ শুনা যাইতেছে, এবং ঐ দিকেই মনুষ্যের আবাসও দৃষ্ট হইতেছে।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"কূর্ম্মক্ষেত্রের এই ভাগ যমশাসিত। যমের পালন কিরূপ প্রত্যক্ষ দেখ। মৃত্যুপতিই ধর্ম্মের বিধানকর্ত্তা; তিনিই স্রষ্টা—পাতা—নিয়ন্তা।"

এই বলিতে বলিতে তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন ; পরে উৰ্দ্ধ হইতে একটি শিলাখণ্ডের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন—"ঐ যে শৈলখণ্ডটি সমুদ্রজলে ধৌত হইতেছে দেখিতেছ, উহার গাত্রে নারিকেলশস্তের ন্যায় এক প্রকার শুভ্রপদার্থ লক্ষিত হইবে। ঐগুলিও প্রাণী। উহারা গতিশক্তিবিহীন, কিন্তু ভক্ষ্যগ্রহণে সমর্থ। ঐ দেখ, যেমন সমুদ্রজল উহাদিগের উপর দিয়া গেল, অমনি উহারা মুখব্যাদান করিয়া ঐ জলস্থিত কীট উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। মৃত্যুপতির পালনগুণে পৃথিবীর যাবতীয় জীবজাত ঐ প্রকার প্রাণী হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী শঙ্খশম্বুকাদি, সম্মুখবর্ত্তী মৎস্যনক্রাদি, পূর্ব্বাপার্শ্ববর্ত্তী পক্ষী পশু বানর নরাদি সকলেই ঐ নারিকেলশস্য-সদৃশ প্রাণীর পরিণামভেদ ; এবং তাদৃশ পরিণতির বিধানকর্ত্তা যমরাজ ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সৃষ্টিবিধানের এই অদ্ভুত রহস্যপ্রণালী কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"সমস্ত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল ব্যাপার যে প্রণালীতে সংঘটিত হয়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রতি প্রাণিশরীরেও তাহার অনুরূপ কাণ্ডসকল অবিকল সেই রীতিক্রমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সর্ব্বজীবপ্রসূতি ভগবতী পৃথিবীর গর্ভে যাহা যাহা হইয়া আসিয়াছে—একমাত্র মাতৃকুক্ষি মধ্যেও তাহাই হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যুগযুগান্ত—কল্পকল্পান্ত—ব্যাপিয়া সে সমস্ত পরিবর্ত্ত ঘটে, বর্ষন্যূন সময়ের মধ্যেও মাতৃজঠরে তদনুরূপ পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয়।

"হঠাৎকারে কিছুই সম্ভূত হইতে পারে না। কোন উৎকৃষ্ট দেহ ধারণ করিবার পূর্ব্বে জীবকে যে সমস্ত নিকৃষ্টদেহ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে হইয়াছে, জরায়ু মধ্যেও তাহাকে সেই সমস্ত দেহপরিবর্ত্ত করিতে হয়। মনুষ্য যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিত থাকে, তখন প্রথম হইতেই মানবীয় সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমন্বিত হয় না। প্রথমে খনিজসকল যে প্রণালীতে জন্মে, অবিকল সেই প্রণালীতেই অণু অণু সম্মিলিত হইয়া জরায়ু মধ্যে একটি কোষ হয়। অনন্তর কোষটি উদ্ভিদ্‌ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া দিন দিন বাড়িতে থাকে। পরে ঐ শিলাখণ্ডসংলগ্ন প্রাণীর অনুরূপ হইয়া ক্রমে পুচ্ছশিরঃপ্রাপ্ত কীটের আকার ধারণ করে। স্বল্পকালেই হস্তপদাদি নির্গত হইলে ভেকশাবকের ন্যায় দেখায়। অনন্তর গোধিকার আকার প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর একেবারে স্ত্রী পুং উভয় চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়াতে উহার জরায়ুকোষ দ্বিভাজিত অনুভূত হয়। ক্রমে একটি চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া আইসে, অপরটি শুষ্ক এবং বিলুপ্তপ্রায় থাকে। কিন্তু তখনই হস্তপদের কোন ইতরবিশেষ হয় না,

তখনও অল্প পরিমাণে পুচ্ছ থাকে, এবং সর্ব্বশরীর লোমাবৃত দেখা যায়। সর্ব্বশেষে হস্তপদের বৈচিত্র্য জন্মে, পুচ্ছটি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, গাত্রের লোমশতা ন্যূন হয়, তখন ঐ জরায়ুজ নরশিশুর আকার প্রাপ্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়।"

"পৃথিবীতে অবিকল এইরূপ ব্যাপার যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া ঘটিয়া আসিতেছে, এবং তাহা মৃত্যুপতির শাসনাধীনে হইয়াছে।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য! এ সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহ পক্ষে মৃত্যুপতি কিরূপে সহায়তা করেন ?—জীবজননে যমরাজের অধিকার কি ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"সমস্ত পরকালেই ধর্ম্মরাজের অধিকার। দেহী মাত্রের দেহসম্বন্ধীয় পরকাল, সেই দেহসমুৎপন্ন সন্তানে বিদ্যমান থাকে। যে জীবদেহ কর্ম্মবলে যেমন উৎকর্ষলাভ করে, তাহার পারলৌকিক দেহও তেমন উৎকৃষ্ট হয়। এই জন্য সমস্ত পরিণতি ব্যাপারই যমরাজের আয়ত্ত।"

মধ্যবয়া ক্ষণকাল অতি নিমগ্নচিত্তে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রাণীর সৃষ্টি এবং উৎকর্ষসাধন যে প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা বুঝিলাম। ঐ ব্যাপারে যমরাজের সর্ব্বাঙ্কুশ কর্তৃত্ব। কিন্তু তাঁহাকে ধর্ম্মরাজও বলা যায়। অতএব মানবীয় ধর্ম্মজ্ঞানেরও কি তিনিই নিদানভূত হইয়াছেন ?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"দেহ এবং মনের অধিষ্ঠাতা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। অধিষ্ঠাতা বিভিন্ন হইলে কার্যপ্রণালীও বিভিন্ন হইত এবং তাহা হইলে জীবসংসার একেবারে উৎসাদিত হইত—অথবা কখনই জন্মিত না। যমরাজই ধর্ম্মরাজ। যাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ এক দেহের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনে অন্য দেহের উদ্ভব, তাঁহারই অধিষ্ঠানে এক প্রকার দেহধর্ম্ম হইতে দেহান্তরধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়। শারীর ধর্ম্মও যে প্রণালীতে জন্মিয়াছে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মও সেই প্রণালীতে প্রসূত হইয়াছে।

"সামান্যাকারেও দেখ, কতকগুলি প্রাণী এ প্রকার দেহসম্পন্ন যে, তাহারা পরস্পর সাহায্য না করিলে জীবিত থাকিতেই পারে না। ওরূপ প্রাণীর মধ্যে যাহারা সমাজবন্ধনে অনুরক্ত, তাহারাই যমরাজের শাসনে সম্বর্দ্ধিত হইবে—যাহারা সমাজবন্ধনে অননুরক্ত তাহারা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজবন্ধনপ্রবৃত্তি ঐ প্রাণীদিগের স্বতঃসিদ্ধ, সহজাত ধর্ম্ম হইয়া আসিবে। মধুমক্ষিকাদির মধ্যে ঐরূপ হইয়াছে। তাহারা ঐ ধর্ম্মানুরোধে একত্র সম্মিলিত হইয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে, আপনারা না খাইয়া পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং পুং মক্ষিকাদিগের কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে

তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

"মনুষ্যেরাও সামাজিক জীব। কিন্তু মনুষ্যের দেহ অধিকতর পরিণামের ফল। ঐ দেহে কার্য্যক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি অধিক। এই জন্য মানবগণের সামাজিকতা-জাত পরস্পর মুখাপেক্ষতা অতি প্রবলতর হইয়া থাকে। সেই মুখাপেক্ষতা পুরুষানুক্রমে সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে এমন দৃঢ়তররূপ ধারণ করে যে, তদধীন হইয়া কার্য্য করা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠে। যে সকল নবগোষ্ঠীয়দিগের তাহা সম্যক না হয়, তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুপতির শাসনে বিনষ্ট হইয়া যায়।

"আদিম মনুষ্যগোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে সাহসিকতা, নৈষ্ঠুর্য্য, ক্লেশ, সহিষ্ণুতা, গোষ্ঠীপতির আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং অপত্যস্পৃহতা যেমন প্রধান ধর্ম্ম—নম্রতা, ন্যায়পরতা, অপক্ষপাতিতা, সত্যনিষ্ঠা তেমন প্রবল ধর্ম্ম হয় না। ইহার কারণ এই যে, ঐ অবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মগুলির প্রয়োজন অধিকতর—সেই প্রয়োজন সকলেরই বোধগম্য এবং পরস্পরমুখাপেক্ষতা ঐ সকল ধর্ম্মেরই প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দেয়। আদিমাবস্থায় ঐ সকল ধর্ম্মবিহীন নরগণ সহজেই মৃত্যুকবলিত হইয়া পড়ে। ক্রমে মনুষ্যসমাজ বৃহত্তর এবং শান্তিবহুল হইয়া আসিলে মানবীয় ধর্ম্ম আর একটি সোপানে অধিরোহণ করে। অন্যে কেমন সকল কার্য্যের প্রশংসা এবং কেমন সকল কার্য্যের অপ্রশংসা করে, তাহার প্রকৃতি বোধ হইতে থাকে। তাহা হইলেই পরোপকারিতা, দানশীলতা, নম্রতা এবং বিনয়াদি কোমলধর্ম্ম আদরণীয় হইয়া উঠে, এবং সেই সমাদরের অপেক্ষা করিয়া লোকে ঐ সকল ধর্ম্মের সেবায় অনুরক্ত হয়।

"অনন্তর বুদ্ধিজীবী নরগণ প্রশংসনীয় যাবতীয় কার্য্যের প্রকৃতি উপলব্ধ করিতে পারেন। তাহা করিতে পারিলেই আর সাক্ষাৎ প্রশংসার তেমন অভিলাষ এবং সাক্ষাৎ তিরস্কারের তেমন ভয় থাকে না। তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে সুদূরপরবর্ত্তী পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং যে কর্ম্ম আপনারা মনে মনে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বোধ করেন, কিয়ৎপরিমাণে তাহা করিতেই প্রবৃত্ত হয়েন।

"ধর্ম্মবুদ্ধি এইরূপে দেহপরিবর্ত্তের সহিত, সমাজের অবস্থা-পরিবর্ত্তের সহিত, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত, বিশোধিত এবং সুবিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজের শাসনই তাহার একমাত্র হেতু।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য! কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে অন্তঃকরণে সমূহ আত্মগ্লানি জন্মে, ইহার হেতু কি?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"আত্মসুখেচ্ছা এবং অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা উভয় চিত্তবৃত্তিই অতি প্রবল এবং চিরজাগরূক। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, আত্মসুখদুঃখের স্মৃতি চিরস্থায়িনী হইতে পারে না, অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা অবশ্যই সর্ব্বদা স্মৃতিপথে বিদ্যমান থাকে। যদি আত্মসুখেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা পরিহারপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে আত্মসুখস্মৃতি যেমন তিরোহিত হইয়া থাকে, অমনি অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিবিধ মনোবৃত্তির মধ্যে চিরস্থায়িনী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে অস্থিরতা এবং গ্লানি জন্মে। যে জীবদেহে স্মৃতিশক্তি যেমন প্রবল, সে জীবের আত্মগ্লানিও তেমনি গুরুতর হইয়া থাকে। শিশু এবং বৃদ্ধের অপেক্ষা প্রৌঢ় এবং মধ্যবয়ার স্মৃতিও অধিক এবং দুষ্কর্ম্মে গ্লানিও অধিক। পক্ষী-পশ্বাদি অপেক্ষা নবগণের স্মৃতিশক্তি অধিক—দুষ্কর্ম্মে আত্মগ্লানিও অধিকতর।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে অন্যদীয় মুখাপেক্ষতাই কি সর্ব্বধর্ম্মের মূলীভূত?—নিবৃত্তিই কি ধর্ম্মবীজ নহে?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"সাক্ষাতে হউক, বা পরোক্ষেই হউক, অন্যদীয় মুখাপেক্ষতার অবলম্বন দ্বারাই মনুজগণ ধর্ম্মরাজের শাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মজ্ঞানলাভ করিয়াছে। মুখাপেক্ষতা সামাজিক বন্ধনের সারভূত। ইহা আদ্যাশক্তিপ্রীতি হইতে সমুদ্ভূত। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েই প্রীতির কন্যা। তন্মধ্যে প্রবৃত্তি গৃহবাসিনী বহুসন্তানজননী। নিবৃত্তি ব্রহ্মচারিণী—নিরপত্যা। সহোদরার সন্তানদিগকে সুপালিত এবং সুশিক্ষিত করিয়াই তিনি জীবন যাপন করেন। মুখাপেক্ষতা প্রবৃত্তিপ্রসূতা এবং নিবৃত্তি কর্ত্তৃক শিক্ষিতা।"

এই সকল কথোপকথনে দিবাবসান হইলে ব্রাহ্মণেরা একজন জালজীবীর নৌকারোহণ পূর্ব্বক সম্মুখস্থ একটি দ্বীপে গমন করিলেন। সেই দ্বীপে মহাদেব রামেশ্বরের মন্দির। মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন—দীপাবলী জলিতেছে—শঙ্খঘণ্টার রব হইতেছে—মন্দির নানাদিগ্‌দেশীয় যাত্রিসমূহে পরিপূর্ণ। তাঁহারা অনেকে ভাগীরথী হইতে যত্নপূর্ব্বক জল আনয়ন করিয়া সেই পবিত্র জলে মহাদেবকে স্নান করাইতেছেন।

এই সকল দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের শরীর একান্ত শীতল হইল, মন্দিরমধ্যে যে দীপমালা জ্বালিতেছিল তাহা যেন অতি দূরগত হইয়া ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাপিত হইল, যে শঙ্খঘণ্টাদির ধ্বনি শুনা যাইতেছিল তাহা ক্রমশঃ অশ্রুত হইয়া পড়িল। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তি সংযত হইল। আর কোন বাহ্যজ্ঞান

রহিল না। তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ক্ষণকাল এইভাবে আছেন, এমত সময়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় গিয়া তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শ করিলেন। মধ্যবয়া স্বপ্নবৎ দেখিলেন যেন আপনি একটি অতিসুপ্রশস্ত পাদপতলে দণ্ডায়মান হইয়া আছেন। সেই বৃক্ষের মূল, রসাতল ভেদ করিয়া নীচে নামিয়াছে। তাহার শীর্ষদেশ, আকাশ অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষের যে ভাগ তাঁহার চক্ষুর নিতান্ত সমীপবর্ত্তী, তাহা অতি সুদর্শনীয়। বিশেষতঃ তাহার উর্দ্ধবর্ত্তী একটি শাখা অতি বিচিত্র এবং একান্ত মনোরম। তাহা হইতে কৃষ্ণ, পীত, লোহিত, শুক্ল এই চারিটি বিটপ নির্গত হইয়াছে, এবং প্রতি বিটপেই নানাবস্থ অসংখ্য পল্লব শোভা করিতেছে। কিন্তু শুক্ল বিটপটিই সমধিক প্রবলতর বোধ হইল। তাহার পল্লবসংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সেই পল্লব সমস্ত চতুর্ধা বিস্তৃত হইয়া অপর বিটপত্রয়কে সমাচ্ছন্নপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে। শুক্ল পল্লবদিগের গাঢ়তর চাপে অপর বিটপগুলি হইতে নূতন পল্লবোদ্গাম ক্রমশঃ রহিতপ্রায় হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে অতি গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হইল। তাঁহার ইচ্ছা হইল স্বহস্তে শুক্ল পল্লবদিগের চাপ সরাইয়া দেন। এমত সময়ে হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল-গৌরকান্তি, গম্ভীরপ্রকৃতি একটি মহাপুরুষের সমাগম দেখিয়া ব্রাহ্মণ তটস্থ হইলেন। পুরুষ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অমৃতায়মান আহ্লাদহাস্য সহকারে অতি সুমধুরস্বরে কহিলেন—"ঐটি প্রাণিবৃক্ষ—এই শাখাটির নাম নর-শাখা—চারিটি বর্ণের চারিটি বিটপ মূলজাতি চতুষ্টয়—এই বৃক্ষ আমার পালিত—আমি মৃত্যু।"

'মৃত্যু' নামটি শুনিয়াও ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে কোন ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি একদৃষ্টে পুরুষের সৌম্য গম্ভীরভাব দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। পুরুষ তাঁহার নির্ভীকতা এবং ঐকান্তিক সাত্ত্বিকতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে কহিলেন—"দ্বাপরযুগাবসানে রাজা যুধিষ্ঠির যখন বনবাসক্লিষ্ট এবং অজ্ঞাতবাস-ভয়ে ভীত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয়ার্থ চিন্তাকুলিত ছিলেন, আমি সেই সময়ে একবার তাঁহার চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন দিয়া তাঁহাকে চারিটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রশ্নের কালোচিত প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তুমিও সেই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে পারিলে পূর্ণমনোরথ হইবে—নচেৎ সমস্ত নিষ্ফল। বার্ত্তা কি?—আশ্চর্য্য কি?—পথ কি?—সুখ কি?"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে উত্তর করিলেন—

"সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানে প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়া আছে। মৃত্যুরূপধারী বিধাতা তাহাতে নিত্য নূতন সৃষ্টির বিধান করিতেছেন। জগতের প্রকৃত বার্ত্তা এই।

"পঞ্চভূত পরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে, এবং সেই জীব ক্রমশঃ পরিণত হইয়া ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃত্যুপতির পালনগুণে এতাদৃশ সমূহ মঙ্গলসাধন হইতেছে, লোকে তাঁহাকে ভয় করে এবং অমঙ্গল বলিয়া বোধ করে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য আর কি ?

"সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য এই জগতের মধ্যেই নির্ব্বাহিত হয়। মৃত্যুপতি শিবরূপ ধারণ করিয়া মণ্ডলীভূত নাগরাজের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। অতএব বিশ্বকাণ্ড সমুদয়ই বৃত্তাকার পথে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

"হে ব্যক্তি, আপনার পূর্ব্ব জন্ম ছিল—পর জন্মও হইবে, ইহা নিরন্তর স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া, আপনাকে অংশরূপী বলিয়া জানে, এবং অভিমানশূন্য হইয়া অংশধর্ম্ম প্রতিপালন করে, সেই সুখী।"

ব্রাহ্মণের স্বপ্নভঙ্গ হইল। মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস, সাধু! তুমি মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হইলে। তুমি সমস্ত বিভীষিকা অতিক্রম করিলে।"

একাদশ অধ্যায়

মহাবলিপুর—পুরুষোত্তম—গঙ্গাসাগর

ব্রাহ্মণেরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিয়া একটি দেশীয় অর্ণবযানযোগে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্ণবপোতটি সমুদ্রের কূলে কূলে গমন করতঃ যে সকল স্থান অতিক্রম করিতে লাগিল, বৃদ্ধ সেই সকল স্থানের বিবরণ সংক্ষেপে আপন সহচরকে শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন এবং যুধিষ্ঠির উভয়ে মিলিত হইয়া যে শ্বেতাম্বরা-তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ত্রিগুণপুরে যে প্রকারে বুদ্ধদেবোপাসনার সূত্রপাত হয়, এবং চোল ও পাণ্ড্যরাজ্য যেরূপে সমুদ্ভূত এবং বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বীক্রমে কথিত হইল। তৎসহ নব্য মান্দ্রাজ এবং ফুলচরি নগরের পূর্ব্ববৃত্ত এবং বর্ত্তমান সমৃদ্ধ অবস্থাও বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইল।

এক দিন উভয়ে পোতপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নানা কথাপ্রসঙ্গে আছেন, এমত সময়ে বৃদ্ধ জলতলের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"এই অম্বুরাশি মধ্যে কেমন বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং দেবমন্দির সকল দৃষ্ট হইতেছে—দেখ।" মধ্যবয়া চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, সমুদ্রগর্ভে পাঁচটি দেবালয় এবং অপর কয়েকটি বৃহৎ প্রাসাদ স্থির হইয়া রহিয়াছে—অর্ণবপোত তাহাদিগের উপর দিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ তাঁহার জিজ্ঞাসু নয়নদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন—"এই স্থান ত্রিভুবনবিজয়ী বলি রাজার রাজধানী ছিল। ঐ নিবিড় বনপূর্ণ, হিংস্র-শ্বাপদ-সমাকীর্ণ কূলে উঠিয়া দেখিলে ঐ মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরীর অল্পাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সমধিক ভাগই রসাতলগামী হইয়াছে। এমন অদ্ভুত দর্শন ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি নাই। সমস্ত নগরটি একটি প্রকাণ্ড শৈল কাটিয়া বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রাসাদাদি সমুদায় পাষাণময়। পূর্ব্বে পৃথিবীর উপরে যে ভাবে ছিল, সমুদ্রগর্ভস্থ হইয়া এখনও সেই ভাবে রহিয়াছে। বলি রাজাব কি অতুল বিভবই ছিল। ত্রিবিক্রমরূপী ভগবানের পূর্ণ ত্রিপাদ-পরিমিত অধিকার না হইলে এমন অদ্ভুত রাজধানী নির্ম্মাণের বিভব জন্মিতে পারে না।"

মধ্যবয়া কহিলেন—"কিন্তু ঐ অদ্ভুত কীর্ত্তির আর কি অবশিষ্ট আছে? জগতের সমস্ত ব্যাপারই এইরূপ; নিতান্ত অচিরস্থায়ী এবং অলীক।" বৃদ্ধ কহিলেন—"ঐ কথাটি একপক্ষে সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে অসত্য। জগতের কিছুই একেবারে যায় না। বলি রাজার কীর্ত্তি কি সত্য সত্যই পাতালগামিনী হইয়া একেবারে গিয়াছে? যে দেশে এবম্ভূত নির্ম্মাণকীর্ত্তি কখনও বিরচিত হইয়াছে সে দেশের লোকের মন কি চিরকালই কালমাহাত্ম্য অতিক্রম করিতে সমুৎসুক হইবে না? সে দেশের লোকেরা কি পুরুষানুক্রমে অনন্তকালব্যাপিনী কীর্ত্তির প্রয়াসী হইবে না? উচ্চাভিলাষ সে দেশের লোকের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়াই থাকিবে। তাহারা কাহারও অধিকারের বিস্তৃতি, কিম্বা পরাক্রমের গরিমা, অথবা বিভবের আতিশয্য দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইতে পারিবে না। যদি কোন কারণে কিছুকাল নিতান্ত নিপীড়িত, তিরস্কৃত এবং ঘৃণিত হইয়া থাকে, তথাপি মনে মনে আপনাদিগকে প্রধান বলিয়াই জানিবে। তাহাদের আত্মাদর এবং উচ্চাভিলাষ কখনই বিলুপ্ত হইবে না। বলি রাজা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিলেন। ভগবান যদিও তাঁহাকে পাতালস্থ করিয়াছেন, তথাপি স্বয়ং বলি রাজার দ্বারিত্ব করিতেছেন, এবং কোন সময়ে

তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিবেন, শ্রীমুখে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন। উচ্চ অভিলাষ থাকিলেই তাহার সিদ্ধি হয়। এক জন্মে না হয়—দুই জন্মে না হয়—দশ জন্মে না হয়—পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত থাকিলে, উচ্চাভিলাষের অবশ্যই সিদ্ধি হয়।"

অর্ণবপোত চলিতেছিল—কয়েক দিনের মধ্যে উহা উৎকলরাজ্যের তীর অতিক্রম করিতে লাগিল। শুভ্র বালুকাময় বেলাভূমির মধ্যভাগ হইতে একটি কৃষ্ণ পদার্থ দীপ্যমান হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"ঐটি মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দির। উহা অতি প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ। অন্যান্য বৈষ্ণবতীর্থের ন্যায় এই তীর্থেরও সহিত বুদ্ধোপাসনার সম্বন্ধ ছিল—এক্ষণেও সেই সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধদেব মগধরাজ্যে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মতবাদ প্রথমতঃ পূর্ব্বাভিমুখে প্রচারিত হয়। মিথিলা, বঙ্গ, উৎকল, কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ, এবং দ্রাবিড় ক্রমে ক্রমে বুদ্ধের উপাসনা প্রণালী গ্রহণ করে।

"যখন বৌদ্ধবাদ উৎকলে প্রচলিত ছিল, তখন নীলাচলে বুদ্ধের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। অনন্তর বঙ্গভূমি হইতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ আসিয়া এখানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু উৎকলবাসী প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বৌদ্ধবাদ বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং বৈষ্ণবতা তেমন সহজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিল না। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়-দ্বয়ের পরস্পর বিবাদে ধর্ম্ম্য-শাসন শিথিল হইতে লগিল।

"এমত সময়ে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি অতি দূরদর্শী, পরম জ্ঞানী ও মহাতপস্বী ছিলেন। তিনি একদা নীলাদ্রিতে বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন—হঠাৎ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান এবং যোগাসনাসীন ধ্যানপরায়ণ শাক্যসিংহ—উভয়ে তাঁহার হৃদয়াকাশে সমুদিত হইলেন। রাজা শুনিলেন, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বুদ্ধদেবকে বলিতেছেন—"তোমাতে আমাতে অভেদ—তবে সৃষ্টির পালনে আমাদিগের মূর্ত্তিদ্বয়ের অধিকারভেদ আছে। সমাকার, এক-বংশোদ্ভব, একদেশবাসী নরগণ তোমার মূর্ত্তির উপাসনায় অধিকারী। বিষমাকার, বিভিন্নবংশসম্ভূত নরজাতীয়েরা একদেশবাসী হইলেও ঐ মূর্ত্তির উপাসনায় অধিকারী নহে। তাহাদিগের মধ্যে যত কাল বর্ণাশ্রমভেদের প্রয়োজন থাকে, ততকাল আমি এই চতুর্হস্ত সমন্বিত মূর্ত্তিতেই তাহাদিগের পালন করিয়া থাকি।" বুদ্ধদেব পূর্ব্বাভিমুখ হইলেন—ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং বিদ্যুৎপ্রভা যেমন মেঘমধ্যে বিলীন হয়, সেইরূপে ভগবদ্দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আপন সমক্ষে শ্রীমৎপুরুষোত্তমমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

"তাঁহার তপঃসিদ্ধির প্রভাবে এই মন্দির নির্ম্মিত হইল, জগন্নাথমূর্ত্তি নীলাচল

হইতে সমানীত হইয়া প্রতিষ্ঠাপিত হইল, এবং পুরীর মধ্যে বর্ণাচার রহিত হইল—বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবের সম্মিলনসাধন হইয়া গেল।"

অর্ণবপোত চলিতে লাগিল। ক্রমে গঙ্গাসাগরসঙ্গম দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে, উহা অতি পুণ্যভুমি। এই দেশ সিন্ধু-গঙ্গা-সঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যাক্ষেত্র। এই অর্ণবপোতের নিম্নভাগেই পাতালপুরী। এখানে সমুদ্রের তলস্পর্শ হয় না। দেখ দেখ, স্বর্ণদী কেমন আনন্দোৎফুল্লা হইয়া সাগবসঙ্গমে প্রধাবিতা হইয়াছেন এবং অগাধসত্ত্ব মহাসাগর কেমন বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া ভগবতীকে অপন বক্ষে ধারণ করিতেছেন। মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির এই সম্মিলন ভুমি।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই মহাতীর্থবাসী নবগণ কিরূপ?"

বৃদ্ধ ক্ষণকালমাত্র নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন—"এই মহাতীর্থবাসের সমস্ত শুভফল এখানকার মনুজগণের মধ্যে ফলিত রহিয়াছে। তাহাদিগেরও চিত্তভুমি মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির সঙ্গমস্থল। সাঙ্খ্যসূত্রপ্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি কবেন। তাঁহার অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন, এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়। কিন্তু অন্য কথায় প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধাযী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞানমার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগেব প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষার প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

"ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই যুগে ভাগীরথীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

"এই বঙ্গভুমি সমুদয়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীর-বিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজূটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মবারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল-মূল-শস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা ভুলোকের নন্দনকানন। এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী। কালধর্ম্মবশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করেন নাই?

"কপিলদেবপ্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্র-শাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

অর্ণবপোত নিরন্তর পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া একটি গিরিসমাকীর্ণ প্রদেশসমক্ষে উপনীত হইল। ব্রাহ্মণেরা নৌকাযোগে একটি নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

চন্দ্রশেখর—জ্ঞানের স্বরূপ—কামাখ্যা—গুপ্তসাধন

ব্রাহ্মণেরা যে নদীমুখে উত্তীর্ণ হইলেন, তাহার নাম কর্ণফুলি নদী। তাঁহারা ঐ নদীর তীরে তীরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখ হইলেন এবং উভয়পার্শ্ববর্ত্তী দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থিত দ্রোণি-ভূমি অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস, দুই দিবস, তিন দিবস অতিবাহিত হইল। অনন্তর তাঁহারা বামভাগস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ পর্ব্বতীয় পথ কোথাও নিতান্ত দুরারোহ বলিয়া বোধ হইল না। তবে উহাতে আরোহণ সর্ব্বথা শ্রমসাধ্য। ঐ পথ স্থানে স্থানে এমত সঙ্কীর্ণ যে, আরোহিগণ বিশেষ অবহিত না হইলে স্খলিতপদ হইয়া অধঃপতিত হইতে পারেন।

বৃদ্ধ তাঁহার সহচরকে বলিলেন—"সম্মুখস্থ পঞ্চ শিখরের মধ্যে যেটি সর্ব্বোচ্চ, তাহার শিরোদেশে ঐ শ্বেতাভ শম্ভুনাথ মন্দির দৃষ্ট হইতেছে। উহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া পর্ব্বতারোহণ কর। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য শিখরাদির আবরণে দৃষ্টির ব্যাঘাত হইবে; কিন্তু তখনও যেন গন্তব্য পথ স্থির থাকে—দিক্‌ভ্রম না হয়। ঐ যে শত শত তীর্থযাত্রী দেখিতেছ, উহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই শম্ভুনাথদর্শনলাভে সমর্থ হয় না। নিম্নবর্ত্তী শিখরের কোন কোনটি দেখিয়াই তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়।"

উভয়ে চলিলেন। পর্ব্বতশোভা অতি বিচিত্র। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড উত্থিত হইয়া উভয় পার্শ্বে অভেদ্য প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোথাও কোন শৈলশিরোদেশ প্লাপিত করিয়া ঝর ঝর শব্দে নির্ঝরবারি নামিতেছে; কোথাও চতুর্দ্দিক নিবিড়বৃক্ষরাজিপরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—নির্গমনের পথ আছে

বলিয়াই লক্ষ্য হয় না। আবার শতাধিক পদ গমন না করিতেই বনরাজি হঠাৎ যেন তিরোহিত হয়, এবং একেবারে সমস্ত দিগ্বলয় খুলিয়া যায়।

পর্ব্বতশোভা যেমন বিচিত্র, পর্ব্বতশরীরের উপাদান সমস্তও তেমনি নানারূপ। কোথাও স্বর্ণের ন্যায় পীত—কোথাও রজতের ন্যায় শুভ্র—কোথাও তাম্রের ন্যায় লোহিত—কোথাও লৌহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থসমূহ রাশি রাশি হইয়া রহিয়াছে। কোথাও তাল, খর্জ্জূর, নারিকেল, কদলীর—কোথাও আম্র, পনস, জম্বুর—কোথাও শাল, সর্জ্জ, দেবদারু প্রভৃতির অরণ্যানী দৃষ্ট হইতেছে এবং স্থানভেদে বিভিন্ন পশু-পক্ষীর শব্দ শুনা যাইতেছে।

বৃদ্ধ কহিলেন—"এক একটি পর্ব্বত সমস্ত পৃথিবীর অনুরূপ। পর্ব্বতশরীর সাক্ষাৎ সর্ব্বমূর্ত্তি।"

ব্রাহ্মণেরা একে একে বাড়ব, সূর্য্য, চন্দ্র ও সীতা নামক চারিটি কুণ্ড চারিটি শিখরে দেখিয়া পরিশেষে পঞ্চম শিখরে আরূঢ় হইলেন। সূর্য্যদেব পশ্চিমসমুদ্রে অঙ্গ প্রক্ষালন করতঃ জবাকুসুমসঙ্কাশ করজালদ্বারা শম্ভুনাথের চরণস্পর্শপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্ত আকাশমধ্যে স্বয়ম্ভূমন্দির একমাত্র বিরাজিত রহিল।

বৃদ্ধ সহচরকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়া দেখেন, মন্দিরের তলভাগে একটি সুগভীর গহ্বর; তন্মধ্যে যেন একটি মাত্র দীপ অল্প অল্প জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণ সাবধান হইয়া ক্রমে ক্রমে গহ্বরমধ্যে নামিলেন। নামিয়া দেখেন, সমস্ত গহ্বর অতি প্রোজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ। সে আলোক এমনি স্নিগ্ধ ও প্রখর-জ্যোতি যে, চক্ষুর কষ্টকর না হইয়াও সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তর ভেদ করিয়া চলে—কাহারও ছায়া পড়িতে দেয় না। ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার নিজ দেহেরও আর ছায়া নাই।

দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ যেন রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। ভগবান যোগিবেশধারী, একাকী ও ধ্যান-নিমগ্ন। মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে বোধ হইল, সর্ব্বদিক শূন্য এবং বিশ্বসংসার জীবনরহিত হইয়াছে।

চকিতের ন্যায় ঐ মূর্ত্তির পরিবর্ত্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন—দেবাদিদেব পঞ্চাস্য হইয়াছেন; পঞ্চভূত তাঁহার পাঁচটি মুখ হইয়া বেদগান করিতেছে, সমুদ্র অনন্তনাগের আকারে তাঁহার কটিবন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আর সেরূপ মূর্ত্তি নাই। মুখমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ত্রিনয়ন

রূপে সমুদিত হইয়াছে; মহাবিদ্যা অঙ্কোপরি বিরাজ করিতেছেন; কলাবিদ্যাগণ চতুঃষষ্টি যোগিনীর আকারে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস, সাধু! ভগবান্ দেবাদিদেব তোমাকে স্ব-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তুমি জ্ঞানময়ের প্রতিভায় প্রতিভাত হইলে। তুমি দেখিলে যে, তন্ময়তাই জ্ঞানের স্বরূপ।"

ব্রাহ্মণেরা চন্দ্রশেখর হইতে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে বৃদ্ধব্রাহ্মণ উত্তীর্য্যমান প্রদেশগুলির বিবরণ শ্রবণ করাইয়া সহচরের অধ্বশ্রম বিমোচন এবং কৌতূহলপূরণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ভূমিতে ত্রিপুরেশ্বরীর আবির্ভাব, কাছাড় প্রদেশে ঘটোৎকচবংশীয়দিগের সম্বর্দ্ধন, এবং জয়ন্তীদেশে মহাদেবী জয়ন্তীয় পূজাবিধান সংক্ষেপ কথিত হইল।

অনন্তর কহিলেন—"আমরা এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান মহাতীর্থ-সীমায় উপনীত হইলাম। ইহা সর্ব্বফলপ্রদ কামাখ্যাক্ষেত্র। এই তীর্থ কাশীপ্রয়াগাদির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহে। এখানে লক্ষ্মীসেবিত পুরুষদিগের এবং যশোলিপ্সু ক্রিয়াশালী ব্যক্তিদিগের সমাগম নাই। ইহা মন্ত্রসাধন করিবার তীর্থ। সচেতন মন্ত্রে দীক্ষিত বীর পুরুষেরাই এই তীর্থের প্রকৃত অধিকারী; প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মহামতিরাই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ। ফলশ্রুতিরূপ খণ্ড লড্ডুক প্রদর্শন দ্বারা শিশুবৎ অবোধ যে সাধকদিগকে ধর্ম্মচর্য্যায় প্রলোভিত করিতে হয়, তাহারা এই তীর্থের অধিকারী নহে। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম!"

মধ্যবয়ার জিজ্ঞাসু নয়নদ্বয় বৃদ্ধের মুখমণ্ডলের প্রতি উন্নমিত হইল।

বৃদ্ধ কহিতে লাগিলেন—"তীর্থের নাম কামাখ্যা—কিন্তু উপাসনা নিতান্ত নিষ্কাম—ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ? কিন্তু ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মুক্তির নিমিত্ত যে কামনা তাহাও কামনা। কোন কামনা করিব না, এই কামনাও কামনা। সুতরাং কোনপদার্থই কামাখ্যার অনধিকৃত নহে। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অতি গূঢ় বিষয়। অন্যান্য তীর্থের জলবিন্দু কিম্বা মৃৎকণিকা স্পর্শ করিলে নানা শুভ ফল ফলিত হয়, ব্রহ্মহত্যাদির পাতক দূর হয়, কোটিশঃ পূর্ব্বপুরুষের বৈকুণ্ঠাদিতে বাস হয়। কামখ্যার বিষয়ে ওরূপ ফলশ্রুতি নাই। এখানে অতি কঠোর তপস্যা করিতে হয়; ইষ্টমন্ত্রের মানস জপ করিতে হয়; বিভীষিকার উপদ্রবজাল উত্তীর্ণ হইতে হয়; নানাপ্রকার অনুষ্ঠান অতি সংগোপনে নির্ব্বাহ করিতে হয়; এক জন্ম, শত জন্ম, প্রতীক্ষা করিতে হয়। ফল কি হয়, বলা যায় না। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম।"

মধ্যবয়া আগ্রহাতিশয়প্রপূরিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ কোন্ বীরপুরুষ, এই মহাদেবীর সাধন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করাইয়া, শ্রুতিযুগল পবিত্র করুন।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন—"কামাখ্যাসিদ্ধদিগের নাম থাকিতে পারে না। অসম্পূর্ণ আংশিক পদার্থের নামকরণ হয় এবং নাম থাকে। বেদ- এবং তন্ত্রশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের নাম কি? তাঁহারা ব্রহ্মত্ব এবং শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের নাম ব্রহ্মা এবং শিব। পুরাণশাস্ত্র-প্রণেতৃদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই জ্ঞানপ্রচারকর্ত্তা; অতএব সকলেই বেদব্যাস। মহাবিদ্যাগণের পূজাপ্রদ্ধতি প্রকাশক বিজিতেন্দ্রিয় মহাত্মাদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন; অতএব সকলেই বশিষ্ঠ। নাম রাখিবার কামনা থাকিলে কি নিষ্কাম উপাসনা হয়? এখানকার সাধন প্রকরণ নিতান্ত গুহ্য। ইষ্টসাধন করিব—সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়—হউক, শরীর যায়—যাউক, নাম ডুবে—ডুবুক, এমত প্রতিজ্ঞারূঢ় বীরপুরুষেরাই এই মহাসাধনে রত হইতে পারেন। ইহা সাক্ষাৎ শক্তি-সাধন।"

মধ্যবয়া চমৎকৃত হইয়া সমুদয় শুনিলেন। শুনিয়া ক্ষণকাল গাঢ়চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে এই তীর্থের অনুষ্ঠেয় ব্যাপার কি কাহারও কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"তাহা প্রকাশিত হইবার নহে এবং এক প্রকারও নহে। সাধকভেদে অভীষ্ট দেবতার রূপভেদ হয়। বিভিন্নরূপ দেবতার পূজাপ্রদ্ধতিও বিভিন্ন। তোমার ধ্যানগম্য যে মূর্ত্তি, তাহা এ পর্য্যন্ত অপর কাহারও ধ্যানগম্য হয় নাই। সুতরাং সেই মূর্ত্তির পূজা এবং সাধনবিধি তোমাকেই স্বয়ং তপস্যাবলে জানিয়া লইতে হইবে।

"শক্তিসাধনের গুরু দ্বিদলাধিষ্ঠাতা ভ্রূযুগমধ্যস্থ মহেশ্বর ভিন্ন আর কেহই নাই। যোগশাস্ত্রের অভ্যাস এবং নিয়ম পালন দ্বারা শরীর দৃঢ়, ইন্দ্রিয় বশীভূত, মন শুচি এবং চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু সেই সাধনসমুদ্রে তাঁহার তরী একবার ভাসমান হইলে তাহা চলিবে কি না, কিরূপে চলিবে, কত কালে কোথায় চলিবে, তাহা সাধকের ইষ্টদেবতা এবং মহাগুরু ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারেন না। তাঁহারাও জানিতে পারেন কি না, সন্দেহ।"

মধ্যবয়া একান্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের উচ্চারিত শেষোক্ত শব্দগুলি তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন ধ্বনিত হইয়াই নির্গত হইল—"তাঁহারাও জানেন কি না, সন্দেহ;"

বৃদ্ধ কহিলেন—"আমি সপ্তকল্পান্তজীবী হইয়া অনেক ব্যাপারই স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। কিন্তু সৃষ্টিবিষয়ে অদ্যাপি সুপরিস্ফুট জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না। স্বয়ং ব্রহ্মাও সৃষ্টিকার্য্য-বিষয়ে সমগ্র জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তাহা সন্দেহের স্থল। কারণ বেদে উক্ত হইয়াছে 'সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে, সৃষ্টি করিবেন কি না, ঈশ্বর স্বয়ং তাহা জানিতেন বা জানিতেন না।' শক্তিসাধন এবং সৃষ্টিপ্রকরণ একই ব্যাপার।"

এই সকল কথোপকথনাবসরে ব্রাহ্মণেরা একটি নদীতীরে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেই নদীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—"এই ব্রহ্মপুত্র মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবে। উহার শিরোভাগে ঐ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে। কামাখ্যামন্দির দূর হইতে দেখিবার নহে। উহা মনোভব গুহা মধ্যস্থিত। ঐ স্থলে কাহারও সমভিব্যাহারী হইবার অধিকার নাই। এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেহমূর্ত্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ হইল। তাঁহার পূজাবিধি কি? তাহা মনোভাব গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং অবগত হও।"

মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই কথা বলিয়া ব্যাসদেবকে সস্নেহআলিঙ্গনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

॥ সমাপ্ত ॥